কর্নেল সমগ্র

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

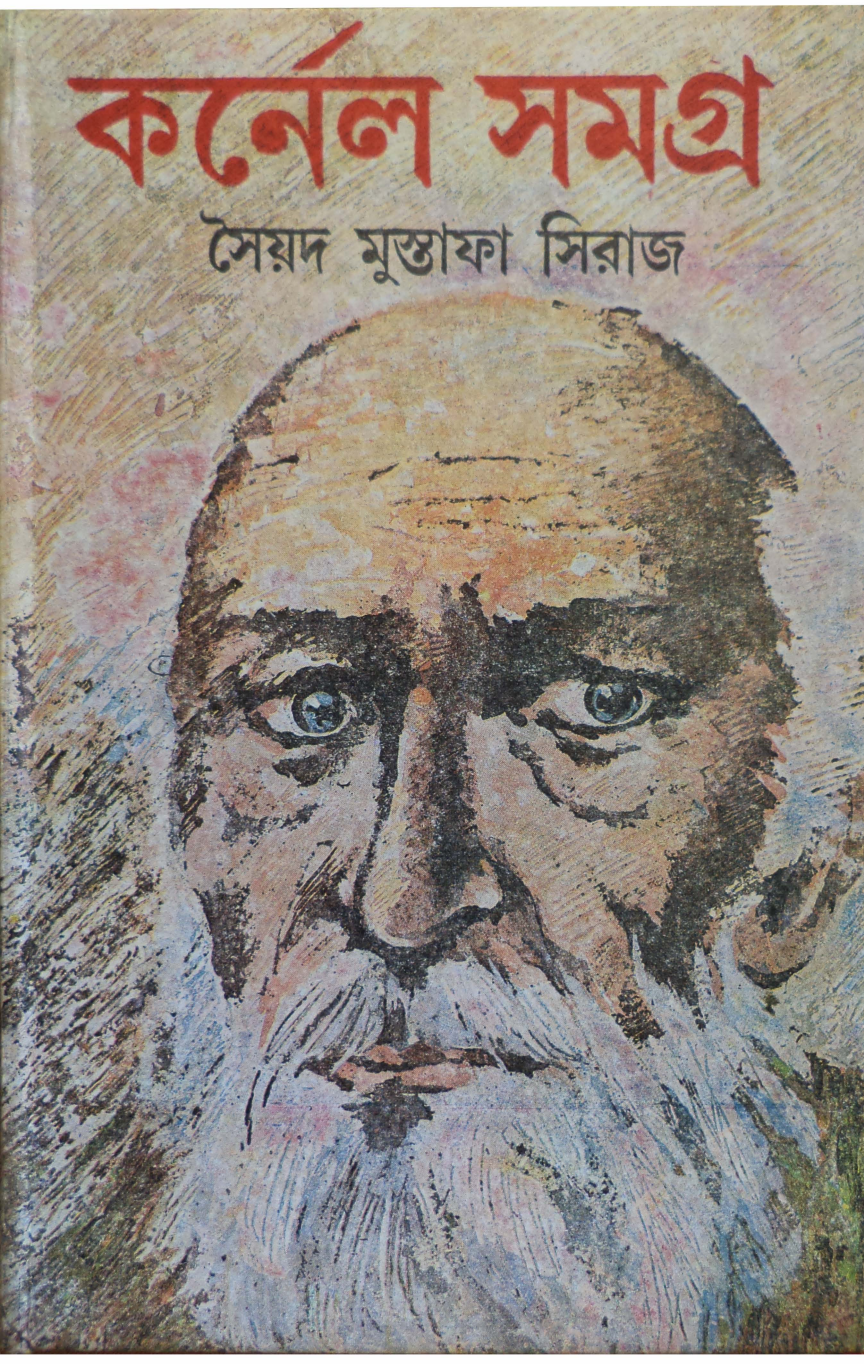

কর্নেল সমগ্র

১৪

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

দে'জ পাবলিশিং
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

COLONEL SAMAGRA-14
A Collection of Detective Stories & Novels
by SYED MUSTAFA SIRAJ
Published by Sudhangsu Sekhar Dey, Dey's Publishing
13 Bankim Chatterjee Street, Kolkata 700 073
Phone : 2241 2330/2219 7920, Fax : (033) 2219 2041
e-mail : deyspublishing@hotmail.com
Rs. 100.00

ISBN : 978-81-295-1099-0

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০১০, অগ্রহায়ণ ১৪১৭

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

১০০ টাকা

প্রকাশক : সুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

বর্ণগ্রন্থন : অনুপম ঘোষ, পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা ৭০০ ০১২

মুদ্রক : সুভাষচন্দ্র দে, বিসিডি অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

কর্নেলের গুণমুগ্ধ পাঠকদের
করকমলে—

লেখকের অন্যান্য বই

অন্ধকারের নায়ক
কর্নেল সমগ্র (১-১২)
কিশোর কর্নেল সমগ্র (১ম, ২য়, ৩য়)
নেপথ্যে আততায়ী
দেবী আথেনার প্রত্নরহস্য
লালুবাবু অন্তর্ধান রহস্য
কর্নেলের একদিন
নিষিদ্ধ অরণ্য, নিষিদ্ধ প্রেম
উপন্যাস সমগ্র (১ম, ২য়)
থ্রিলার সপ্তক
থ্রিলার পঞ্চক
স্বর্ণচাঁপার উপাখ্যান
রূপবতী
বেদবতী
হাওয়া সাপ
জনপদ জনপথ
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ততৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কাগজে রক্তের দাগ
খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
সমুদ্রে মৃত্যুর ঘ্রাণ
রোড সাহেব ও পুনর্বাসন
জিরো জিরো নাইন
শ্রেষ্ঠ গল্প
ডমরুডিহির ভূত
সন্ধ্যানীড়ে অন্ধকার
তৃণভূমি
বিষাক্ত প্রজাপতি

ছোটদের জন্যে

কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
কোকোদ্বীপের বিভীষিকা
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর
হাট্টিম রহস্য
কালো মানুষ নীল চোখ
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
বনের আসর
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
কালো বাকসের রহস্য
ভয়ভূতুড়ে

সূচি

প্রজাপতি রহস্য	.....	৪০২৯
রেনবো অর্কিড রহস্য	.....	৪১০৮
ব্ল্যাক অ্যামবাসাডার		৪১৮০
ভূতুড়ে বাগানবাড়ি		৪২৩৭

প্রজাপতি রহস্য

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কৃতান্তকুমার হালদার, আমাদের প্রিয় 'হালদারমশাই' খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তাঁর ডান হাতের দুই আঙুলে এক চিমটে নস্যি। হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন—অ্যাঁ? কয় কী? বেড়ালের শোকে মাইনষের মৃত্যু!

বিস্ময় প্রকাশের পর তিনি নাকে নস্যি গুঁজে প্যান্টের বাঁ পকেট থেকে নোংরা রুমাল বের করে যথারীতি নাক মুছলেন। তারপর আমার দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে বললেন—জয়ন্তবাবু! আপনাগো সাংবাদিকগো লইয়া এই এক প্রবলেম!

জিজ্ঞেস করলুম—কী প্রবলেম হালদারমশাই?

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন—যা শোনবেন, তাই লেইখ্যা ফেলবেন! মশায়! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি! কখনো এমন কথা শুনি নাই যে কারও পোষা বেড়াল মরলে তার শোকে সে-ও মারা যায়। কী কাণ্ড!

একটু হেসে বললুম—হালদারমশাই। খবরটা আমি পড়িনি। তবে এমন কিছু ঘটনা অসম্ভব বলেও মনে হয় না। পোষা পশুপাখির প্রতি কিছু মানুষের প্রচণ্ড ভালোবাসা থাকতেই পারে। তাদের কোনো কারণে মৃত্যু হলে কেউ মনে প্রচণ্ড শোক পেতেও পারে। আর সেই শোকের প্রচণ্ড শকে হার্ট ফেল করে তার মৃত্যুও হতে পারে।

হালদারমশাই খি খি করে হেসে উঠলেন। — কর্নেলস্যার! জয়ন্তবাবুরে প্রচণ্ডের ভূতে পাইচ্ছে। তিনখান প্রচণ্ড কইলেন। শোনলেন তো?

—হ্যাঁ। শুনলাম। কর্নেল একটা বইয়ের পাতায় রঙিন প্রজাপতির ছবি আতস কাচের সাহায্যে খুঁটিয়ে দেখতে বললেন। —তবে সত্যি বলতে কী, জয়ন্ত নিজের অজ্ঞাতসারে সম্ভবত একটা সত্য কথাই বলে ফেলেছে!

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন—অ্যাঁ? জয়ন্তবাবু সইত্য কইছেন? কী সইত্য?

—ওই 'প্রচণ্ড' শব্দটার কথাই বলছি।

—তার মানে?

—খুব সরল মানে হালদারমশাই। খবরটার আড়ালে তিনটে নয়, তিন দুগুণে ছটা প্রচণ্ডতা লুকিয়ে আছে।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বললেন—খবরটা আপনি পড়ছেন কর্নেলস্যার?

কর্নেল বইটা আর আতস কাচ টেবিলে রেখে ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে

বসলেন। তারপর বললেন—আপনি খবরটা খুঁটিয়ে পড়েননি। এমনকী, হেডিংটাও খুঁটিয়ে পড়েননি। না, না। তার জন্য আপনাকে দোষ দিচ্ছি না। করনগড়ের বৃদ্ধা রানিমা প্রকৃতপক্ষে একজন মানুষ তো বটেই।

হালদারমশাই এবার খবরের কাগজের সেই খবরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তারপর অভ্যাসমতো প্রতিটি লাইনের তলায় তার লম্বা তর্জনী রেখে বিড়বিড় করে খবরটা পড়তে থাকলেন। একটু পরে তিনি সোজা হয়ে বসে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন—হেভি মিস্ট্রি!

কর্নেল হাসলেন। —বরং জয়ন্তর প্রচণ্ডটা এর সঙ্গে জুড়ে দিন হালদারমশাই। প্রচণ্ড হেভি মিস্ট্রি! আমি আপনাকে বলছিলুম ছটা প্রচণ্ডতা লুকিয়ে থাকার কথা। খবরে এবার পড়লেন, করনগড়ের বৃদ্ধা রানিমার মোট ছটা পোষা বেড়াল ছিল। তাই না?

—হঃ! ছয়খান বেড়াল। কিন্তু ছয়খান বেড়ালের সঙ্গে ছয়খান প্রচণ্ডতা লুকাইয়া আছে। এট্টু বুঝাইয়া কন।

—এই বেড়ালগুলোর প্রত্যেকটার গায়ের রং আলাদা। একটার গায়ের রং ধূসর। একটার ফিকে কমলা। একটার কালো। একটার দুধ সাদা। একটার গায়ের রং মেটে। আর বাকি বেড়ালটার গায়ের রং ময়লা সাদা। ইংরেজিতে ডার্টি হোয়াইট বলা যায়। অবশ্য এই ছটা বেড়ালের পেটের রং সাদাই বলা যায়। কোনোটার পায়েও সাদা ছোপ আছে।

অবাক হয়ে বললুম—আপনি বেড়ালগুলো দেখেছেন?

কর্নেল আমার কথার পাশ কাটিয়ে গিয়ে বললেন—আমরা অনেকসময় ছাপা হরফে যা লেখা আছে, তা খুঁটিয়ে লক্ষ্য না করেই বাক্যের সাবস্ট্যান্স অর্থাৎ সারপদার্থ মনে মনে পড়ে ফেলি। এটা একটা সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক ঘটনা। হালদারমশাইয়ের ক্ষেত্রে সেটাই ঘটেছিল। যাই হোক, ঠাকুরঘরে পুজো শেষ করে এসে করনগড়ের বৃদ্ধা রানিমা তাঁর বেডরুমে ঢুকে দেখেছিলেন, তাঁর আদরের প্রাণীগুলো ঘরের মেঝেয়, এমনকী, তাঁর পালংকের তলায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আছে। রানিমার পরনে তখনও পুজোর পোশাক। হাতের রেকাবে প্রসাদ। প্রত্যেকদিন ভোরবেলা স্নান করার পর তিনি তিনতলার ঠাকুরঘরে পুজোয় বসতেন। তারপর গৃহদেবতাকে পায়েস আর কাটা ফল নিবেদন করে দোতলার বেডরুমে আসতেন। বেড়ালগুলো তাঁর দিকে ছুটে আসত। তখন তিনি রুপোর রেকাবে রাখা প্রসাদ মেঝেয় রাখতেন। বেড়ালগুলো চেটেপুটে সব খেয়ে ফেলত। কিন্তু এদিন রানিমা বেড়ালগুলোর ওই অবস্থা দেখেই মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। রেকাব পড়ে যাওয়ার শব্দ শুনে তাঁর পরিচারিকা ছুটে আসে। তার ডাকাডাকিতে বাড়ির লোকেরা এসে রানিমাকে আগে তাঁর পালংকে শুইয়ে দেয়। তারপর চোখে-মুখে জল ছিটিয়ে তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। কিন্তু কী একটা কথা বলেই

আবার জ্ঞান হারান। এরপর ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেন, রানিমা আর বেঁচে নেই।

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে কর্নেলের কথা শুনছিলেন। উত্তেজনায় তাঁর সরু গোঁফের দুটি ছুঁচোলো ডগা যথারীতি তিরতির করে কাঁপছিল। তিনি এবার বলে উঠলেন—খবরে তো এত কথা লেখা নাই!

কর্নেল একটু হেসে বললেন—ঠিক বলেছেন হালদারমশাই। মফস্‌সলের সংবাদদাতার পাঠানো খবরে এত কিছু ডিটেলস লেখা নেই। কিন্তু যতটা লেখা আছে আমি তা বিশ্লেষণ করে শোনালুম।

—কিন্তু কর্নেলস্যার, ছয়খান বেড়ালের গায়ের রঙের ডেসক্রিপশন দিলেন ক্যামনে?

আমি মুখে গাম্ভীর্য এনে বললুম—কর্নেলকে কেউ-কেউ বলেন অন্তর্যামী পুরুষ। সম্ভবত সেটা ওঁর মুনিঋষিসুলভ সাদা দাড়ির মাহাত্ম্য। কেউ কেউ বলেন, কর্নেলের মাথার পিছনেও নাকি একটা চোখ আছে। এখন আমি বলতে চাই, কর্নেলের মাথার পিছনের অদৃশ্য চোখটা ওঁর বাইনোকুলারের মতো। অর্থাৎ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। এতই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন যে তিনি অনেক দূরের কোনো করনগড় অবধি দেখতে পেয়েছেন।

কর্নেল আমার রঙ্গব্যঙ্গ কানে নিলেন না। মৃদু হেসে তিনি বললেন—বেড়ালগুলোর গায়ের রং আমি ওই খবর থেকে বিশ্লেষণ করে বর্ণনা দিলুম জয়ন্ত!

আমি কিছু বলার আগে গোয়েন্দাপ্রবর বলে উঠলেন—খবরে কি তা লেখছে? পড়লাম না তো কর্নেলস্যার!

—হালদারমশাই! খবরে লেখা আছে ছটা ছয় রঙের বেড়াল। তাই না?

—হঃ! তা লিখছে।

—আমাদের দেশে এ যাবৎকাল নানা জায়গায় যত বেড়াল দেখেছি, তাদের গায়ের রং ওই ছটা রঙের বাইরে নয়। আপনারা কি কেউ লাল সবুজ নীল এই তিন রঙের বেড়াল কোথাও দেখেছেন?

প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটু ভেবে নিয়ে বললেন— কর্নেলস্যার ঠিক কইছেন। জয়ন্তবাবু! কর্নেলস্যার রানিমার বেড়ালের গায়ের রঙের যে ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন, তার বাইরে কোনোও রঙের বেড়াল কি দ্যাখছেন কোথাও?

একটু ভেবে নিয়ে বললুম—নাঃ! আর কী রং হতে পারে মাথায় আসছে না।

এইসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী! তারপর তিনি দেয়াল ঘড়ি দেখে নিলেন। লক্ষ্য করলুম, দশটা পাঁচ বাজছে।

কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্টের এই জাদুঘর সদৃশ বিশাল ড্রয়িং রুমের বাঁ দিকে দরজার পর ছোট্ট একটা ঘর আছে। সেটা ডাক্তারদের চেম্বারে রোগীদের ওয়েটিংরুমের মতো এবং আয়তনে অপ্রশস্ত। সেই ঘরের বাইরের দরজাই

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টের সদর দরজা। ষষ্ঠী ওই অপ্রশস্ত রুমে ঢোকে ডাইনিং ও কিচেনের করিডর দিয়ে। কারও নির্দিষ্ট সময়ে আসবার কথা ষষ্ঠীকে কর্নেল বলে থাকলে সে আগন্তুকের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে ঢোকে না। করিডর দিয়ে সোজা কিচেনে চলে যায়।

তাই একটু পরে এক ভদ্রলোককে একা এ ঘরে ঢুকতে দেখেই বুঝলুম, ষষ্ঠী জানত ইনি আসবেন। ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। গায়ের রং ফর্সা। পরনে হাফহাতা বুশশার্ট আর প্যান্ট। হাতে একটা ব্রিফকেস।

তিনি ঘরে ঢুকেই প্রথমে আমাদের তিনজনকে দেখে নিয়েছিলেন। এবার কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনিই কি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আপনি মিঃ তীর্থব্রত সিংহ!

ভদ্রলোক সায়েবি কেতার মানুষ, তা বোঝা গেল। তিনি কর্নেলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন এবং তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার পর বললেন—আপনার পাওয়ার অব অবজারভেশন সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য ঘটনা শুনেছি ক্যাপ্টেন এইচ সি পাণ্ডের কাছে।

—প্লিজ আগে বসুন মিঃ সিংহ।

সিংহসায়েব সোফায় বসে ব্রিফকেসটা পাশে রাখলেন। তারপর বললেন—এঁদের পরিচয় পেলে খুশি হতুম কর্নেল সরকার।

—জয়ন্ত চৌধুরি। আমার এই তরুণ বন্ধু এই বয়সেই বহুলপ্রচারিত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাংবাদিক। ইনি মিঃ কে কে হালদার। জাঁদরেল পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। এঁরা দুজনেই আমার বিশ্বস্ত সহযোগী।

তীর্থব্রত সিংহের কাছ থেকে আমরা একটু দূরে বসেছিলুম। সে-কারণেই আমরা নমস্কার বিনিময় করলুম। তারপর তিনি মৃদু স্বরে বললেন—কলকাতা এলে আমি হোটেল এশিয়াতে উঠি। ওখানে একটা বিশেষ সুবিধা আছে। ওঁরা দরকার হলে গাড়ির ব্যবস্থা করে দেন। গতরাত্রে আপনার কাছে তাই আসবার কোনো অসুবিধে ছিল না। কিন্তু রাত্রি দশটায় আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছে ছিল না বলেই ফোন করেছিলুম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য সকালে গাড়ি পেতে দেরি হওয়ার জন্য পঁয়ত্রিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছি। আপনি কর্মব্যস্ত মানুষ। জানি না এতে আপনার কোনো অসুবিধে করে ফেলেছি কি না। করে থাকলে আমি দুঃখপ্রকাশ করছি কর্নেল সরকার!

কর্নেল সহাস্যে বললেন—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে যদি আপনাকে বলে থাকেন আমি কর্মব্যস্ত মানুষ, তা হলে তিনি আমার পুরোনো জীবনের কথা ভেবেই বলেছেন। কাজেই আপনার দুঃখপ্রকাশের কারণ নেই। প্রকৃত ঘটনা হল, আমি এখন প্রায়ই কর্মহীন হয়ে পড়ি। বিশেষ করে এই অগাস্ট মাসে। আমার হাতে করার মতো

কিছু কাজ এখন নেই। তবে—প্লিজ একটু অপেক্ষা করুন। কফি আসুক। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে। আপনি নার্ভ চাঙ্গা করার পর যা কিছু বলার বলবেন। কই ষষ্ঠী?

ষষ্ঠীচরণ শিগগির ট্রেতে কফির পট, আর কাপ প্লেট রেখে গেল। কর্নেল একটা কাপে কফি ঢেলে মিঃ সিংহকে দিলেন। তারপর হালদারমশাই এবং আমাকে দেওয়ার পর তাঁর নিজস্ব লম্বাটে কাপে কফি ঢেলে চুমুক দিলেন। তীর্থব্রত সিংহ কফি খেতে খেতে বললেন—বাঃ! আপনার লোকটি চমৎকার কফি করে তো। সত্যি বলতে কী, আমাদের দেশে কোথাও অমি এতকাল প্রকৃত কফির স্বাদ পাইনি। আমার যা প্রফেশন, মাঝে মাঝে বিদেশে যেতে হয়। সাউথ আফ্রিকার ডারবানে ঠিক যে-স্বাদের কফি খেয়েছিলুম, অবিকল সেই স্বাদ!

কর্নেল হাসলেন—ধন্যবাদ মিঃ সিংহ! আমার সংগৃহীত এই কফি সাউথ ইন্ডিয়ার।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কফিপানের পর মিঃ সিংহ বললেন—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বলছিলেন, তিনি নাকি আপনাকে কেসটার মোটামুটি একটা ব্যাকগ্রাউন্ড জানিয়েছেন!

—জানিয়েছেন। তবে যা-ই বলুন উনি একজন বাইরের লোক। তা ছাড়া মূল ঘটনার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। উনি যা কিছু আমাকে বলেছেন, সবটাই অন্যের মুখে শোনা।

—আমারও অবশ্য কতকটা তা-ই। ঘটনার সময় আমি ফ্যাক্টরিতে ছিলুম।

—কিন্তু আপনিই নাকি ভদ্রমহিলার মুখ থেকে লালা ঝরতে দেখেছিলেন? লালায় রক্তের ছিটেও ছিল?

মিঃ সিংহ সোজা হয়ে বসলেন। —একজ্যাক্টলি! আমিই এটা লক্ষ করেছিলুম। আর তা কখন জানেন? যখন মামিমাকে চিতায় শোওয়ানো হয়েছে, ঠিক তখন। হ্যাঁ, অনেক সময় মৃতের নাক দিয়ে ওই জাতীয় তরল কিছু গড়িয়ে পড়বে জেনেই নাকে তুলো গুঁজে দেওয়া হয়। কিন্তু ঠোঁটের বাঁ কোনা দিয়ে লালাগড়ানো ব্যাপারটা আমার অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল।

—আপনার মামিমা মারা যান সাড়ে ছটা থেকে সাতটার মধ্যে। তাই না?

—হ্যাঁ। ডাক্তারবাবু সওয়া সাতটায় যান। তিনি পরীক্ষা করে বলেন, মামিমা হার্টফেল করে মারা গেছেন।

—আপনি তখন ফ্যাক্টরিতে ছিলেন বললেন। আপনি কি ভোরবেলায় সেখানে যান?

মিঃ সিংহ একটু বিব্রতভাবে বললেন—না। কোনোদিনই ওইসময় আমি যাই না। ঘটনা হল, সেদিন ভোর সাড়ে পাঁচটায় টেলিফোনের বিরক্তিকর শব্দে ঘুম ভেঙেছিল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই শুনি, কেউ হিন্দিতে বলছে, সিনহা সাব! আপনার ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগেছে। শিগগির সেখানে চলে যান।

কর্নেল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। বললেন—তারপর আপনি কী করলেন?

—তখনই দমকলে খবর দিয়ে নিচে এসে গ্যারাজ থেকে গাড়ি বের করে বেরিয়ে গেলুম। পোশাকও বদলাইনি। নাইটড্রেস পরেই বেরিয়েছিলুম। শেষ রাত্রে একপশলা বৃষ্টি হয়েছিল। যে গতিতে যাচ্ছিলুম, গাড়ির চাকা পিছলে গিয়ে পাহাড়ি খাদে পড়ে মারা যেতুম।

—ফ্যাক্টরির দূরত্ব কত?

—প্রায় আট কিলোমিটার। ওদিকটায় ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন।

—গিয়ে কী দেখলেন—

—ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগেনি। ওই জোনেই দমকল আফিস। দুটো দমকল আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। দমকলকর্মী আর অফিসাররা ফ্যাক্টরিতে চারদিক ঘুরে পরীক্ষা করে বেড়াচ্ছিলেন, কোথায় আগুন লেগেছে। বাইরের মেইন গেট অবশ্য দারোয়ানরা খুলে দিয়েছিল। তবে ফ্যাক্টরিতে চাবি এক সেট থাকে ম্যানেজার সিদ্ধেশ নারায়ণের কাছে। তিনি ফ্যাক্টরিতে যান ঠিক নটায়। যাই হোক, আমার চাবির সেট বুদ্ধি করে নিয়ে গিয়েছিলুম। ফ্যাক্টরি খুলে আলো জ্বেলে দিলুম। আশ্চর্য ঘটনা!

—আগুন লাগেনি কোথাও?

—নাঃ।

—তারপর আপনি কী করলেন?

—অফিস খুলে ম্যানেজারকে ফোন করে সব জানালুম। তাঁকে তখনই চলে আসতে বললুম।

—তিনি কখন এলেন?

—সাতটা থেকে সওয়া সাতটার মধ্যে। যাই হোক, অফিসে বসে দুজনে এরকম সাংঘাতিক একটা উড়ো ফোনের কথা নিয়ে আলোচনা করছি, সেই সময় আমার স্ত্রী অরুণিমার ফোন এল। মামিমা হার্টফেল করে মারা গেছেন। এই পরিস্থিতিতে আমার মানসিক অবস্থা কী হতে পারে, একটু চিন্তা করুন কর্নেল সরকার।

কর্নেল আস্তেসুস্থে কফি পান করছিলেন। এতক্ষণে কফি শেষ ক'রে চুরুট ধরালেন। তারপর একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন—আপনার মামিমার বডি চিতায় তোলা হয়েছিল কখন?

—তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। এলাকায় মামিমা খুব জনপ্রিয় ছিলেন। মামাবাবু তো ছিলেনই। ওই এলাকায় জাতপাতের অবস্থা কী রকম, তা আপনার জানবার কথা। আমার মামা অবশ্য উত্তররাঢ়ী কায়স্থ ছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের জাতপরিচয় দিতেন ক্ষত্রিয় হিসেবে। এদিকে মামিমা রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। তাঁর বাবা

দর্পনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই ছিলেন পুরুষানুক্রমে রাজা পদবিধারী জমিদার। তিনি মামিমার অসবর্ণ বিয়ে মেনে নিয়েছিলেন। জামাইকে ঘরে তুলেছিলেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁকে তাঁর জমিদারির উত্তরাধিকারী করেছিলেন। আমার মামা প্রসন্নকুমার সিংহ তাঁর শ্বশুরের মৃত্যুর পর প্রজাদের কাছে 'রাজাসায়েব' হয়ে উঠেছিলেন। অবশ্য এলাকাটা তাঁর আমলে আদিবাসীপ্রধান ছিল। কালক্রমে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও করনগড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এখনকার দিনে হলে ওই অসবর্ণ বিয়ে নিয়ে কী ঘটত বুঝতেই পারছেন। রাজ্যটা বিহার।

'করনগড়' শব্দটা শুনেই চমকে উঠেছিলুম। হালদারমশাইয়ের দিকে তাকালুম। তিনি চোখের ভাষায় আমাকে কিছু বললেন যেন। বুঝতে পারলুম না। তবে এতক্ষণে বুঝে গেছি যে এটা সেই 'ছটা বেড়ালের শোকে রানিমার মৃত্যু'-র কেস। কর্নেল কি তা হলে ইচ্ছে করেই তাঁর পড়া খবরের কাগজটা এমনভাবে ভাঁজ করে রেখেছিলেন, যাতে হালদারমশাইয়ের সরাসরি চোখে পড়ে ?

কর্নেল আবার বললেন—তারপর কী হল বলুন।

মিঃ সিংহ বললেন—শ্মশানে উপস্থিত অনেকেই ডেডবডির মুখ দিয়ে লালা গড়ানোর ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু আমার মাথায় একটা সন্দেহের কাঁটা বিঁধতে শুরু করেছিল। আমি শেষ পর্যন্ত আমার এক বন্ধু কুন্দলাল শর্মাকে থানায় পাঠালুম। পুলিশ এল। স্থানীয় হাসপাতালের একজন ডাক্তারকে সঙ্গে এনেছিল কুন্দলাল। সেই ডাক্তারও সন্দেহ প্রকাশ করলেন। তখন অ্যাম্বুল্যান্স আনিয়ে মামিমার ডেডবডি মর্গে চালান দিল পুলিশ। সেদিনই রাত একটার মধ্যে মর্গের রিপোর্ট থানায় পৌঁছেছিল। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বডির কাঁধের কাছে ইঞ্জেকশনের চিহ্ন আছে এবং সাংঘাতিক কোনো বিষই মামিমার মৃত্যুর কারণ। কী বিষ, তা জানার জন্য কাঁধের কাছে ইঞ্জেকশনের জায়গার মাংস কেটে পাটনায় ফরেনসিক ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। পরদিন শুক্রবার সকালে মামিমার বডি ফেরত দিল পুলিশ। বেলা সাড়ে দশটার মধ্যে দাহ হয়ে গেল।

—বেড়ালগুলোর পোস্টমর্টেম করা হয়নি?

—বেড়ালগুলোকে রাজবাড়ির এককোণে মাটির তলায় পুঁতে রাখা হয়েছিল। পুলিশ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেড়ালের বডিগুলো তুলে মর্গে পাঠিয়েছিল। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ বলা হয়েছে, সাংঘাতিক কোনো বিষ। পাটনার ফরেনসিক এক্সপার্টরাও কীসের বিষ তা এখনও বুঝতে পারেননি।

—পুলিশ কি কাউকে অ্যারেস্ট করেছে?

—মামিমার পরিচারিকা নন্দরানি আর আমাদের রাজবাড়ির সরকারজি সুখলাল দুবেকে।

—মোটিভ?

মিঃ সিংহ গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে বললেন—মোটিভ আমার কাছে অস্পষ্ট।

কিন্তু পুলিশের বক্তব্য, ওরা দুজনে কারও কাছে প্রচুর টাকা নিয়ে এই জঘন্য কাজ করেছে। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা, নন্দরানির বিছানার তলা থেকে দশহাজার টাকা পাওয়া গেছে। আর সরকারজির ঘরের কুলুঙ্গিতে বজরঙ দেবের মূর্তির তলা থেকেও দশহাজার টাকা পুলিশ উদ্ধার করেছে।

—টাকার ব্যাপারে আসামিদের কী বক্তব্য?

—তারা কান্নাকাটি করে বলেছে, এই টাকার কথা তারা জানে না। কেউ তাদের মিথ্যা করে ফাঁসানোর জন্য টাকা তাদের ঘরে পাচার করেছে।

—টাকাগুলো পিনআঁটা ছিল? অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি, ব্যাংক থেকে দশ হাজার টাকার নোটের বান্ডিল যেভাবে দেওয়া হয়?

—না। খোলা অবস্থায় গোছানো ছিল।

কর্নেল কিছুক্ষণ চুপচাপ চুরুট টানার পর বললেন—রানিমা স্বর্ণময়ী সিংহের প্রোপার্টি তাঁর মৃত্যুর পর তো আপনিই পাবেন। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বলেছেন, তাঁর সন্তানাদি নেই।

লক্ষ করলুম, কর্নেলের অতর্কিত এবং সরাসরি এই প্রশ্নে তীর্থব্রত সিংহের মুখে ঈষৎ ক্ষোভ কিংবা রোষের আভাস ফুটে উঠেছিল। কিন্তু পরক্ষণে তা মিলিয়ে গেল। তিনি হেসে উঠলেন।—কর্নেল সরকার! ক্যাপ্টেন পাণ্ডে কি আপনাকে একথা বলেননি যে মামিমার প্রোপার্টির যা বাজারদর, তার চেয়ে তাঁর স্বামী অর্থাৎ আমার মামাবাবুর দেনার পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ?

কর্নেল আবার একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আমাকে শুধু একটা আভাস দিয়েছেন, রাজাসায়েব প্রসন্নকুমার সিংহের সঙ্গে এলাকার একজন ব্যবসায়ীর অনেক বছর ধরে একটা মামলা হয়েছিল। সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট অবধি উঠেছিল। রায় তাঁর পক্ষে গেলেও সেই মামলার খরচ জোগাতে শুধু রাজবাড়িটা ছাড়া তাঁর হাতে আর কিছুই ছিল না।

মিঃ সিংহ মৃদুস্বরে বললেন—সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মামাবাবুকে সেই মামলার খরচ ফিরিয়ে দেওয়ার কোনো শর্ত ছিল না। কারণ হাইকোর্টের রায়ে হেরে গিয়ে মামাবাবুই জেদের বশে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন। আপিল গ্রাহ্য হয়। হাইকোর্টের রায় বাতিল হয়ে যায়। তা না হলে মামাবাবুকে রাজবাড়িটাও বেচতে হত।

—কী নিয়ে মামলা?

—মামাবাবু নাকি মনমোহন সুখানিয়া নামে এক ব্যবসায়ীর কাছে লক্ষাধিক টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছিলেন।

—কোনো দামি জিনিসের জন্য অ্যাডভান্স?

—হ্যাঁ। বলে মিঃ সিংহ মুখ নামিয়ে তাঁর বাঁ হাতের আঙুলে তিনটে রত্নখচিত আংটি নাড়াচাড়া করতে থাকলেন।

কর্নেল বললেন—কিন্তু সেই দামি জিনিসটা কী?

তীর্থব্রত সিংহ মুখ তুলে বললেন—পূর্বপুরুষের কী সব জুয়েলস এবং সেই জুয়েলসের নিজস্ব দাম ছাড়াও ঐতিহাসিক দাম নাকি অনেক বেশি। আসলে সেই মামলা চলার সময় আমি বয়সে বালক। থাকতুম বীরভূমের রাজনগরে ঠাকুর্দার কাছে। আমার বাবা-মাকে শৈশবেই হারিয়েছিলুম। যাই হোক, ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর মামাবাবু আমাকে নিয়ে যান। সেই সময় মনমোহন সুখানিয়ার সঙ্গে তাঁর মামলা চলছিল। তো আমি শুধু এইটুকু জানি যে, হিস্টোরিক্যালি ইমপর্ট্যান্ট কিছু ধনরত্ন মামাবাবু বিক্রি করার জন্য টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু সেগুলো তিনি দিতে পারেননি সময়মতো।

—কেন?

মিঃ সিংহ আস্তে বললেন—মামিমার কাছে শুনেছিলুম, সেই জুয়েলস রাজবাড়ি থেকে কেউ চুরি করেছিল। তাই মামাবাবু কথা রাখতে পারেননি। কর্নেল সরকার, এর বেশি আর কিছু আমার জানা নেই।

এতক্ষণে হালদারমশাই বলে উঠলেন—সিংহসায়েবের একটা কথা জিগাই!

তীর্থব্রত সিংহ তাঁর দিকে শুধু তাকালেন।

হালদারমশাই বললেন—কোনো ব্যবসায়ী লেখাপড়া না কইর‍্যা টাকা দেয় না। আপনার মামাবাবু নিশ্চয় কোনো কাগজে সই করেছিলেন। এখন কথা হইল গিয়া, সুপ্রিম কোর্ট কীসের বেসিসে হাইকোর্টের রায় ডিসমিস করছিল?

মিঃ সিংহ একটু হেসে বললেন—আপনি প্রাক্তন পুলিশ অফিসার এবং বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ, আপনার প্রশ্নের মূল্য আছে। কিন্তু এই ধরনের কেনাবেচার কথা কার সঙ্গে হয়েছিল একটু ভেবে দেখুন। করনগড়ের রাজাবাবুর সঙ্গে! তা ছাড়া ঐতিহাসিক জুয়েলসের ব্যাপারে। সবটাই হয়েছিল মৌখিক কথার ভিত্তিতে।

—তা হলে কোর্ট ক্যাস লইল ক্যান?

—সাক্ষী ছিল। তা ছাড়া সে আমলে এ ধরনের লেনদেন ওইভাবেই হত। আপনি কি 'চোপড়ি' কথাটা জানেন? ওড়িশায় এই মৌখিক লেনদেনব্যবস্থা এখনো চালু আছে। একে বলে 'চোপড়ি'। চোপা অর্থ মুখ। মুখে মুখে লেনদেনের ব্যাপারটা সাক্ষীদের সাক্ষ্যেই আইনত গ্রাহ্য হয়।

গোয়েন্দাপ্রবর নড়ে বসলেন। সহাস্যে বললেন—হঃ! আমাগো পূর্ববঙ্গে মুখেরে 'চোপা' কয়। রাগ হইলে মাইনষে কয়, চোপাখান ভাইঙ্গা দিমু!

মিঃ সিংহ বললেন—জুয়েলস চুরির পর মামাবাবু থানায় ডায়রি করেছিলেন। তার কপি বাদী-বিবাদী দু-পক্ষেরই কাজে লেগেছিল। যাই হোক, ওসব পুরনো কথা আলোচনা করে লাভ নেই। কর্নেল সরকার। আপনার অজস্র প্রশ্ন থাকতে পারে। এখানে বসে সবকিছুর উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে যেন ধ্যানস্থ ছিলেন। মুখে কামড়ে ধরা চুরুট। এবার সোজা হয়ে বসে চুরুট অ্যাশট্রেতে রেখে বললেন—আপনি ঠিক বলেছেন মিঃ সিংহ। আমি শুধু বিষয়টার একটা আউটলাইন এঁকে দেখার চেষ্টা করছিলুম। এখন মনে হচ্ছে, কেসটা আপাতদৃষ্টে নিছক প্রতিহিংসামূলক হত্যাকাণ্ড মনে হলেও আদতে তা নয়। একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের পিছনে আরও কিছু ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আপনি কবে করনগড় ফিরছেন?

—আজ রাতের ট্রেনেই ফিরব।

—ক্যাপ্টেন পাণ্ডেকে বলবেন, আমি যে-কোনো দিন করনগড়ে পৌঁছুব। ঠিক কবে পৌঁছুব, তা অবশ্য টেলিফোনে জানিয়ে দেব।

তীর্থব্রত সিংহ ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর কর্নেলের সঙ্গে করমর্দন এবং আমাদের নমস্কার করে বেরিয়ে গেলেন....

তীর্থব্রত সিংহ বেরিয়ে যাওয়ার পর হাসতে হাসতে বললুম—বাপ্‌স। মাথা ঝিমঝিম করছে আমার। এ যে দেখছি অ্যারাবিয়ান নাইটসের কারবার। ঘটনার ভিতরে ঘটনা। তার ভিতরে ঘটনা।

হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন—আমি একটা পয়েন্ট ভাবতাছি। খুনি রানিমারে বিষের ইঞ্জিকশন দিয়া মারছে! কিন্তু সে বেড়ালগুলিরে কী কইর‍্যা মারল? বিষের ইঞ্জেকশন দিয়া অতগুলি বেড়ালেরে মারতে তো সময় লাগনের কথা! হেভি টাইম লাগব। তাই না কর্নেলস্যার?

কর্নেল তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। তারপর সাড়া পেয়ে ইংরেজিতে বললেন—আমি ম্যানেজার মিঃ শর্মার সঙ্গে কথা বলতে চাই! আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার!

একটু পরে মিঃ শর্মার সাড়া পেয়ে তিনি বললেন—মর্নিং মিঃ শর্মা। একটা সামান্য গোপনীয় কথা জানতে চাইছি। গত রাত্রে আপনাকে ফোন করে জেনেছিলুম, স্যুইট নাম্বার সিক্স টু ওয়ানে যিনি উঠেছেন, তাঁর সঙ্গে এক ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন। ...হ্যাঁ মনে আছে। মিঃ রঘুবীর আচারিয়া! তো আজ মর্নিংয়ে কি তিনি আবার এসেছিলেন? ...না। এটা নিছক কৌতূহল মিঃ শর্মা। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনো ঝামেলার ব্যাপার নেই। নিছক একটা প্রশ্ন। ...এসেছিলেন। তারপর? দুজনে কি একসঙ্গে বেরিয়েছিলেন—তার মানে, আপনাদের ভাড়ার গাড়িতে চেপে ...থ্যাংকস। তো মিঃ শর্মা, আপনাদের হোটেলের নিয়ম অনুসারে ভিজিটারের নাম ঠিকানা লেখার কথা। কাল রাত্রে আমি ঠিকানা চাইনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ঠিকানাটা আমার জানা দরকার। ...না, না। কোনো ঝামেলা নয়। সব দায়িত্ব আমার। আপনি বরাবর আমাকে সহযোগিতা করেছেন বলেই ...হ্যাঁ। বলুন।

কর্নেল টেবিলের প্যাড আর কলম টেনে নিয়ে লিখতে থাকলেন। তারপর লেখা শেষ হলে মিঃ শর্মাকে ধন্যবাদ দিয়ে রিসিভার রাখলেন।

বললুম—হোটেল এশিয়ার ম্যানেজার সুরেশ্বর শর্মার সঙ্গে এসব কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, গতরাত্রি থেকে আপনি তীর্থব্রত সিংহের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করছেন! কী ব্যাপার কর্নেল? আরব্য রজনী যে ঘোরতর অন্ধকার হয়ে উঠল।

আমার কথার পর গোয়েন্দাপ্রবরও বলে উঠলেন—কর্নেলস্যার! ভদ্রলোকেরে দেইখ্যা আর ওনার কথাবার্তার টোন লইক্ষ্য কইর‍্যা আমারও য্যান খটকা বাধছিল।

কর্নেল আমাদের কথায় কান দিলেন না। হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী! আরেকবার কফি চাই। তারপর তিনি টেবিল থেকে সেই প্রজাপতির বইটা টেনে নিয়ে চিহ্নিত পাতাটা খুললেন এবং আগের মতো আতস কাচ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে থাকলেন।

ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে যাওয়ার পর হালদারমশাই বললেন—আর কফি খামু? সাড়ে এগারোটা বাইজ্যা গেছে।

বললুম—খান হালদারমশাই। নার্ভ ঝিমিয়ে পড়েছে প্রচণ্ড হেভি মিস্ট্রির ধাক্কায়। চাঙ্গা হওয়া দরকার।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ একটু হেসে বললেন—আপনি যখন কইতাছেন, তখন খাই। বলে তিনি অভ্যাসমতো ফুঁ দিয়ে কফিতে চুমুক দেওয়ার পর সম্ভবত বেশিরকম চাঙ্গা হয়ে বললেন—কর্নেলস্যারেরে একখান কথা জিগাই।

কর্নেল ছবি দেখতে দেখতে বললেন—বলুন হালদারমশাই।

—ইস্‌ছা করে আমি সিংহসায়েবেরে ফলো কইর‍্যা রাত্রের ট্রেনে করনগড় যাই।

কর্নেল ছবি থেকে মুখ তুলে কফিতে চুমুক দিলেন। তারপর সহাস্যে বললেন—পকেটের পয়সা খরচ করে গোয়েন্দাগিরি করবেন হালদারমশাই? আপনি বলতে পারেন, আমি মাঝেমাঝে এই কাজটা করি। কিন্তু আমার দ্বিগুণ পুষিয়ে যায়। কীভাবে যায়, তা জয়ন্ত জানে। ওকে জিজ্ঞেস করুন।

গোয়েন্দাপ্রবর আমার দিকে তাকালেন। বললুম—ব্যাপারটা আপনারাও অজানা নয় হালদারমশাই। কর্নেল করনগড়ে ট্যাকের কড়ি খরচ করে যাবেন। গোয়েন্দাগিরি যা করার তা করবেন। সেই সঙ্গে বিরল প্রজাতির পাখি বা প্রজাতির ছবি তুলবেন। পাহাড়ি অর্কিড সংগ্রহ করবেন। এইসব করার পর কলকাতা ফিরে সচিত্র প্রবন্ধ পাঠাবেন বিদেশি কোনো বিজ্ঞাপনসংক্রান্ত পত্রিকায়। এক কাঁড়ি টাকা পাবেন। এছাড়া এ দেশের মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে আজকাল প্রকৃতি-পরিবেশ সংক্রান্ত সংস্থা ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়েছে। প্লেনভাড়া আর ফাইভস্টার হোটেলে থাকার সুবিধেসহ একেকটা লেকচারে কমপক্ষে দশহাজার টাকা দক্ষিণা। অবশ্য স্লাইড সহযোগে লেকচার দিতে হবে। তা-ও কর্নেলের আছে।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত একটু বাড়িয়ে বলছে হালদারমশাই। তবে আপনার যা প্রোফেশন, একজন ক্লায়েন্ট থাকা দরকার। আইনসম্মত পদ্ধতিতে দু-পক্ষের চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। একটু অপেক্ষা করুন। আপনার যেমন ক্লায়েন্ট দরকার, আমারও তেমনই আপনাকে দরকার।

অবাক হয়ে বললুম—করনগড়ের রানিমার মৃত্যুরহস্য, বেড়ালগুলোর কথা ছেড়েই দিচ্ছি, সেই রহস্যভেদে ক্লায়েন্ট বলতে তো মিঃ তীর্থব্রত সিংহ। অথচ আপনি তার পিছনেই গোয়েন্দাগিরি করছেন। আমি বুঝতে পারছি না কর্নেল, কলকাতায় বসে হালদারমশাইকে করনগড়ের কেসের ক্লায়েন্ট কীভাবে জোগাড় করে দেবেন?

কর্নেল হাসলেন।—জয়ন্ত। তুমি বলেছ অ্যারাবিয়ান নাইটসের কথা। ঘটনার ভিতরে ঘটনা। হ্যাঁ—তোমার উপমা প্রচণ্ড লাগসই। তোমার সেই তিনখানা 'প্রচণ্ডের' চেয়েও। তবে আগে আমাকে কফিটা শেষ করতে দাও।

প্রজাপতির বইটা আতস কাচ সমেত টেবিলে রেখে তিনি ড্রয়ার থেকে একটা খুদে নোট বই বের করলেন। তারপর কফি খেতে খেতে পাতা ওলটাতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে একটা পাতায় আঙুল রেখে আস্তেসুস্থে তিনি কফি শেষ করলেন এবং চুরুট ধরালেন। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নম্বর ডায়াল করতে করতে বললেন—কথাটা আমিই হালদারমশাইয়ে কাছে কোনো এক সময়ে তুলতুম। উনি নিজেই সময়টা এগিয়ে দিলেন। এটা বরং ভালোই হল। তদন্তের শুরু থেকেই গতি বাড়তে থাকবে...সোহিনী? আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। ...হ্যাঁ, আমি জানি আজ তুমি বাড়িতেই থাকবে। ...শোনো! তোমার তো গাড়ি আছে। এখনই একবার আমার এখানে আসতে পারবে? ...হ্যাঁ। তোমারই ইন্টারেস্টে। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে কি তোমার সঙ্গে আর যোগাযোগ করেছিলেন? কর্নেল হেসে উঠলেন। উনি বুদ্ধিমান মানুষ। ভালোই জানেন, আমি তোমার স্বার্থে কতদূর এগোব। এনিওয়ে। এখনই চলে এসো। ...রাখছি।

রিসিভার রেখে কর্নেল বললেন—যে মেয়েটি একটু পরে এসে যাবে, তার নাম সোহিনী রায়। করনগড়ের রানিমা স্বর্ণময়ীর দূরসম্পর্কের নাতনি। সোহিনীর বাবা-মা বেঁচে থাকতে সে তাঁদের সঙ্গে প্রতিবছর পুজোর সময় করনগড় বেড়াতে যেত। সোহিনী আজ সকাল সাতটায় খবরটা পড়ে আমাকে রিং করেছিল। তার আগে অবশ্য তার ঠাকুর্দার বন্ধু ক্যাপ্টেন পাণ্ডে রানিমার মৃত্যুর পরদিনই তাকে খবর দিয়েছিলেন। সে করনগড় যেতে পারেনি। আমার কাছে এসেছিল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডেরই পরামর্শে। অবশ্য সোহিনীর ঠাকুর্দা মেজর অরবিন্দ রায় আমারও বন্ধু ছিলেন। দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারার ছিলেন ভদ্রলোক।

হাঁ করে কর্নেলের দিকে তাকিয়েছিলুম। এবার বললুম—বাঃ! করনগড়ের আরব্য রজনী ঘোর অন্ধকার হলেও কোনো যুবতী তাতে ছিল না। যুবতী ছাড়া

আরব্য রজনী একেবারে অচল। ইলিউসন সৃষ্টি হয় না। কর্নেল! আমার 'প্রচণ্ডের' সংখ্যা বাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে।

হালদারমশাই ক্লায়েন্টপ্রাপ্তির খবরে খুশি হয়েছিলেন। তিনি বললেন — এতক্ষণে একটা কথা বোঝলাম। কর্নেলস্যার আগে হইতেই করনগড়ের ঘটনার লগে-লগে ছিলেন।

কর্নেল বললেন—হালদারমশাই কিছুটা ঠিক কথাই বলেছেন। তবে আমার আসল আগ্রহ ছিল আগস্ট মাসে করনগড় এলাকায় একটা বিশেষ প্রজাতির প্রজাপতি দর্শন। হঠাৎ এই প্রজাপতির খবর পেয়েছিলুম।

বললুম—যে প্রজাপতির ছবিটা আতসকাচ দিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন, সেটাই কি?

—ঠিক ধরেছ, জয়ন্ত! আমার বন্ধু ক্যাপ্টেন হরিচরণ পাণ্ডের করনগড়ে একটা ফার্ম হাউস আছে। তিনি সেখানে গত জুলাইয়ে এই অদ্ভুত গড়নের প্রজাপতি আবিষ্কার করে আমাকে খবর দিয়েছিলেন। গড়নটা এত বেশি অদ্ভুত বলেই তাঁর কৌতূহল জেগেছিল। তিনি অনেক চেষ্টার পর প্রজাপতিটার একটা রঙিন ছবি তুলে পাঠিয়েছিলেন। তার প্রায় দু-সপ্তাহ পরে এ মাসের গোড়ার দিকে করনগড়ের রানিমার মৃত্যুসংবাদ তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলুম। তীর্থব্রত সিংহকে তিনি আমার সাহায্য নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা তোমরা আজ জেনেছ।

হালদারমশাই বললেন—কিন্তু কাগজে খবর এত দেরিতে ছাপল স্যার?

—জয়ন্তকে জিজ্ঞেস করুন! সে কাগজের লোক।

বললুম—খবরটা পাঠিয়েছিলেন ওই এলাকার নিজস্ব সংবাদদাতা। তিনি খবরটা নিশ্চয় ঘটনার দিনই পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতার কাগজে নিজস্ব সংবাদদাতার খবর পৌঁছোয় দেরিতে এবং ছাপাও হয় আরো দেরিতে। কাগজে মফস্‌সলের খবর ছাপা হয় সেদিন, যেদিন কাগজে কোনো কারণে বাড়তি জায়গা থাকে। অসংখ্য খবর মফস্‌সল থেকে আসে। সেগুলো ফেলে দেওয়া হয় আবর্জনার ঝুড়িতে। দৈবাৎ কোনো চমকপ্রদ খবর এলে বিভাগীয় সম্পাদক তা রেখে দেন। যেদিন জায়গা পান, সেদিন ছাপতে দেন। 'বিড়ালের শোকে রানিমার মৃত্যু' খবরটাতে একটু চমক ছিল। আমার ধারণা, আমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা ছাড়া আর কোনো কাগজ খবরটা ছাপেনি।

কর্নেল সায় দিয়ে বললেন—হ্যাঁ। দৈনিক সত্যসেবক ছাড়া কলকাতার কোনো কাগজই ছাপেনি। তবে আমার ধারণা পাটনা থেকে প্রকাশিত স্থানীয় কাগজে খবরটা সম্ভবত ফলাও করে ছেপেছে। পরবর্তী ঘটনাও 'ফলো-আপ' হিসেবে ছেপেছে। কারণ ঘটনাটা হত্যাকাণ্ড।

—পরবর্তী ঘটনা আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা হয়তো পাঠিয়েছিলেন। বিভাগীয় সম্পাদক তপেশদার টেবিলে এখনো হয়তো রাখা আছে। স্থানাভাবে ছাপা হচ্ছে না।

এইসময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন—ষষ্ঠী।

একটু পরে ষষ্ঠী পর্দার ফাঁকে উঁকি মেরে বলল—বাবামশাই! সেদিন যে মেয়েছেলেটি এয়েছিলেন, উনি।

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন—সোহিনীকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস হতভাগা?

ষষ্ঠীচরণের মুখ অদৃশ্য হল। তারপর ড্রয়িংরুমের পর্দা তুলে একজন তরুণী ঢুকল। তার পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে ধূসর টি শার্ট। চেহারায় তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য এবং স্মার্টনেস। গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। ছোট করে ছাঁটা চুল। ধরেই নিয়েছিলাম, সে বাংলায় কথা বলবে না। কিন্তু একটু হেসে সে কর্নেলের উদ্দেশে বলল—স্বর্ণদিদিমার কেস আপনি নিতে আগ্রহী, এ কথা ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আমাকে বলেছিলেন। কিন্তু আজ টেলিফোনে আপনার কথা শুনে মনে হল, হঠাৎ আপনি কোনো কারণে আমার প্রত্যক্ষ সাহায্য চান। তাই না?

কর্নেল আস্তে বললেন—বসো সোহিনী। আলাপ করিয়ে দিই।

সোহিনী সোফায় বসে আমাকে একটুখানি দেখে নিয়ে বলল—কর্নেল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি, এই ভদ্রলোক সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। নমস্কার জয়ন্তবাবু।

প্রতি নমস্কার করলুম। কর্নেল একটু হেসে বললেন—তা হলে ওই ভদ্রলোককে তোমার চেনা উচিত।

সোহিনী হালদারমশাইকে দেখে নিয়ে বলল—এক মিনিট! ওঁর হাতে নস্যির কৌটো। খুঁটিয়ে ছাঁটা চুল। আগাথা ক্রিস্টির ডিটেকটিভ এরকুল পোয়ারোর মতো গোঁফের দুই ডগা ছুচোলো। যেন মোম মাখানো আছে। মাই গুডনেস! উনিই সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার!

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিলেন। বলে উঠলেন-আশ্চইর্য! ম্যাডাম আমারে চিনলেন ক্যামনে?

সোহিনী হেসে ফেলল। —বাঃ! নিজে থেকেই ধরা দিলেন আপনি।

আমি বললুম—মিস রায় তা হলে নিয়মিত দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা পড়েন?

—পড়ি। তবে গত এক বছরে আপনার কেস স্টোরির ভাষা বড্ড ডাল হয়ে যাচ্ছে জয়ন্তবাবু। আগের মতো সাহিত্যগুণ থাকছে না।

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন। তারপর বললেন—জয়ন্তর দোষ নেই সোহিনী। ওর কাগজে চিফ অফ নিউজব্যুরোর কড়া নির্দেশ, খবরের কাগজের কেস স্টোরি হবে অবজেক্টিভ। পাঠকরা নাকি গাদা-গাদা চিঠি লিখে অভিযোগ করেছে, খবরের কাগজে তারা সাহিত্য আশা করে না। যাইহোক তোমাকে বেশিক্ষণ আটকাব না। শুরুতেই তোমার স্বর্ণদিদিমার কেসে, ইংরেজিতে যাকে বলে স্মেলিং আ ডেড র‍্যাট সামহোয়্যার। হ্যাঁ—আই স্মেল!

সোহিনীর মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল। সে বলল—আমারও তাই মনে হয়েছে।

—বলো কী! কেন মনে হয়েছে?

—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আমাকে টেলিফোনে বলেছিলেন, এই কেসে তীর্থকাকুর যেন বড্ড বেশি মাথাব্যথা। তা ছাড়া উনিই নাকি স্বর্ণদিদিমার সব প্রোপার্টির মালিক হবেন। অথচ বাবার কাছে শুনেছিলুম, এদিকে ক্যাপ্টেন পাণ্ডেও আমাকে আভাসে বলেছেন, স্বর্ণদিদিমার উইলে প্রোপার্টির টু-থার্ড আমার নামে আর বাকি ওয়ান-থার্ডের অর্ধেক তাঁর কর্মচারীদের নামে দেওয়া আছে। বাকি অর্ধেক দেওয়া আছে তীর্থকাকুর নামে। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে উইলের অন্যতম সাক্ষী।

কর্নেল হাসলেন।—আজ তোমার তীর্থকাকু আমার কাছে এসেছিলেন। প্রায় ঘণ্টাদুই ছিলেন। উনি উঠেছেন হোটেল এশিয়াতে।

—আশ্চর্য! কলকাতা এলে উনি আমাকে রিং করেন। আমাদের বাড়িতেও এসে দেখা করে যান।

—এবার শোনো! কথায় কথায় আমি ইচ্ছে করেই ওঁকে যখন বললুম, আপনিই তো আপনার মামিমার সব প্রোপার্টির মালিক, উনি তাতে সায় দিলেন। আচ্ছা সোহিনী, বাই এনি চান্স তুমি কি কোনো রঘুবীরকে চেনো? তিনি নিউ আলিপুরে থাকেন।

সোহিনী ঠোঁট কামড়ে ধরে কথা শুনছিল। বলল—রঘুবীর আচারিয়া?

—হ্যাঁ।

—নাঃ! ও নামে আমি কাউকে চিনি না। কে উনি?

—এখনও জানি না। হোটেল এশিয়ায় উনি তোমার তীর্থকাকুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। শুধু এটুকু বুঝেছি, উনি তীর্থবাবুর বন্ধু। অবশ্য এমনও হতে পারে ওঁর সঙ্গে তীর্থবাবুর ব্যবসাবাণিজ্যের সম্পর্ক আছে। যাই হোক, আমি ভদ্রলোকের ঠিকানা জানি। খোঁজ নিয়ে দেখব। এবার কাজের কথাটা বলি।

বলুন।

তুমি তোমার স্বর্ণদিদিমার হত্যাকাণ্ডের রহস্য সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে অধিকার দাও। একটু ফর্ম্যালিটির ব্যাপার আছে। মিঃ হালদার তাঁর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কন্ট্র্যাক্ট পেপার নিয়ে তোমার কাছে যাবেন। তুমি ওতে সই করে দেবে। তুমি সই করলে মিঃ হালদার আইনসম্মতভাবে তদন্তের অধিকার পাবেন।

সোহিনী একটু চুপ করে থাকার পর বলল—আমার আপত্তি নেই। কিন্তু যতদূর জানি, এটা ওঁর প্রফেশন। কাজেই টাকাকড়ির ব্যাপারটা.....

কর্নেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ওটা তোমার পক্ষে সামান্য ব্যাপার। তোমার স্বর্ণদিদিমার প্রোপার্টির লোভ তোমার নেই, তা আমি বুঝি। কিন্তু তুমি তো অপরাধীর শাস্তি চাও।

—নিশ্চয় চাই। এ কথা তো আপনাকে আমি বলেছি। মিঃ হালদার কখন যাবেন বলুন?

—এখনই ওঁকে তোমার সঙ্গে যেতে বলতুম। কিন্তু ওঁর কাগজপত্র সঙ্গে নেই। গণেশ অ্যাভেনিউয়ে ওঁর অফিস।

গোয়েন্দাপ্রবর উসখুস করছিলেন। এবার বলে উঠলেন—ম্যাডামের তো গাড়ি আছে। উনি যদি আমার অফিসে যান, কাম হইব স্পিডিলি। আজ রাত্রেই আমি তীর্থবাবুরে ফলো কইর‍্যা যামু।

সোহিনী কর্নেলের দিকে তাকাল। দৃষ্টিতে প্রশ্ন ছিল।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। তীর্থবাবু আজ রাতের ট্রেনেই করনগড়ে ফিরবেন।

সোহিনী ঈষৎ দ্বিধার সঙ্গে বললেন—আমি আসলে মিঃ হালদারকে অ্যাডভান্স দেওয়ার কথা ভাবছি।

হালদারমশাই হাত নেড়ে বললেন—সেটা তেমন কিছু না। যা আপনার ইস্‌ছা হয়, দেবেন। জাস্ট ফর্মালিটি। পুলিস আমার ইনভেস্টিগেশনে বাধা দিলে আমারে কন্ট্যাক্ট পেপার আর ফি-এর অ্যামাউন্ট দেখান লাগব।

—কোনো অসুবিধে নেই। আমি আপনার অফিস হয়ে আপনাকে নিয়ে আমার সার্কাস অ্যাভেনিউয়ের বাড়িতে যাব। পেমেন্ট করব।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। এটাই ঠিক হবে। তুমি দুটোর মধ্যে আমাকে রিং করে জানাবে। আর হালদারমশাই! আপনি যদি ফোনে আমাকে না পান, ষষ্ঠীকে জানিয়ে দেবেন কখন করনগড় যাত্রা করছেন!

সোহিনীর সঙ্গে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হৃষ্টচিত্তে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরে বললুম—সোহিনী রায় কী করে জানতে ইচ্ছে করছে কর্নেল!

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন—সোহিনী টেনিসে দু-বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। তা ছাড়া রাইফেল শুটিংয়েও ওর সুনাম আছে। ওর ব্যবসায়ী বাবা প্রচুর টাকাকড়ি রেখে গেছে। ওর মা ছিলেন ইতিহাসের অধ্যাপিকা। চিন্তা করো জয়ন্ত। স্বামী তুখোড় ব্যবসায়ী আর স্ত্রী অধ্যাপিকা। এঁদের একমাত্র সন্তান সোহিনী।

বললুম—সোহিনী তাই নিজস্ব পথে হাঁটতে চেয়েছিল।

এবং সে-পথে সে সাকসেসফুল!

—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না। এমন একটি মেয়ে করনগড়ে একা যেতে ভয় পেয়েছিল কেন? তার স্বর্ণদিদিমা তাকে স্নেহ করতেন। তার প্রমাণ, উইলে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পত্তিদান। অথচ সোহিনী....

কর্নেল আমার কথার ওপর বললেন—তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। ওর স্বর্ণদিদিমার মৃত্যুর খবর দিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন পাণ্ডে। যখন সোহিনী যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে, তখন কেউ উড়ো ফোনে ওকে ভয় দেখায়, ওখানে গেলে তার অবস্থা হবে রানিমার মতো। কথাটা সোহিনী ক্যাপ্টেন পাণ্ডেকে জানিয়েছিল। তাই উনি

ওকে যেতে নিষেধ করেছিলেন। আমার কাছে আসতে বলেছিলেন। আমি ওকে বলেছিলুম, কিছুদিন অপেক্ষা করো। তারপর বরং আমিই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।

—এ যে দেখছি আরব্য উপন্যাস নয়, মহাভারতের মতো জটিল উপাখ্যান।

কর্নেল হাসলেন।—আপাতদৃষ্টে জটিল। কিন্তু কাঠামোটি সরল। সেটা তুমি নিজেই বুঝতে পারবে।

—আচ্ছা কর্নেল, সোহিনীর বাড়িতে গার্জেনের মতো কেউ নিশ্চয় আছেন?

—তুমি বুদ্ধিমান। ওর পিসিমা আছেন। ভদ্রমহিলা বালবিধবা। তবে ওঁকে রায়বাঘিনী বলতে পারো। বলে তিনি দেয়ালঘড়ির দিকে তাকালেন।—মাই গুডনেস! একটা বেজে গেছে। জয়ন্ত! তুমি স্নান করে নাও। আজ আমার স্নানের দিন নয়। ঠিক দেড়টায় আমরা খেয়ে নেব। একঘণ্টা বিশ্রাম করে একসঙ্গে বেরুব।

—কোথায়?

—যথাসময়ে জানতে পারবে।

দুটো তিরিশে বেরুনোর কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই হঠাৎ ঝিরঝিরিয়ে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। কর্নেল বলেছিলেন—বৃষ্টিটা বেড়ে গেলে সমস্যা। রাস্তায় জল জমে যাবে। তোমার পেট্রোলকারের ওপর ভরসা করা যাবে না। দেখা যাক।

বৃষ্টিটা ক্রমশ বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় একঘণ্টা পরে যখন থামল, তখন কর্নেল ষষ্ঠীচরণকে রাস্তার অবস্থা দেখতে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরে ষষ্ঠী ফিরে এসে খবর দিল, রাস্তায় একহাঁটু জল।

কর্নেল বিরক্ত হয়ে বললেন—প্রতি বর্ষায় ইলিয়ট রোড এলাকা ছেড়ে তোমার মতো সল্টলেক কিংবা অন্যত্র চলে যাব ভাবি। কিন্তু বর্ষা চলে গেলে কথাটা ভুলে যাই। আসলে এ একটা অচ্ছেদ্য মায়া। যেখানে জন্মেছি এবং অবসর নেওয়ার পর এত বছর ধরে বাস করছি, সেখান ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে মনে শান্তি পাব না।

জানালার পর্দা তুলে আকাশ দেখে নিয়ে বললুম—আর বৃষ্টির চান্স নেই। আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। রাস্তার জল কি একঘণ্টার মধ্যে নেমে যাবে না?

কর্নেল আমার পাশে এসে উঁকি মেরে রাস্তা দেখে বললেন—অন্তত চারটের আগে তোমার গাড়ি বের করার ঝুঁকি আছে।

—চারটেতে বেরুলে কি আপনার অসুবিধে আছে?

কর্নেল কী যেন একটা চিন্তা করলেন। তারপর এগিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে একটা নাম্বার ডায়াল করলেন। সাড়া এলে বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। মিঃ সোমের সঙ্গে কথা বলতে চাই। মিঃ সোম? না। না। নিছক আলস্য। আমার এ বয়সে আলস্যকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আলস্য সিন্দবাদ নাবিকের গল্পের সেই বুড়ো। কাঁধে চেপে বসলে নামানো যায় না। হ্যাঁ।

ঠিক বলেছেন। তো আপনাদের ওখানে বৃষ্টির অবস্থা কি? এখানকার অবস্থা সাংঘাতিক ...না। বৃষ্টির খবর জানবার জন্য ফোন করিনি। আচ্ছা মিঃ সোম, একটা কথা জানতে চাই। প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল। ...হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। এবার শুনুন। আপনাদের পারিজাত হাউজিং কমপ্লেক্সের সি ব্লকে অ্যাপার্টমেন্ট সি-১৭ তে রঘুবীর আচারিয়া নামে ভদ্রলোক থাকেন। আপনি না চিনতেই পারেন। বরং তা হলে ওই ব্লকে আপনার আত্মীয় ভদ্রলোককে ফোন করে জেনে নিন। প্লিজ মিঃ সোম। ওঁকে একটু জানিয়ে দেবেন, আপনার কোনো ক্লায়েন্টের স্বার্থে মিঃ আচারিয়া সম্পর্কে এই ইনফরমেশনগুলো আপনার দরকার। ...হ্যাঁ, আমি বলছি। আপনিও নোট করে নিন। এক— মিঃ আচারিয়া কী করেন? দুই— ওঁর কোনো কাজ-কারবার থাকলে, সেটা কোথায়? তিন— ওঁর বিশেষ কোনো হবি আছে কি না এবং থাকলে সেটা কী? চার— উনি কি অ্যাপার্টমেন্টে সপরিবারে থাকেন, নাকি একা? আপাতত এই চারটেই যথেষ্ট। আপনি এখনই যোগাযোগ করে জেনে নেবেন। তারপর আমাকে টেলিফোনে জানিয়ে দেবেন। ....আমি বাড়িতেই থাকছি। ...আপনার কৌতূহল স্বাভাবিক। তবে সব কথা সময়মতো বলব। মুখোমুখিই বলব। রাখছি। ....

কর্নেল রিসিভার রেখে ইজিচেয়ারে বসলেন।—সহাস্যে বললেন—আমাকে সত্যিই বাহাত্তুরে ধরেছে জয়ন্ত! হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট মিঃ শিলাদিত্য সোমের কথা ভুলে গিয়েছিলুম। উনি রঘুবীর আচারিয়ার ডেরায় গিয়ে আমাকে একরাশ মিথ্যে অজুহাত তৈরি করতে হত। তাছাড়া রিস্কও ছিল। কী ধরনের লোক এই আচারিয়া, তা জানি না। করনগড়ের তীর্থব্রত সিংহের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক তাও জানি না। আশা করছি, ওই চারটে ইনফরমেশন থেকেই রঘুবীর আচারিয়ার মোটামুটি একটা আদল পেয়ে যাব।

বললুম—আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না। তীর্থব্রত সিংহের সঙ্গে কেউ হোটেল এশিয়ায় দেখা করলে তিনি আপনার সন্দেহভাজন কেন হবেন?

—নিজেই জানি না জয়ন্ত, রঘুবীর আচারিয়া সম্পর্কে আমার কেন এত তীব্র কৌতূহল।

হাসতে হাসতে বললুম—বরং বলুন আপনার সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সেই ইনট্যুইশন। আপনি নিজেই নিজের এই ইনট্যুইশন সম্পর্কে সাতকাহন করে বলেন।

—না ডার্লিং! কর্নেল মৃদুস্বরে বললেন।—আমার করনগড়ের বন্ধু ক্যাপ্টেন হরিচরণ পাণ্ডে আমাকে শুধু একটা আভাস দিয়েছেন তীর্থব্রত সিংহ সম্পর্কে আমি যেন সতর্ক থাকি। তাই এটা নিছক সতর্কতা।

—কী আশ্চর্য! মিঃ সিংহ যদি করনগড়ের রানিমাকে হত্যার চক্রান্ত করে থাকেন, তা হলে কেন তিনি শ্মশানের চিতা থেকে ওঁর ডেডবডি তুলে পুলিশকে

পোস্টমর্টেম করতে বলবেন? মিঃ সিংহই তো তাঁর মামিমার ঠোঁটের পাশে রক্তের ছিটেলাগা লালা গড়াতে দেখেছিলেন!

—করনগড়ে না পৌঁছুনো অবধি আমার কাছে ঘটনাটা আগাগোড়া অস্পষ্ট থেকে যাচ্ছে জয়ন্ত। আমি এখনও কোনো বিষয়ে সিওর নই। এটা ইজিচেয়ারে বসে অঙ্ক কষার কেস নয়।

ষষ্ঠীচরণ কফি নিয়ে এল। সঙ্গে একটা চিনেমাটির থালাভর্তি পাঁপরভাজা। সে মুচকি হেসে বলল—বাবামশাই! আবার বর্ষাবে মনে হচ্ছে। আবার আকাশ কালো করে মেঘ উঠে আসছে।

সে চলে গেলে পাঁপরভাজা তুলে নিয়ে বললুম—মিঃ সিংহের হাওড়া স্টেশন পৌঁছুতে অসুবিধে হবে না। কিন্তু হালদারমশাই থাকেন ডুবো এলাকায়। উনি মিঃ সিংহকে ফলো করতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

কর্নেল বললেন—সোহিনী ফোনে কী বলছিল ভুলে যেও না জয়ন্ত। জোর করে সে প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে এক হাজার টাকা অ্যাডভান্স গছিয়ে দিয়েছে। কাজেই হালদারমশাই তাঁর ডুবো এলাকা থেকে দরকার হলে সাঁতার কেটে পাড়ি দেবেন। তা ছাড়া ভুলে যেও না, উনি পূর্ববঙ্গের মানুষ এবং নিজেকে জলপোকা বলেন।

ঠিক সেই সময় কাকতলীয় ব্যাপারটা ঘটে গেল। টেলিফোন বেজে উঠল এবং কর্নেল সাড়া দিয়েই বললেন—বলুন হালদারমশাই! ....বাঃ! আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করছি। ...অ্যাঁ? বলেন কী! দাড়ি-পরচুলা? ....ঠিক করেছেন। ছদ্মবেশ না ধরলে মিঃ সিংহের চোখে পড়ার চান্স ছিল। কিন্তু সাবধান! ফার্স্টক্লাসের একই ক্যুপে যেন উঠবেন না। যদি দেখেন, রিজার্ভেশন একই ক্যুপের বার্থে হয়েছে, তখনই আপনি চেকারকে ম্যানেজ করে নেবেন। ...হ্যাঁ সোহিনীর চিঠি দেখলে ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আপনার ইচ্ছে অনুসারে থাকবার ব্যবস্থা করে দেবেন। ...ঠিক আছে। উইশ ইউ গুড লাক।

রিসিভার রেখে কর্নেল বললেন—জয়ন্ত। হালদারমশাইকে তুমি যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করো না কেন, উনি একজন প্রাক্তন পুলিস অফিসার। উনি বৃষ্টি শুরু হতেই ট্যাক্সি করে হাওড়া স্টেশনে চলে গেছেন। রাত দশটা পঁচিশে ট্রেন। ফার্স্ট ক্লাসের কম্পার্টমেন্ট প্রায় ফাঁকাই যায়। কাজেই ওঁর রিজার্ভেশন পেতে অসুবিধে হয়নি। ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি এঁটেছেন। মাথায় মানানসই পরচুলা। নেকটাই এঁটেছেন। হাতে ব্রিফকেস। পরচুলার ওপর টুপি। মূর্তিটা কল্পনা করো জয়ন্ত!

হেসে ফেললুম।—কিন্তু ওঁর মুখের ভাষা?

—ভাষা কোনো ব্যাপার নয়। তবে আমার ধারণা, উনি ইংরেজিতেই কথাবার্তা বলবেন। তুমি তো জানো, ইংরেজিতে কাজ চালানোর মতো স্পিকিং পাওয়ার ওঁর আছে।

—বাজি রেখে বলতে পারি, উনি দৈবাৎ মুখ ফসকে পূর্ববঙ্গীয় ভাষার একটা শব্দ উচ্চারণ করলেই তীর্থব্রত সিংহের কাছে ধরা পড়ে যাবেন।

—করনগড়ে কিছুদিন মিঃ সিংহকে উনি এড়িয়ে চলবেন। তারপর যথাসময়ে ছদ্মবেশ ছেড়ে নিজমূর্তিতে দেখা দেবেন।

—আপনাকে হালদারমশাই তা-ই বললেন বুঝি?

—হ্যাঁ। উনি রীতিমতো প্ল্যানপ্রোগ্রাম করে পা বাড়িয়েছেন।

ষষ্ঠীচরণের পূর্বাভাস ব্যর্থ করে বৃষ্টি আর এল না। আবহাওয়া কদিন থেকে ছিল বিরক্তিকর। ভ্যাপসা গরমে মানুষজন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। বিকেলে টানা প্রায় একঘণ্টার বৃষ্টি এবং তারপর স্নিগ্ধ ঠাণ্ডা বাতাস শরীরকে প্রচুর আরাম দিচ্ছিল।

সন্ধ্যা ছটায় ষষ্ঠী কী কাজে বেরিয়েছিল। ফিরে এসে বলল—দাদাবাবু। রাস্তার জল নেমে গেছে।

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন—তোর দাদাবাবুর গাড়ি বেরুবে না।

সেই সময় আবার টেলিফোন বাজল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন—বলছি। ...হ্যাঁ, বলুন মিঃ সোম! ..আমার এলাকায় জল নেমে গেছে। কেন একথা...তা হলে তো আমার পরম সৌভাগ্য! আপনারা আসুন। অনেকদিন আড্ডা দেওয়া হয়নি। এই সুন্দর সন্ধ্যায় আপনারা সুস্বাগত।

তিনি রিসিভার রেখে বললেন—জয়ন্ত! অ্যাডভোকেট মিঃ শিলাদিত্য সোম তাঁর আত্মীয় অভিষেক বসুকে সঙ্গে নিয়ে এখানে আসছেন। টেলিফোনে নাকি সব কথা বলা যাবে না।

—তার মানে 'রঘুবীর আচারিয়া' নামক বিষয়টি একটু জটিল?

—দেখা যাক! অবশ্য আমাকে চর্মচক্ষে দর্শনের আগ্রহ অভিষেক বসুর নাকি তীব্র।

নিউ আলিপুর থেকে কর্নেলের পরিচিত অ্যাডভোকেট শিলাদিত্য সোম আর তার আত্মীয় অভিষেক বসু এসে পৌঁছুলেন সন্ধ্যা সাতটায়।

মিঃ সোম বললেন—অভিষেকদা! ইনিই সেই কিংবদন্তি পুরুষ কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। তারপর তিনি আমার দিকে ঘুরে সহাস্যে বললেন—কর্নেল পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগেই আমি চিনেছি। অভিষেকদা চিনেছে কিনা দেখা যাক।

অভিষেক বসু ভুরু কুঁচকে মিটিমিটি হেসে বললেন—অবশ্যই চিনেছি।

যেখানে কর্নেলসায়েব, সেখানেই সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। নমস্কার! দুজনকেই নমস্কার!

কর্নেল বললেন—বসুন মিঃ সোম! মিঃ বোস! বসুন! আপনিও যে মিঃ সোমের সঙ্গে আসছেন, তাই-ই শুনে প্রথমে অবাক হলেও পরে ব্যাপারটা স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। তার চেয়ে বড় কথা, মিঃ সোমের মাধ্যমে আপনার

বক্তব্য শোনার চাইতে সরাসরি আপনার মুখ থেকে শোনার গুরুত্ব আমার কাছে অনেক বেশি। তবে আগে কফি। তারপর অন্যকিছু।

মিঃ সোম হাসলেন।—কর্নেলসায়েবের ওই এক মন্ত্র অভিষেকদা। কফি নার্ভ চাঙ্গা করে।

দুই প্রৌঢ়কে দেখে আমার কৈশোরে দেখা সিনেমা লরেল হার্ডির কথা মনে পড়েছিল। তবে আচার ব্যবহারে নয়, চেহারায়। মিঃ সোম প্রায় কর্নেলের মতো তাগড়াই। আর মিঃ বসু রোগা। উচ্চতা সওয়া পাঁচ ফুট হবে কি না সন্দেহ। মিঃ সোমের পরনে প্যান্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জি। মিঃ বসুর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। তবে তাঁর গোঁফ দেখার মতো লম্বা।

ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। কফি খেতে খেতে কর্নেল বললেন—মিঃ বোসের সঙ্গে আপনার আত্মীয়তা আছে মিঃ সোম। আমার ধারণা, আত্মীয়তার সম্পর্কটা সুমিষ্টধরনের।

অভিষেক বসু হেসে উঠলেন।—এইজন্যই কর্নেলসায়েব আমার কাছে কিংবদন্তি পুরুষ। দ্যাখো হে সোম। কেমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। দুজনকে দেখেই ধরে ফেলেছেন আমরা পরস্পর কিসে বাঁধা আছি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—সম্ভবত আপনাদের শ্বশুর-শাশুড়ি একই ভদ্রলোক ও একই ভদ্রমহিলা!

—ব্রাভো! শীর্ণকায় মিঃ বসু প্রায় চেঁচিয়ে উঠলেন!—কর্নেলসায়েব। আপনি হয়তো সোমের সঙ্গে যোগাযোগের আগেই একদফা গোয়েন্দাগিরি করে নিয়েছেন।

—না মিঃ বোস! নিছক অনুমান!

—অসম্ভব! সোম হয় তো আগে কোনো সময়ে আমার কথা আপনাকে বলে থাকবে।

মিঃ সোম বললেন—নাঃ! কর্নেলের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেকদিনের। কিন্তু তোমার প্রসঙ্গ ওঠার কোনো চান্স ছিল না। তো কর্নেলসায়েবকে জিজ্ঞেস করছি। বলুন তো কোন সূত্রে আপনি অভিষেকদার সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক টের পেলেন?

—কর্নেল বললেন—স্মৃতির সূত্রে।

—তার মানে?

—বেঙ্গল ক্লাবে মহাবীর আগরওয়ালের পার্টিতে আপনি আপনার স্ত্রী মিসেস মালবিকা সোমের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে সকৌতুকে বলেছিলেন, এর পর কোথাও যদি প্রায় এই চেহারার কোনো মহিলাকে দেখতে পান, সাবধান। তাঁকে যেন মিসেস সোম বলে আলাপ করতে যাবেন না। মালবিকার সঙ্গে তার দিদি পারমিতাকে অনেকেই গুলিয়ে ফেলে। এর একটা বড় কারণ ওর দিদিও থাকে একই হাউজিং কমপ্লেক্সে। আমি এই স্মৃতির সূত্রেই কতকটা আন্দাজে ঢিল ছুড়েছিলুম।

দুই ভদ্রলোক একসঙ্গে হেসে উঠলেন। তারপর মিঃ বোস বললেন—এই একটা সমস্যা সত্যি আছে। পারমিতা মালবিকার চেয়ে মাত্র এক বছরের বড়। কিন্তু দেখলে মনে হবে দুই যমজ বোন।

কফি শেষ করে কর্নেল চুরুট ধরালেন। অভিষেকবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে সিগারেট বের করে বললেন—সোম আর দুই বোন মিলে আমার সিগারেট খাওয়ার জন্য ভয়ংকর সব ভয় দেখায়। অথচ কর্নেলসায়েব এই বয়সেও চুরুট খান।

তিনি সিগারেটের প্যাকেট আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। আমি বললুম—আগে প্রচুর সিগারেট খেতুম। জোর করে ছেড়ে দিয়েছি।

—পেরেছেন? আশ্চর্য! আমি পারলুম না।

মিঃ সোম ঘড়ি দেখে বললেন—এবার কাজের কথা হোক অভিষেকদা। কর্নেলসায়েবের মূল্যবান সময় নষ্ট করা উচিত হবে না। কর্নেলসায়েব! আপনিই প্রশ্ন করুন।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—আমার প্রথম প্রশ্ন মিঃ বোস সম্পর্কে। বাই এনি চান্স আপনি কি শিক্ষকতা করতেন? ধরা যাক, অধ্যাপনা?

মিঃ সোম বললেন—অভিষেকদা। কী বুঝছ বলো?

মিঃ বোস বললেন—বুঝেই তো এসেছি। হ্যাঁ কর্নেলসায়েব। আমি অধ্যাপনা করতুম। বছর পাঁচেক আগে রিটায়ার করেছি। আমি পড়াতুম রাষ্ট্রবিজ্ঞান।

মিঃ সোম বললেন—শুধু অধ্যাপনা নয়। অভিষেকদা ছাত্রদের জন্য অনেক টেক্সটবুকও লিখেছে। অধ্যাপক এ বোস নামে টেক্সটবই দেখলেই বুঝবেন, এই সেই অধ্যাপক। বই থেকে ওর আয় আমার দ্বিগুণ।

কর্নেল বললেন—এবার বলুন রঘুবীর আচারিয়া কী করেন?

মিঃ বোস বললেন—ব্র্যাবোর্ন রোডে আচারিয়ার এক্সপোর্টের ইমপোর্ট কারবার আছে। মেক্যানিকাল পার্টসের কারবার। আমি অবশ্য ওঁর অফিসে কখনও যাইনি। তবে আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয়ের কারণ আমরা একটা চওড়া করিডরের দুই প্রান্তে মুখোমুখি থাকি। আপাতদৃষ্টে বিনয়ী, ভদ্র, অমায়িক।

—ওঁর বিশেষ কোনো হবি লক্ষ করেছেন কি?

—হ্যাঁ। ওঁর হবি দেশবিদেশের প্রাচীন জিনিস সংগ্রহ। ওঁর সংগ্রহশালা আমাকে উনি দেখিয়েছেন। ধাতু ও পাথরের মূর্তি, পানপাত্র, বর্শার ফলা ব্রোঞ্জের! চিন্তা করুন, প্রাক-লৌহযুগের অস্ত্র। এছাড়া অজানা ভাষার হরফে খোদাই করা পাথরের ফলক, রঙিন ছবি আঁকা মাটির পাত্রের খানিকটা অংশ। আমাকে উনি বলেছিলেন, বিদেশে কোথাও গেলেই এইসব জিনিস তিনি সংগ্রহ করে আনেন।

—মিঃ আচারিয়ার ফ্যামিলি?

মিঃ বোস চোখে হেসে চাপা স্বরে বললেন—একজন মেমসায়েব মাঝেমাঝে

এসে আচারিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন। আমার সঙ্গে একবার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। মেমসায়েব নাকি তাঁর স্ত্রী। নাম ন্যান্সি আচারিয়া। অ্যামেরিকার মহিলা। আমি বিশেষ কৌতূহল দেখাইনি। কিন্তু আচারিয়া নিজেই বলেছিলেন মিসেস আচারিয়া বিহারে কোনো একটা জায়গায় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। জায়গাটার নাম আজই কাগজে বেরিয়েছে সোম! তুমিই সেদিন বলছিলে বেড়ালের শোকে সেখানকার এক বৃদ্ধা রানিমা নাকি মারা গেছেন।

মিঃ সোম বললেন—কর্ণগড়। তবে কাগজে করনগড় লিখেছে!

আমি চমকে উঠলেও মুখ খুললাম না। কর্নেল বললেন—মিঃ সোম কি করনগড়ে কখনও গেছেন?

শিলাদিত্য সোম বললেন—যাইনি। তবে কর্ণগড়ের রাজার সঙ্গে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীর পুরোনো একটা কেস হিস্ট্রি অর্থাৎ একটা মামলার পুরো প্রসিডিং আমার লাইব্রেরিতে আছে। আপনি নিশ্চয় জানেন, আমার প্রোফেশনে এইসব প্রসিডিং এবং কোর্টের জাজমেন্ট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। বিশেষ করে সুপ্রিম কোর্টের অনেক জাজমেন্ট একই ধরনের কেসে প্রিসিডেন্স হিসেবে কাজে লাগে। যাই হোক খুব ইন্টারেস্টিং কেস।

কর্নেল বললেন—করনগড় আসলে কর্ণগড়ই। হিন্দিভাষীদের উচ্চারণ পদ্ধতি বাংলার মতো নয়। মিঃ বোস কি করনগড়ের রানিমার মৃত্যুর খবর নিয়ে আজ মিঃ আচারিয়ার সঙ্গে কোনো আলোচনা করেছিলেন?

অভিষেক বসু বললেন—সোমের কাছে খবরটা অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তাই টেলিফোনে আমাকে ওটা পড়তে বলেছিল। খবরটা পড়ায় আমি ভেবেছিলুম মিঃ আচারিয়াকে জানাব। কারণ তাঁর স্ত্রী ন্যান্সি আচারিয়া সেখানে থাকেন। কিন্তু ওঁর অ্যাপার্টমেন্টের কাজের লোক গুণধর বলল, সায়েব বেরিয়েছেন। তারপর আর অবশ্য ওটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। কর্নেলসায়েব। খবরটা নিশ্চয় পড়েছেন?

—পড়েছি।

—জয়ন্তবাবুদের কাগজেই বেরিয়েছে। অদ্ভুত খবর নয়?

—কেন অদ্ভুত?

—ছ-টা বেড়াল পুষতেন ভদ্রমহিলা। হঠাৎ ছ-টা বেড়ালই একসঙ্গে মারা গেল। আর তাই দেখে তিনিও শোকে হার্টফেল করে মারা গেলেন। নিশ্চয় কেউ বিষ খাইয়ে বেড়ালগুলোকে মেরে ফেলেছিল। কর্নেলসায়েব! এতে এক রহস্যের ঝাঁঝ আছে না?

—কীসের রহস্য বলে আপনার ধারণা?

—যে বেড়ালগুলো মেরেছে, সে জানত বৃদ্ধা রানিমা এতে ভীষণ শোকাহত হবেন এবং সেই শোক সামলাতে পারবেন না।

মিঃ সোম একটু নড়ে বসলেন।—মাই গুডনেস! ইনি নিশ্চয় কর্নগড়ের সেই

রাজার স্ত্রী, যাঁর মামলার ইতিহাস আমি পড়েছি। তা হলে কি রাজাসায়েবের প্রতিপক্ষ এতকাল পরে এভাবেই প্রতিশোধ নিল? কিন্তু এক বৃদ্ধাকে এভাবে মেরে ফেলে প্রতিশোধ নেওয়াটা আমার যুক্তিগ্রাহ্য ঠেকছে না। প্রতিশোধের স্পৃহা বংশপরম্পরায় কি থাকে?

মিঃ বোস বললেন—মিঃ আচারিয়াকে জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রকৃত ঘটনা তাঁর স্ত্রীর কাছে জানতে পারবেন।

কর্নেল বললেন—প্লিজ মিঃ বোস। আমার অনুরোধ আপনি এ বিষয়ে মুখ বুজে থাকবেন। মিঃ সোম! আপনিও হাউজিং কমপ্লেক্সে কারও সঙ্গে এই নিয়ে কোনো আলোচনা করবেন না।

দুজনে পরস্পর তাকাতাকি করলেন। তারপর মিঃ সোম বললেন, বুঝতে পেরেছি। আপনি কর্নগড়ের রানিমার কেস হাতে নিয়েছেন। আপনি এ কেসে অভিষেকদার সাহায্য পাবেন।

মিঃ সোমের কথা শোনার পর কর্নেল একটু হেসে বললেন—মিঃ বোসকে আমি কখনই তাঁর প্রতিবেশী ভদ্রলোকের পিছনে গোয়েন্দাগিরি করতে বলছি না। সেটা ওঁর পক্ষে অশোভন ব্যাপার হবে।

অভিষেক বোস চোখে একটা কৌতুকের ভঙ্গি করে বললেন—আমি এখন নিষ্কর্মা ঢেঁকি। তবে কর্নেল যদি ধান ভানতে বলেন ভানব। তা কাজটা যত অশোভন হোন না কেন!

কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। তারপর এগিয়ে গিয়ে ড্রয়ার-আলমারি থেকে ওপরসারির একটা ড্রয়ার টেনে একটা ফাইল বের করলেন এবং ফাইলটা নিয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসলেন। বললেন—আপাতত একটা ব্যাপারে আমি মিঃ বোসের সাহায্য চাইছি।

মিঃ বোস সাগ্রহে বললেন—বলুন কী সাহায্য করব?

কর্নেল ফাইলটা খুলে বললেন—এতে আমি আমার হবিসংক্রান্ত খবরের কাটিং সাদা কাগজে এঁকে রাখি। এই যে কাটিং দেখছেন, এগুলো পাঁচ বছর আগেকার একটা ইংরেজি দৈনিক থেকে নেওয়া। খবরের ডেটলাইন ১০ আগস্ট। তার মানে ১১ আগস্টের কাগজ। ডেটলাইন সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক।

মিঃ বোস উঁকি মেরে কাটিং দেখার চেষ্টা করে বললেন—খবরটা কীসের?

কর্নেল হাসলেন। খবরটা তো বলেছি, আমার হবিসংক্রান্ত। আগে আপনাকে সংক্ষেপে খবরের বিষয়টা বলি। পি টি আই সূত্রে পাওয়া এই খবরে বলা হয়েছে, সিকিমের ইউকসম অঞ্চলে 'কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক' নামে সংরক্ষিত অভয়ারণ্যের রক্ষীরা ৩০ জুলাই তিনজন বিদেশিকে গ্রেফতার করেছিল। তারা ১৯৭২ সালে 'ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন' আইন লঙ্ঘন করে প্রায় কুড়ি কিলোগ্রাম প্রজাপতি আর নানা প্রজাতির কীটপতঙ্গ ধরেছিল।

দুই ভায়রাভাই একসঙ্গে বলে উঠলেন—কুড়ি কিলোগ্রাম?

—হ্যাঁ। তো তাদের মধ্যে দুজন রুশ নাগরিক ছিল। তাদের নাম আমোসোভ্ ওলেগ এবং সিনিয়ায়েভ ভেক্তার। এরা দুজনে পুরুষ। তৃতীয় জন মহিলা এবং মার্কিন নাগরিক। তাঁর নাম ন্যান্সি বার্নার্ড। বাড়ি লস অ্যাঞ্জেলসে। কোর্টে হাজির করানো হলে রুশ নাগরিকরা বলেন, তাঁরা আণবিক জীববিজ্ঞানী। গবেষণার প্রয়োজনে এ কাজ করেছেন। তাঁরা ওই আইনের কথা জানতেন না। ন্যান্সি বার্নার্ড বলেন, তিনি একজন লেপিডপটারিস্ট অর্থাৎ প্রজাপতি বিশেষজ্ঞ। তিনি ওই পাহাড়ি জঙ্গলে দুর্লভ প্রজাতির প্রজাপতি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেটের প্রশ্নের উত্তরে ন্যান্সি জানান, ইউকসাম জঙ্গলে তিনি 'প্যাপিলিও অ্যাস্টিমাচুস' প্রজাতির দুটি প্রজাপতি দেখতে পান। তাঁর বিস্মিত হওয়ার কারণ ছিল। এই প্রজাতির প্রজাপতি আফ্রিকার জঙ্গলের অধিবাসী। তবে প্রজাপতিদের আয়ু কম হলেও এই ধরনের কিছু প্রজাতি পরিযায়ী। এরা সাধারণত জাহাজের মাস্তুলে বা কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেয়। পাড়ি দিতে স্বভাবত দুই-তিন বা চার প্রজন্মও সময় লাগে। পরিযায়ী প্রজাপতিরা পুরুষ ও স্ত্রী একত্রে থাকে।

মিঃ সোম বললেন—ভেরি ইন্টারেস্টিং! তারপর ম্যাজিস্ট্রেট কী করলেন?

মিঃ বোস বললেন—আমার যে ন্যান্সি নামে খটকা বেধেছে!

কর্নেল বললেন—ম্যাজিস্ট্রেট ন্যান্সি বার্নার্ডকে নিঃশর্তে মুক্তি দেন। রুশ নাগরিকদের শাস্তি হয়েছিল, নাকি পরে তারা মুক্তি পেয়েছিল, জানি না। কারণ এই খবরের আর ফলোআপ করা হয়নি।

মিঃ বোস বললেন—সেই ন্যান্সি পরে মিসেস আচারিয়া হয়েছিল কিনা আমাকে গোয়েন্দাগিরি করে জানতে হবে। এই তো কর্নেলসাহেব?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—তার আগে জানতে চাই, আপনি পড়াশোনা করতে চশমা ব্যবহার করেন কি না?

—হ্যাঁ। চশমা লাগে। চশমা পকেটেই আছে। আমার লং সাইট ভালো। শর্ট সাইট খারাপ।

—অবশ্য আমার কাছে উৎকৃষ্ট ম্যাগনিফাইং গ্লাস আছে। তার আগে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় আপনি এই খবরের সঙ্গে দেওয়া ছবিটা দেখুন। ধারে বনরক্ষী আর সশস্ত্র পুলিশ। মাঝখানে বাঁ দিক থেকে দুই রুশ নাগরিক। ডান দিকে ন্যান্সি বার্নার্ড।

বলে কর্নেল টেবিল ল্যাম্প জেলে দিয়ে খবরের কাটিং আঁটা কাগজটা ফাইল থেকে খুলে মিঃ বোসকে দিলেন। মিঃ বোস চশমা পরে নিয়ে ছবিটা দেখতে দেখতে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তিনি শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন—এবার ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা দিন তো প্লিজ!

কর্নেল তাঁকে টেবিলের ড্রয়ার থেকে তাঁর আতস কাচটা বের করে দিলেন।

মিঃ বোস আতস কাচ দিয়ে ছবিটা দেখার পর চাপা স্বরে বলে উঠলেন—হ্যাঁ। এই সেই মেমসায়েব।

মিঃ সোম ধমকের সুরে বললেন—অভিষেকদা! সিয়োর হয়ে বলো। আমাদের চোখে সব মেমসায়েবকেই একইরকম লাগে!

—কী বলছ তুমি সোম? অভিষেক বোস সোজা হয়ে বসলেন।—

আমি সিয়োর। টল ফিগার। ঝুঁটিবাঁধা চুলের স্টাইল। পাতলা ঠোঁটের হাসি। খবরের কাগজে আজকাল স্পষ্ট ছবি ছাপা হয়।

—অভিষেকদা! এই ছবিটা কিন্তু পাঁচ বছর আগে তোলা।

—তাতে কী হয়েছে? আমিও তো মিসেস আচারিয়াকে প্রায় তিনবছর ধরে দেখে আসছি। মেমসায়েবদের চেহারা বা ফিগার আমাদের মেয়েদের মতো অত শিগগির বদলায় না।

কর্নেল বললেন—তা হলে আপনি সেন্ট পারসেন্ট সিয়োর? নাকি একটু দ্বিধা থেকে যাচ্ছে?

—নো দ্বিধা। কর্নেলসায়েব! আমি হান্ড্রেড পারসেন্ট সিয়োর। তা ছাড়া আমি জানি, রঘুবীর আচারিয়ার কারবারের একটা ব্রাঞ্চ গ্যাংটকে আছে। আমাকে কতবার উনি বলেছেন, গ্যাংটকে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছে হলে আমাকে বলবেন। সেখানে তাঁর একটা রেস্টহাউস আছে।

মিঃ সোম মিটিমিটি হাসছিলেন। এবার বললেন—ইশ্! কথাটা আমাকে জানাওনি কেন? খামোকা একগাদা টাকা খরচ করে গতবার গ্যাংটক ঘুরে এলুম!

মিঃ বোস তাঁর কথায় কান না দিয়ে বললেন—কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না কর্নেলসায়েব। আপনি এই খবরের কাটিং রেখেছিলেন কেন?

কর্নেল বললেন—আপনি আমার হবির কথা তো জানেন মিঃ বোস। আমিও যে একজন লেপিডপটারিস্ট! প্রজাপতি সম্পর্কে আমারও প্রচণ্ড বাতিক আছে। বিশেষ করে ওই আফ্রিকান প্রজাতির প্রজাপতি রেয়ার স্পিসিজের মধ্যে পড়ে। বিশ্বে আর কোনো প্রজাপতির ডানার মাপ এত লম্বা নয়। এক ডানার প্রান্ত থেকে অন্য ডানার প্রান্ত অবধি মাপ দশ ইঞ্চি। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এটা জানা গিয়েছিল। তবে সেটা ছিল পুরুষ প্রজাপতি। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডের লর্ড রথসচাইল্ড এই প্রজাতির স্ত্রী প্রজাপতিকে আবিষ্কার করেছিলেন।

মিঃ সোম সহাস্যে বললেন—আমার আইনের বই পড়ার চেয়ে কর্নেলসায়েবের প্রজাপতির বই পড়া অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

মিঃ বোস ঘড়ি দেখে বললেন—এই রে! পৌনে নটা বাজছে! ওহে সোম! তোমারও তো নেমন্তন্ন! কর্নেলসায়েব! এবার আমাদের উঠতে হচ্ছে। আমাদের গিন্নিরা এতক্ষণে সেজেগুজে তৈরি হয়ে যে-যার ব্যালকনিতে বসে বেলুনফোলা হয়ে ফুলছে।

মিঃ সোম বললেন—পার্টি তো রাত দশটায়। তা ছাড়া আমাদেরই পারিজাত আবাসনের কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠান। তবে এখনই ওঠা উচিত।

মিঃ বোস বললেন—কর্নেলসায়েব! অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠতে হচ্ছে। তবে এর পর যদি আমাকে আপনার প্রয়োজন হয়, টেলিফোনে জানাবেন। আর—যাওয়ার সময় আবার বলে যাচ্ছি, ওই মেমসায়েবই মিঃ রঘুবীর আচারিয়ার স্ত্রী মিসেস ন্যান্সি আচারিয়া!

দুই ভায়রাভাই চলে যাওয়ার পর বললুম—আজ আপনি সকালে বই খুলে যে প্রজাপতির ছবি আতসকাচে খুঁটিয়ে দেখছিলেন, সেটা ওই প্রজাপতি। তাই না?

কর্নেল কাটিং আঁটা কাগজটা ফাইলবন্দি করে ড্রয়ারে রেখে এলেন। তারপর ইজিচেয়ার বসে বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছ।

—কিন্তু এ-ও তো একটা অদ্ভুত রহস্য! কেন আপনি ওই প্রজাপতির দিকে আজ মনোযোগ দিয়েছিলেন?

কর্নেল তুম্বো মুখে বললেন—তোমার স্মরণশক্তি এত কম কেন জয়ন্ত? তোমাকে কি বলিনি করনগড়ে ক্যাপ্টেন পাণ্ডে ওঁর ফার্মের এলাকায় খুব লম্বা ডানাওয়ালা অদ্ভুত গড়নের প্রজাপতি দেখেছিলেন?

অগত্যা বলতেই হল—হয়তো বলেছিলেন। এত সব রহস্যের পর রহস্যের স্তূপে তা ঢাকা পড়েছে।...

পরদিন সোমবার কী কী ঘটেছিল, তা আমার নোটবই থেকে অবিকল তুলে দিচ্ছি।

* সকাল ১০টা ১৫ মিনিটের সোহিনীর টেলিফোন। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে প্রাঃ ডিঃ - কে তাঁর নতুন বাংলোতে রেখেছেন। বাঙালিটোলার রাজবাড়ির পশ্চিমে। নৈনি নদীর ব্রিজ পেরিয়ে টিলার গায়ে ক্যাঃ পাণ্ডের নতুন বাংলো। কেয়ারটেকার আছে। চৌকিদার আছে। প্রাঃ ডিঃ-র অসুবিধে হবে না।

* ১১টা ৫মিনিটে কর্নেল একা বেরিয়েছিলেন। ফিরে এলেন ১২টা ১৫ মিনিটে। কোথায় গিয়েছিলেন তা খুলে বললেন না। কোথায় নাকি কী একটা জরুরি কাজ ছিল।

* ১২টা ২০ মিনিটে কর্নেলের সোহিনীকে টেলিফোন। কথাবার্তা শুনে বুঝলুম, আজ রাতের ট্রেনে করনগড় যাবেন। সোহিনীকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে তৈরি হয়ে আসতে বললেন।

* ১টা ৩০ মিনিটে খাটের ওপর অভ্যাসমতো ভাত-ঘুমের টানে শুয়ে পড়েছিলুম। দেখছিলুম, কর্নেল সেই প্রজাপতির বইটা থেকে তাঁর নোটবইয়ে কী সব লিখছেন। ঘুম ভেঙেছিল ষষ্ঠীচরণের ডাকে। সে চায়ের জন্য ডাকছিল উঠে দেখলুম, কর্নেল নেই। ষষ্ঠী বলল, বাবামশাই তিনটেতে বেরিয়েছেন। কোথায় গেছেন, বলে যাননি।

* ৫টা ২০ মিনিটে বৃষ্টি এল। ঝিরঝিরে বৃষ্টিটা আধঘণ্টা পরে থেমে গেল। ৬টা ৫ মিনিটে টেলিফোন বাজল। কর্নেলের টেলিফোন। তিনি বললেন, দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটা বাড়িতে আছেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।

* ৬টা ৩০ মিনিটে আবার টেলিফোন বাজল। নিউ আলিপুর থেকে অভিষেক বোসের ফোন। কর্নেল নেই শুনে তিনি বললেন, কর্নেল ফিরে এলে যেন তাঁকে রিং করেন। আমি জানতে চাইলুম, কোনো বিশেষ খবর আছে কি না। মিঃ বোস বললেন, একটা ছোট্ট খবর আছে। তবে তিনি তা সরাসরি কর্নেলকে জানাতে চান। ক্ষুব্ধ হয়ে রিসিভার রেখে জানালার কাছে গেলুম। পর্দা খুলে দেখলুম, আবার বৃষ্টি পড়ছে। তবে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি। জোর হাওয়া দিচ্ছে। আলোর শরীর জুড়ে বৃষ্টিকণার আঁকাবাঁকা ছুটোছুটি দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, আমি এবার থেকে কবিতা লেখার চেষ্টা করব।

* ৭টায় টেলিফোন বাজল। প্রাঃ ডিঃ হালদারমশাই করনগড় থেকে ফোন করছেন। কর্নেলস্যার নেই শুনে তিনি বললেন, কর্নেলস্যারের শিগগির করনগড় আসা দরকার। আজ বিকেলে রাজবাড়ির পিছনে জঙ্গলের মধ্যে তিনি একখানে গভীর গর্ত আবিষ্কার করেছেন। টাটকা গর্ত। আর একটা খবর যেন কর্নেলস্যারকে আমি দিই। রাজবাড়িতে তীর্থব্রত সিংহের শ্যালকও থাকেন। তাঁর নাম শ্যামল মজুমদার। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বলেছেন, শ্যামলবাবুর সঙ্গে স্থানীয় একটা জঙ্গি আদিবাসী গোষ্ঠীর যোগাযোগ আছে। জঙ্গি গোষ্ঠীটার নাম 'ব্ল্যাক প্যান্থার'। তীর্থব্রত সিংহ কর্নেল স্যারকে শ্যামলের কথা জানাননি। কেন জানাননি, এটা হালদারমশাইয়ের কাছে সন্দেহজনক ঘটনা। আমি হালদারমশাইকে শুধু জানালুম, আজ রাতের ট্রেনে কর্নেল করনগড় যাচ্ছেন।

* ৭টা ১৫ মিনিটে কর্নেল ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে সোহিনী রায়। তাঁর কাঁধে একটা ব্যাগ এবং হাতে একটা ব্যাগ। কাঁধের ব্যাগটা প্রকাণ্ড। কর্নেলকে অভিষেকবাবুর কথা বললুম। হালদারমশাইয়ের খবরও দিলুম। কর্নেল তখনই অভিষেকবাবুকে ফোন করলেন। তারপর শুনলুম, কর্নেল ক্রমাগত হুঁ দিয়ে যাচ্ছেন। ষষ্ঠীচরণ কফি আর স্ন্যাক্স রেখে গেল। সোহিনী বলল, আই মাস্ট টেক দ্য চান্স টু সার্ভ দ্য লেজেন্ডারি হিরোজ! সে কর্নেল ও আমাকে কফি তৈরি করে দিয়ে নিজে শুধু লিকার আর একটু চিনি নিল। তারপর প্রেমে পড়ার মতো হাসি হেসে (আমার ভুল হতেও পারে) বলল, জানেন জয়ন্তদা? মাই বিলাভেড গ্র্যান্ডপা বলতেন নীলাদ্রি সরকারের মতে দুধছাড়া কফিপান অ্যামেরিকানিজম! কর্নেল বললেন, ঠিকই বলি। এই যে জয়ন্ত সিগারেট ছেড়েছে, এ-ও অ্যামেরিকানিজম! কফির লিকারে ক্ষতিকর কেমিক্যাল পদার্থ আছে। দুধ তা নষ্ট করে। আর স্মোকিং? নন-স্মোকারদের মধ্যেই ক্যান্সারের রোগী বেশি। মার্কিনরা তাদের নিজস্ব লাইফস্টাইলকে গ্লোবালাইজ করতে চায়। মাই গুডনেস! 'গ্লোবাল ভিলেজ' কথাটা

আমি ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকায় প্রথম শুনেছিলুম। সোহিনী হেসে উঠল। হাসলে ওকে এত সুন্দর দেখায়, ওই শ্যামবর্ণ তরুণীটি কি তা জানে?

* ৮টা ৩০ মিনিট। কর্নেল ভিতর থেকে এসে বললেন, তাঁর গোছ-গাছ শেষ। আমার জন্য তিনি একটা বাড়তি রেনকোট সঙ্গে নিয়েছেন। সোহিনী আবার সেই প্রেমেপড়ার মতো হাসি হাসি হেসে বলল, জানেন জয়ন্তদা? বৃষ্টিরাতের ট্রেনে যেতে আমার অসাধারণ লাগে! বললুম, আমারও। কর্নেল রসভঙ্গ করে বললেন, বৃষ্টিরাতের ট্রেনে ওই লাইনে প্রায় ডাকাতি হয়। সোহিনী বলল, কী নেবে ওরা? আমি তো গয়না পরি না। মনে মনে বললুম, তুমি নিজেই এক অসামান্য গয়না। হা ঈশ্বর! আমি কি ওর প্রেমে পড়ে গেলুম?

* জাপানি ওয়ালক্লকে পিয়ানোর সুরে ৯টা বাজল। কর্নেল বললেন — এগারোটা পঁচিশে ট্রেন। দশটায় ডিনার খেয়ে বেরুব। পাঁচ মিনিট পরে টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে হুঁ হুঁ করে গেলেন। তারপর রিসিভার রেখে মিটিমিটি হেসে আমার দিকে তাকালেন। বললেন, নিউ আলিপুর থেকে আবার মিঃ বোসের ফোন। জয়ন্তের আগ্রহের কারণ আছে। আজ সকালে ন্যান্সি আচারিয়া হঠাৎ এসেছিলেন। মিঃ আচারিয়া তাই অফিসে যাননি। মিঃ বোস যেচে পড়ে মিঃ আচারিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে আড্ডা দিতে গিয়েছিলেন। তিনি নিশ্চিত, এই সেই ন্যান্সি বার্নার্ড। এইমাত্র মিঃ বোস আড়ি পেতে শুনেছেন, ন্যান্সি আজ রাতের ট্রেনে আবার তাঁর কর্মস্থল করনগড় ফিরে যাচ্ছেন। ব্যাপারটা নাকি সন্দেহজনক। সোহিনী জানতে চাইল, হু ইজ দ্যাট ন্যান্সি? কর্নেল তাকে সংক্ষেপে সিকিমের ঘটনাটা শোনালেন। সোহিনী বলল, বিদেশিরা আদিবাসী এলাকায় রাজনীতি করছে। স্বর্ণদিদিমার কাছে সে শুনেছিল, করনগড় অঞ্চলে একটা মিলিট্যান্ট দল গড়ে উঠেছে। করনগড়ের 'রাজাসায়েব' বেঁচে থাকতে এসব ছিল না। তবে 'রানিমা'-র প্রতি তাদের ভক্তি আগের মতোই ছিল। ১০টায় ডিনারে বসে আমি সোহিনীর কাছে জানতে চাইলুম, সে করনগড় রাজবাড়িতে তার দূরসম্পর্কের কাকু তীর্থব্রতবাবুর শ্যালক শ্যামল মজুমদারকে দেখেছে কি না। সোহিনী বলল, অরুণিমা কাকিমার এই ভাইটিকে সে একবারমাত্র দেখেছিল। স্বর্ণদিদিমা তাকে তার সঙ্গে মেলামেশা করতে নিষেধ করেছিলেন। শ্যামল মজুমদার নাকি বিহারের নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। শুধু তীর্থব্রতের খাতিরে স্বর্ণদিদিমা তাকে রাজবাড়ি থেকে চলে যেতে বলতে পারছেন না। আমি বললুম, সোহিনী! আপনার প্রাইভেট ডিটেকটিভ খবর দিয়েছেন, 'ব্ল্যাক প্যান্থার' নামে একটা জঙ্গি আদিবাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে শ্যামলবাবুর যোগাযোগ আছে। সোহিনী শক্ত মুখে বলল, স্বর্ণদিদিমার প্রোপার্টিতে আমার অধিকার আছে। আমি তাকে ফেস করব। কর্নেল বললেন, সোহিনী! এখনও তোমার ফেস করার সময় হয়নি। নাও উই আর জাস্ট প্রসিডিং টোয়ার্ডস দ্য পয়েন্ট জিরো ফ্রম দা পয়েন্ট ওয়ান জিরো জিরো। সোহিনী

একটু হেসে বলল, কাউন্ট ডাউন কি শুরু হয়েছে? কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই। এতে খাদ্যের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায় না এবং শ্বাসনালীতে খাদ্য আটকে যাওয়ার সাংঘাতিক সম্ভাবনা থাকে।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ আমরা করনগড় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা রেখেছিলুম। ফার্স্টক্লাসের একটামাত্র কম্পার্টমেন্ট। কোনো মেমসায়েব সেই কম্পার্টমেন্টের কোনো ক্যুপেতে ওঠেনি। সোহিনীই বারবার উঁকি মেরে চারটে ক্যুপেতে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। প্ল্যাটফর্মে নেমে সে ভিড়ের মধ্যে একজন মেমসায়েবকে খুঁজছিল, তা লক্ষ্য করেছিলুম। কিন্তু যত লোক ট্রেন থেকে নেমেছিল, তার দ্বিগুণের বেশি ট্রেনের প্রতীক্ষায় ছিল। ভিড় ঠেলে গেটের দিকে আমরা এগিয়ে গিয়ে দেখেছিলুম, তীর্থব্রত সিংহ দাঁড়িয়ে আছেন। তা হলে কর্নেল তাঁকে আগে থাকতেই খবর দিয়ে রেখেছিলেন। গেট পেরিয়ে যাওয়ার পর তিনি কর্নেলকে সম্ভাষণ করে সোহিনীর কাঁধে মৃদু থাপ্পড় মেরে বলেছিলেন—তা হলে শেষপর্যন্ত তুই এলি সোহিনী? তুই আসবি শুনে তোর কাকিমা আমার সঙ্গে এসেছেন। আয়!

তাঁর পাশে একজন তাগড়াই চেহারার গুঁফো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। কর্নেলকে করমর্দন করে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ইংরেজিতে বললেন—গত বছর নভেম্বর থেকে আমি প্রতীক্ষা করছি। আমার মাননীয় বন্ধু জীবন সম্পর্কে কি ক্রমশ নিরাসক্ত হয়ে পড়েছেন?

মিঃ সিংহ বললেন—কর্নেলসায়েবের চেয়ে আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্রী অনেক বেশি নিরাসক্ত। শুধু নিরাসক্ত নয়। জীবন সম্পর্কে প্রচণ্ড শীতল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে। সোহিনী মামিমার মৃত্যুসংবাদ শুনে আপনাকে কী যেন বলেছিল?

—মানুষ মরণশীল। বলে ক্যাপ্টেন পাণ্ডে হেসে উঠলেন।

সোহিনী ভুরু কুঁচকে একটু হেসে বলল—কী আশ্চর্য! এই সাংঘাতিক জংলি জায়গায় আমি একা আসব কী করে, তা আপনারা কেউ ভাবলেন না। শুধু খবর দিলেই দায়িত্ব শেষ?

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—ওসব কথা থাক। সোহিনী এখন পুরোপুরি পরিণত এবং প্রকৃত মহিলা হয়ে উঠেছে দেখে আমি খুশি। প্রথমে তোমাকে দেখে চিনতেই পারিনি।

কথা বলতে বলতে আমরা নিচের চত্বরে হেঁটে যাচ্ছিলুম। কর্নেল আমার সঙ্গে ক্যাপ্টেন পাণ্ডের আলাপ করিয়ে দিলেন। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আমার হাতে হাত আঁকড়ে ধরে হাঁটছিলেন। এতেই মানুষটিকে আমার খুব ভালো লাগল। এর ফাঁকে জিজ্ঞেস করলুম—এই ট্রেনে এখানে এত ভিড় কেন ক্যাপ্টেন পাণ্ডে?

তিনি বললেন—ওরা সব ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনের কর্মী। একটা বড়ো দল চলে গেছে ভোর পাঁচটার ট্রেনে। এটা দ্বিতীয় দল। এরা নটার শিফ্‌টে কাজ করবে।

একটা অ্যামবাসাডার গাড়ির পাশে একজন বাঙালি মহিলা দাঁড়িয়ে ছিলেন। সোহিনী গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে নত হয়েছিল। কিন্তু তিনি সোহিনীকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন। বুঝলুম, ইনিই তীর্থব্রতবাবুর স্ত্রী অরুণিমা। তাঁর চেহারায় মাতৃত্বের আদল ফুটে উঠেছিল। মিঃ সিংহ বললেন—জয়ন্তবাবু! আপনি সামনের সিটে আমার পাশে বসুন। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের জিপে যেতে হলে আপনাকে পেছনে উঠতে হবে।

পাশেই জিপগাড়িটা দাঁড় করানো ছিল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে সহাস্যে বললেন ঠিক বলেছ তীর্থ। আমাদের দুই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারের আয়তন কালক্রমে বেড়ে গেছে। এজন্য অবশ্য আমাদের নিজেদের কোনো দোষ নেই।

তীর্থবাবু নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর বাঁ পাশে বসলুম। আমাদের তিনজনের লাগেজ এই গাড়ির ডিকিতে ঢোকানো হয়েছিল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের জিপ আগে চলল। তার পিছনে অ্যামবাসাডার। রাস্তার অবস্থা শোচনীয়। ধারে ঘন জঙ্গল। চড়াই-উতরাই হয়ে ঝাঁকুনি খেতে খেতে গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছিল। পিছনে অরুণিমা ও সোহিনীর মধ্যে চাপা স্বরে কী কথা হচ্ছিল, স্পষ্ট বুঝতে পারছিলুম না। বারবার শুধু কানে আসছিল একটা কথা 'চক্রান্ত।'

কিছুক্ষণ পরে বাঁকের মুখে বাঁ দিকে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী দেখতে পেলুম। নদীটা কানায় কানায় ভরা। কোথাও পাথর মাথা উঁচিয়ে আছে। তীব্র খাত বইছে। মিঃ সিংহ বললেন—জয়ন্তবাবু! এই নদীটার নাম নৈনি। এখন জল দেখছেন, ওটা গত রাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টির জল, পাহাড় ধুয়ে নেমেছে। সকলের মধ্যে আর বৃষ্টি না হলে অন্যরকম রূপ দেখতে পাবেন। ছোটোনাগপুর ফাউন্টেন রেঞ্জের একটা শাখা করনগড় পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। পাহাড় আর জঙ্গল এলাকায় আগের যুগের সামন্ত রাজারা দুর্গ তৈরি করে বাস করতেন। দিল্লি বা পাটনা থেকে তুর্কি-মোগল-পাঠান কোনো শক্তিই এঁদের জব্দ করতে পারত না। অবশ্য আমার মামিমার বাবা তাঁর পূর্বপুরুষের সূত্রে রাজা খেতাব পেয়েছিলেন। আপনার মনে থাকতে পারে, ওঁরা ছিলেন রাঢ়ী ব্রাহ্মণ। আকবরের আমলে রাজা মানসিংহ বাংলা বিহার সীমান্তে বিদ্রোহ দমনে এসেছিলেন। তখনই রাঢ়ী ব্রাহ্মণ পরিবার তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তার পুরস্কার হিসেবে 'কর্ণঠাকুর' নামে পরিচিত এই পরিবারের প্রধান পুরুষ একটা বিশাল এলাকা জায়গির পান। কর্নঠাকুর সম্পর্কে এলাকায় অদ্ভুত সব গল্প চালু আছে। মূলত আদিবাসীরাই তাঁর প্রজা ছিল। একটু পরেই নদীর বাঁ দিকে তাঁর কর্ণগড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাবেন। ওটাই কর্ণগড়। তা থেকে করনগড়।

ডানদিকে তরঙ্গায়িত প্রান্তর কোথাও সবুজ ঘাসে ঢাকা, কোথাও নিরাবরণ। কাছে ও দূরে টিলার গায়ে আদিবাসীদের গ্রাম দেখা যাচ্ছিল। ঘাসের জমিতে রাখাল ছেলেরা গোরু চরাচ্ছিল। আবার চড়াইয়ে ওঠার পর মিঃ সিংহ বললেন,

জয়ন্তবাবু। ওই দেখুন নদীর ওপারে কর্ণগড়ের ধ্বংসাবশেষ। কাছে না দেখলে মনে হবে নিছক পাহাড়ি জঙ্গল। কিন্তু ওদিকটায় হাতির উপদ্রব আছে।

মিনিট দশেক পরে সমতল রাস্তার ডানদিকে উঁচু জমির ওপর পুরোনো এক তলা বাড়ি চোখে পড়ল। মিঃ সিংহ বললেন—এসে গেছি। এটা বাঙালিটোলার দক্ষিণ প্রান্ত। রাজবাড়ির অবস্থা দেখছেন?

বলে তিনি হেসে উঠলেন। বাঁ দিকে নদীর ওপারে গাছপালার ফাঁকে ক্যাপ্টেন পাণ্ডের রেস্ট হাউস খুঁজছিলুম। একটু পরেই সেটা দেখতে পেলুম। খানিকটা দূরে একটা সবুজ টিলার গায়ে ছবির মতো সুন্দর রঙিন বাংলো বাড়ি। গোয়েন্দাপ্রবরকে এতদূর থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়। বাঁ দিকে একটা পাথরের ব্রিজ, নদীর ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রিজের ওধারে সংকীর্ণ একটা লাল মাটির রাস্তা টিলার দিকে এগিয়ে গেছে।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডের জিপ ডাইনে ঘুরে উঁচু জমিতে উঠছিল। লক্ষ্য করলুম সামনে রাজবাড়ির দেউড়ি। দেউড়িটা মেরামত করে অক্ষত রাখা হয়েছে। একজন দারোয়ানও আছে। সে সেলাম ঠুকে দেউড়ির বিশাল গরাদ দেওয়া দরজা খুলে দিল।

ভিতরে প্রশস্ত লনের দুধারে পামগাছ। বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে দেশি-বিদেশি গাছ বর্ষার আমেজে যথেচ্ছ শ্যামলতা ছড়চ্ছে। একপাশে ভাঙা ফোয়ারা এবং ফুলের বাগান। অন্য পাশে ঘাসে ঢাকা জমির মাঝখানে একটা ঢাকা ইঁদারা। তার পাশে পাম্পিং মেশিনের ঘর। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের জিপ গাড়ি-বারান্দার নীচে থামল। তার পিছনে থামল আমাদের অ্যামবাসাডার।

আমরা গাড়ি থেকে নামলুম। সোহিনী বলল—কাকু! ডিকি খোলো! আমার ব্যাগ বদলে গেলে কেলেংকারি! জয়ন্তদার ব্যাগে কী আছে জানি না। কিন্তু আমার ব্যাগে সাংঘাতিক জিনিস আছে।

তীর্থব্রত হাসলেন।—রাইফেল টুকরো করে এনেছিস না কি রে?

—আনব না? সামনের মাসে শুটিং কম্পিটিশন। প্র্যাকটিসের জন্য এত বেশি স্পেস কোথায় পাব? বলে সে একটুখানি জিভ কাটল। কাকিমা। একসঙ্গে এলুম। অথচ এই ভদ্রলোকের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিইনি। কাকু না হয় ফর্মালিটির ধার ধারে না। কাকিমা। ইনি বিখ্যাত সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি। তোমাদের এখানে তো বাংলা কাগজ আসে না।

একবার ভাবলুম, ভদ্রমহিলাকে প্রণাম করব। কিন্তু তার আগেই উনি নমস্কার করলেন। কিন্তু কী জানি কেন, অরুণিমা সিংহকে দেখার পর থেকে তাঁর স্নেহবৎসল দৃষ্টি আমাকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল।

সোহিনী তার ছোট ও বড় দুটো ব্যাগ দু-কাঁধে নিয়ে অরুণিমার একটা কাঁধ আঁকড়ে দরজার ভিতরে অদৃশ্য হল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—কর্নেল সরকারকে

আমার ফার্মহাউসে রাখব ঠিক করেছিলুম। তীর্থ বাদ সাধল। যাই হোক, আপাতত তীর্থের আতিথ্যে থাকাই ওঁর উচিত হবে।

কর্নেল হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন—মিঃ সিংহ! আপনার কাকিমার ঘরের দরজা এখনো কি পুলিস সিল করে রেখেছে?

তীর্থব্রত বললেন—হ্যাঁ। পাটনা থেকে আর একটা ফরেন্সিক এক্সপার্ট টিম আসবার কথা। কিন্তু বারোদিন হয়ে গেল। তাঁদের পাত্তা নেই।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—চলো তীর্থ। দেখি, এঁদের থাকার ব্যবস্থা কেমন করেছ।

তীর্থব্রত ডাকছিলেন—ভজুয়া! ভজুয়া!

একজন হাফপ্যান্ট-গেঞ্জি-পরা লোক জিপের পাশ দিয়ে এসে সেলাম ঠুকল। সে হিন্দিতে বলল, ভজুয়াকে মাইজি বাজারে যেতে বলেছিলেন। এখনও সে ফেরেনি স্যার!

—ঠিক আছে। তুই এঁদের জিনিসপত্র নিয়ে আয়।

এ ধরনের 'রাজবাড়ি' কর্নেলের সান্নিধ্যে অনেক দেখেছি। বিশাল হলঘর। দেওয়ালে রাজবেশ পরা পুরুষ ও মহিলাদের বিশাল অয়েলপেন্টিং টাঙানো। ডিম্বাকৃতি প্রকাণ্ড টেবিল ঘিরে গদিআঁটা চেয়ার। একপাশে বিবর্ণ সোফাসেট। ইতস্তত টুলে বড়ো চিনেমাটির ফুলদানি। মাথার ওপর ঝোলানো ঝাড়বাতি। একপাশের কয়েকটা আলমারি বোঝাই বাঁধানো বই। তা ছাড়া দেওয়ালে হরিণ, চিতাবাঘ এবং নেকড়ের স্টাফ করা মাথা আটকানো আছে। হলঘর থেকে কাঠের চওড়া সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। মেঝে এবং সেই সিঁড়িতে পুরোনো লাল কার্পেট পাতা।

দোতলায় উঠে দেখলুম, ডানদিকে টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে সোহিনী একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার সামনে ঘরের দরজার পাশে অরুণিমা দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। তাঁকে বারবার আঁচলে চোখ মুছতে দেখলুম। এক বৃদ্ধা পরিচারিকা বারান্দার মেঝেয় বসে সম্ভবত কর্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছে।

তীর্থব্রত আমাদের নিয়ে গেলেন বাঁদিকে। সিঁড়ির মাথার ওপর প্রশস্ত গোলাকার বারান্দার একটা অংশ ঘুরে তিনি হঠাৎ দাঁড়ালেন। বললেন—এই ঘরে মামিমা থাকতেন। পুলিস সিল করে রেখেছে।

কর্নেল বললেন—আপনার মামিমার ঠাকুরঘর কোথায়?

—এই ঘর থেকে ওদিকে একটা ছোট্ট বারান্দায় যাওয়া যায়। সেখান থেকে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠলে এই ঘরের উপরেই তাঁর ঠাকুরঘর। সে ঘরটাও সিল করা আছে।

এরপর বাড়িটা ডাইনে ঘুরেছে। ইংরেজি এল হরফের মতো। এদিকটায় তিনটে ঘর। শেষপ্রান্তের ঘরের দরজা খোলা ছিল। তীর্থব্রত বললেন—বুধুয়া!

জিনিসগুলো ঘরে রেখে তুই ননীঠাকুরকে গিয়ে বল, আগে কফি আর স্ন্যাক্স এখনই যেন নিয়ে আসে।

বুধুয়া আমাদের ব্যাগগুলো ঘরের ভিতরে রেখে চলে গেল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—তীর্থ! আমার জুতো খোলার সমস্যা আছে!

তীর্থব্রত হাসলেন।—কী আশ্চর্য! আপনি জুতো পরেই ঢুকুন। আমরাও জুতো পরে ঢুকব।

ঘরে ঢুকে দেখলুম, বেশ চওড়া ঘর। পশ্চিমে একটা জানালা। দরজার দুপাশে উত্তরে দুটো এবং ঘরের ভিতরে দক্ষিণে দুটো জানালা। সব জানালায় নতুন পর্দা ঝুলছে। মেঝেয় কার্পেট পরানো হলেও পরিচ্ছন্ন। দুপাশে দুটো নিচু গাছ। তীর্থব্রত দক্ষিণের দরজা খুলে দিয়ে বললেন—এখানে ব্যালকনিতে বসলে কর্নেলসায়েব আনন্দ পাবেন।

সোফাসেট, সেন্টার টেবিল ছাড়াও ওয়ার্ড্রোব, লেখার জন্য চেয়ার টেবিল এবং একটা ইজিচেয়ারও আছে। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে সোফায় বসে বললেন—কী আশ্চর্য! আমি ভুলেই গিয়েছিলুম, এই গেস্টরুমে একসময় মন্ত্রী বা আমলাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতুম। যাই হোক, তুমি ফ্যানদুটো চালিয়ে দাও। আজ সকাল থেকে কদর্য গরম পড়েছে। করনগড়ে আগস্ট মাসে এ যাবৎকাল গরম আবহাওয়া ছিল না।

ইতিমধ্যে কর্নেল দক্ষিণের ব্যালকনিতে গিয়ে বাইনোকুলারে সম্ভবত পরিবেশ দর্শন করছিলেন। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে তীর্থব্রত সিংহের দিকে তাকিয়ে বললেন—তীর্থ! দাঁড়িয়ে কেন? বসো। আমাকে এখনই ফার্মে যেতে হবে। প্রথামিক কথাবার্তা আলোচনা করে নিই। কর্নেল সরকার! আগে কফি পান করে প্রকৃতি দর্শন করবেন। কফির গন্ধ পাচ্ছি।

তীর্থব্রত সোফার এক কোণে বসলেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন—সোহিনী আসায় ভালো হয়েছে। উইল প্রবেট করানোর কাজটা সেরে ফেলা যাবে। পাওনাদাররা মামিমার মৃত্যুর পর থেকে আমাকে উত্ত্যক্ত করছে।

এইসময় সেই বধুয়া বারান্দার দিকের দরজার পর্দা সরিয়ে দিল। শীর্ণকায় একজন পৈতে ও টিকিধারী ঢ্যাঙা মানুষ দুহাতে প্রকাণ্ড ট্রে ধরে ঘরে ঢুকলেন। তিনিই যে ননীঠাকুর তা বুঝতে পারলুম। সেন্টারটেবিলে ট্রে রেখে তিনি ক্যাপ্টেন পাণ্ডে ও আমাকে নমস্কার করলেন। কর্নেলকে ঘরে ঢুকতে দেখে তিনি তাঁকেও নমস্কার করলেন। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে তাঁকে বাংলায় বললেন—ঠাকুরমশাই। আপনার এই অতিথিরা কিন্তু নিরামিষ খান না। আপনি নিজে নিরামিষাশী। তা হলে কী হবে?

ননীঠাকুর মৃদু হেসে বসলেন—আপনি ভুলে যাচ্ছেন পাণ্ডেজি। আমার হাতে আপনি রাজবাড়িতে কি আমিষ রান্না খাননি? আমি নিজে না খেলেও অতিথিদের আমিষ পরিবেশনে আমার কোনো দোষ হয় না!

কর্নেল সোফায় বসে বললেন—কিন্তু ঠাকুরমশাই! শাস্ত্রে আছে ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম।

ঠাকুরমশাই রসিক মানুষ, তা বোঝা গেল। মুচকি হেসে তিনি বললেন—স্যার! এই রাজবাড়িতেই জন্মেছিলুম। এখানেই দেহরক্ষা করব। আমার দশবছর বয়স থেকে আমিষের ঘ্রাণ পেতে পেতে এই চল্লিশ বছরে আমিষের ঘ্রাণ ভুলে গেছি। আর যদি বলেন, স্পর্শদোষ হয় কিনা। চল্লিশবছর ধরে যা স্পর্শ করে আসছি, তা আমিষ না নিরামিষ, সেটা চিন্তা না করলেই হল! স্যার চিন্তার দোষই আসল দোষ।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে এবং কর্নেল হেসে উঠলেন। মিঃ সিংহ বললেন—ননীদা! এবার এঁদের জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করোগে।

কর্নেল বললেন—ব্রেকফাস্ট করব দশটায়। আপনার ব্যস্ত হবার কারণ নেই।

ননীঠাকুর এবং বুধুয়া চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন—রাজবাড়ির কেয়ারটেকার আর রানিমার পরিচারিকাকে পুলিশ জামিন দিচ্ছে না। মিঃ সিংহ কি আপনাকে ল'ইয়ারের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কিছু জানতে পেরেছেন?

তীর্থব্রত বললেন—ওদের ঘরে দশহাজার করে টাকা খুঁজে পাওয়াটাই পুলিশের সন্দেহের একটা গ্রাউন্ড। পাণ্ডেজির সঙ্গে অফিসার-ইন-চার্জ রাজকুমার প্রসাদের ভালো জানাশোনা অছে। পাণ্ডেজি চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এই ওড়িয়া লোকটি বড্ড গোঁয়ার।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—হ্যাঁ। প্রসাদজি ওই একটা পয়েন্টে স্টিক করে আছেন। আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, এমন তো হতেই পারে, প্রকৃত খুনি টাকাগুলো ওদের ঘরে কোনো সুযোগে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু প্রসাদজির এক কথা। তা হলে তো রাজবাড়ির সব কর্মচারীকে অ্যারেস্ট করতে হয় এমনকী তীর্থকেও বাদ দেওয়া যায় না।

তীর্থব্রত একটু হেসে বললেন—ওসি লোকটির এই মার্ডারের মোটিভ সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণাই নেই।

কর্নেল বললেন—আচ্ছা মিঃ সিংহ, বৃদ্ধা এক মহিলাকে এমনভাবে মানসিক যন্ত্রণা দিয়ে মেরে ফেলার মোটিভ কী হতে পারে বলে আপনার ধারণা?

—প্রতিহিংসা চরিতার্থ।

—কী ব্যাপারে?

—মোহনলাল সুখানিয়ার গ্র্যান্ডসন প্রকাশ সুখানিয়ার কুখ্যাতি আছে। বছর দুই আগে তাকে পুলিশ নিষিদ্ধ মাদকপাচারের দায়ে গ্রেফতার করেছিল। কিন্তু শেষাবধি সে রেহাই পেয়ে যায়। আমার নিজস্ব সোর্স থেকে জানি, তার সেই নার্কোটিকসের কারবার এখনও চালু আছে। ব্যবসার আড়ালে এই গোপন কাজ সে করে যাচ্ছে।

—প্রকাশ সুখানিয়া কীসের ব্যবসা করেন?

—ইলেকট্রনিক গুডসের। আশ্চর্য ব্যাপার, পুলিশ দেখেও দেখে না প্রকাশের গোডাউনে বিদেশি টিভি, ভি সি আর, টেপরেকর্ডার থেকে ক্যামেরা পর্যন্ত দেশি জিনিসের সঙ্গে মিশিয়ে রাখা আছে।

—কিন্তু প্রতিহিংসা চরিতার্থ বলতে কি আপনি আপনার মামাবাবুর সঙ্গে মামলায় হেরে যাওয়ার ব্যাপারটা বোঝাচ্ছেন?

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে, একটু হেসে বললেন—হিস্টোরিক্যাল জুয়েলস নাকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিশপ্ত হয়ে যায়। আমি তীর্থকে বলেছি, সুখানিয়া ফ্যামিলি রাজাসায়েবের তথাকথিত জুয়েলস পেলে অভিশাপের পাল্লায় পড়ত। পায়নি বলে সুখে-স্বচ্ছন্দে বেঁচে আছে। আর রাজবাড়ির ওপর যেন অভিশাপের কালো ছায়া। তীর্থের ফ্যাক্টরির অবস্থাও ভালো নয়। লেবার ট্রাবল লেগেই আছে।

তীর্থব্রত বললেন—অনেকদিন থেকে ভেবেছি, আমি অন্য জায়গায় বাড়ি তৈরি করব। কিন্তু মামিমার কথা ভেবে সেটা করতে পারিনি। পাণ্ডেজি ঠিক বলেছেন। রাজবাড়ি না ছাড়লে আমার ভাগ্যেও কি আছে, কে জানে?

কর্নেল বললেন—রানিমার মৃত্যুর দিন ভোরবেলায় যে আপনার ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার খবর দিয়েছিল। পুলিশ এ ব্যাপারে কী তদন্ত করছে না?

—কী করছে তা পুলিশ জানে। এটা তো স্পষ্ট, মামিমার বেড়ালগুলোকে বিষ খাইয়ে কেউ তাঁকেও বিষাক্ত ইঞ্জেকশনে মেরে ফেলবে বলেই আমাকে ওইভাবে রাজবাড়ি থেকে বেশ কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

—আপনার স্ত্রী ওই সময় কোথায় ছিলেন?

—অরুণিমা নিচে ছিল। ফ্যাক্টরিতে আগুন লাগার খবর শুনে সে নিচে নেমে এসেছিল। তখন তার মানসিক উদবেগের কথা বুঝতেই পারছেন। রাজবাড়ির সরকার, তাকে কেয়ারটেকারও বলতে পারেন, তাকে খুঁজছিল দুবেজি তখন নাকি ঠাকুরবাড়িতে ছিলেন।

—রাজবাড়িতে ঠাকুরবাড়ি থাকা স্বাভাবিক। সেটা কোথায়?

—উত্তর-পূর্ব কোণে। ওখানে একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরের পারে ঠাকুরবাড়ি। শুনলে অবাক হবেন, রাজবাড়ির গৃহদেবতা চণ্ডীমা। আর মামিমা নিজস্ব ঠাকুরঘরে গৃহদেবতা শিব। মামিমা নাকি বিয়ের পর তাঁর শ্বশুরমশাইয়ের কাছে অনুমতি নিয়ে তার বাবার বাড়ি থেকে কষ্টিপাথরে তৈরি শিবলিঙ্গ এনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে সহস্যে বললেন—এই রাজবাড়ির সবকিছুই বিচিত্র কর্নেল সরকার ননীঠাকুরকে দেখলেন। তার ঘরে আছেন রাধামাধব।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরিয়ে বললেন—জয়ন্ত তুমি পোশাক বদলে বিশ্রাম করো। পৌনে নটা বাজে। আমি একবার ক্যাপ্টেন পাণ্ডের ফার্ম থেকে আসি। ঠিক দশটায় এসে ব্রেকফাস্ট করব। দেরি হবে না।

তীর্থব্রত বললেন—আমি গিয়ে দেখি, ননীঠাকুর কী করছে। অরুণিমা সোহিনীর পাল্লায় পড়েছে।

দেখলুম, কর্নেল যথারীতি ক্যামেরা আর বাইনোকুলার গলায় ঝুলিয়ে এবং পিঠে কিটব্যাগ এঁটে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিটব্যাগের কোনা দিয়ে প্রজাপতিধরা থলের স্টিক বেরিয়ে আছে। ওঁকে সতর্ক করে দেওয়ার ছলে সকৌতুকে বললুম করনগড় অঞ্চলে কি ওয়াল্ড লাইফ প্রোটেকশন আইন চালু নেই?

কর্নেল হাসলেন।—তুমি তো দেখেছ জয়ন্ত! আমি প্রজাপতি যদি দৈবাৎ করতে পারি, সেটাকে পরীক্ষা করেই মুক্তি দিই!....

গেস্টরুমের সংলগ্ন বাথরুমে প্রাতঃকৃত্য এবং দাড়ি কামানোর পর পোশাক বদলে নিলুম। তারপর দক্ষিণের ব্যালকনিতে গিয়ে দেখলুম—সেখানে দুটো চেয়ার আছে। তীর্থব্রত সিংহ অতিথিসৎকারে কোনো ত্রুটি রাখেননি। চেয়ারে বসে এক মনোরম ল্যান্ডস্কেপ দেখছিলুম। রাজবাড়ির দক্ষিণের বাউন্ডারি দেয়ালের পর একটা তরঙ্গায়িত প্রান্তর কোথাও ঘাসে ঢাকা, কোথাও নগ্ন, আর কোথাও ছোট বড় নানা গড়নের কালো পাথর ছড়িয়ে আছে। প্রান্তরের শেষে ইতস্তত কয়েকটা জঙ্গলে ঢাকা টিলার পিছনে নীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে উঁচু পাহাড়। বাঁ দিকে পূর্বে নিবিড় জঙ্গল। ওই জঙ্গলেই কি হালদারমশাই টাটকা বড় গর্ত দেখেছিলেন? ডানদিকে পশ্চিমে রাজবাড়ির নিচে এবড়োখেবড়ো ওধারে নৈনি নদী সারবন্দি গাছের আড়ালে ঢাকা পড়েছে। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের রেস্টহাউসটা দেখার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলুম। হালদারমশাই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আর পরচুলা পরে সায়েব সেজে ওখানে এখন কী করছেন কে জানে? একটু পরে পিছনে ঘরের ভিতরে সোহিনীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলুম।— আশ্চর্য! রাজবাড়ির গেস্টরা কি সবাই ভ্যানিশ হয়ে গেল?

সাড়া দিয়ে বললুম—একজন ভ্যানিশ হতে পারেনি!

সোহিনী এসে পর্দা তুলে আমাকে দেখে বলল—জয়ন্তদা! আপনাকে ফেলে ওঁরা কেটে পড়েছেন দেখছি!

—বসুন।

সোহিনী বলল—আপনি-টাপনি ছাড়ুন তো।

—ঠিক আছে। বসো।

—এখানে বসে দেখার মতো কিছু নেই। তার চেয়ে চলুন, পিছনে বাড়ির পুকুরের ধারে কিছুক্ষণ ঘুরে আসি।

—আপত্তি নেই। কিন্তু এ ঘরে একটা তালা দরকার।

—তালা কী হবে? আপনারা হাজার হাজার টাকাকড়ি সঙ্গে নিয়ে তো আসেননি।

একটু হেসে বললুম—টাকাকড়ির কথা ভাবছি না। আমার ওই ব্যাগে একটা ফায়ার আর্ম আছে।

সোহিনী হাসল। —হ্যাঁ। ফায়ার আর্মস্ থাকা একটা প্রব্লেম। আমার রাইফেলটা কাকিমার জিম্মায় রেখেছি। আপনার নিশ্চয় স্মলগান?

—পয়েন্ট টোয়েন্টি টু ক্যালিবারের সিক্সরাউন্ডার রিভলভার।

—কী সর্বনাশ! সাংবাদিকদেরও এসব দরকার হয়?

—তুমি তো জানো আমি আসলে ক্রাইম রিপোর্টার।

—হ্যাঁ। মনে পড়েছে। একটা কেসস্টোরিতে পড়েছিলুম, আপনি কর্নেলের বাধাসত্ত্বেও এক রাউন্ড ফায়ার করে ক্রিমিন্যালকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন কর্নেলের প্রচণ্ড বকুনি খেয়েছিলেন। দেখবেন, পুকুরপাড়ের পিছনে ঘন জঙ্গল আছে। সেই জঙ্গলে নাকি দিনদুপুরেও ভূতের উৎপাত হয়। সাবধান জয়ন্তদা। ভূত দেখে যেন ফায়ার করবেন না। খামোকা একটা গুলি খরচ হবে। মরবে না।

রিভলভারটা লোডেড ছিল। ওই অবস্থায় পাঞ্জাবির ঝুলপকেটে রুমালে মুড়িয়ে রাখলুম। তারপর সোহিনীকে অনুসরণ করলুম।

হলঘরে নেমে সোহিনী পিছনের একটা দরজা খুলল। একটা খোলা বৃত্তাকার বারান্দা থেকে কয়েকটা ধাপ সিঁড়ি দিয়ে নেমে একটা লাইমকংক্রিটে জড়ানো চত্বর। তারপর একটা মন্দির। নিচে হাড়িকাঠ দেখে বুঝলুম, এখানে মা চণ্ডীর উদ্দেশে পাঁঠা বলি হয়। মন্দিরের দরজায় তালা আঁটা। বাঁ পাশ দিয়ে শীর্ণ পথে এগিয়ে বাউন্ডারি ওয়াল, সেখানে একটা দরজা। দরজা খুলে এগিয়ে গিয়ে দেখি একটা চৌকো পুকুর। পুকুরে প্রচুর পদ্ম। সবে কুঁড়ি ধরেছে। গাছপালা আর ঝোপঝাড় আছে। দরজার নিচেই বাঁধানো ঘাট এবং অনেকটা জায়গা পরিষ্কার আছে। জল স্বচ্ছ। সোহিনী বলল—পুকুরে প্রচুর মাছ থাকত। এখন অত মাছ আছে কি না জানি না। জানেন জয়ন্তদা, একটা আশ্চর্য ব্যাপার। ঠাকুরপুকুরের জল কিন্তু গ্রীষ্মেও শুকোয় না। স্বর্ণদিদিমার কাছে শুনেছিলুম, পুকুরের তলায় একটা প্রস্রবণ আছে। সেটা কিন্তু সত্যি। ওই কোণের দিকে দেখছেন একটা খাল কাটা আছে, ওখান দিয়ে বাড়তি জল বেরিয়ে যায়। নিচের জমিতে তাই ধানখেত। দেখতে পাচ্ছেন?

বললুম—পাচ্ছি। কারা ধানচাষ করেছে?

—জমিগুলো রাজবাড়িরই। আদিবাসীরা চাষ করে। ফসলের ভাগ দেয়। আর ওই মরচেধরা তারের জাল দেখছেন, পুকুরের মাছ যাতে জলের সঙ্গে পালিয়ে না যায়, তাই খালের মুখে জাল দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে।

পুকুরপাড়ে পায়ে চলা পথে পা বাড়িয়ে বললুম—চলো। জঙ্গলে ভূতদর্শন করে আসি।

সোহিনী হাসল। —আপনি বা আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু রাজবাড়ি কেন, আদিবাসী চাষিরাও বিশ্বাস করে ওটা ভূতের ডেরা। দিনদুপুরেও ওদিকে কেউ যায় না।

এসো আমরা যাই। অন্তত একটা ভূত দেখতে পেলে অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা হবে।

পুকুরের পূর্বপাড় ঘুরে পায়ে চলা রাস্তাটা নিচে নেমে গেছে। আমরা সোজা জঙ্গলে ঢুকে গেলুম। দেখলুম এটা একটা শালবন। নিচে ততবেশি ঝোপঝাড় নেই। কোথাও-কোথাও নগ্ন পাথুরে মাটি। একখানে একটা প্রকাণ্ড কালো গ্রানাইট পাথর লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলুম। তারপর থমকে দাঁড়ালুম। সোহিনী পিছনে ছিল। ঘুরে ঠোঁটে আঙুল রেখে তাকে চুপচাপ থাকতে ইশারা করলুম।

অদ্ভুত একটা চাপা শব্দ আমার কানে এসেছিল। সোহিনীও শব্দটা শুনে চমকে গিয়েছিল। তাকে ফিসফিস করে বললুম—ভূত!

সোহিনীও ফিসফিস করে বলল—ভূত দেখব। চলুন।

পা টিপে টিপে পাথরটার ডানদিকে গিয়ে হাঁটু মুড়ে মেরে বসলুম। তারপর গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গেলুম। সামনে শালগাছের গুঁড়ির ওধারে একটা হাফপ্যান্ট গেঞ্জিপরা বেঁটে লোক কোদাল দিয়ে নরম মাটি খুঁড়ে পিছনে ছুড়ে ফেলছে। গর্তে জল জমে আছে। তাই মাটি খোঁড়ার শব্দটা সত্যি ভূতুড়ে শোনাচ্ছে। লোকটার গায়ে পোশাকে জলকাদা লেগে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। ওদিকে গর্তের পাড়ে বসে আছে আরেকটা লোক। সে ইঙ্গিতে মাটিখোঁড়া লোকটাকে নির্দেশ দিচ্ছে। তার পরনেও হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি। এক হাতে একটা শাবল।

আমি বাধা দেওয়ার আগেই সোহিনী উঠে গিয়ে চার্জ করল। এই! কে তোমরা! কেন এখানে গর্ত খুঁড়ছ ?

লোকদুটো যেন বাঘের দৃষ্টিতে সোহিনীকে দেখছিল। আমি কিছু না ভেবেই পকেট থেকে রিভলভার বের করে এক লাফে সোহিনীর পাশে গেলুম। তারপর তাদের মাথার ওপর দিয়ে এক রাউন্ড ফায়ার করলুম। অমনি লোকদুটো কোদাল আর শাবল ফেলে জঙ্গলের ভিতরে উধাও হয়ে গেল। .....

গুলি ছুড়েই বুঝতে পেরেছিলুম, বড্ড বেশি হঠকারিতা করে ফেলেছি। গুলি ছোড়ার মতো কোনো অবস্থাই ছিল না। কোদাল ও শাবল ফেলে কালো কুচকুচে লোকদুটো যেভাবে পালিয়ে গেল, তাতে বোঝা যায় তারা নিরস্ত্র এবং আশা করেনি যে তারা গর্ত খুঁড়ছে বলে কেউ তাদের গুলি করে মারতে পারে।

সোহিনী প্রথমে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। তারপর খিলখিল করে হেসে উঠল। জয়ন্তদা। আপনি কি ভেবেছিলেন লোকদুটো আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে?

কাঁচুমাচু হেসে বললুম—ওদের চোখদুটো দেখে মনে হচ্ছিল যেন হিংস্র চোখে তোমাকে দেখছে। আমি ভেবেছিলুম, যে কোনো মুহূর্তে ওরা তোমাকে আক্রমণ করবে। কারণ ওরা দেখছে, তুমি একা। আমাকে তো ওরা দেখতে পায়নি।

সোহিনীর পায়ের হাত তিনেক দূরে গর্ত। সোহিনী ঝুঁকে গর্তটা দেখে

সকৌতুকে বলল—ওরা কি গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে এখানটা খুঁড়ছিল? কিন্তু গর্তটা তো তত বড় নয়। মাটিটা খুব শক্ত বলে ওদের খুঁড়তে দেরি হচ্ছিল। কিন্তু যা-ই বলুন জয়ন্তদা, আপনি অকারণ একটা গুলি খরচ করে ফেললেন।

—স্বীকার করছি সোহিনী! সত্যিই আমি হঠকারিতা করে ফেলেছি। বলে গর্তটার অন্যদিকে গেলুম। তারপর শাবলটা তুলে নিলুম।

সোহিনী চোখ বড় করে বলল—এবার নিজেই কি গুপ্তধন খুঁড়ে বের করবেন?

বললুম—না। শাবলটা দেখছি, বেশ ভারী। শক্ত মাটি কাটার পক্ষে উপযুক্ত।

সোহিনী চোখে সুন্দর একটা ভঙ্গি করে বলল—তা হলে আসুন। আমরাই গুপ্তধন খুঁড়ে বের করি।

এবার চাপা স্বরে বললুম—এই গর্তটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। তা হলেই বুঝতে পারবে, কেন আমি এমন হঠকারিতা করে ফেলেছি। প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার গতকাল টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, রাজবাড়ির পিছনে সদ্য খুঁড়ে রাখা একটা গর্ত তিনি আবিষ্কার করেছেন। তাঁর কথার ভঙ্গিতে মনে হয়েছিল, সম্ভবত তিনি এই শালবনে ঢুকেছেন, তা টের পেয়েই যারা গর্ত খুঁড়ছিল তারা পালিয়ে গেছে। তিনি অবশ্য বলেছিলেন, টেলিফোনে সব কথা বলা যায় না। তো এবার চিন্তা করো, কেন আমি তোমাকে নিয়ে শালবনে ঢুকেছিলুম।

সোহিনী এবার সিরিয়াস হল। সে বলল—তার মানে, গতকাল লোকদুটো গর্ত খুঁড়ে কিছু খুঁজছিল। মিঃ হালদার এসে পড়ায় পালিয়ে যায়। গতরাত্রে এখানে বৃষ্টি হয়েছে। তাই ভিজে মাটিতে গর্ত খোঁড়া সহজ হবে বলে তারা সকাল সকাল এসে আবার খোঁড়া শুরু করেছিল।

বললুম—এখানে নিশ্চয় এমন কিছু পোঁতা আছে বলে তারা জানতে পেরেছে। রাজবাড়ি সংলগ্ন এই জঙ্গলে গুপ্তধন থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

আমার এইসব আলোচনা করছি, এমন সময় পাথরটার পিছনে পায়ের শব্দ হল। এবার রিভলভার নয়, শাবলটা মুঠোয় ধরে সোহিনীর পাশে গিয়ে জোরে বললুম—কে?

পাথরের পাশ দিয়ে বুধুয়া এসে বলল—আমি স্যার।

সোহিনী বলল—তুমি এখানে কী করতে এসেছি বুধুয়া।

সে হাসল। —দিদি! আমি পুকুরপাড়ে গাইগোরু বাঁধতে এসেছিলুম। তারপর কারা কথা বলছে কানে এল। আরে! এখানে গর্ত খুঁড়ল কে?

সোহিনী বলল—দুটো লোক চুপিচুপি গর্ত খুঁড়ছিল। আমাদের দেখে পালিয়ে গেল। তুমি এখনই গিয়ে কাকুকে ডেকে আনো।

বুধুয়া গর্তটা দেখে উলটোদিকে গেল। তারপর কাছেই একটা উঁচু গাছের দিকে তাকাল। গাছ থেকে প্রচুর লতাপাতার ঝালর মাটিতে নেমে এসেছে। সে তার পায়ের কাছ থেকে একটা মোটা লতা ওপড়ানোর চেষ্টা করছিল। জিজ্ঞেস করলুম—কী ব্যাপার বুধুয়া?

বুধুয়া সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু-হাত ঝেড়ে নোংরা ফেলে দিয়ে হাসল। —স্যার! এই যে গাছ দেখছেন, এটাকে আমরা বলি চিহড়গাছ। এই গাছে খুব মোটা লতাপাতা দেখতে পাচ্ছেন। গাছ থেকে আসল লতাটা ঢুকেছে এই গর্তের ধারে। দেখতে পাচ্ছেন তো?

সোহিনী হাসতে হাসতে বলল—জয়ন্তদা! টার্জনের ছবিতে এইরকম মোটা লতা ধরে টার্জন ঝুলতে ঝুলতে একগাছ থেকে আরেক গাছে যায়। নিশ্চয় দেখেছেন?

বললুম—দেখেছি! কিন্তু বুধুয়া কী বলতে চাইছে?

বুধুয়া বলল—এই লতার শেকড় মাটির তলায় চলে গেছে। আর সেই শেকড়ে বড় বড় আলুর মতো কন্দ আছে। একেকটা কন্দের ওজন কমপক্ষে দশ কিলো। আমরা বলি কানালকন্দ। এক কিলোর দাম তিন-চার টাকা। পাহাড়িরা খায় স্যার। আমি একবার খেয়ে দেখেছিলুম। সুন্দর স্বাদ।

সোহিনী দু-কাঁধ নেড়ে এবং দুই হাত চিতিয়ে একটা সুন্দর ভঙ্গি করে বলল—কোনো মানে হয়? কানা আলু নাকি একটা কন্দ-টন্দ এসে গুপ্তধনের সম্ভাবনা বাতিল করে দিল। খামোকা একটা গুলি গচ্চা গেল জয়ন্তদার! ওদিকে দুই হতভাগা হয়তো এখন জঙ্গলের মধ্যে হার্টফেল করে মারা পড়েছে! দু-দুটো মার্ডারের দায়! ও মাই গড!

ওর কথা শুনে হেসে ফেললুম—সোহিনী! ওরা পাহাড়-জঙ্গলের মানুষ। এত সহজে মারা পড়বে না। তবে হতভাগাদের রুজির হাতিয়ার এখানে ফেলে গেছে। এটাই প্রবলেম।

সোহিনী বলল—আমি কিন্তু প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের সঙ্গে কন্ট্র্যাক্ট বাতিল করব। উনিই আপনাকে মিসগাইড করেছেন। বুধুয়া। এই শাবল আর কোদাল কাদের, তা কীভাবে জানা যাবে বলো তো?

বুধুয়া বলল—দিদি! শাবল আর কোদাল এখানেই পড়ে থাক। যারা গর্ত খুঁড়ছিল, তারাই এসে নিয়ে যাবে।

সোহিনী বলল—কিন্তু তোমার এই স্যার যে ওদের ভয় দেখাতে রিভলভারের গুলি ছুড়েছেন। এর পর ওরা কি আর ওখানে আসতে সাহস পাবে?

বুধুয়া কী বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছে, এমন সময় শালবনের ভিতরে কাদের কথাবার্তা শোনা গেল। একজনের কণ্ঠস্বর চড়া আর ঝাঁঝাল। সে কী ভাষায় কথা বলছে, বুঝতে পারলুম না। বুধুয়া এগিয়ে গিয়ে একটা ঝোপের আড়াল থেকে উঁকি দিল। তারপর সতর্ক পা ফেলে আমাদের কাছে এল। সে চুপিচুপি বলল—আপনারা এখানে থাকবেন না দিদি। শ্যামলবাবু একদল পাহাড়িকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন।

তখনই বুঝলুম, এই শ্যামলবাবু মিঃ সিংহের শ্যালক সেই শ্যামল মজুমদার।

সোহিনী বাঁকা মুখে আস্তে বলল—সেই বিপ্লবী মিলিট্যান্ট লিডার। ঠিক আছে। সে আসুক।

বুধুয়া ভীত মুখে বলল—দিদি! শ্যামলবাবুকে আপনারা বুঝিয়ে বললে উনি বুঝবেন। কিন্তু ওঁর সঙ্গে যারা আসছে, তারা গোঁয়ার। স্যার! আপনারা চলে আসুন। শিগগির!

বলে বুধুয়া দ্রুত কালো পাথরটার আড়ালে অদৃশ্য হল। সোহিনী ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। অগত্যা একটা হাত ধরে টেনে বললুম—পাগলামি কোরো না সোহিনী। আমরাই দোষী। চলে এসো। পরে ওই বিপ্লবী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলে তাঁকে যা বলার, তা বলা যাবে। এ মুহূর্তে আদিবাসীদের ফেস করা বিপজ্জনক।

সোহিনীকে প্রায় জোর করে টেনে নিয়ে এলুম। তারপর পুকুরপাড়ের রাস্তা দিয়ে রাজবাড়িতে ঢুকে পড়লুম। তীর্থব্রত সিংহ ছাড়া আপাতত ওই লোকগুলোকে কেউ বুঝিয়ে শান্ত করতে পারবে না।...

রাজবাড়ির দোতলায় উঠে সোহিনী ডান দিকে সবেগে চলে গেল। আমি বাঁ দিকে এগিয়ে আমাদের ঘরে ঢুকলুম। কর্নেল নেই। তাই উদ্বেগ বোধ করছিলুম। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার মনে হল, আমি কি নিজের অজ্ঞাতসারে সত্যিই সোহিনীর প্রেমে পড়ে গেছি। তা না হলে নেহাত অকারণে তার আক্রান্ত হওয়ার কথা আমার মাথায় এসেছিল কেন? যেন শিভালরি দেখাতেই লোকদুটোকে ভয় পাইয়ে দিতে রিভলভারের একটা দামি বুলেট খরচ করে ফেললুম। আমি কল্পনাও করিনি ব্যাপারটা এতদূর গড়াতে পারে।

দক্ষিণের এই ঘর থেকে দোতলার উত্তরদিকের বারান্দা ও ঘরগুলো দেখা যায়। বাতাসে দরজার পর্দা সরে যাচ্ছিল। দেখলুম, তীর্থব্রত সিংহ হন্তদন্ত হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর পিছনে সোহিনী। অরুণিমা তাকে বারবার ডাকছেন। কিন্তু সে পিছু ফিরে তাকাল না।

সোহিনী কলকাতায় বলেছিল, সে শ্যামল মজুমদারকে 'ফেস' করবে। কর্নেল তাকে নিষেধ করেছিলেন। সোহিনীও দেখছি বড্ড গোঁয়ার মেয়ে।

কী হয়, তা আড়াল থেকে দেখব কি না ভাবছিলুম। হঠাৎ মনে পড়ল, দক্ষিণের ব্যালকনি থেকে উত্তর-পূর্বের শালবনটা দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমে রিভলভারের বুলেটকেস থেকে ফায়ার্ড বুলেটের খোলসটা বের করে ব্যাগের ভিতরে আরো ছটা তাজা থ্রি নট থ্রি বুলেটের সঙ্গে মিশিয়ে রাখলুম এবং একটা তাজা বুলেট রিভলভারের খালি বুলেটকেসে ঢুকিয়ে ব্যাগে ভরে রাখলুম। দরকার হলে মিথ্যা কথা বলব ভেবেই এই কাজটা করলুম। অর্থাৎ সোজা জানিয়ে দেব, আমি গুলি ছুড়িনি। ওরা রিভলভার দেখেই পালিয়েছিল।

দক্ষিণের ব্যালকনিতে বসে দেখলুম, প্রকাণ্ড কালো পাথরের একটা অংশ

চোখে পড়ছে। সেখানে একজন রোগাটে গড়নের যুবক দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে কিছু বলছে। তার পরনে হাফহাতা নীল হাওয়াই শার্ট এবং ছাইরঙা প্যান্ট। কাঁধে একটা কাপড়ের ব্যাগ ঝুলছে। সম্ভবত সে-ই শ্যামল মজুমদার। এপাশে সে মুখ ঘোরালে দেখলুম, মুখে একটুখানি এলোমেলো গোঁফদাড়ি আছে।

এক পলকের জন্য মিঃ সিংহ এবং সোহিনীকে দেখতে পেলুম। তারপর গাছপালার আড়ালে শ্যামল মজুমদার ঢাকা পড়ল। পুকুরপাড়ে একটা গলায় দড়ি বাঁধা গোরু ঘাস খাচ্ছে। তার বাছুরটাও যেন ঘাস খাওয়ার ভঙ্গি করছে। আবার দৌড়ে ঝোপের আড়ালে চলে যাচ্ছে। বুধুয়াকে দেখতে পেলুম না। সম্ভবত সে তার স্যারের সঙ্গে গেছে।

দীর্ঘ পনেরো মিনিট পরে পুকুরপাড়ে সোহিনীকে দেখতে পেলুম। সে হন হন করে এগিয়ে আসছিল। আরও কয়েকমিনিট পরে তীর্থব্রত ও বুধুয়াকে দেখতে পেলুম। বুধুয়া পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে রইল। তীর্থব্রত আস্তেসুস্থে হেঁটে আসছিলেন। মুখটা বেজায় গম্ভীর।

কিছুক্ষণ পরে পশ্চিমে রাস্তার দিকে গাড়ির শব্দ কানে এল। ব্যালকনি থেকে ঘরে ঢুকে দরজার কাছে গেলুম। দেখলুম, ক্যাপ্টেন হরিচরণ পাণ্ডের জিপ থেকে কর্নেল নেমে গেটের দিকে আসছেন। তখনই আমার সব উদ্বেগ কেটে গেল।

যেন কিছুই ঘটেনি, এমন নির্বিকার মুখে বসে রইলুম। তারপর তীর্থব্রত কর্নেলের সঙ্গে কথা বলছেন কানে এল। সোহিনীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনলুম—শালবন রাজবাড়ির প্রপার্টি। কেন সেখানে যেমন খুশি ঢুকে খোঁড়াখুঁড়ি করবেন কাকু! আমার স্ট্রেটকাট কথা। আপনার শ্যালক এভাবে আমার বিরুদ্ধে লোকেদের উত্তেজিত করলে আমি চুপ করে থাকব না।

তারপর কর্নেল এবং তীর্থব্রত ঘরে ঢুকলেন। কর্নেল সহাস্যে বললেন—জয়ন্ত! তুমি সোহিনীর পাল্লায় পড়ে প্রব্লেম বাধিয়ে বসে আছো! সোহিনী রাইফেলশুটার! সে যা পারে, তুমি তা পারো না।

একটু হেসে বললুম—কর্নেল ভুলে যাচ্ছেন! আমিও একসময় রাইফেল ক্লাবের মেম্বার ছিলুম।

কর্নেল ক্যামেরা-বাইনোকুলার এবং পিঠের কিটব্যাগ খুলে কোনার দিকে একটা টেবিলে রাখলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন—ভাগ্যিস আদিবাসীদের সঙ্গে মিঃ সিংহের সম্পর্ক ভালো। জোর বেঁচে গেছ!

মিঃ সিংহ বললেন—না, না। তেমন কিছু না জয়ন্তবাবু। আপনি এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হবেন না।

বললুম—শ্যামলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। বুধুয়া আমাদের তাঁর সম্পর্কে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।

—বুধুয়া একটা বুদ্ধু! আর শ্যামলেরও ক্রমশ মাথার গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে।

ওকে আর আমি আশ্রয় দিতে পারব না। জানেন? আমার খাতিরে পুলিশ ওকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে চলছে। ওর নামে দ্বারভাঙা জেলায় কয়েকটা মামলা ঝুলছে!

—শ্যামলবাবু কয়েকজন আদিবাসীকে সঙ্গে নিয়ে আসছেন দেখে বুধুয়ার পরামর্শে আমি ও সোহিনী কেটে পড়েছিলুম। কিন্তু চিন্তা করুন, শালবনের মধ্যে দুটো লোক গর্ত খুঁড়ছে। তারপর সোহিনী একা ব্যাপারটা যে দেখতে গেছে, অমনই....

আমাকে মিথ্যা কথা বলার দায় থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে মিঃ সিংহ বললেন— সোহিনী আফটার অল মেয়ে। তার ভয় পাওয়া স্বাভাবিক। ফিলিপ আর যোশেফ দুই-ভাই ওখানে কন্দ খুঁড়তে এসেছিল। তারা সোহিনীকে তখনই বললেই পারত, তারা কী করছে। যাক গে। ছেড়ে দিন ওসব কথা। আমি ননীঠাকুরকে ব্রেকফাস্টের টেবিল সাজাতে বলি। দশটা বেজে গেছে।

কর্নেল বাথরুমে ঢুকেছিলেন। তীর্থব্রত সিংহ চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে বললেন— ন্যান্সি আচারিয়াকে কাল ট্রেনে বা প্লাটফর্মে আমরা খুঁজে পাইনি। কিন্তু একই ট্রেনে এসেছেন, মেমসায়েব।

জিজ্ঞেস করলুম—মেমসায়েবের সঙ্গে আলাপ করে এলেন বুঝি?

—নাহ। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের ফার্মহাউস থেকে 'সার্ভিস টু দ্য ম্যানকাইন্ড' প্রতিষ্ঠানের দূরত্ব মাত্র আধ কিলোমিটার। আমার বাইনোকুলারে মেমসায়েবকে দেখে এলুম।

—হালদারমশাইয়ের কাছে যাননি?

—গিয়েছিলুম। উনি চুপচাপ বসে নেই। একটা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উনি পেয়ে গেছেন।

হাসতে হাসতে বললুম—রাজবাড়ির পিছনে শালবনের মধ্যে একটা গর্ত খোঁড়ার মতো সূত্র?

কর্নেলও হাসলেন।—না। এটা অন্যরকম। তবে উনি যে শাবলনের মধ্যে দুটো লোককে কাল চুপিচুপি গর্ত খুঁড়তে দেখেছিলেন, তাতে মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক। সেই ঐতিহাসিক জুয়েলসের কথা মাথায় রাখলে সন্দেহ তো আরও তীব্র হবে। বিশেষ করে হালদারমশাইকে দেখামাত্র যদি লোকদুটো তখনই গা-ঢাকা দেয়। তবে হালদারমশাই অভিজ্ঞ প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। উনি তোমার মতো রিভলভার বের করেননি বা গুলিও ছোড়েননি।

কর্নেলকে ঘটনাটা ব্যাখ্যা করে শোনালুম। এ-ও বললুম, সোহিনী একা থাকলে ওরা নিশ্চয় তার উপর হামলা করত। ওদের হিংস্র চোখগুলো দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলুম।

—হামলা বলতে তুমি কি কদর্য কিছু বোঝাতে চাইছ?

—হ্যাঁ। জঙ্গলে একা এক যুবতী। ওদিকে দুটো আদিম প্রকৃতির মানুষ।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—স্বীকার করছি ওদের মধ্যে এখনও আদিম মানুষের কিছু স্বভাব থেকে গেছে। কিন্তু তুমি সাংবাদিক। কখনো কি শুনেছ ওরা আমাদের সুসভ্য মানুষের মতো কোনো মেয়েকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছে? কোনো-কোনো আদিবাসী গোষ্ঠীকে চুরি-ডাকাতি করে বলে ব্রিটিশ আমলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু মেয়েদের সম্মান রক্ষার ব্যাপারে এদেশের আদিবাসী গোষ্ঠীর সচেতনতার প্রশংসা করতেই হবে। আমাদের মতো সভ্যদের সংস্পর্শে ওরা ব্যক্তিগতভাবে খারাপ হতেই পারে। কিন্তু সে-জন্য তাদের সমাজ তাকে কঠিন শাস্তি দেয়।

কর্নেলের এই গুরুগম্ভীর লেকচারকে খণ্ডনের জন্য আমি ওদের জানগুরুর বিচারে ডাইনি বলে মেয়েদের হত্যার ঘটনা শোনাতে চাইছিলুম। কিন্তু একটা ষণ্ডামার্কা প্যান্ট-হাওয়াই শার্ট পরা গুঁফো লোক এসে পর্দা তুলে সেলাম দিল এবং বিনীতভাবে বলল—সায়েবদের ব্রেকফাস্ট রেডি!

কর্নেল বললেন—তুমিই কি ভজুয়া?

লোকটা হাসবার চেষ্টা করে বলল—স্যার! আমি ভজনলাল। তবে সবাই আমাকে ভজুয়া বলে ডাকে।

লোকটাকে অনুসরণ করে কর্নেল বললেন—যেদিন ভোরে রানিমা মারা যান, তখন তুমি কোথায় ছিলে?

এই আকস্মিক প্রশ্নে ভজুয়া থমকে দাঁড়াল। তারপর মৃদু স্বরে বলল—পুলিশ আমাকে অনেক জেরা করেছে। তা আপনি স্যার যখন একই কথা জিজ্ঞেস করছেন, আমার জবাব, একরকম ছাড়া দুরকম হবে না। স্যার! আমি সেদিন ভোরবেলা রাজবাড়ির পুকুরের ওদিকে মাঠে গিয়েছিলুম। আগের রাত্রে রানিমা বলেছিলেন, দোতলা থেকে উনি দেখতে পেয়েছেন ধানখেতে খুব বেশি জল জমে গেছে। যারা জমিগুলোতে চাষ করে, তারা আসছে না। আমি যেন গিয়ে আল কেটে জল বের করে দিই। তাই কোদাল নিয়ে মাঠে গিয়েছিলুম। পনেরো বিঘে জমি আছে স্যার। পাঁচ জায়গায় আল কেটে নিচের খালে জল নামিয়ে দিচ্ছিলুম। জল কমে গেলে আবার আলগুলোর কাটা জায়গা কাদা দিয়ে বন্ধ করতে হবে। এই কাজ সেরে রাজবাড়ি ফিরে কান্নাকাটি শুনতে পেলুম। বুধুয়া বলল, রানিমার বেড়ালগুলো মারা গেছে। সেই শোকে রানিমা হার্টফেল করে মারা গেছেন। বাঙালিটোলার অবনীবাবু ডাক্তার এসেছিলেন, তা-ও শুনলুম।

কর্নেল বললেন—চলো! যেতে যেতে আরেকটা কথা জেনে নিই।

ভজুয়া বলল—যা জিজ্ঞেস করবেন, ঠিক জবাব দেব স্যার। এই রাজবাড়িতে আমার জন্ম। আমার চৌদ্দোপুরুষ এই রাজবাড়ির লোক।

হলঘরের সিঁড়িতে নামতে নামতে কর্নেল বললেন—নন্দরানি আর

সরকারজির ঘর সার্চ করে পুলিশ যখন টাকা খুঁজে পেয়েছিল, তুমি তখন কোথায় ছিলে?

—আমাকে আমার সায়েব রানিমার ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিতে বলেছিলেন। তাই আমি সেখানেই ছিলুম। পরে পুলিশ এসে দরজা আটকে দিয়েছিল।

—তুমি রানিমাকে তখন কোথায় দেখেছিলে?

—উনি পালংকে শুয়েছিলেন। বডির ওপরে চাদর ঢাকা ছিল।

—আর বেড়ালগুলো?

—বেড়ালগুলোকে তখন কারা নীচে নিয়ে গিয়েছিল।

—বেড়ালগুলোকে তুমি তাহলে দেখতে পাওনি?

—না স্যার। পরে শুনলুম, বুধুয়া দু-জন মজুর ডেকে এনে রাজবাড়ির ভিতরে পূব-দক্ষিণ কোনায় বেড়ালগুলোকে কবর দিয়েছে। তারপর সন্ধেবেলায় পুলিশ এসে গর্ত খুঁড়ে সেগুলোকে বস্তায় ভরে নিয়ে গিয়েছিল।

—প্রকাশ সুখানিয়াকে তুমি চেনো নিশ্চয়?

—ভজুয়া বলল—তাকে সবাই যেমন চেনে, আমিও তেমনি চিনি। কেন স্যার?

—রানিমার মৃত্যুর আগের দিন বিকেলে তুমি খ্রিস্টান মিশনের হাসপাতালে গিয়েছিলে। তাই না?

ভজুয়াকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সে বলল—আমি মিশনারি হাসপাতালে ওষুধ আনতে গিয়েছিলুম। আমার কিছুদিন অম্বর মাথায় যন্ত্রণা হয়। অবনীডাক্তারের ওষুধে সারেনি। তাই....

—সেখানে প্রকাশ সুখানিয়া ছিল। তার গাড়িতে চাপিয়ে সন্ধ্যাবেলায় প্রকাশ তোমাকে রাজবাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল।

ভজুয়া হাসবার চেষ্টা করে বলল—এসব কথা আপনাকে কে বলেছে জানি না স্যার! আপনিই বা কেন আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করছেন তা-ও বুঝতে পারছি না।

কর্নেল হাসলেন। —তোমার ভয় পাওয়ার কারণ নেই। প্রকাশ সুখানিয়া তোমার চেনা লোক। তুমি তাকে অনুরোধ করলে তার গাড়িতে চাপিয়ে আনতেও পারে। কারণ বর্ষার সময় সন্ধ্যাবেলা অন্ধকারে আসতে তোমার অসুবিধে হওয়ারই কথা!

—ঠিক বলেছেন স্যার! তবে আমার সায়েবকে যেন দয়া করে একথা বলবেন না। আমাকে তাহলে তিনি তাড়িয়ে দেবেন। কাচ্চাবাচ্চা আর বউ নিয়ে আমি কোথায় দাঁড়াব, বলুন স্যার? বলে সে কর্নেলের পা ছুঁতে নিচু হল।

—না। না। আমি ওঁকে বলব না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

—কিন্তু এসব কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন, বুঝতে পারছি না স্যার।

—পরে পারবে। আমি আজ খ্রিস্টান হাসপাতালে গিয়েছিলুম। সেখানে এক মেমসায়েবের সঙ্গে আলাপ হল। আমি রাজবাড়ির ঘটনা নিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলুম। তখন, মেমসায়েবই তোমার কথাটা বললেন।

হলঘরে ভিতরের দরজা দিয়ে আমরা প্রশস্ত ডাইনিংরুমে ঢুকলুম। ভজুয়া আমাদের পৌঁছে দিয়েই বাঁ দিকের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। ডাইনিং টেবিলে সোহিনী আর মিঃ সিংহ অপেক্ষা করছিলেন। সোহিনীর মুখে গাম্ভীর্য দেখে বুঝলুম শ্যামল মজুমদারের উপর তার রাগ এখনও পড়েনি।

তীর্থব্রত বললেন—দশটায় ব্রেকফাস্ট করার কথা। দশটা পঁচিশ বাজে। ভজুয়া কি কর্নেলসায়েবকে তার ভালুক মারার গল্প শোনাচ্ছিল?

কর্নেল হাসলেন। —ভজুয়া ভালুক মেরেছিল নাকি?

তীর্থব্রত একটু হেসে বললেন—মেরেছিল। তবে সবাই যখন আহত ভালুকটাকে তাড়া করে একটা খাদে ফেলেছে, তখন সে ভালুকটার মাথায় কুড়ুলের কোপ বসিয়েছিল। এই বীরত্বের গল্প সে সবাইকে শোনায়। আপনার আসতে দেরি হচ্ছে দেখে আমি ভেবেছিলুম সে তার সেই বীরত্বের গল্প শোনাচ্ছে। আসলে ভজুয়ার চেহারা দেখে যা মনে হবে, প্রকৃতপক্ষে সে তার উল্টো।

কর্নেল বললেন—সোহিনী! তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, শালবনে গর্ত খোঁড়ার ঘটনাটা তুমি মেনে নিতে পারোনি। না পারারই কথা। জয়ন্ত ভজুয়ার মতো বীরত্ব দেখাতে গিয়ে অকারণ একটা ঝামেলা বাধিয়েছিল।

সোহিনী হাসল না। সে আস্তে বলল—ঝামেলা কীসের? আমি এসব ব্যাপারে গ্রাহ্য করি না। অকারণে একজন আউটসাইডার সামান্য একটা ব্যাপারকে পলিটিক্যাল ইস্যু করবে। তা করুক না।

তীর্থব্রত বললেন—আঃ সোহিনী! আমি তো বলেছি, শ্যামল নিজের দোষে নিজেই বিপদে পড়বে। তা ছাড়া আমি এবার ঠিক করেছি, ওইসব পাগলামি না ছাড়লে ওকে প্রোটেকশন দেওয়া আর আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

বললুম—আসল দোষটা কিন্তু আমার।

কর্নেল বললেন—খাওয়ার সময় কথা নয়। আমার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে। এসময়ে তোমাদের কথা দৈবাৎ কানে গেলে আমি কিছু বলার চেষ্টা করব। আর তখনই আমার শ্বাসনালিতে লুচির টুকরো আটকে যাবে। এর জন্য দায়ী হবে জয়ন্ত আর সোহিনী।

সোহিনীর মুখে এতক্ষণে একটু হাসি ফুটল।

ব্রেকফাস্টের পর তীর্থব্রত বললেন—কর্নেলসায়েবের গাড়ির দরকার হলে বলুন। আমি ফ্যাক্টরিতে ফোন করে ম্যানেজারের গাড়িটা আনতে বলব। আমার গাড়িটা কর্নেলসায়েব নেবেন। ড্রাইভার শাকিলের বাড়ি বাঙালিটোলার শেষে।

ওকে এগারোটায় আসতে বলেছি। কারণ ফ্যাক্টরিতে যেতেই হবে। শাকিল আপনাদের সার্ভিস দেবে।

কর্নেল বললেন—এবেলা আমার গাড়ির দরকার নেই। বিকেল চারটেতে ক্যাপ্টেন পাণ্ডে গাড়ি পাঠাবেন। আর একটা কথা। আপনি ফ্যাক্টরিতে যাওয়ার আগে আপনার ল-ইয়ারকে টেলিফোনে জানিয়ে দিন, নন্দরানি আর দুবেজির জন্য আবার জামিনের দরখাস্ত যেন তিনি পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে পেশ করেন।

—আগামীকাল বুধবার নেক্সট হিয়ারিংয়ের তারিখ পড়েছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ওদের সাতদিনের জন্য পুলিশ হাজতে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। গোড়া থেকেই আমি চেষ্টা করে আসছি, যাতে ওরা জামিন পায়। কিন্তু ও সি রামকুমার প্রসাদ পাবলিক প্রসিকিউটরকে কী মন্ত্র জপিয়েছেন জানি না। তিনি অনবরত বাগড়া দিচ্ছেন। আমার ল-ইয়ার বাঙালি। প্রদীপ্ত চ্যাটার্জি। এস ডি জে এমের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক আছে। জে এম প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন, ঘরে মাত্র দশ হাজার টাকা রাখাটা ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩০২ নম্বর ধারা প্রয়োগের ব্যাপারে তত মজবুত পয়েন্ট নয়। পি-পি-বক্তব্য, যারা রানিমার কাছের লোক, তাঁকে খুন করার সুযোগ তাদেরই বেশি।

ওঁরা কথা বলতে থাকলেন। সোহিনী আমার কাছে এসে আস্তে বলল—চলুন জয়ন্তদা! আমরা নৈনি নদীর ধারে বেড়িয়ে আসি।

ভজুয়া যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছিল, আমরা দুজনে সেখান দিয়ে বেরিয়ে দেখি নীচের তলাতেও টানা বারান্দা এবং প্রকাণ্ড সব থাম। দোতলাতেও এমন থাম আছে। বারান্দা থেকে ঘাসে ঢাকা প্রাঙ্গণে নেমে বললুম—রাজবাড়িটা ইতালিয়ান স্থাপত্যের ধাঁচে তৈরি। এ ধরনের থামকে করিন্থিয়ান পিলার বলা হয়। শুধু ডাইনে বেঁকে এল প্যাটার্নের ব্যাপারটা একটু বেখাপ্পা।

সোহিনী বলল—আমি স্থাপত্য-টাপত্য বুঝি না। শুধু এটুকু জানি, আপনি যেটা এল প্যাটার্ন বলছেন, ওটা স্বর্ণদিদিমার বাবা পুরোনো রাজবাড়ির সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। স্বর্ণদিদিমা বলতেন, রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকের বিশাল উপত্যকার মতো খোলামেলা জায়গাটা দেখার জন্য তিনি তৈরি করেছিলেন।

বললুম—বাঃ! তাঁর সৌন্দর্যবোধের প্রশংসা করা উচিত।

সোহিনী গেটের কাছে গিয়ে বলল—ওখানে আমি টার্গেট শ্যুটিং প্র্যাকটিস করব। রাজবাড়ির মধ্যে তত স্পেস নেই। তা ছাড়া দৈবাৎ কর্মচারীদের কাচ্চাবাচ্চারা গিয়ে পড়লে বিপদ। তাই না?

—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ।

উঁচু জমি থেকে ঢালু রাস্তা দিয়ে নিচের এবড়োখেবড়ো পিচরাস্তায় গেলুম। তারপর দক্ষিণে কিছুটা এগিয়ে সোহিনী বলল—চলুন! ওই ব্রিজের কালভার্টে বসা যাক। ব্রিজের ওপর গাছের ছায়া পড়েছে। রোদ্দুর বিরক্ত করবে না।

কোন মান্ধাতার আমলের পাথরের ব্রিজের ওপর গিয়ে বললুম—সোহিনী! তুমি কি জানো তোমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ ওই টিলার গায়ে সুন্দর রেস্টহাউসে বাস করছেন?

সোহিনী প্রথমে অবাক হল। তারপর হেসে উঠল। —কী আশ্চর্য! আমি আমার গোয়েন্দামশাইয়ের কথাই একেবারে ভুলে গেছি। বাংলোটা কার?

—ওটা ক্যাপ্টেন পাণ্ডের রেস্টহাউস।

—তাই বলুন! ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আমাকে তাঁর নতুন একটা রিসর্টের কথা বলেছিলেন। ওখানেই আপনাদের ওঠার কথা ছিল। কিন্তু কর্নেলসায়েব রাজবাড়িতে থাকতে চেয়েছিলেন। আপনারা ওখানে থাকলে আনন্দ পেতেন। আমি যখন তখন গিয়ে হাজির হতুম।

—সোহিনী! ভুলে যেয়ো না। কর্নেল আনন্দ পেতে আসেননি। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য, তোমার স্বর্ণদিদিমার হত্যাকাণ্ডের রহস্যভেদ।

—ওঃ জয়ন্তদা! আপনি বড্ড সিরিয়াস।

হেসে ফেললুম। —ঠিক বলেছ সোহিনী। আজ সকালে বড্ড সিরিয়াস হতে গিয়েই খামোকা একটা বুলেট খরচ করে ফেলেছি। এখন অবশ্য সঙ্গে অস্ত্র-টা নেই। কিছু ঘটলে তোমাকে ফেলে লেজ তুলে পালিয়ে যাব।

সোহিনী হেসে অস্থির হল। তারপর বলল—এই প্রকৃতি-ট্রকৃতি আমার কিন্তু বড্ড একঘেয়ে লাগে। বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারি না। বরং চলুন না, ক্যাপ্টেনদাদুর রেস্টহাউসে আমার গোয়েন্দামশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।

—চলো। তবে তাঁকে প্রথম দর্শনে চিনতে পারবে না।

—কেন?

—তিনি ছদ্মবেশে আছেন। কল্পনা করো সোহিনী! মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মাথায় পরচুলা। তার ওপর টুপি। নেকটাই—স্যুটপরা হালদারমশাইয়ের হাতে ছড়ি এবং মুখে পাইপ থাকাও সম্ভব। যদিও উনি নস্যি নেন।

সোহিনী হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা জয়ন্তদা, কর্নেলসায়েব আর আপনি ওঁকে হালদারমশাই বলেন কেন? উনি তো একজন রিটায়ার্ড পুলিশ ইন্সপেক্টর।

বললুম—ঘটনাটা কর্নেলের কাছে জেনে নিয়ো। কারণ আমি তখনো কর্নেলের সান্নিধ্যে আসিনি।

—যেটুকু জানেন, বলুন।

—কোনো বড়োলোকের বাড়িতে মেয়ের বিয়ের আসরে বরযাত্রীদের ভিড়ে মিশে একদল ডাকাত হানা দেবে, এরকম একটা খবর। মেয়ের মামার কানে এসেছিল। তিনি কর্নেলের বন্ধু ছিলেন। কর্নেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদারকে পাত্রীপক্ষের কর্তা সাজিয়ে নিয়ে যান। স্থানীয় থানার কিছু পুলিশও

সাদা পোশাকে রাখা হয়। কথা ছিল, কর্নেল বরযাত্রীদের দিকে নজর রাখবেন এবং সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই বলে উঠবেন, 'হালদারমশাই! হালদারমশাই! আপনার ভাগনির চোখে পোকা!' অমনি অ্যাকশন শুরু হবে। গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে। তো মিঃ হালদারকে কর্নেল যে-ই ওই কথাটা বলেছেন—

—তার মানে কর্নেল ডাকাত বলে কাউকেও চিনতে পেরেছিলেন?

—সন্দেহ করেছিলেন। তো কর্নেল কথাটা বলা মাত্র মিঃ হালদার পাঞ্জাবির ঝুলপকেট থেকে রিভলভার বের করে পর-পর তিন রাউন্ড ফায়ার করে বসলেন!

—বরযাত্রীদের দিকে?

—না। মাথার ওপরে চাঁদোয়ার দিকে। অনেক বাল্ব গুঁড়ো হয়েছিল। শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে গিয়েছিল সামিয়ানায়। সেই সুযোগে ডাকাতের দল পিঠটান দিয়েছিল। আর তারপর থেকে মিঃ হালদার হয়ে গেলেন 'হালদারমশাই।'

সোহিনী আবার হেসে অস্থির হল। রেস্ট হাউসের দূরত্ব আধ কিলোমিটারেরও কম। সংকীর্ণ মোরামবিছানো রাস্তাটা রোদে শুকিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দু-ধারে গাছ থাকায় ছায়াও পাচ্ছিলুম। টিলার নিচে গিয়ে দেখলুম, একজন মধ্যবয়সী ধুতি পাঞ্জাবি পরা ভদ্রলোক গেট থেকে আমাদের লক্ষ করছেন। রাস্তাটা বাঁক নিয়ে টিলার দক্ষিণ দিক দিয়ে এগিয়ে গেছে। গেট অব্দি সামান্য চড়াইটুকু পিচে ঢাকা এবং দুধারে রঙিন ইটের কেয়ারি করা। গেটের কাছে গিয়ে বাংলায় জিজ্ঞেস করলুম—ক্যাপ্টেন পাণ্ডের গেস্ট ভদ্রলোক কি আছেন?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন হিন্দিতে। —হালদারসাব ন-টায় বেরিয়েছেন। বলে গেছেন ফিরতে একটা বেজে যাবে।

রাজবাড়ির গেটের সামনে পৌঁছে সোহিনী বলল—আমার গোয়েন্দামশাই যে চুপচাপ বসে নেই, তা বোঝা গেল। কিন্তু হাঁটিহাঁটি করে আমি এখন টায়ার্ড জয়ন্তদা। ঘরে গিয়ে সটান শুয়ে পড়ব।

বললুম—আমিও ক্লান্ত। আমিও শুয়ে পড়ব।

গেটের একটা অংশ খোলা ছিল। দারোয়ান গেটের পাশে তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখে সে সেলাম দিল। সে বলল—দিদিজি! এই রোদে কোথায় গিয়েছিলেন?

—তোমাদের পাগলি নৈনিমাকে দর্শন করে এলুম।

দারোয়ান অবাক হয়ে বলল—নৈনি মাইজি পাগলিই বটে। কিন্তু মাইজির মন্দির তো গড়ের জঙ্গলে। আপনারা অতদূর গিয়েছিলেন? ওখানে হাতির উৎপাত আছে দিদিজি।

—রামু! তুমিও দেখছি পাগল! নৈনিমাইজির দর্শন তো রাস্তার ওধারে গেলেই পাওয়া যায়।

দারোয়ান হেসে ফেলল।—তা ঠিক দিদিজি। আমি ভাবলুম আপনারা মন্দিরে গিয়েছিলেন।

সোহিনী বলল—সাদা দাড়িওয়ালা সায়েব, মানে কর্নেলসায়েব কি বেরিয়েছেন?

—না দিদিজি। একটু আগে দেখলুম উনি রাজবাড়ির পিছনে প্রজাপতির ছবি তুলছেন।

বললুম—চলো সোহিনী! আমরা দুজনেই ক্লান্ত। কিন্তু কর্নেলের প্রজাপতির ছবি তোলার দৃশ্য দেখলে ক্লান্তি ভুলে যাব।

সোহিনী লনে হাঁটতে হাঁটতে বলল—কেন বলুন তো?

—কর্নেলের এই ব্যাপারটা দেখলে হাসির চোটে ক্লান্তি পালিয়ে যাবে। কখনও গুঁড়ি মেরে, কখনও কুঁজো হয়ে, কত অদ্ভুত ভঙ্গিতে ক্যামেরা তাক করবেন কর্নেল। এগিয়ে যাবেন। আবার পিছিয়ে আসবেন। কখনও মুখটা এত উঁচু করবেন যে ওঁর মাথার টুপি খুলে পড়ে যাবে। আর চকটকে টাকে রোদ্দুর পড়ে তোমার চোখ ঝলসে যাবে। আর প্রজাপতিগুলোও যেন কর্নেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় মেতে ওঠে।

সোহিনী চোখে হেসে বলল—চলুন। তাহলে চুপিচুপি গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে দেখব। আমাদের দেখতে পেলে উনি পোজ বদলে ফেলতে পারেন।

—ঠিক বলেছ।

বলে সোহিনীকে অনুসরণ করলুম। কিছুটা এগিয়ে বাড়িটার দক্ষিণে রঙ্গনা আর জবাফুলের ঝোপের আড়ালে সোহিনী বসল। আমিও বসলুম। তারপর দেখলুম, কর্নেল বাড়ির পূর্বের দেওয়ালের নীচে ঘন ঘাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে উপরে তাকাচ্ছেন। আবার নীচে তাকাচ্ছেন। সোহিনী আমার দিকে তাকাল। আমি ফিসফিস করে বললুম—প্রজাপতিটা হয়তো উপরে উড়ে গিয়ে কার্নিশে বসেছে।

তারপর দেখলুম কর্নেল এগিয়ে গিয়ে পূর্বের খোলা চত্বরে উঠলেন। তারপর যে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হলেন, সেটা হলঘরের পিছনের দরজা। ওখান দিয়েই সকালে সোহিনী আমাকে শালবনের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

সোহিনী উঠে দাঁড়িয়ে বলল—ব্যাড লাক! চলুন। ক্লান্তিটা বেড়ে গেল।

আমরা সোজা এগিয়ে গাড়িবারান্দার তলা দিয়ে হলঘরে ঢুকলুম। তারপর দোতলায় উঠে সোহিনী ডান দিকে এবং আমি বাঁ দিকে এগিয়ে উত্তরের বারান্দা দিয়ে হেঁটে আমাদের ঘরে ঢুকলুম। দেখলুম, কর্নেল কিটব্যাগের মধ্যে হাত ভরে কী যেন খুঁজছেন। আমাকে দেখে তিনি কপট গাম্ভীর্যে বললেন—সোহিনীর সঙ্গে বড্ড বেশি মেলামেশা করছ। সাবধান!

আমিও কপট ক্ষোভের সঙ্গে বললুম—কী আশ্চর্য! সোহিনী আমাকে তার গোয়েন্দা ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে বলেছিল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের রেস্টহাউসে গিয়ে শুনলুম তিনি নেই।

—কিন্তু কিছুক্ষণ আগে রাজবাড়িতে ঝোপের আড়ালে বসে দুজনে প্রেম করছিলে না?

হেসে ফেললুম। —ওঃ কর্নেল! আপনার সর্বাঙ্গে চোখ আছে। তবে আপনি যা ভাবছেন, তা নয়। আমরা আপনার প্রজাপতি ছবি তোলার খবর পেয়েছিলুম দারোয়ান রামুর কাছে। ওইসব আপনি যে-সব অদ্ভুত ভঙ্গি করেন, সোহিনী তা উপভোগ করতে চাইল। তাই তাকে নিয়ে ঝোপের আড়ালে বসেছিলুম। কিন্তু আপনি একবার উপর, একবার নিচে তাকিয়ে কী প্রজাপতি দর্শন করছিলেন?

কর্নেল কিটব্যাগে চেন টেনে দিয়ে ইজিচেয়ারে বসলেন। তারপর মিটিমিটি হেসে বললেন—ডার্লিং! যুবক-যুবতীদের প্রেম করতে দেখলে এ বৃদ্ধের মনে হয়, পৃথিবীটা তা হলে এখনও গলে পচে ক্ষয়ে যায়নি! তবে সোহিনী সম্পর্কে তোমাকে বলার কথা হল, তার একজন বয়ফ্রেন্ড আছে।

বললুম—কী অদ্ভুত কথাবার্তা। হাঁটাহাঁটি করে প্রচণ্ড ক্লান্তির সময় প্রেম? বলে জুতো খুলে আমি এ পাশের বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন—ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন। একটু পরে স্নান করে নেবে। একটায় আমরা খেয়ে নেব। তারপর ...।

বলে কর্নেল চুপ করলেন। জিজ্ঞেস করলুম—তারপর?

—তারপর দেখবে কী হয়।

—কী হবে?

—যথাসময়ে দেখতে পাবে।

—কী দেখতে পাব বললে কি আপনার মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

কর্নেল চোখে হেসে বললেন—তুমি আর সোহিনী যা দেখার জন্য ঝোপের আড়ালে বসেছিলে।

না হেসে পারলুম না। —প্রজাপতির ছবি তোলার সময় আপনি যে সব অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি করেন, তা-ই দেখতে পাব?

—ঠিক বলেছ।

—অর্থাৎ আপনি আবার প্রজাপতির ছবি তুলতে মাঠে নামবেন?

—উঁহু। মাঠে নয়। অন্যত্র। যাই হোক, আর কথা নয়। তুমি স্নান করে ফেলো। সাড়ে বারোটা বাজে।

একটা পাঁচে বুধুয়া আমাদের খাওয়ার জন্য ডাকতে এসেছিল। কর্নেল ও আমি তার সঙ্গে ঘর থেকে বেরুচ্ছিলুম। বুধুয়া বলল—স্যার! আপনাদের ঘরে তালা এঁটে দিয়ে চলুন। ভজুয়ার একটা ছেলে আর একটা মেয়ে আছে। ওরা এতক্ষণে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছে। ভাই-বোন খুব বিচ্ছু আর ধড়িবাজ। ভোর সাড়ে ছটা থেকে সাড়ে বারোটা মুন্না আর তিন্নি স্কুলে থাকে। বাড়ি ফেরার পর ওরা রাজবাড়ির সব ঘরে উঁকিঝুঁকি মেরে বেড়ায়।

কর্নেল বললেন—জয়ন্ত! আমার কিটব্যাগের পাশে একটা তালা-চাবি দেখেছি। তালাটা আটকে দাও।

বুধুয়া বলল—আমিই দরজা খুলে ওখানে তালা চাবি রেখেছিলুম স্যার। আমিই তালা আটকে দিচ্ছি!

সে ঘরে ঢুকে, দক্ষিণের দরজা বন্ধ করল। তারপর ভিতর থেকে এই বারান্দার দিকের দুটো জানালাও বন্ধ করে দিল। দরজায় তালা এঁটে সে চাবিটা কর্নেলকে দিল।

বললুম—আমরা কতক্ষণ ধরে বাইরে কাটিয়েছি। ভাগ্যিস মুন্না-তিন্নি তখন বাড়িতে ছিল না।

কর্নেল বললেন—ভজুয়ার ছেলে-মেয়ে কোন স্কুলে পড়ে বুধুয়া?

—স্যার! ওরা মিশন স্কুলে পড়ে।

—তার মানে, খ্রিস্টান মিশন স্কুলে? যেখানে হাসপাতাল আছে, সেখানে?

—হ্যাঁ স্যার। এখান থেকে বেশি দূর নয়।

—ওখানে একজন মেমসায়েবও আছেন শুনেছি। ডাক্তারি করেন। আবার মাস্টারিও করেন। তাকে তুমি নিশ্চয় দেখেছ?

বুধুয়া চাপা স্বরে বলল—আমার সায়েবের এক বন্ধু আছেন কলকাতায়। তিনি মেমসায়েবকে বিয়ে করেছেন। আমার তাজ্জব লাগে স্যার। সেই ভদ্রলোক জাতে ব্রাহ্মণ। বিলিতি সায়েব নন।

—দিশি সায়েব! কর্নেল হেসে উঠলেন। —তা বুধুয়া, মেমসায়েব আর তাঁর স্বামী রাজবাড়িতে নিশ্চয় এসেছেন। তোমার সায়েব কি ওঁদের নেমন্তন্ন না করে পারেন?

—গত বছর বাঙালিটোলায় ওঁরা পুজোর সময় এসেছিলেন। বলে বুধুয়া থমকে দাঁড়াল। আবার চাপা স্বরে বলল—বউদিরানির ছেলেপুলে নেই। তাই সায়েব তাঁকে মেমসায়েবের কথায় ওঁদের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করেছিলেন। কিন্তু রানিমা এজন্য খুব রাগ করেছিলেন। রানিমা কতবার বউদিরানির জন্য পুজোআচ্চা আর মানতের ব্যবস্থা করেছিলেন। আর তাঁকে লুকিয়ে খ্রিস্টান হাসপাতালে রাখার জন্য রানিমা কিছুদিন তার ভাগনে—মানে, আমার সায়েবের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। শেষে যদি বা তার সঙ্গে রানিমা কথা বলতেন, বউদিরানিকে এড়িয়ে চলতেন। তাঁকে রানিমা নিজের কোনো জিনিস পর্যন্ত ছুঁতে দিতেন না। বউদিরানি আড়ালে রানিমাকে গালমন্দ করতেন, তাও শুনেছি।

কর্নেল পা বাড়িয়ে বললেন—চলো! তোমাদের ননীঠাকুর এতক্ষণ মনে মনে আমাদের মুণ্ডুপাত করছেন।

সিঁড়িতে নামতে নামতে বুধুয়া বলল—বউদিরানিও খাওয়ার ঘরে আছেন। কলকাতার দিদিও আছেন।

জিজ্ঞেস করলুম একতলায় নামবার জন্য আরও সিঁড়ি আছে মনে হচ্ছে।

—আছে স্যার! বউদিরানির পাশের ঘর দিয়ে একতলায় নামা যায়।

ডাইনিং রুমে গিয়ে দেখলুম, সোহিনী স্নান করে সতেজ হয়েছে। পরনে গাঢ় লাল স্পোর্টিং গেঞ্জি আর জিনসের প্যান্ট। তার পাশে চেয়ারের হাতল ধরে অরুণিমা দাঁড়িয়েছিলেন। নমস্কার করে তিনি বললেন—কর্নেলসায়েবের উপযুক্ত খাবার এখানে পাওয়া যায় না। সোহিনীর কাকুর কাছে শুনেছি, আবার পাণ্ডেজিও বলছিলেন, কর্নেলসায়েবের লাইফ-স্টাইল নাকি একেবারে ইউরোপিয়ান।

কর্নেল বললেন—সোহিনী! এই সাংঘাতিক মিথ্যা রটনার প্রতিবাদ তোমারই করা উচিত।

সোহিনী শুধু হাসল। আমি বললুম—কর্নেল বাইরে-বাইরে ইউরোপিয়ান, ভিতরে একেবারে নিখাদ ভেতো বাঙালি। ভাবতে পারেন? বৃষ্টিসন্ধ্যায় কর্নেল তেলেভাজা না পেলে তাঁর পরিচারক ষষ্ঠীচরণকে ঘরে ঢুকতে দেন না!

সোহিনী বলল—কাকিমা! তুমি কাকুর বদলে আমার সঙ্গে বসে পড়ো।

অরুণিমা বললেন—ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নে, আমি দুটোর পরে খাই। তোদের খাইয়ে তবে স্নান করব। তারপর খাওয়া।

কিছুক্ষণ পরে অরুণিমা বাইরের দরজায় গিয়ে কর্কশ কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন—লছমি! এই লছমি। তোর বাঁদরদুটো আবার কালকের মতো ফুল ছিঁড়ে তছনছ করছে দেখতে পাচ্ছিস না? এবার আমি ওদের চাবকে ছাল ছাড়িয়ে নেব বলে দিচ্ছি! লছমি! শুনতে পাচ্ছিস কী বলছি?

বলে তিনি বারান্দায় চলে গেলেন। সোহিনী চাপা স্বরে বলল—কাকিমার সব ভালো। কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ—কেমন গ্রাম্য মহিলা হয়ে যায়।

ননীঠাকুর বললেন—বউদিরানির দোষ নেই। ভজুয়ার ছেলে-মেয়েদুটো সুন্দর সাজানো কিছু দেখতে পারে না। স্নান করে আমি কাপড় মেলে দেব। তো ওরা তাতে ধুলোকাদা মাখিয়ে দেবে। বুধুয়া। তুমি গিয়ে মুন্নি-তিন্নিকে থাপ্পড় মেরে ওদের ঘরে রেখে এসো। নইলে বউদিরানির স্নানখাওয়া আর হবে না।

বুধুয়া তখনি একই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বললুম—ভজুয়া ছেলেমেয়েকে শাসন করে না?

ননীঠাকুর বললেন—করে। তবে তার ওপর বাড়ির হাজারটা কাজের ভার। জমি দেখাশোনা থেকে বাজার করা, ওষুধ আনা—কতকিছু। সে এখন নেই মনে হচ্ছে।

বললুম—তোমাদের বউদিরানির ফুলের বাগান করার খুব শখ। তাই না?

—তা স্যার, ওইসব নিয়েই তো আছেন। ভগবান কোলেপিঠে একটা এখনো দিলেন না। এসব দুঃখ মেয়েরা যতটা বোঝে, অন্যে কী বুঝবে, বলুন স্যার?

সোহিনী ভুরু কুঁচকে বাঁকা হেসে বলল—শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর। সরি—ননীঠাকুর।

আমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেল। অরুণিমা আর এলেন না। আমরা হলঘরের দিকে পা বাড়িয়েছি, সেই সময় সোহিনী আমাদের পিছনে এসে বলল—চলুন জয়ন্তদা। আপনার ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ আড্ডা দিই। কাকিমার এইসব অদ্ভুত স্বভাবের জন্য করনগড়ে আমার আসতে ইচ্ছে করে না। স্বর্ণদিদিমা বেঁচে থাকতেও কাকিমা তুচ্ছ কথায় হইচই বাধাতেন। আবার পরে কান্নাকাটির বন্যা বইয়ে দিতেন।

হলঘরের সিঁড়িতে ওঠার সময় বললুম—জানো সোহিনী? কর্নেল বলেছেন, তখন ঝোপের মধ্যে কর্নেলের যে অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গি দেখার জন্য আমরা বসেছিলুম, এবার নাকি উনি তা আমাদের দেখাবেন?

সোহিনী অবাক হয়ে বলল—ও মাই গড! কর্নেলের কি সর্বাঙ্গে চোখ আছে?

কর্নেল হাসলেন।—বাঃ! এতদিন পরে এতক্ষণে তুমি জয়ন্তের মতো শুধু কর্নেল বললে। এমনকী, জয়ন্তের মতোই আমার সর্বাঙ্গে চোখ আছে বললে। অতএব তুমি আমার কাছে এখন জয়ন্তের তুল্য হয়ে উঠলে। আমি জয়ন্তকে যেমন সস্নেহে ডার্লিং বলি, তোমাকেও বলব।

সোহিনী সিঁড়ি বেয়ে প্রায় নাচতে নাচতে উঠছিল। —ও কর্নেল! আই অ্যাম সো হ্যাপি।

আমাদের ঘরের বারান্দা থেকে দেখলুম, ফুলবাগানের কাছে কেউ নেই। আমাদের নীচের বারান্দায় সম্ভবত লছমির চাপাগলায় গালমন্দ শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে কাচ্চাবাচ্চার কান্নাকাটি।

ঘরে ঢুকে সোহিনী সোফায় হেলান দিয়ে বসল। কর্নেল ততক্ষণে ইজিচেয়ারে বসে চুরুট ধরিয়ে চোখ বুজে টানছেন। দক্ষিণের দরজা দিয়ে বাইরের হাওয়া আর সিলিং ফ্যানদুটোর হাওয়া চুরুটের ধোঁয়াকে ছত্রভঙ্গ করে ফেলছে। সোহিনী আমার মতো চুরুটের ধোঁয়ার গন্ধ সহ্য করতে পারছে কি না জানার জন্য বললুম সকালে ননীঠাকুর বলছিলেন আমিষের ঘ্রাণশক্তি উনি হারিয়ে ফেলেছেন। সোহিনীরও মনে হচ্ছে ঘ্রাণশক্তি হারিয়ে ফেলেছে!

সোহিনী বলল—মোটেও না। আমি শুধু কষ্ট করে প্রতীক্ষা করছি, কখন কর্নেল তাঁর সার্কাস দেখাবেন!

বললুম—দারুণ বলেছ তো! সার্কাস। তবে আমি বলব জোকারের সার্কাস।

কর্নেল চোখ বুজেই বললেন—সোহিনী! জয়ন্ত আমাকে জোকার বলছে।

সোহিনী কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময়ে গেটের দিকে গাড়ির জোরালো হর্ন শোনা গেল। অমনি কর্নেল উঠে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—ঠিক দুটোয় এসে গেছে ওরা। কে বলে পুলিশ সময় মেনে চলে না?

পুলিশ শুনেই চমকে উঠেছিলুম। সোহিনীও উঠে দাঁড়িয়েছিল। সে বলল —পুলিশ কেন? তারপর বেরিয়ে গিয়ে কর্নেলের পাশে দাঁড়াল। আমি গিয়ে দেখলুম, বুধুয়া একজন পুলিশ অফিসার এবং দুজন কনস্টেবলকে নিয়ে আসছে।

বললুম—কী ব্যাপার কর্নেল? হঠাৎ পুলিশ কেন?

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—ওয়েট অ্যান্ড সি।

কিছুক্ষণ পরে বুধুয়া পুলিশের দলটিকে নিয়ে এই বারান্দায় এল। পুলিস অফিসার করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করে বললেন—ও সি মিঃ প্রসাদ নিজেই আসতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা জরুরি কাজে তাঁকে অন্যত্র যেতে হল। আমি সাব-ইন্সপেক্টর অজিত বার্মা। চলুন কর্নেলসাব। ঘরদুটো খুলে দিচ্ছি। আপনি শুধু এই কাগজে একটা সই করে দেবেন।

বুধুয়া এগিয়ে গেল। তারপর বাঁ দিকে ঘুরে সিঁড়ি থেকে ওঠার পর যে ঘরটা আছে, সেটার দরজা দেখিয়ে বলল— হুজুর! এইটে রানিমার ঘর।

এস আই অজিত বার্মা তাকে প্রায় ধমক দিয়ে বললেন—তোমাকে চেনাতে হবে না। এই সিলকরা হ্যান্ডকাফ আমিই আটকেছিলুম।

বলে তিনি খাকি ফুলপ্যান্টের পকেট থেকে ছোট্ট একটা হাতুড়ি বের করে গালার সিলটা ভেঙে ফেললেন। তারপর চাবি দিয়ে হ্যান্ডকাফ খুলে তিনি একজন কনস্টেবলকে দিলেন। কর্নেল বললেন—দরজা আমিই খুলি। কী বলেন?

অজিত বার্মা একটু হেসে বললেন—খুলুন না স্যার। এখন সবই আপনার চার্জে।

এ ঘরের দরজায় পর্দা নেই। কপাটদুটো বেশ বড় এবং কাঠের ওপর সুন্দর নকশা খোদাই করা আছে। কর্নেল কপাটদুটো যখন খুললেন, কেন কে জানে ভিতরে গাঢ় অন্ধকার থেকে গা ছমছম করে উঠল। কী একটা গন্ধ ভেসে এল ঘরের ভিতর থেকে। মৃত্যুর গন্ধ কি? জানি না। তবে পরে সোহিনী বলেছিল, সে-ও কেমন একটা গন্ধ পেয়েছে।

কর্নেল বললেন—বুধুয়া! এ ঘরের সুইচবোর্ড কোথায় আছে?

বুধুয়া ভীতমুখে বলল—কপাটের বাঁদিকে আছে স্যার!

কর্নেল ভিতরে ঢুকে বাঁ দিকে হাত বাড়িয়ে কয়েকটা সুইচ টিপে দিলেন। ঘরে আলো জ্বলে উঠল। পাখাও ঘুরছিল। কর্নেল পাখার সুইচ অফ করে দিলেন।

ঘরটা নীচের হলঘরের চেয়েও প্রশস্ত। সামনের দেওয়াল থেকে একটু তফাতে বিশাল মেহগনি কাঠের নকশাদার উঁচু পালংক। পালংকে ওঠার জন্য দুধাপ সিঁড়ি আছে। বিছানাটা রেশমি বেডকভারে ঢাকা। পালংকের পিছনে কালো আয়রন চেস্ট দেওয়ালে গাঁথা আছে। দরজার ডান দিকে দুটো স্টিলের আলমারি। বাঁ দিকে একটা কারুকার্যখচিত প্রকাণ্ড সিন্দুক। তার ওপাশে একটা টেবিল ও গদিআঁটা চেয়ার। টেবিলের ওপর একটা পঞ্জিকা, লেখার সরঞ্জাম, প্যাড, কিছু বই এবং দুটো মোটা-মোটা ফাইল। উপরে কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশের লাল মূর্তি। ঘরের মেঝে পুরু লাল কার্পেটে ঢাকা। দেওয়ালে হলঘরের মতো কয়েকটা পেন্টিং। একটা দেখে মনে হল, রাজদম্পতির ফটো। কিন্তু কর্নেল দরজার সামনে যেখানে

দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেখানে কার্পেটের উপর কিছুটা জায়গা নোংরা হয়ে গেছে। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—মিঃ বার্মা! আপনি তো সেদিন এ ঘরে এসেছিলেন।

—হ্যাঁ স্যার।

—এইখানে সম্ভবত রানিমার হাতের রেকাবি আর পুজোর প্রসাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। তাই না?

—ঠিক বলেছেন স্যার। ফরেন্সিক এক্সপার্টরা সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। মেঝে আর পরিষ্কারের ব্যবস্থা হয়নি।

—এবার ঠাকুরঘরে যাওয়া যাক, কনস্টেবলদের এখানে থাকতে বলুন।

অজিত বার্মা বাঁ দিকে একটা দরজা খুলে দিলেন। দরজাটা ভিতর থেকে আটকানো ছিল। সেখানে একটা সংকীর্ণ করিডর। তারপর ওপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়িটা ঢাকা। কর্নেলকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখি, সোহিনী রানিমার পালংকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম, সে নিঃশব্দে কাঁদছে।

আমি আর উপরের ঠাকুরঘরে গেলুম না। সোহিনীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ডাকলুম—সোহিনী?

সোহিনী অমনই সংযত হয়ে রুমাল বের করে চোখ মুছল। তারপর ভাঙাগলায় আস্তে বলল—আমি এই খাটে স্বর্ণদিদার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়তুম। আমি সব ভুলে গিয়েছিলুম। এই ঘরটা আমার স্মৃতি ফিরিয়ে দিল। এখন আমার কষ্ট হচ্ছে কেন জানেন? আমি স্বর্ণদিদার মৃত্যুর খবর পেয়ে আসতে পারিনি। আমাকে আসতে নিষেধ করেছিলেন ক্যাপ্টেন পাণ্ডে। অথচ আমার একটা রাইফেল আছে।

ওকে কী বলব ভেবে পাচ্ছিলুম না। একটু পরে বললুম—যা ঘটে গেছে, ভুলে যাও।

কর্নেল ওপরের ঠাকুরঘর থেকে নেমে এলেন। অজিত বার্মা বললেন—তাহলে রানিমার ঠাকুরঘর আর এই শোওয়ার ঘরের তালার চাবি আপনার কাস্টডিতে থাকল। আপনি অনুগ্রহ করে এই কাগজে সই করে দিন।

কর্নেল রানিমার টেবিলে কাগজটা রেখে সই করে দিলেন। অজিত বার্মা ও কনস্টেবলরা তখনি নমস্কার করে চলে গেলেন। কর্নেল এবার বুধুয়াকে জিজ্ঞেস করলেন—ছ-টা বেড়াল কোথায় পড়েছিল তুমি দেখেছ?

বুধুয়া বলার আগে সোহিনী বলে উঠল—এই গোল চিহ্নগুলো কীসের? খড়ির দাগ মনে হচ্ছে!

কর্নেল বললেন—তোমার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করছি। এক মিনিট। সবগুলো জানালা খুলে দিই। তারপর আমি একবার আমাদের ঘরে যাব। তোমরা এখানে থাকো। বুধুয়া! কেউ যেন এ ঘরে ঢোকে না। তুমি দরজার বাইরে থাকো।

জানালাগুলো খুলে দিয়ে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। সোহিনী বলে উঠল—

জয়ন্তদা! এই দেখুন। খড়ির দাগ কোথাও কোথাও মুছে গেলেও বোঝা যাচ্ছে, স্বর্ণদিদা এই নোংরা জায়গার ওপাশে পড়ে গিয়েছিলেন।

খড়ির দাগ পরীক্ষা করে বুঝলুম, রানিমা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেই বেড়ালগুলোর অবস্থা দেখে মূর্ছিত হয়েছিলেন। তিনি লম্বালম্বি পালংকের দিকে মুখ করে পড়ে গিয়েছিলেন। পা দুটো ছিল দরজার চৌকাঠ থেকে মাত্র দেড়ফুট দূরে।

সোহিনী ছ-টা বেড়াল কোথায় কোথায় মরে পড়েছিল, তা খুঁজতে থাকল। পুলিশের দেওয়া খড়ির দাগ দেখে দেখে আমিও জায়গাগুলো শনাক্ত করছিলুম। একটু পরে কর্নেল এসে গেলেন। তাঁর একহাতে ছোট্ট অথচ জোরালো টর্চ, অন্যহাতে একটা ইঞ্চি তিনেক লম্বা খুদে কাচের কৌটো, সূক্ষ্ম একটা চিমটে এবং আতস কাচ। তিনি এসেই খড়ির গণ্ডিগুলোতে একে একে আতস কাচ রেখে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন—জয়ন্ত! তুমি টর্চটা নাও। যেখানে বলব, সেখানে আলো ফেলবে।

এরপর তিনি সারা ঘরের মেঝে টেবিলের তলা থেকে খাটের তলা এবং আলমারিদুটোর তলা থেকে সূক্ষ্ম চিমটে দিয়ে কী সব তুলে কাচের কৌটোতে ভরতে থাকলেন। এখন তাঁর অঙ্গভঙ্গি দেখে কৌতুক বোধ করার মতো মনের অবস্থা আমার ছিল না। সোহিনীরও ছিল না। অবাক হয়ে ভাবছিলুম, কাচের কৌটোতে কর্নেল কী কুড়িয়ে ভরছেন?

কর্নেল তাঁর কাজ শেষ করে রানিমার ঘরের দরজায় তালা এঁটে বেরিয়ে এলেন। সেই সময় অরুণিমাকে বারান্দা দিয়ে আসতে দেখলুম। রানিমার ঘরের দরজার দিকে তিনি বললেন—সোহিনী! পুলিশ এসে দরজা খুলে দিয়ে গেছে শুনলুম। আমি তখন স্নান করছিলুম। পুলিশকে তোমার একটু অপেক্ষা করতে বলা উচিত ছিল।

সোহিনী গম্ভীরমুখে বলল—এ ব্যাপারে তোমার কিছু করার নেই কাকিমা।

কর্নেল বললেন—ব্যাপারটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। তা ছাড়া রানিমার মৃত্যুর কেসে মিঃ সিংহ আমাকে তদন্তের সব দায়িত্ব দিয়েছেন। পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করার দায়িত্বও আমার। আপনি এ নিয়ে অকারণ উদ্বিগ্ন না হয়ে আপনার স্বামীকে টেলিফোনে জানান।

—জানিয়েই আসছি। কিন্তু এ ঘরের চাবি?

—চাবি পুলিশ আমাকে দিয়ে গেছে। কারণ, আমার আরো তদন্তের কাজ বাকি আছে।

অরুণিমা আর কথা না বলে চলে গেলেন। আমরা আমাদের ঘরে ঢুকলুম। বুধুয়া একটু দাঁড়িয়ে থাকার পর চলে গেল। কর্নেল তাঁর কিটব্যাগে কাচের কৌটো এবং চিমটে ঢুকিয়ে রাখলেন। আতসকাচটা ঢোকালেন প্যান্টের পকেটে।

বললুম—কর্নেল! মিঃ সিংহ বলছিলেন, ফরেন্সিক এক্সপার্টরা আবার এসে রানিমার ঘর পরীক্ষা করবেন। কিন্তু তার আগেই পুলিস আপনাকে ঘর খুলে দিয়ে গেল। এমনকী, যা বুঝলুম, পুলিশ আপনাকে রানিমার বেডরুমে আর ঠাকুরঘরেরও দায়িত্ব দিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।

সোহিনী বলল—আমি ভাবছি, স্বর্ণদিদার ঘরের তালার ডুপ্লিকেট চাবি যদি কারও কাছে থাকে? ঘর থেকে কিছু চুরি গেলে কর্নেলের উপরই দোষ চাপাবে পুলিশ।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—আর আধঘণ্টার মধ্যেই ক্যাপ্টেন পাণ্ডের জিপ এসে যাবে। কিন্তু এখনই আমার একটা টেলিফোন করা দরকার। সোহিনী! টেলিফোন তো তোমার কাকিমার ঘরে। তাই না?

সোহিনী বলল—হ্যাঁ। কিন্তু স্বর্ণদিদার ঘরেও তো টেলিফোন আছে। দেখতে পাননি?

—পেয়েছি। কিন্তু পালংকের তলায় টেলিফোনের তার কেউ ছিঁড়ে রেখেছে।

—সে কী! পুলিস এটা জানে না?

—জানে!

—তাহলে তারটা জোড়া দিলেই টেলিফোন চালু হবে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হবে না। তারের বাকি অংশ জানালার চৌকাঠের নীচে দিয়ে বেরিয়ে হলঘরের ভিতরে টেলিফোন বক্স পর্যন্ত টানা ছিল। তোমরা আমাকে যখন ঝোপের আড়াল থেকে দেখছিলে, তখন আমি টেলিফোনের তারের একটা লম্বা অংশ খুঁজছিলুম। রানিমার ঘরের ভিতর থেকে তারটা ছিঁড়ে বাকি লম্বা অংশটা বাইরে ঠেলে দিয়েছিল কেউ। এ অবস্থায় তারটা একতলার ছাদ পর্যন্ত ঝুলছিল। এরপর সে পাইপ বেয়ে উঠে তারের অনেকটা অংশ ছিঁড়ে কোথাও ফেলে দিয়েছে। তারে ক্লিপ আঁটা ছিল। নিচে ঘাসের মধ্যে রোদে কয়েকটা ক্লিপ আমার চোখে পড়েছিল। আমি তাই খুঁজছিলুম এসব ক্লিপ কীসের? তবে ক্লিপ কুড়োতে গিয়ে আমার একটা বড়োরকমের লাভ হয়েছে।

সোহিনী বলল—কী লাভ?

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে বললেন—চুপ। ও সব প্রশ্ন এখন নয়। এখন দরকার একটা টেলিফোন।

বলে কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বারান্দায় গিয়ে ডাকলেন—সোহিনী! শোনো!

সোহিনী বাইরে গেল। বলল—বলুন কী করতে হবে।

কর্নেল বললেন—তোমাকে একটা নাম্বার লিখে দিচ্ছি। তুমি তোমার কাকিমার ঘরে গিয়ে যেভাবো পারো, এই নাম্বারে ফোন করে বলবে—কর্নেল সরকার ডক্টর গুপ্তকে বলেছেন, তিনি যেন এখনি ক্যাপ্টেন পাণ্ডের সঙ্গে দেখা করেন। কথাগুলো কিন্তু চাপা স্বরে বলবে। সাবধান।

—যদি ডঃ গুপ্ত না থাকেন?

—ওঁর থাকার কথা। উনি আমার ফোনের প্রতীক্ষা করছেন। বলে কর্নেল তাকে পকেট থেকে খুদে নোটবই বের করে পাতা ছিঁড়ে নাম্বার লিখে দিলেন। সোহিনী তখনি চলে গেল।

বেরিয়ে গিয়ে বললুম—আমার ধারণা, আপনি এখন একটা নাটকের মধ্যে পা বাড়িয়েছেন।

কর্নেলে আস্তে বললেন—প্রকৃত নাটক শুরু হয়েছে অন্যত্র।

—প্লিজ কর্নেল! একটু আভাস অন্তত দিন।

—তখন পুলিশের এস আই অজিত বার্মার মুখে শুনলে না? ও সি মিঃ রামকুমার প্রসাদ একটা জরুরি কাজে বেরিয়ে গেছেন। তা না হলে তিনি নিজেই আসতেন।

—বুঝলুম না।

—ও সি মিঃ প্রসাদ যে কোনো পুলিস অফিসার এবং ফোর্স পাঠিয়ে যে কাজটা করতে পারতেন, তা নিজেই করতে গেছেন। তার মানে কাজটার গুরুত্ব তিনি পরে বুঝেছেন। আমি যখন ক্যাপ্টেন পাণ্ডের ফার্ম থেকে তাঁকে টেলিফোনে এই কাজটার দায়িত্ব নিতে অনুরোধ করেছিলুম তখন তিনি অত তলিয়ে কিছু চিন্তা করেননি।

হতাশ হয়ে বললুম—এক বর্ণও বুঝলুম না।

—তা হলে চুপ করে থাকো। যথাসময়ে নিজেই বুঝতে পারবে।

মিনিট পাঁচেক পরে সোহিনী ফিরে এল। তার মুখে হাসি। সে বলল—কাকিমাকে আপনার বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই বলে এলুম। কাকিমার এক কথা। সোহিনী, তুই বাধা দিলি না কেন পুলিশকে? আমি বানিয়ে বানিয়ে অনেক কিছু বললুম। কাকিমা প্রায় কেঁদে ফেললেন। আমি গার্জেন না, কে এক দাড়িওয়ালা বুড়ো কর্নেল গার্জেন?

কর্নেল বললেন—টেলিফোন?

—আহা! শুনুন না! কাকিমা শান্ত হয়ে শুয়ে পড়লেন। বললেন, তোর কাকু এখনই এসে পড়বেন। তাকে লাইনে পাইনি তো কী হয়েছে? ম্যানেজার খবর দেবে। বলেছি, বাড়িতে সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে।

—সোহিনী! টেলিফোন?

সোহিনী মুখ টিপে হাসল।—ডঃ গুপ্ত সত্যিই ওয়েট করছিলেন।

—তিনি কিছু বললেন?

—শুধু বললেন, ও কে। তারপর পিঁ পিঁ।

কর্নেল ঘড়ি দেখে নিয়ে বলল—সোহিনী! তুমি তৈরি হয়ে এসো। যে কোনো সময় ক্যাপ্টেন পাণ্ডের গাড়ি এসে যাবে।

সোহিনী বলল—আমি রেডি হয়েই আছি। সঙ্গে আমার টুকরো করা রাইফেলভর্তি ব্যাগটা নিতে হবে না তো?

কর্নেল হাসলেন। নাঃ! তোমার রাইফেল চুরি করে এ বাড়ির কেউ বিপদে পড়ার রিস্ক নেবে না।

আমি বললুম—শ্যামল মজুমদারের কথা ভুলে যাচ্ছেন কর্নেল!

আমার কথা শুনে সোহিনী চঞ্চল হয়ে উঠল। সে চাপা স্বরে বলল—হ্যাঁ। সে জানে, আমি রাইফেলশুটার। এখন সে বাড়িতে নেই। কিন্তু যে-কোনো সময় বাড়ি ফিরতে পারে। কর্নেল। আপনি যা-ই বলুন। আমি রিস্ক নেব না।

বলে সে দ্রুত বেরিয়ে গেল। কর্নেল মুচকি হেসে বললেন—আপাতত আমরা এখানে থাকা অবধি শ্যামলবাবু রাজবাড়িতে আসবেন না। মিঃ সিংহ তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ আমি এখানে থাকা মানেই পুলিশের আনাগোনা। মিঃ সিংহ এটা বোঝেন বলেই তাঁর শ্যালককে সতর্ক করেছেন।

—একথা মিঃ সিংহ আপনাকে জানিয়েছেন?

—হ্যাঁ। তুমি শিগগির রেডি হয়ে নাও। আমি আসছি।

বলে কর্নেল বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন কে জানে। আমি প্যান্টশার্ট পরে রিভলভারটা রুমালে জড়িয়ে প্যান্টের পকেটে রাখলুম। কয়েকমিনিট পরে কর্নেল ফিরে এলেন। তাঁর হাতে একটা ডায়রি। তিনি সেটা তাঁর কিটব্যাগে ঢুকিয়ে বললেন—কোনো প্রশ্ন কোরো না।

কর্নেল পিঠে কিটব্যাগ এঁটে গলায় বাইনোকুলার ও ক্যামেরা ঝুলিয়ে বললেন এসো। দরজায় তালা এঁটে দেব।

আমরা হলঘরের সিঁড়ির মাথায় গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর সোহিনী কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে এসে গেল। সোহিনী আমাদের আগে চঞ্চল পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল। সে বুধুয়াকে ডেকে হলঘরের দরজা বন্ধ করতে বলল। রাজবাড়ির গেটের বাইরে গিয়ে আমরা দাঁড়ালুম।

বুধুয়া আমাদের অনুসরণ করে এসেছিল। সে বলল—সায়েব এলে যদি আপনাদের কথা জানতে চান, তাকে কী বলব স্যার?

কর্নেল বললেন—বলবে, আমরা ক্যাপ্টেন পাণ্ডের ফার্মে যাচ্ছি। আর একটা কথা। আজ রাত্রে আমরা সেখানেই খেয়েদেয়ে ফিরব। তোমার সায়েবকে কথাটা টেলিফোনে জানাতুম। আর তোমার সায়েবের যদি ফ্যাক্টরি থেকে ফিরতে দেরি হয়, তুমি বউদিরানি আর ননীঠাকুরকে কথাটা জানিয়ে দেবে। পাণ্ডেজি আমাদের নেমন্তন্ন করেছেন।

বুধুয়া ভিতরে চলে গেল। একটু পরেই দক্ষিণ দিক থেকে একটা সাদা অ্যামবাসাডার গাড়ি এসে নিচের রাস্তায় থামল। তারপর ড্রাইভার গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে নেমে দাঁড়াল এবং কর্নেলকে সেলাম ঠুকে বলল—ক্যাপ্টেনসাবের

জিপগাড়িতে যেতে আপনাদের অসুবিধা হবে বলে উনি আমাকে ডাক্তারসাবের গাড়ি নিয়ে যেতে বললেন।

কর্নেল বললেন—তুমি কি ডাক্তার গুপ্তের ড্রাইভার?

—জি সাব!

—ডাক্তার গুপ্ত পাণ্ডেজির ফার্মে আছেন নাকি খ্রিস্টান হাসপাতালে গেছেন?

—ডাক্তারসাব ফার্মে আছেন।

আমি ও সোহিনী পিছনে বসলুম। কর্নেল সামনে ড্রাইভারের বাঁ পাশে বসলেন। গাড়ি এবড়োখেবড়ো রাস্তা দিয়ে কিছুটা চলার পর বাঁ দিকে সেই বিশাল তরঙ্গায়িত মাঠের দিকে বাঁক নিল। সেখানে পিচরাস্তাটা মসৃণ। নতুন তৈরি বলেই মনে হল। ডাইনে জঙ্গলে ঢাকা একটা লম্বাটে টিলা। টিলার গায়ে কালো গ্রানাইট পাথর ঝোপ থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে। সোহিনী বলল—এই টিলায় একসময় শম্বর হরিণ থাকত। স্বর্ণদিদার কাছে শুনেছি, রাজাসায়েব—মানে আমার দাদামশাই একটা শম্বর মেরেছিলেন। শম্বরটার স্টাফ করা মাথা হলঘরে আছে।

কর্নেল বাইনোকুলারে বাঁ দিকের উপত্যকার মতো বিস্তীর্ণ প্রান্তরে কিছু দেখতে দেখতে যাচ্ছিলেন। বাইনোকুলার নামিয়ে বললেন—খুব মেঘ জমেছে। পাহাড়ের মাথায়। বৃষ্টি হতে পারে।

সোহিনী বলল—এখানে এসে বৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি না। বৃষ্টি হলে এনজয় করা যাবে। ক্যাপ্টেন দাদুর ফার্মের বাংলোটা—যতটুকু মনে পড়েছে, এই টিলারই দক্ষিণপিঠে। তাই না কর্নেল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ। তবে সন্ধ্যার দিকে বাংলোর পিছনে কাঁটাতারের বেড়া গলিয়ে বাঘ-ভালুক হানা দিলে তুমি রাইফেল ছুড়বে তো?

সোহিনী হাসল।—রাইফেল আর বুলেট তৈরি রাখব। কিন্তু বাঘ বা ভালুক মারলে সেই মেমসায়েবের মতো আমাকে ফরেস্টগার্ডরা অ্যারেস্ট করবে। তখন আপনি বাঁচাতে পারবেন তো?

—নাঃ। ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট এখন আরো কড়া করা হয়েছে।

—তাহলে বাঘ-ভালুক আপনাদের মাংস খাবে। আর আমি এনজয় করব।

কর্নেল তাঁর বিখ্যাত অট্টহাসি হাসলেন। আমি বললুম—তা কেন? আমি সকালে যেভাবে দুজন আদিবাসীকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলুম, তুমি তা-ই করবে। বাঘ-ভালুকের মাথার ওপর দিয়ে ফায়ার করবে। দেখবে, ওরা লেজ তুলে পালাবে।

সোহিনী চোখে হেসে চাপা স্বরে বলল—আমার বুলেটগুলো তো আপনার মতো রিয়্যাল বুলেট নয়। এগুলো টার্গেট প্র্যাকটিসের জন্য নিরামিষ বুলেট। গর্জনও করে না।

—সত্যিকার বুলেট তোমার রাখা উচিত।

—আছে কিনা বলব কেন আপনাকে?

এবার পিচরাস্তাটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে এগিয়ে গেছে। সেদিকে একটা টিলার গায়ে চার্চ এবং নিচে অনেকগুলো বাড়ি দেখা যাচ্ছিল। বুঝলুম, ওটাই খ্রিস্টান মিশন স্কুল এবং 'সার্ভিস টু দ্য ম্যানকাইন্ড' হাসপাতাল। ডাইনে মোরামরাস্তার দুধারে ইউক্যালিপটাস গাছের সারি। তারপর গেট। উপরে অর্ধবৃত্তাকার সাইনবোর্ডে ইংরেজি ও হিন্দিতে লেখা 'রোহিনী এগ্রিকালচারাল ফার্ম।'

গেটের কাছে ক্যাপ্টেন পাণ্ডে এবং স্যুট পরা এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর গলায় স্টেথিসকোপ দেখেই বুঝলুম, ইনি সেই ডাক্তার গুপ্ত, কর্নেল যাঁকে ফোন করতে বলেছিলেন সোহিনীকে। সোহিনী নেমে গিয়ে ডাক্তার গুপ্তের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—আপনি অবনীকাকু না?

সে প্রণাম করতে ঝুঁকলে ডাঃ গুপ্ত বললেন—কী আশ্চর্য! তুমি একেবারে লেডি হয়ে উঠেছ সোহিনী। তিনবছরেই একটা রোগাটে গড়নের মেয়ের এই পরিবর্তনের হার এগিয়ে গেলে কী ঘটবে বুঝেছ?

সোহিনী বলল—অবনীকাকু আমার খবর রাখেন না, সেটা আমার দোষ নয়।

কর্নেল বললেন—ডাক্তার গুপ্ত শুনেও তুমি বুঝতে পারোনি কাকে ফোন করতে যাচ্ছ!

ডাঃ গুপ্ত সহাস্যে বললেন—সোহিনী ফোন করেছিল? আমি ভাবলুম ভজুয়ার বউ লছমি।

সোহিনী কপট রোষে বলল—আপনি মেডিসিনের ডাক্তার। শিগগির এন টি ডাক্তারকে আপনার কানদুটো দেখিয়ে নিন অবনীকাকু।

ডাঃ গুপ্ত হাসতে হাসতে গাড়িতে চেপে বসলেন—খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালে যাচ্ছি। কান দেখিয়ে নেব। কর্নেলসায়েব। পাণ্ডেজির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করে নিয়েছি। আমি মিশন হাসপাতাল থেকে এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসব।

ডাঃ গুপ্তের ড্রাইভার গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। তখন কর্নেল ডাঃ গুপ্তের কাছে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কী সব কথা বললেন। তারপর ফিরে এলেন। আমরা ফার্মে এলুম। দক্ষিণের সমতল মাঠে ধানখেত, অড়হরখেত, এবং আরো কী সব ফসলের খেত। অনুমান করলুম, অন্তত ২৫ একর চৌকো জমিতে ক্যাপ্টেনও চাষ করেছেন। সবটাই ছ-ফুট ইটের পাঁচিল এবং পাঁচিলের উপর অনেকটা কাঁটাতারের বেড়া। বেড়ার গায়ে নানারকমের লতার ঝালর। বাংলোর ফুলবাগিচা, ক্যাকটাস, গোলাকার ঝাউ এবং আরো বিচিত্র গড়নের উদ্ভিদ। ফুলের ছাদের বাগানের কথা মনে পড়ে গেল। এই দুই অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারের মতো সম্ভবত গোপন যোগসূত্রটা এতক্ষণে আবিষ্কার করে ফেললুম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে বাংলোর অর্ধবৃত্তাকার কংক্রিট চত্বর। তারপর আরো একধাপ সিঁড়ি বেয়ে বাংলোর বারান্দায় উঠলুম। বারান্দায় বেতের চেয়ার ফেলে সাজানো। একজন উর্দি-পরা

পরিচারক সেলাম দিল। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে সকলের মতোই তার দিকে তাকিয়ে বললেন—কফি!

লোকটা ভেতরে চলে গেল। বেতের চেয়ারে বসে এবার নিচে ডানদিকে গোডাউন এবং আটচালা ঘরে কৃষিযন্ত্রপাতি দেখতে পেলুম। গোডাউনের ওধারে একতলা তিনটে ঘর। বারান্দায় বন্দুকহাতে একজন গার্ডও চোখে পড়ল। অন্যপ্রান্তে উঁচু একটা চত্বরে আরেকজন গার্ড দাঁড়িয়েছিল। তার দু-পাশে দুটো কুকুর। কুকুরদুটোর চেন গার্ডের হাতে।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে চাপা স্বরে বললেন—আধঘন্টা আগে ওসি মিঃ রামকুমার প্রসাদ ফোন করেছিলেন। অপারেশন সাকসেসফুল। তিনি এস পি-কে খবর নিলেন। এস পি কলকাতা পুলিশের সঙ্গে থ্রু প্রপার চ্যানেল যোগাযোগ করবেন। কিছু ঠিকঠাক চললে আজ রাত্রেই আচারিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে পুলিশ হানা দেবে।

কর্নেল বললেন—মিঃ সিংহের রিঅ্যাকশন কী, তা জানতে পেরেছেন?

—ডাঃ গুপ্ত থাকার সময় তীর্থ ফোন করেছিল। সে কিছু বুঝতে পারছে না। তাছাড়া এই ঘটনায় তার ফ্যাক্টরির উপর আঘাত আসবে। আচারিয়া প্রোডাকশনের একজন ডিস্ট্রিবিউটর। আমি বললুম, এটা সম্ভবত অন্য। আমি ও সি-কে ফোন করে জেনে নিচ্ছি, কী ব্যাপার।

—আমার ধারণা, মেমসায়েব কেটে পড়েছে।

—আমার ধারণা অন্যরকম। তার একটা শক্ত অ্যালিবাই আছে। সে হাসপাতালের প্যাথোলজিস্ট। স্বামীর সঙ্গে তার দেখাসাক্ষাৎ হয় কদাচিৎ। তার মাথার উপর ফাদার ব্লুমফিল্ড এবং ফাদার হ্যারিংটন আছেন। ফাদার হ্যারিংটন এলাকার আদিবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয়। এখানে সরকারি নীতি হল, প্রশাসন যেন এমন কিছু না করে, যাতে আদিবাসীরা গোলমাল বাধানোর সুযোগ পায়। এই পরিস্থিতিতে মেমসায়েব কেটে পড়তে চাইবে না। বরং মিশনেই সে নিরাপদ।

পরিচারক কফি আর স্ন্যাক্স ভর্তি ট্রে রেখে গেল। কর্নেল বললেন—সোহিনী। তোমাকে আড়ষ্ট দেখাচ্ছে। হয়তো আমাদের কথাবার্তার অর্থ বুঝতে পারছ না। কফি খাও। নার্ভ চাঙ্গা করো। তারপর সব বুঝবে।

সোহিনী একমুঠো চানাচুর তুলে নিয়ে বলল—হয়তো বুঝেছি। তারপর কফির পেয়ালা তুলে নিল।

কফি খেতে খেতে কর্নেল বললেন—ডাঃ গুপ্তের কথা শুনে আপনার কী হল?

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—ওঁকে নিজের পয়েন্টে স্টিক করে থাকতেই হবে কারণ শ্মশানে আমি ছাড়াও অনেক ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ গুপ্ত যে পুলিশকে খবর দিতে ইনসিস্ট করেছিলেন, তার সাক্ষীও আমরা। এই অবস্থায় পুলিশকে খবর দিতে বাধ্য হয়েছিল। তা না হলে তার উপরই এসে যেত। তাই না?

—ঠিক। কিন্তু উনি আমার কাছে ঘটনাটা অন্যভাবে বলেছেন কেন? ওঁর উচিত ছিল, প্রকৃত ঘটনা আমি জানতে পারবই।

তীর্থ আপনাকে সরাসরি চেনে না। আমার সূত্রে চেনে। কাজেই আপনার সম্পর্কে তার কতটা সতর্ক থাকা উচিত, তা সে বুঝতে পারেনি।

একটু চুপ করে থাকার পর কর্নেল বললেন—কাল বুধবার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে মিঃ সিংহকে নন্দরানি আর দুবেজির জামিনের দরখাস্ত জন্য তৈরির তাঁর ল-ইয়ার প্রদীপ্ত চ্যাটার্জিকে বলতে বলেছি। জানি না, উনি চ্যাটার্জির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন কি না।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—তীর্থ না বললেও কিছু আসে যায় না। আমি তাকে টেলিফোনে বলে দেব। তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে সন্ধ্যা ৭টায়। নিজেই কোর্টে যাব। কোর্টে পেশাদার জামিনদার পাওয়া যায়। তারা হাজার টাকার ওপর শতকরা তিরিশ টাকা হারে চার্জ নেয়।

দু-জনের ঘরে পুলিশ দশ হাজার করে মোট কুড়ি হাজার টাকা পায়। সেই টাকাটাও তো কোর্ট জামিনের টাকা হিসেবে গণ্য করতে পারে। কী বলে তা অবশ্য আমি জানি না।

—দ্যাটস দ্য ডিসক্রিশন অব দ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট। যাই হোক, দেখা যাক তীর্থ কী করে।

—একটা কথা ক্যাপ্টেন পাণ্ডে। আপনার ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোস্কোপ আছে। আমি একবার সেখানে যেতে চাই।

—কোনো অসুবিধে নেই। কফি শেষ করে নিন।

কর্নেল দ্রুত কফি শেষ করে উঠলেন। বললেন—সোহিনী! জয়ন্ত! তোমরা ততক্ষণ গল্প করো। আমরা আসছি।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে এবং কর্নেল বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেলেন। বললুম—সোহিনী! কী ঘটেছে তা কি বুঝতে পেরেছ?

সোহিনী বলল—এটুকু বুঝেছি, কলকাতায় কর্নেল আমাকে এক আচারিয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তাকে করনগড় থানার অফিসার-ইন-চার্জ সম্ভবত তীর্থকাকুর ফ্যাক্টরিতে অ্যারেস্ট করেছেন।

—রঘুবীর আচারিয়া?

—মেমসায়েব ন্যান্সির স্বামী তো সেই আচারিয়া?

—হ্যাঁ।

—রঘুবীর আচারিয়ার কলকাতার অ্যাপার্টমেন্টে ওখানকার পুলিশ যাতে হানা দেয়, পুলিশ সুপার থ্রু চ্যানেল তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু বুঝতে পারছি না, কী আছে তার অ্যাপার্টমেন্টে?

একটু ভেবে নিয়ে বললুম—আচারিয়ার অ্যাপার্টমেন্টে নানারকমের অ্যান্টিক আর ঐতিহাসিক জিনিসের সংগ্রহশালা আছে।

সোহিনী চমকে উঠেছিল। সে বলল—রাজাসায়েবদাদুর সঙ্গে এখানকার এক ব্যবসায়ীর মামলা হয়েছিল। কী একটা হিস্টোরিক্যাল জুয়েল কিংবা ওইরকম দামি জিনিস বিক্রির জন্য দাদামশাই নাকি অ্যাডভান্স টাকা নিয়েছিলেন।

তার কথার ওপর বললুম—জিনিসটা নাকি হারিয়ে গিয়েছিল রাজবাড়ি থেকে। তাই রাজাসায়েব মোহনলাল সুখানিয়া নামে ব্যবসায়ীকে সেটা দিতে পারেননি। সোহিনী! আমার মনে হচ্ছে, সেই দামি জিনিসটা কিনেছিল রঘুবীর আচারিয়া।

সোহিনী আস্তে বলল—তীর্থকাকুর সঙ্গে তার ট্রেডসংক্রান্ত সম্পর্ক আছে শুনলেন না?

—বন্ধুত্বও আছে।

—দাদামশাই থানায় ডায়েরি করেছিলেন, তা স্বর্ণদিদার কাছে শুনেছিলুম।

—সোহিনী। তা হলে ঘটনার একটা দিক এবার স্পষ্ট হল।

এইসময় দেখলুম, নীচের গেটের কাছে একটা অটোরিকশা এসে থামল। তারপর অবাক হয়ে দেখলুম অটোরিকশা থেকে হালদারমশাই নামছেন। কিন্তু এখন তাঁর মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি নেই। মাথায় পরচুলা এবং টুপি নেই। গোয়েন্দাপ্রবর স্বমূর্তিতে অটোরিকশার ভাড়া মেটাচ্ছেন। কাঁধে তাঁর সুপরিচিত কালো ব্যাগটা ঝুলছে।

কিন্তু দারোয়ান তাঁকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। তখন তিনি ইংরেজিতে তাকে ধমক দিতে থাকলেন। অগত্যা আমি নিচের চত্বরে নেমে গিয়ে চেঁচিয়ে বললুম—

—দারোয়ানজি! সাবকো আনে দো! সাব হামারা আদমি হ্যায়। ক্যাপ্টেন সাবকা বন্ধু হ্যায়। বন্ধু সমঝতা?

আমার হিন্দি শুনে সোহিনী হেসে উঠল। দারোয়ান এবার গোয়েন্দাপ্রবরকে আসতে দিল। তিনি ভেতরে ঢুকে তাকে নিজের চিবুকে আঙুল রেখে বললেন—

—আমার দাড়ি ছিল। মাথায় টুপি ছিল। টাই পরেছিলাম। এখন দাড়ি কাইট্যা আইতাছি। বোঝলা ঝাব্বু সিং?

দারোয়ান অবাক হয়েছিল। তারপর কী ভেবে সেলাম দিয়ে বলল—যাইয়ে সাব! যাইয়ে!

হালদারমশাই উঠে এসে বললেন—জয়ন্তবাবু! কর্নেলস্যার কোথায়?

বললুম—বারান্দায় চলুন। কর্নেল ভিতরে আছেন।

প্রাইভেট ডিটেকটিভ তাঁর মক্কেল সোহিনীকে দেখে সহাস্যে বললেন—জাল গুটাইয়া আনছি মিস রায়! খুব ছোটাছুটি করছি। বয়েন জয়ন্তবাবু! কফি খামু। তারপর কথা হইব।

উর্দিপরা পরিচারক কফির ট্রে নিতে এসেছিল। সে একটু ইতস্তত করার পর সেলাম ঠুকে একটু হাসল। তারপর বলল—চিনেছি স্যার! আপনি চুল দাড়ি কেটে ফেলেছেন। তাই প্রথমে চিনতে পারিনি।

হালদারমশাই বললেন—কফি! কফি! গলা ব্যাবাক শুকাইয়া গেছে।....

গোয়েন্দাপ্রবর কফি শেষ করে যখন নস্যি নিচ্ছেন, তখন কর্নেল এবং ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বাংলোর ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কর্নেল বললেন—হ্যালো হালদারমশাই! ওয়েলডান!

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে অবাক হয়ে বললেন—মিঃ হালদার কি চুলদাড়ি কেটে ফেলেছেন?

হালদারমশাই বললেন—না ক্যাপ্টেনসায়েব! আমি ছদ্মবেশে ছিলাম।

—আশ্চর্য! আমি একটুও বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলুম, ওটাই আপনার আসল চেহারা।

—হঃ! মিঃ সিংহের ফ্যাক্টরির কাছে কতক্ষণ ঘুরছি। তিনিও আমারে দ্যাখছেন। কিন্তু ট্যার পান নাই।

কর্নেল এবং ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বসলেন। তারপর কর্নেল বললেন—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে! রবিবার সকালের কাগজে খবরটা পড়েই আমার যা সন্দেহ হয়েছিল, ঠিক তা-ই। সেইজন্যই এখানকার পুলিশ সুপার রাঘবেন্দ্র সিনহাকে টেলিফোনে অনুরোধ করেছিলুম, পাটনা থেকে ফরেন্সিক এক্সপার্ট টিম আর ডেকে আনার দরকার নেই। অন্তত মঙ্গলবার পর্যন্ত রানিমার ঘরের দরজা যেন পুলিশ কারো অনুরোধে না খুলে দেয়।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—আমি আপনার মতো এক্সপার্ট নই। কিন্তু আমার ফার্মে এই প্রজাতির প্রজাপতি দেখে অবাক হয়েছিলুম। এখানে এই প্রজাতি কীভাবে এল? নিশ্চয় বাইরে থেকে কেউ এনে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর কয়েকটা প্রজন্মের প্রজনন ঘটেছে।

—এটা আমার হিসেবে থার্ড জেনারেশন।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে রুষ্ট মুখে বললেন—এতো মানুষের বসতিহীন আফ্রিকার জঙ্গল নয়। এখানে এর অস্তিত্ব বিপজ্জনক। এখন বুঝতে পারছি, এই অঞ্চলে গত দু-বছরে আদিবাসীদের অনেক কুকুর অদ্ভুত রোগে মারা পড়েছে কেন? বন দফতরের আইন নিয়ে এ ব্যাপারে আমার মাথাব্যথা নেই। আমি বিষ স্প্রে করে আগে আমার ফার্মকে এই ভয়ংকর প্রজাপতির কবল থেকে মুক্ত করব। তারপর বন দফতর এবং স্বাস্থ্য দফতরের উপরমহলে ব্যাপারটা জানাব। এদের প্রজনন বন্ধ না হলে এর পর অনেক সাংঘাতিক ঘটনা ঘটবে।

কর্নেল গেটের দিকে তাকিয়ে বললেন—ডাঃ গুপ্ত শিগগির ফিরে এলেন দেখছি।

একটু পরে ডাঃ গুপ্ত এসে চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর হাসিমুখে বললেন—কর্নেলসায়েব। অপারেশন সাকসেসফুল। আপনি কিছুক্ষণ আগে রাজবাড়ি থেকে আসার পর যে জিনিসটা আমাকে দেখিয়েছিলেন, আমি ঠিক সেই জিনিসই মিশন হাসপাতালের প্যাথোলজিরুমে কাল বিকেলে মেমসায়েবের হাতে দেখেছিলুম। এখন গিয়ে দেখলুম, মেমসায়েব নেই। ফাদার ব্লুমফিল্ড বললেন, ফাদার হ্যারিংটন তাঁকে নিয়ে কোথায় বেরিয়েছেন। তো আমি একজন রোগীর যে রক্তের স্যাম্পেল বুদ্ধি করে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলুম, সেটা দেখিয়ে ফাদারকে অনুরোধ করলুম, এই রক্তটা এখনি পরীক্ষা করা জরুরি। তিনি যদি অনুগ্রহ করে প্যাথোলজি রুমে ঢোকার অনুমতি দেন, উপকৃত হব।

—উনি অনুমতি দিলেন?

—হ্যাঁ। আমি প্রতিদিন বিকেলে মিশন হাসপাতালকে ভলান্টারি সার্ভিস দিই। কাজেই ফাদার আমাকে না করবেন কোন মুখে? উনি আমাকে নির্দ্বিধায় ওই রুমের চাবির গোছা দিলেন।

—তারপর?

—আমি প্যাথোলজি রুমে ঢুকে রক্তপরীক্ষার ছলে মেমসায়েবের টেবিলের ড্রয়ার সাবধানে খুলে ফেললুম। তারপর দেখলুম, খুদে একসেট কালো অ্যামপিউল রাখা আছে। একটা অ্যামপিউলের তলায় আপনার নির্দেশমতো একটু চাপ দিতেই উপর দিয়ে সূক্ষ্ম সিকি ইঞ্চিটাক সূচ বেরিয়ে পড়ল। বুঝলুম, আপনার কথা ঠিক। তখন সেইটা যেমন ছিল, তেমনই রেখে নিঃশব্দে ড্রয়ারে তালা এঁটে দিলুম। কর্নেলসায়েব! মেমসায়েব ফিরে আসার আগেই তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে বিষাক্ত অ্যামপিউল-কাম-ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জগুলো পুলিশ যাতে সিজ করে, তার ব্যবস্থা করা দরকার।

কর্নেল বললেন—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে। বরং আপনিই থানায় টেলিফোন করে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে আসুন। ও সি মিঃ প্রসাদকে পেলে ভালো। নয়তো ডিটেকটিভ ইন্সপেক্টর মিঃ রাজীব সিনহার সঙ্গে কথা বলবেন। একটুও দেরি করা চলবে না কিন্তু।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে তখনি বাংলোর ভিতরে ঢুকে গেলেন। সেই উর্দিপরা পরিচারক ডাঃ গুপ্তের জন্য কফি দিয়ে গেল। কফিতে চুমুক দিয়ে ডাঃ গুপ্ত হালদারমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন—এঁকে কোথায় যেন দেখেছি?

কর্নেল প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দিলেন। হালদারমশাই সহাস্যে বললেন—কাইল বিকালে মিশন হাসপাতালের

কাছে আপনাকে দেখেছিলাম। আপনি আমারে ইংরাজিতে কইলেন, আমি খ্রিস্টান মিশনের লোক কি না। আমিও ইংরাজিতে কইলাম, আমি মিশনের লোক।

—আপনি দাড়ি আর চুল কেটে ফেললেন কেন?

—ডাঃ গুপ্ত! তখন আমি ছদ্মবেশে ঘুরতাছিলাম।

ডাঃ গুপ্ত হেসে উঠলেন। বললেন—বুঝেছি। আসলে তখন আপনার হাতে নস্যির কৌটো ছিল। এখনও নস্যির কৌটো আছে। তা ছাড়া আপনার টল ফিগার! আর ওই খাড়া নাক। তাই চেনা মনে হচ্ছিল।

কর্নেল বললেন—এবার জিনিসটা সবাইকে দেখাচ্ছি। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে ফিরে আসুন। বলে তিনি তাঁর বুকপকেট থেকে কালো ইঞ্চিটাক টুকরো পেনসিলের মতো কী একটা জিনিস বার করলেন।

একটু পরে ক্যাপ্টেন পাণ্ডে ফিরে এসে বললেন—ও সি মিঃ প্রসাদের সঙ্গে কথা বললুম। উনি এখনই নিজে ফোর্স নিয়ে মিশন হাসপাতালে যাচ্ছেন। উনি আমাকে একটা সুখবরও দিলেন। ফাদার হ্যারিংটন রেলস্টেশনে মেমসায়েবকে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ প্ল্যাটফর্মেই মেমসায়েবকে অ্যারেস্ট করেছে। মেমসায়েবের বিরুদ্ধে পুলিশের পুরনো অভিযোগ আছে। উনি এলাকার জঙ্গি 'ব্ল্যাক প্যান্থার'দের সাহায্য করেন। কিন্তু প্রশাসনের উচ্চস্তরে ফাদার হ্যারিংটনের প্রভাবের জন্য তা বটেই, তা ছাড়া আদিবাসীদের মধ্যে মেমসায়েব জনপ্রিয়—তাই পুলিশ এতদিন চুপচাপ ছিল। কিন্তু এবার রঘুবীর আচারিয়াকে গ্রেফতারের সূত্রে তাঁর স্ত্রী ন্যান্সিকেও পুলিশ একই অভিযোগে গ্রেফতার করেছে। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চক্রান্ত করে রাজবাড়ি থেকে ঐতিহাসিক দামি জিনিস হাতিয়েছিল। পুলিশের অভিযোগ এটাই। এতে আদিবাসীদের মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ রাজাসায়েব তাদের প্রিয় মানুষ ছিলেন।

কর্নেল বললেন—বাঃ! মিঃ প্রসাদ বুদ্ধিমান। কিন্তু একটা কথা। মিঃ সিংহ তাহলে কি পুলিশের সন্দেহভাজন? কী বললেন মিঃ প্রসাদ?

—তীর্থ সম্পর্কে আমি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে আপনি যেমন জানেন, আমি তেমনই জানি, রঘুবীর আচারিয়ার সঙ্গে তীর্থের কারবারি সম্পর্ক আছে। বন্ধুত্বও আছে। মোট কথা, তীর্থ সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়।

কর্নেল এবার সেই ছোট্ট কালো টুকরো পেনসিলের মতো এক ইঞ্চি লম্বা জিনিসটা দেখিয়ে বললেন—ক্যাপ্টেন পাণ্ডে! ডাঃ গুপ্ত মেমসায়েবের টেবিলের ড্রয়ারে এই জিনিসই দেখে এসেছেন। এটাই মার্ডার উইপন। এটা দিয়েই রানিমাকে হত্যা করা হয়েছিল।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। ডাঃ গুপ্ত বললেন—তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করিনি। এখন জিজ্ঞাসার সুযোগ পেয়েছি। এইটা আপনি কোথায় পেলেন?

কর্নেল বললেন—আজ রাজবড়িতে রানিমার ঘরের পিছনে দেওয়ালের নিচে ঘন ঘাসের ফাঁকে কয়েকটা ক্লিপ পড়ে থাকতে দেখেছিলুম। ক্লিপগুলো কীসের তা জানার জন্য দোতলার দিকে তাকিয়ে দেখি, রানিমার ঘরের জানালার কোনা থেকে টেলিফোনের তারের খানিকটা অংশ ছেঁড়া। ক্লিপগুলো তাই খুলে পড়েছে। কেন রানিমার টেলিফোনের তার ছেঁড়া, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই বুঝলুম, কেউ যাতে রানিমার ঘর থেকে বাইরে টেলিফোন করতে না পারে, তাই তার ছিঁড়ে রাখা হয়েছে। কেন? একটা দৃশ্য মনে ভেসে উঠল। ঘরে ছ-টা বেড়ালের মৃত্যু দেখে রানিমা মূর্ছিতা। খুনি একলা হওয়ার সুযোগ চায়। তাই সে কাউকে মিঃ সিংহের ঘরে গিয়ে ডাক্তার গুপ্তকে টেলিফোন করতে বলেছিল।

ডাঃ গুপ্ত বললেন—নন্দরানি আমাকে ফোন করেছিল। সে শুধু বলেছিল, রানিমা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমি যেন শিগগির যাই।

কর্নেল বললেন—অর্থাৎ খুনি একটু সময় ও সুযোগ চেয়েছিল। নন্দরানি রানিমার ঘরের ফোন ডেড দেখে মিঃ সিংহের ঘরে ছুটে যায়। সেই সময় খুনি মূর্ছিতা রানিমার বাঁ কানের নীচে গলায় এই অ্যামপিউল-কাম-ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ বিঁধিয়ে দেয়। তারপর সে এটা জানালার বাইরে ছুড়ে ফেলে। সে ভেবেছিল, ঘন ঘাস আর আগাছার ঝোপে এটা কেউ খুঁজে পাবে না।

বলে কর্নেল সেই কালো এক ইঞ্চি খুদে অ্যামপিউলের তলায় চাপ দিলেন। অমনি উপর দিকে সিকি ইঞ্চিটাক সূক্ষ্ম সূচ অর্থাৎ সিরিঞ্জ বেরিয়ে পড়ল। কর্নেল ওটা টিপে বললেন—বিষটুকু রানিমার শরীরে ঢুকে গেছে। তাই এটা টিপলেও কিছু বেরুচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—কিন্তু আপনি এটা কীভাবে পেলেন, শুনতে ইচ্ছে করছে।

কর্নেল বললেন—আজ আমি রাজবাড়ির পিছনে ঘাস ও ঝোপের মধ্যে প্রজাপতির ছবি তোলার ছলে প্রকৃতপক্ষে একটা ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জই খুঁজছিলুম। কারণ রানিমার গলায় বিষ ইঞ্জেক্ট করেই তাঁকে মারা হয়েছে। সিরিঞ্জটা খুনি জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলতে পারে। যাই হোক, খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে ঘাসের মধ্যে এই জিনিসটা কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। পরীক্ষা করতে গিয়ে দৈবাৎ আঙুলে চাপ লেগেছিল এটার তলায়। চমকে উঠে দেখি, এই খুদে সূচ অর্থাৎ সিরিঞ্জ বেরিয়ে পড়ল। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে সূচের মাথায় ছিদ্র দেখলুম। ওমনি সব স্পষ্ট হয়ে গেল।

সোহিনী বলল—আমি আর জয়ন্তদা তখন ফুলের ঝোপের আড়ালে বসে ভাবছি, কর্নেল প্রজাপতির ছবি তোলার জন্য লুকোচুরি খেলছেন।

ডাঃ গুপ্ত বললেন—তা হলে নন্দরানিই বলতে পারে, মূর্ছিতা রানিমার কাছে কে ছিল?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। কিন্তু খুনি এমন কেউ, যাকে সে ভাবতেই পারেনি রানিমাকে হত্যা করবে। এমন অদ্ভুত ইঞ্জেকশনের কথা সে কেন, আমি উপস্থিত থাকলেও কল্পনা করতে পারতুম না। কাজেই নন্দরানি তার উপস্থিতির কথা পুলিশকে বললেও পুলিশ তাকে সন্দেহ করেনি।

ক্যাপ্টেন পাণ্ডে একটু হেসে বললেন—কর্নেলসায়েব! এবার বলুন। রানিমার হত্যা রহস্যের পর্দা কখন খুলবেন? কোথায় খুলবেন?

কর্নেল বললেন—আগামিকাল বুধবার রাজবাড়ির ল-ইয়ার মিঃ প্রদীপ্ত চ্যাটার্জি কোর্টে নন্দরানি আর দুবেজির জামিনের জন্য আবার দরখাস্ত করবেন, এটা তো আপনি জানেন। আমার সিদ্ধান্ত কাল বিকেল তিনটেতে রাজবাড়ির হলঘরে রহস্যের পর্দা তুলব। পুলিশ সুপার কথা দিয়েছেন, সদলবলে ওই সময় উপস্থিত থাকবেন। রাজবাড়ির সবাই উপস্থিত থাকবে। এবার আমার ইচ্ছা, ক্যাপ্টেন পাণ্ডে এবং ডাঃ গুপ্ত করনগড়ের গণ্যমান্য কয়েকজন লোককে যেন ওইসময় হলঘরে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেন।

ওঁরা দুজনে একবাক্যে বললেন—করব।

কর্নেল বললেন—স্থানীয় গণ্যমান্যদের উপস্থিত থাকা দরকার অন্তত একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণে। ল-ইয়ার মিঃ চ্যাটার্জি রানিমার উইল পড়ে শোনাবেন। সোহিনী উইলের একজিকিউশনার। তাকে উইল কোর্টে প্রোবেট করতে হবে। সোহিনী রানিমার প্রপার্টির দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। যাই হোক, সেটা দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

সোহিনী বলল—আমার শেয়ার আমি করনগড় বাঙালিটোলার 'সরোজিনী স্মৃতিসংঘ'-কে দান করব। সরোজিনী দেবী আমার স্বর্ণদিদার শাশুড়ি ছিলেন।

আমরা সবাই হাততালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালুম। ততক্ষণে ফার্মে আলো জ্বলে উঠেছে। বাংলোর বারান্দায় বসে আমরা আরেক দফা কফি আর পকৌড়া খেলুম।

সে রাতে ডিনার খাওয়ার সময় ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বললেন—মিঃ হালদার আজ রাত্রে এখানেই থাকুন। কর্নেলেসায়েব কাল সকালে বরং জয়ন্তবাবুকে নিয়ে রাজবাড়ি ছেড়ে আমার রেস্টহাউসে যাবেন। তীর্থকে কোনো একটা কৈফিয়ত দেবেন কর্নেলসায়েব। বিকেলে রাজবাড়ির হলঘরে একটা মিটিং হওয়ার কথা তীর্থকে বলাই যথেষ্ট। উইলসংক্রান্ত মিটিং। আমিও ফোনে তীর্থকে জানাব।

হালদারমশাই বললেন—কিন্তু আমার ক্লায়েন্ট মিস সোহিনী রায়ের রাজবাড়িতে থাকা কি ঠিক হইব?

সোহিনী শক্তমুখে বলল—আমি রাজবাড়িতেই থাকব।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ। সোহিনী আমাদের সঙ্গে রাজবাড়ি ছেড়ে ক্যাপ্টেন পাণ্ডের রেস্টহাউসে থাকলে মিঃ সিংহের মনে কোনও সন্দেহ জাগতে পারে।....

সে রাতে ডাঃ গুপ্তের বাড়িতে কর্নেল, সোহিনী আর আমি রাজবাড়িতে ফিরেছিলুম। বুধুয়া বলেছিল, তার সায়েব ফ্যাক্টরি থেকে তখনো ফেরেননি। পরদিন ভোর ছ-টায় কর্নেল আমাকে বিছানা থেকে প্রায় জবরদস্তি উঠিয়েছিলেন। কারণ ক্যাপ্টেনের জিপ রাজবাড়ির গেটে হর্ন দিচ্ছিল। প্রাতঃকৃত্যের সুযোগ দেননি কর্নেল। আমরা যখন আমাদের ব্যাগ গুছিয়ে হলঘরে নেমেছি, তখন ভজুয়া এসে জানতে চেয়েছিল, আমরা কোথায় যাচ্ছি। কর্নেল তার কথার জবাব দেওয়ার পর সে কাঁচুমাচু মুখে বলেছিল, অনেক রাত্রে সায়েব ফিরে এখনও ঘুমোচ্ছেন। বউদিরানি তাকে বলেছেন, কর্নেলসায়েব যেন রানিমার শোওয়ার ঘর আর ঠাকুরঘরের চাবি তাকে দিয়ে যান। কর্নেল তাকে বলেছিলেন, চাবিদুটো পুলিশ তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে। আর তার সায়েব উঠলে ভজুয়া যেন তাকে বলে, বিকেল তিনটেয় আমরা রাজবাড়িতে আসব। আর যা বলার কথা, কর্নেলসায়েবকে ক্যাপ্টেন পাণ্ডের রেস্টহাউসে ফোন করে মিঃ সিংহ যেন বলেন।

এরপর আমি এবার সরাসরি বিকেল তিনটেতে রাজবাড়ির হলঘরে মোটামুটি বড়রকমের একটা সমাবেশ প্রসঙ্গে আসছি। কারণ মধ্যবর্তী সময়ে কর্নেলের টেলিফোনে মিঃ সিংহের সঙ্গে কী সব কথাবার্তা ছাড়া, তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনাই ঘটেনি। হ্যাঁ—সোহিনী আমাকে ফোন করে বলেছিল, সে খুব নিঃসঙ্গবোধ করছে। তার সময় কাটতে চাইছে না। কিন্তু কর্নেল নাকি তাকে ফোন করে রাজবাড়ি ছেড়ে বেরুতে নিষেধ করেছেন।...

বুধবার বিকেল তিনটের সময় রাজবাড়ি গিয়ে দেখেছিলুম, পুলিশে-পুলিশে একেবারে যাকে বলে ছয়লাপ। হলঘরে সেই ডিম্বাকৃতি টেবিলটা খুলে এককোণে রাখা হয়েছে। চেয়ারগুলো ভর্তি। সোফাতেও কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন। হলঘরের সিঁড়ির উপরদিকে একদল কনস্টেবল বসে আছে। নিচের ধাপগুলোতে দারোয়ান, রামু, ভজুয়া, বুধুয়া এবং ননীঠাকুর বসে আছেন। সিঁড়ির পাশে ভজুয়ার বউ লছমি আর তার দুটি ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে এক প্রৌঢ়া আছে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির শেষ ধাপের পাশে একটা চেয়ারে একজন প্রৌঢ় বসে আছেন। তার পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। কর্নেলের দু-পাশে পুলিশ সুপার রাঘবেন্দ্র সিংহ আর ও সি রামকুমার প্রসাদকে চিনিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন পাণ্ডে—অবশ্য আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে তিনি কথাটা বললেন। সামনের দিকে দেওয়াল ঘেঁষে চেয়ারে বসে আছেন তীর্থব্রত সিংহ। তাঁর পাশে অরুণিমা সিংহ। সোহিনীকে খুঁজে বের করতে হল। সে সোফার এদিকে গোয়েন্দাপ্রবরের পাশে বসে আছে।

সামান্য গুঞ্জন চলছিল হলঘরে। হঠাৎ ও সি মিঃ প্রসাদ বললেন—সাইলেন্স প্লিজ!

অমনি হলঘর নিস্তব্ধ হয়ে গেল। এবার কর্নেল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—মাননীয় ভদ্রমহিলাবৃন্দ এবং ভদ্রমহোদয়গণ। আমি প্রথমে আপনাদের একটা প্রজাপতির ছবি দেখাব। তারপর মূল প্রসঙ্গে যাব।

বলে তিনি তাঁর কিটব্যাগ থেকে একটা বড় সাইজের রঙিন প্রজাপতির ছবি বের করে সামনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে সবাইকে কিছুক্ষণ ধরে দেখালেন। তারপর বললেন—এই প্রজাতির প্রজাপতিটির নাম লাতিন ভাষায় 'পাপিলিও আন্তিমাচুস'। রবার্ট স্টিলার নামে একজন প্রজাপতিবিশারদ লিখেছেন, এই প্রজাপতির শরীরে একরকম গন্ধ বেরোয়। তাতে কুকুর-বেড়ালজাতীয় প্রাণীরা আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এই একটা প্রজাপতির শরীরে যে বিষ আছে, তাতে ছ-টা বিড়ালের মৃত্যু হতে পারে। এই বিষয়টি বাস্তব। Robert Goodden -এর Butterflies বই (Hamlyn, London) থেকে নেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সালের সংস্করণ। ১৩২ পৃষ্ঠায় এই বিবরণ আছে।

হলঘরে গুঞ্জন উঠেছিল। কর্নেল আবার কথা শুরু করলে থেমে গেল। সম্প্রতি এই অঞ্চলে এই প্রজাতির আবির্ভাব ঘটেছে। ক্যাপ্টেন পাণ্ডের ফার্মেও এই প্রজাপতি আমি দেখেছি। তার মানে, কেউ এই প্রজাতির পুরুষ এবং স্ত্রী প্রজাপতি এনে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর তারা বংশবৃদ্ধি করেছে। আপনারা হয়তো শুনে থাকবেন, এই অঞ্চলে আদিবাসীদের কয়েকটা কুকুর বিভিন্ন সময়ে মারা পড়েছিল। যাই হোক, এবার আমি মূল প্রসঙ্গে আসি।

কর্নেল একটু দম নিয়ে বললেন—আমার এবার প্রশ্ন রানিমার বিশ্বস্ত পরিচারিকা নন্দরানিকে। আজ তিনি জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। বলে তিনি সিঁড়ির বাঁ পাশে সেই প্রৌঢ়ার দিকে ঘোরেন।—নন্দরানি। ভোরে রানিমা স্নান করে যখন সিঁড়ি বেয়ে দোতলার উপরে ঠাকুরঘরে যেতেন, তখন কি আপনি রানিমার ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে রাখতেন?

নন্দরানি বললেন। —হ্যাঁ। আমি রানিমার সঙ্গে গিয়ে ঠাকুরঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতুম।

—তখন বেড়ালগুলো কি রানিমাকে অনুসরণ করত?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। সেইজন্য তাদের ঘরে বন্দি রেখে ভিতরের দরজা বন্ধ করে রাখতুম। রানিমার শরীর ইদানীং দুর্বল হয়ে পড়েছিল। পাছে তিনি পড়ে-টড়ে যান, তাই সারাক্ষণ তাঁর কাছাকাছি থাকতুম।

—ঘটনার দিন রানিমা পুজো করে যখন দোতলায় নিজের ঘরে ঢুকেছিলেন, তখন বেড়ালগুলো কী অবস্থায় ছিল?

নন্দরানি চোখ মুছে বললেন—সারা ঘরে ছড়িয়ে ছিল। তাদের মুখ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। দেখামাত্র রানিমা কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'এ সর্বনাশ কে করল রে?' বলেই তিনি পড়ে গেলেন। হাতের রেকাবিতে পুজোর প্রসাদ ছিল। রেকাবি

ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল। সেই সময় দরজা খুলে আমি দেখলুম, বউদিরানি ছুটে আসছেন!

—বউদিরানি মানে মিসেস অরুণিমা সিংহ? মিঃ তীর্থব্রত সিংহের স্ত্রী?

—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। উনি দৌড়ে আসছিলেন। রেকাবি পড়ার শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। উনি জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে মাসি? আমি বললুম, দেখে যান কী হয়েছে। উনি ঘরে ঢুকে রানিমার পাশে বসে বললেন, এখনি ডাক্তারবাবুকে ফোন করো। আমি রানিমার টেলিফোন তুলে দেখি, টেলিফোন ডেড। কথাটা বউদিরানিকে বললুম। তখন উনি বললেন আমার ঘরে গিয়ে ফোন করো। তোমাদের সায়েবের ফ্যাক্টরিতে নাকি আগুন লেগেছে। তাই শুনে উনি সেখানে ছুটে গেছেন।

—আপনি তাহলে আপনার বউদিরানির ঘর থেকে ডাক্তার অবনী গুপ্তকে ফোন করেছিলেন?

—হ্যাঁ স্যার।

—ফোন করে এসে কী দেখলেন?

—বউদিরানি রানিমার পাশে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

—রাজবাড়ির কর্মচারীরা তখন কোথায় ছিল?

—তারা তখনো কেউ তো জানে না কী হয়েছে! আমার ডাকাডাকিতে ভজুয়া, দুবেজি, বুধুয়া, তারপর ননীঠাকুর দৌড়ে এসেছিলেন। তার কিছুক্ষণ পরে ডাক্তারবাবু এলেন।

—তখনো কি রানিমা মেঝেয় পড়েছিলেন?

—না স্যার! আমরা তাঁকে ধরাধরি করে পালংকে শুইয়ে দিয়েছিলুম।

কর্নেল ডাঃ গুপ্তের দিকে ঘুরে বললেন—ডাঃ গুপ্ত! আপনি এসে রানিমাকে কী অবস্থায় দেখেছিলেন?

ডাঃ গুপ্ত বললেন—আমি পরীক্ষা করে দেখলুম শি ওয়াজ অলরেডি ডেড।

—হার্টফেল করে মৃত্যু?

—তখন তা-ই ভেবেছিলুম। বিকেলে শ্মশানে গিয়ে চিতায় ওঠানোর পর আমি লক্ষ করলুম, রানিমার ঠোঁটের পাশ দিয়ে রক্তমাখা লালা গড়াচ্ছে। ক্যাপ্টেন পাণ্ডে আর আমি তীর্থকে পুলিশে খবর দিতে বললুম। তীর্থ একটু ইতস্তত করছিল। পুলিশের ঝামেলা অবশ্য কেউ চায় না। তীর্থের আপত্তির কারণ ছিল।

কর্নেল বললেন—এবার রানিমার ছ-টা বেড়ালের মৃত্যুর প্রসঙ্গে আসছি।

বলে তিনি কিটব্যাগ থেকে কাচের একটা কৌটো বের করলেন। ওমনি ক্যাপ্টেন পাণ্ডে বলে উঠলেন—কর্নেল রানিমার ঘরের কার্পেট থেকে যে জিনিসগুলো কুড়িয়ে ওই কৌটোতে রেখেছেন, তা আমার ল্যাবরেটরিতে মাইক্রোস্কোপে দু-জনেই পরীক্ষা করে দেখেছি। বলুন কর্নেল, ওগুলো কী?

কর্নেল বললেন—যে প্রজাপতির ছবি আপনাদের দেখিয়েছি, তারই ডানার কুচি এগুলো। সূক্ষ্ম চিমটে দিয়ে আতস কাচের সাহায্যে আমি কাল বিকেলে রানিমার ঘরের মেঝে থেকে তুলে রেখেছি। সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি আমাকে টর্চ দেখিয়েছিল। রানিমার নাতনি মিস সোহিনী রায়ও তখন ও-ঘরে উপস্থিত ছিল। যাই হোক, তাহলে এটা স্পষ্ট যে বেড়ালগুলো রানিমার ঘরে এক বা একাধিক বিষাক্ত প্রজাপতির গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে সেগুলো খেয়ে ফেলেছিল এবং তারপরই মারা পড়েছিল। এখন প্রশ্ন রানিমার ঘরে এই প্রজাতির প্রজাপতি কীভাবে ঢুকেছিল? রানিমার ঘরের জানালা নিশ্চয় খোলা ছিল। বলুন নন্দরানি?

নন্দরানি বললেন—হ্যাঁ স্যার। জানালা খোলা ছিল। কিন্তু পর্দাগুলো টানা ছিল।

—তাহলে এক বা একাধিক প্রজাপতি, আমি একাধিকই বলছি, তারা নিজেরা কী করে ঘরে ঢুকেছিল? এই প্রশ্নের সোজা জবাব, কেউ তাদের জানালার পর্দা তুলে ঘরের ভিতর উড়িয়ে দিয়েছিল। কীভাবে সে প্রজাপতিগুলো নিয়ে গিয়েছিল? তার জবাব, একটা প্ল্যাস্টিকের সচ্ছিদ্র প্যাকেটে ভরে সে, মোট তিনটে প্রজাপতি নিয়ে এসে জানালার ভিতর প্যাকেটটা ঝেড়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। প্যাকেটটা আমি রাজবাড়ির পিছনে কুড়িয়ে পেয়েছি। প্রজাপতি তিনটের তত বেশি ওড়ার ক্ষমতা ছিল না। দশ ইঞ্চি ডানাওয়ালা প্রকাণ্ড প্রজাপতি। তাদের দেখামাত্র ছটা বেড়াল ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

কর্নেল কিটব্যাগ থেকে একটা সছিদ্র কালো প্যাকেট বের করে দেখালেন। তারপর বললেন—এখানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ হালদার উপস্থিত আছেন। সোহিনী তাঁর ক্লায়েন্ট। মিঃ হালদারকে আমি হালদারমশাই বলি। হালদারমশাই! এবার আপনি বলুন।

গোয়েন্দাপ্রবর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—খ্রিস্টান মিশন হাসপাতালের এক কর্মীর লগে নস্য দিয়ে ভাব করছিলাম। তার নস্য ফুরাইয়া গিছল। সেই কর্মীরে আমি আইজ লইয়া আইছি। তার লগে ম্যামসায়েবের কথা আলোচনা করছিলাম। কথায় কথায় সে কইয়া দিল, ম্যামসায়েব রাজবাড়ির একটা লোকেরে তিনখান বড় বড় প্রজাপতি দিছিল। ক্যান দিছিল সে জানে না। এবার ভাইটি দাঁড়াইয়া কও, কী দেখছিলা?

একজন আদিবাসী তাঁর পিছন থেকে সামনে এল। তার পরনে হাফপ্যান্ট আর শার্ট। সে বলল—আমার নাম কানু মুর্মু স্যার! রানিমা মারা যাওয়ার আগের দিন সন্ধ্যার একটু আগে রাজবাড়ির একটা লোক মিশন হাসপাতালে গিয়েছিল। মেমসায়েব তার হাতে ওই প্ল্যাস্টিক প্যাকেটে তিনটে প্রজাপতি ভরে দিয়েছিলেন। আমি জানালা দিয়ে দেখেছিলুম। বুঝতে পারিনি কিছু। তবে প্রায়ই দেখতুম, মেমসায়েব প্রজাপতি ধরে এনে প্যাথলজি রুমে কাটাছেঁড়া করছেন।

কর্নেল বললেন—মেমসায়েব কেন কাটাছেঁড়া করতেন তা ডাঃ গুপ্ত জানেন। থানার ওসি মিঃ প্রসাদও ইতিমধ্যে জেনে গেছেন। তার আগে কানু মুর্মুকে জিজ্ঞেস করছি, রাজবাড়ির সেই লোকটা এখানে আছে কি? তাকে তুমি দেখিয়ে দাও।

কানু মুর্মু হলঘরের সিঁড়ির দিকে আঙুল তুলে বলল—ওই লোকটা স্যার!

কথাটা বলামাত্র ভজুয়া যেন নিজে থেকেই ধরা দিল। সে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। তারপর ওসি মিঃ প্রসাদের ধমক খেয়ে বলল—আমি কিছু জানি না স্যার। আমি বিকেলে মাথার যন্ত্রণার ওষুধ আনতে গিয়েছিলুম। মেমসায়েব আমাকে বসিয়ে রেখে বলেছিলেন, একটু বসো। তারপর সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে আমি তাঁকে কাকুতি মিনতি করলুম। তখন উনি ওষুধ দিলেন। তারপর ওই কালো প্ল্যাস্টিকের প্যাকেট দিয়ে বললেন, এটা তোমার সায়েবকে দিও।

তীর্থব্রত সিংহ রুষ্টমুখে বললেন—মিথ্যে কথা। আমাকে ভজুয়া কোনো প্যাকেট দেয়নি।

ভজুয়া বলল—তখন আপনি ফ্যাক্টরি থেকে আসেননি। তাই বউদিরানিকে ওটা রাখতে দিয়েছিলুম।

অরুণিমা ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বরে বলে উঠলেন—ওতে কী ছাইপাঁশ ছিল, আমি কেমন করে জানব? আমি ওটা টেবিলের তলায় রেখেছিলুম। অনেক রাতে তীর্থ বাড়ি ফিরেছিল। তখন আমার ওটার কথা মনে ছিল না।

তীর্থব্রত বললেন—ভোর রাতে পাঁচটার সময় কে ফোনে বলেছিল, আপনার ফ্যাক্টরিতে আগুন লেগেছে। তাই শুনে আমি তখনই বেরিয়ে গিয়েছিলুম। তারপর কী হয়েছিল, তা কর্নেল সায়েব জানেন। দমকল অফিস জানে। ও সি মিঃ প্রসাদও জানেন। বলুন আপনারা।

কর্নেল তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—আবার আমি মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসছি। তা হল রানিমার মৃত্যু। না—মৃত্যু নয়, হত্যাকাণ্ড। আপনারা এই অদ্ভুত জিনিসটা আগে দেখে নিন।

বলে তিনি বুকপকেট থেকে সেই খুদে অ্যামপিউল-কাম-ইঞ্জেকশন সিরিঞ্জ বের করলেন। তার তলায় তিনি চাপ দিতেই সূক্ষ্ম সূচটা বেরিয়ে পড়ল। সোফা থেকে রাশভারি চেহারার এক বাঙালি ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন—ওটা কী?

কর্নেল বললেন—মেমসায়েব ন্যাপ্পি আচারিয়া প্রজাপতি কাটাছেঁড়া করতেন, তা কানু মুর্মু দেখছেন। হ্যাঁ—যে বিষাক্ত প্রজাপতির ছবি আপনাদের দেখিয়েছি, সেই প্রজাপতির শরীর থেকে মেমসায়েব বিষটুকু বের করে নিয়ে একটা অ্যামপিউলে রাখতেন। তারপর এই খুদে অ্যামপিউলে ঢোকাতেন। এটা রবারের তৈরি। এতে প্রজাপতির বিষ ভরে মেমসায়েব এটার মাথায় জুড়ে দিতেন এই সিকি-ইঞ্চি মাপের সিরিঞ্জ। এই খুদে অ্যামপিউল-কাম-সিরিঞ্জ তাইওয়ান-হংকং অঞ্চলে চিনারা নেশার জন্য ব্যবহার করে। মেমসায়েব এগুলো সম্ভবত হংকং

থেকে এনেছিলেন। শত্রুবিনাশের উদ্দেশ্যে ধনী লোকেরা এগুলো তাঁর কাছ থেকে কিনে নিত। এখানে পুলিশ সুপার মিঃ রাঘবেন্দ্র সিনহা উপস্থিত আছেন। তিনিই জানেন, সারা বিহার অঞ্চলে অনেক ধনী ব্যক্তি রানিমার মতো গত দু-তিন বছরে মারা পড়েছেন। কিন্তু সেইসব মৃত্যুরহস্যের কিনারা করা যায়নি। এতদিনে সেই রহস্যের পর্দা আমি তুলে ধরতে পেরেছি।

পুলিশ সুপার বললেন—কাল বিকেলে ন্যান্সি আচারিয়াকে করনগড় রেলস্টেশনে গ্রেফতার করা হয়েছে। এর সবটুকু কৃতিত্ব কর্নেল সরকারেরই প্রাপ্য। তাঁকে আমরা পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

কর্নেল বললেন—এই অদ্ভুত অ্যামপিউল-কাম-সিরিঞ্জটা আমি উদ্ধার করেছি। রানিমার ঘরের পিছনদিকে ঘন ঘাসের জঙ্গলে এটা পড়েছিল। রানিমার খুনি কল্পনাও করেনি এটা কারও চোখে পড়বে। মূর্ছিতা রানিমার বাঁ কানের নীচে গলায় খুনি এটা ঢুকিয়ে দিয়ে অ্যামপিউলটা চাপ দিতেই প্রজাপতির বিষটুকু রক্তে মিশে তখনি তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। তারপর খুনি এটা পিছনের জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলেছিল।

সোফা থেকে সেই বাঙালি ভদ্রলোক বললেন—এবার আপনি বলুন কে এই সাংঘাতিক কাজ করেছিল?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—তার আগে আমি আপনার পরিচয় জানতে আগ্রহী।

—আমি বাঙালিটোলার 'রানি সরোজিনী স্মৃতিসংঘে'র প্রেসিডেন্ট অরিন্দম রায়চৌধুরি।

কর্নেল নন্দরানির দিকে ঘুরে বললেন—তাহলে নন্দরানি, আপনি যখন রানিমার টেলিফোন ডেড দেখে তীর্থব্রত সিংহের ঘরে ডাঃ গুপ্তকে ফোন করতে যান তখন রানিমার ঘরে মূর্ছিতা রানিমার কাছে কে ছিলেন?

নন্দরানি বললেন—বলেছি তো স্যার! বউদিরানি ছিলেন।

কর্নেল বললেন—মিসেস অরুণিমা সিংহ! আপনিই দীর্ঘকালের আক্রোশের বশে—বিশেষ করে রানিমার উইলে মাত্র এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির অর্ধেক আপনার স্বামীর প্রাপ্য তা জানার পর রানিমাকে হত্যার চক্রান্ত করেছিলেন। আপনার স্বামীর বন্ধু রঘুবীর আচারিয়ার স্ত্রী ন্যান্সি অর্থাৎ মার্কিন মেমসায়েবের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ এবং বন্ধুতার পর এই সাংঘাতিক মরণাস্ত্র হাতে পেয়েছিলেন। এই সছিদ্র কালো রবারের প্যাকেটে মরণাস্ত্রের সঙ্গে মেমসায়েব ভজুয়ার হাত দিয়ে আপনাকে তিনটে বিষাক্ত প্রজাপতিও পাঠিয়েছিলেন। রানিমা ঘর বন্ধ করে উপরের ঠাকুরঘরে গেলে আপনিই জানালা দিয়ে প্রজাপতিগুলোকে ফেলে দিয়েছিলেন। তারপর কী ঘটেছিল, আমরা নন্দরানির মুখে শুনেছি। হ্যাঁ—আপনিই রানিমার খুনি।

তীর্থব্রত উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কিছু বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলুম, সিঁড়ির উপর থেকে চারজন মহিলা দ্রুত নেমে আসছে। তারা অরুণিমার কাছে আসতেই একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে গেল। অরুণিমা তাঁর হাতের মুঠোয় লুকিয়ে রাখা একটা খুদে অ্যামপিউল-কাম সিরিঞ্জ তাঁর স্বামীর গলায় ঢুকিয়ে দিলেন। তীর্থব্রত সিংহ আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলেন। কর্নেল চেয়ারের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে অরুণিমাকে বাধা দেওয়ার আগেই অরুণিমা এবার আরেকটা খুদে অ্যামপিউল-কাম-সিরিঞ্জ নিজের গলায় ঢুকিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে কর্নেলের ওপর আছড়ে পড়লেন।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল। হলঘরে কোলাহল শুরু হল। মহিলা পুলিশ এবং কয়েকজন কনস্টেবল ও সি মিঃ প্রসাদের নির্দেশে ভিড় হটিয়ে স্বামী-স্ত্রীকে কার্পেটে শুইয়ে দিল। ডাঃ গুপ্ত উঠে গিয়ে দুজনকে পরীক্ষা করে বললেন—ডেড।

এরপর রানিমার উইল পড়ে শোনানোর অবস্থা ছিল না। কর্নেল হালদারমশাইকে ইঙ্গিত জানালেন, তাঁর মক্কেল সোহিনীকে নিয়ে যেন এখনি বেরিয়ে আসেন।

কর্নেল, ক্যাপ্টেন পাণ্ডে, ডাঃ অবনী গুপ্ত, পুলিশ সুপার মিঃ সিনহা, ও সি মিঃ প্রসাদ, এবং রানি সরোজিনী স্মৃতি সংঘের প্রেসিডেন্ট অরিন্দম রায়চৌধুরি সেদিনই রাত্রে বাঙালিটোলায় অরিন্দমবাবুর বাড়িতে বসে রানিমার সম্পত্তি রক্ষার জন্য একটা ট্রাস্টিবোর্ড গঠন করেছিলেন। রানিমার বেডরুম এবং ঠাকুরঘরের তালার চাবি কর্নেল ও সি মিঃ প্রসাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। পরদিন বৃহস্পতিবার সকালের ট্রেনে সোহিনী আমাদের সঙ্গে কলকাতা ফিরে এসেছিল।

শুক্রবার বিকেলে আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার অফিসে যখন এই ঘটনা লিখছি, তখন কর্নেলের ফোন এসেছিল। কর্নেল বলেছিলেন—জয়ন্ত রঘুবীর আচারিয়ার ঘরে রাজাসায়েবের সংরক্ষিত সেই ঐতিহাসিক দামি জিনিসটা পাওয়া গেছে। যেটা করনগড় রাজপরিবারের পূর্বপুরুষ কণ্ঠাকুরকে আকবরের সেনাপতি রাজা মানসিংহ উপহার দিয়েছিলেন।

জিজ্ঞেস করলুম—কিন্তু জিনিসটা কী তা-ই বলুন।

কর্নেল বললেন—সোনার খাপের মধ্যে ভরা একটা নিতান্ত ইস্পাতের ছোরা। কিন্তু ছোরাটার বাঁট আর খাপ নিরেট সোনার। তাতে অজস্র হিরে, মুক্তো, বৈদূর্যমণি ইত্যাদি নানারকমের মূল্যবান রত্ন বসানো আছে। রঘুবীর আচারিয়া স্বীকার করেছেন করনগড়ের তীর্থব্রত সিংহ তাঁর অনেক বছরের বন্ধু। একসময় করনগড়ে রঘুবীর আচারিয়ার একটা ট্রেডিং এজেন্সি ছিল। তীর্থব্রত তাঁর মামা 'রাজাসায়েব' প্রসন্নকুমার সিংহের ঘর থেকে চুরি করে ওই ঐতিহাসিক ছোরাটা রঘুবীর আচরিয়াকে বিক্রি করেছিলেন। দশ বছর আগের ঘটনা এটা। রঘুবীরের

এসব জিনিস কেনার বাতিক বরাবর ছিল। ছোরাটার বিনিময়ে তিনি তীর্থব্রতকে আড়াই লক্ষ টাকা দেন। সেই টাকায় তীর্থব্রত মেশিনপার্টস তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। তবে এটা তিনি রাজাসায়েবের মৃত্যুর পর করেন। টাকা তিনি করনগড়ের একটা ব্যাংকে ফিক্সড ডিপোজিট করে রেখেছিলেন স্ত্রীর নামে। সুদে-আসলে তার পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল প্রায় দ্বিগুণ। আর একটা কথা জয়ন্ত!

—বলুন।

—রানিমার মৃত্যুর আগের দিন অরুণিমা ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার টাকা তুলেছিলেন। সেই টাকাই নন্দরানি আর দুবেজির বিছানার তলায় রাখা ছিল। বাকি দশ হাজার টাকা ভজুয়ার মারফত ন্যান্সিকে পাঠিয়েছিলেন। অরুণিমা নিজেই একাজ করেছিলেন তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি। ওদিকে ভজুয়া পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে, অরুণিমা দশ হাজার টাকা মেমসায়েবকে পাঠিয়েছিলেন।

—কিন্তু কর্নেল, আমি বুঝতে পারিনি, রঘুবীর আচারিয়ার ঘরে মানসিংহের উপহার দেওয়া ছোরার খোঁজ কে দিয়েছিল পুলিশকে?

—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার ছাড়া আর কে দেবে?

—আপনি কী করে ওটার খোঁজ পেয়েছিলেন? আপনি তো রঘুবীর আচারিয়ার ঘরে একবারও ঢোকেননি!

কর্নেলের হাসি ভেসে এল! জয়ন্ত! নিউ আলিপুরের অভিষেক বসুকে ওই ছোরাটার ইতিহাস শুনিয়েছিলেন স্বয়ং রঘুবীর আচারিয়া। মিঃ বসু পরে আমাকে টেলিফোনে ঘটনাটা জানান। তারপর রানিমার ঘর থেকে ডায়ারি চুরি করে এনেছিলুম, তাতে ওই ছোরার ইতিহাস লেখা ছিল। তখনি আমি ও সি মিঃ প্রসাদকে ফোন করে খবর দিয়েছিলুম। ডায়ারিতে তীর্থব্রত আর অরুণিমার বিরুদ্ধে রানিমা অনেক অভিযোগ লিখে রেখেছিলেন।

—ডায়ারিটা কি দেখতে পাব?

—দুঃখিত জয়ন্ত! ওটা করনগড়ে পুলিশকে আমি দিয়ে এসেছি। বাই দ্য বাই, সোহিনী তোমাকে টেলিফোন করেনি?

—না তো!

—যে কোনো মুহূর্তেই করবে। প্রতীক্ষায় থাকো।

কর্নেলের লাইন কেটে গেল। কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে বসে রইলুম। হ্যাঁ—আমি সোহিনীর টেলিফোনের প্রতীক্ষায় অনন্তকাল বসে থাকতে রাজি।

রেনবো অর্কিড রহস্য

কর্নেলের জার্নাল থেকে

পঞ্চগড় নামে কোনও জনপদের কথা আমি হয়তো কস্মিনকালে জানতে পারতুম না, যদি না সেবার মার্চের শেষে কলকাতার হোটেল কন্টিনেন্টালে রাজকুমার সিংহ নামে এক রাজপুত রত্ন ব্যবসায়ী খুন হতেন। সত্যি বলতে কী, সেই খুনের ঘটনা ছিল জটিল রহস্যের অন্ধকারে ঢাকা এবং আমার জীবনের কয়েকটি মাইলস্টোনের মধ্যে মাত্র বারো ঘন্টায় এই হত্যা রহস্য উন্মোচন করে ফেলা একটি সেরা মাইলস্টোন। হ্যাঁ, এ নিয়ে আমার কিছু গর্ব আছে। আমি তো নিজেই অবাক হয়েছিলুম নিজের সেই কীর্তি দেখে। কিন্তু চিন্তা করা যায়? বারো ঘন্টা! মাত্র বারোঘন্টার মধ্যেই খুনীকে নির্ভুলভাবে শনাক্ত করা!

কিন্তু সে-ঘটনা ইনিয়ে বিনিয়ে আমার তরুণ সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী লিখে ফেলেছিল। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকাকে, সে আরও একধাপ উঁচুতে তুলেছিল। তার ফলে হ'ল কী, লন্ডনের গোয়েন্দা পুলিস সংস্থা প্রখ্যাত 'স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড' বিশ্বের অন্যতম সেরা ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে জয়ন্তকে তাদের কাজকর্মের নমুনা দেখাতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। তাছাড়া এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে সে ক্রাইম রিপোর্টিং প্রশক্ষিণ শিবিরেও যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়েছিল।

জয়ন্ত লন্ডন চলে যাওয়ার পর আমি পঞ্চগড় ভ্রমণের কথা ভাবছিলুম। শুনেছিলুম, বিহারের সিংভূম জেলায় পাহাড় আর অরণ্যের মধ্যে কৈলি নদীর তীরে পঞ্চগড় নাকি প্রকৃতির এক অসামান্য সৌন্দর্যভূমি। কিন্তু আমার অভ্যাস, কোনো অজানা জায়গায় যাওয়ার আগে সেখানকার খুঁটিনাটি তথ্য জেনে নেওয়া। তাছাড়া এ যাবৎকাল অনেক অপরাধীকে ধরিয়ে দিয়ে তাদের শত্রু করে ফেলেছি নিজেকে। তারা জেলে জীবন কাটালেও তাদের আত্মীয়-স্বজন-অনুচররা তো থাকতেই পারে, যারা এই টেকোমাথা দাড়িওয়ালা বুড়ো লোকটির প্রতি ক্রুদ্ধ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ। তাই যেখানে যাই, সেখানকার পুলিশ-প্রশাসনের উঁচুমহলকে আগে-ভাগে টেলিফোনে খবর দিয়েই যাই : আমি যাচ্ছি। দেখ বাপু, এ বুড়ো যেন কোনো বিপদে পড়ে না। হ্যাঁ, আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। সামরিক জীবনের অসংখ্য শিক্ষা এখনও আমি ভুলিনি। তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, জঙ্গল-যুদ্ধে অর্থাৎ 'গেরিলা ওয়ারফেয়ার'-এর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমার যেন একটা বাড়তি ইন্দ্রিয় গজিয়েছিল তা এখনও টিকে আছে। জঙ্গলের মধ্যে কোনো

শব্দ শুনতে পেলে শব্দটা কীসের কোথায় এবং কতটা দূরত্বে হয়েছে, এখনও আমি তা টের পাই। সবচেয়ে আশ্চর্য, আমার 'ইনট্যুইশন'। কতবার এই ইনট্যুইশন আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে!

কিন্তু না। নিজের সম্পর্কে বড় বেশি বড়াই করে ফেললুম। এবার আসল কথায় আসছি।

এপ্রিলের মাঝামাঝি জয়ন্ত লন্ডনে চলে যাওয়ার কয়েকদিন পরে হোটেল এশিয়ায় প্রকৃতি ও পরিবেশের সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলুম। দেশের প্রকৃতি-পরিবেশ বিজ্ঞানীরা ভালোই জানেন, মূলত কর্নেল নীলাদ্রি সরকার একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী, যাঁর প্রকৃত বাতিক বিরল প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, অর্কিড, ক্যাকটাস এইসব বিষয়ে। তাঁরা এ-ও জানেন, ওই বাতিকের বশে কোথাও গিয়ে কেমন যেন অনিবার্যভাবে আমি কোনো রহস্য-জটিল অপরাধের মুখোমুখি পড়ে যাই এবং তখন সেই রহস্যের জট খোলার জন্য প্রায় পাগল হয়ে পড়ি।

তো সেই সম্মেলনে ডঃ সুরজপ্রসাদ মিশ্র নামে একজন অর্নিথোলজিস্ট অর্থাৎ পক্ষীতত্ত্ববিশারদের সঙ্গে পরিচয় এবং ক্রমে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেল। আর ঘটনাচক্রে তাঁর বাসস্থান সেই পঞ্চগড়। তিনি তাঁর পরিচিত রাজপুত রত্ন ব্যবসায়ী রাজকুমার সিংহের খুনের ঘটনা ততদিনে জানতে পেরেছিলেন এবং আমার ভূমিকাও কিছুটা শুনেছিলেন। এর ফলেই আমি তাঁর চোখে যেন একটি দামী জিনিস হয়ে উঠেছিলুম। সম্মেলন শেষ হওয়ার পর তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু প্রস্তুতির জন্য কয়েকটা দিন সময় আমাকে নিতে হয়েছিল।

শুধু অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল হওয়ার জন্য নয়। কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোর সুনজরে থাকার দরুন আমি বিনি পয়সায় ট্রেনের ফার্স্টক্লাসে আরামে-আপ্যায়নে যাত্রার সুবিধাভোগী। রাত ন'টা পঁয়ত্রিশে হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেন ছেড়েছিল। তারিখটা ছিল উনিশে এপ্রিল। যে ক্যুপে আমি লোয়ার বার্থ পেয়েছিলুম, সেই ক্যুপে একজন যুবক ও দু'জন যুবতী যাত্রী ছিল। একটু পরে বুঝতে পেরেছিলুম, পাশের ক্যুপে আরেকজন যুবক তাদের সহযাত্রী। সে এসে এদের সঙ্গে গল্প করছিল। তারা বাঙালি এবং কলকাতাবাসী, তা-ও টের পেতে দেরি হয়নি। চেহারা, ব্যক্তিত্ব আর পোশাক-আশাকে তাদের বিত্তবান পরিবারের সন্তান মনে হয়েছিল। এ-ও বুঝতে পারছিলুম, তারা যুগল দম্পতি নয়। এই যুবতীদের সিঁথিতে সিঁদুর দেখার আশা করিনি। কারণ দুজনেই জিনস এবং হাতকাটা পুরু রঙিন আঁটোসাঁটো গেঞ্জি পরেছিল। যুবক দুটিও জিনস এবং টিশার্টে সজ্জিত। তারা বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলছিল। মাঝেমাঝে হেসে উঠছিল। এটাই অবশ্য যৌবনের ধর্ম।

আমি জানালার পাশে বসে একটা সচিত্র অর্কিডের বইয়ের পাতায় চোখ

রেখেছিলুম। টুপিটা তখনও খুলিনি। ওদের আলোচ্য বিষয় ছিল ওদেরই চেনাজানা কিছু মানুষ, পুরুষ এবং নারী। মাঝেমাঝে ওদের কথাবার্তায় অশালীনভাবে যৌনতার প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছিল। তখন মনে হচ্ছিল, রেলদফতর আমার স্থান নির্বাচনে ভুল করেছেন। কিন্তু না। আমি একালের যুবক-যুবতীদের মেলামেশায় কোনো দোষ ধরি না। বরং এর পক্ষপাতী। কিন্তু এত বেশি নয়। শালীনতার মাত্রাটা রাত দশটার পর ছাড়িয়ে গেল, যখন পাশের ক্যুপের যুবকটি এক যুবতীকে বলল—সুইট হানি বল্লরী! উইল ইউ প্লিজ কিস মি অন মাই লিপ?

যুবতীটি অর্থাৎ বল্লরী তার ঠোঁট দুই আঙুলে কামড়ে ধরে বলল—ইন্দ্রনীল! ডোন্ট বিহেভ লাইক আ ডার্টি ডগ।

ইন্দ্রনীল নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল—আমাকে ডগ বললে তো? দেখবে এবার পাগলা কুকুর হয়ে কামড়ে দেব। তারপর সে বেরিয়ে গেল।

বল্লরী আমার উপরের বার্থে উঠে গেল। অন্য যুবতীটি বলল—সৌর! তোমার বন্ধুটি বড্ড বাড়াবাড়ি করছে। আফটার অল, এটা আমাদের বেডরুম নয়। একজন বিদেশি বৃদ্ধ ভদ্রলোক আছেন। উনি কী ভাবছেন বলো তো!

উপর থেকে বল্লরী বলল—আমার আর ইন্দ্রনীলের ব্যাপারে তোমরা কোনো কথা বলবে না সুদক্ষিণা!

সুদক্ষিণা বলল—দেখ বল্লরী, এটা য়ুরোপ-অ্যামেরিকা নয়। ইন্ডিয়া। সৌর বলল—নাও। এই শুরু হ'ল 'মেরা ভারত মহান।' তুমি ভুলে যেও না, এদেশেই খাজুরাহো আছে। বাৎসায়নের কামসূত্র আছে। অন্য দেশের তুলনায় আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেক্সকে এসেন্স অব লাইফ মনে করতেন।

সুদক্ষিণা বলল—বাজে কথা বোলো না। ট্রেন কখন পৌঁছবে যেন? —ভোর সাড়ে পাঁচটায়।

বল্লরী বলল—আচ্ছা সৌর, পঞ্চগড় মানে তো পাঁচটা গড়। দ্যাট মিনস ফাইভ কোর্টস! হু বিল্ট দোজ কোর্টস?

সৌর মুচকি হেসে বলল—ইন্দ্রনীল রায়ের পূর্বপুরুষ! রিয়্যালি! ওর চেহারা দেখেও কি টের পাও না কিছু? রাজপুত ওরিজিন। আর ওই স্বাস্থ্য। আর সৌন্দর্য! আর মানসিক শক্তি! তাই না সে তোমার কাছে—

বল্লরী বলল—দ্যাটস এনাফ। স্টপ ইট।

সুদক্ষিণা ফিসফিস করে সৌরের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল—বিদেশি পর্যটক বুড়োকে দেখে কী মনে হচ্ছে বলব? ফাদার ক্রিসমাস!

আমার কানের শক্তির কথা আগেই বলেছি। সুদক্ষিণার কথা শোনার পর আমি আর চুপ করে থাকতে পারলুম না। বইটা বুজিয়ে রেখে বললুম—হ্যাঁ। ফাদার ক্রিসমাস বড় দেরি করে এসেছে এবং ভুল করে তাজা উজ্জ্বল খোলামেলা যৌবনের মধ্যে এসে পড়েছে। অথচ সে শিশুদেরই বেশি ভালবাসে।

তখনই ওরা কয়েক সেকেন্ডের জন্য হতবাক হয়ে পড়ল। উপর থেকে বল্লরী বলল সৌর! ইন্দ্রনীলকে ডেকে আন। তখন থেকে ওকে চিমটি কেটে সতর্ক করছিলুম। কিন্তু সায়েবদের দেশে এ ধরনের খোলামেলা আর খোলাখুলি কথাবার্তা স্বাভাবিক বলছিল সে। একবার আমেরিকা ঘুরে এসেই তার বিশ্বদর্শন হয়ে গেছে। সুদক্ষিণা বলল—এ কী বল্লরী! তুমি ইংরেজি কথা ছাড়লে কেন? বল্লরী বলল—আমার খুশি!

সৌর বলল—এই রে! ভদ্রলোককে সায়েব ভেবে বল্লরী ইংরেজি বলে ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছিল। কী যেন বলে একে? শো বিজনেস! ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স থেকেই বাঙালিরা এমনটি করে।

সুদক্ষিণা আমার দিকে ঘুরে বসল। বলল—আপনি সত্যিই বাঙালি? বললুম—সন্দেহের কারণ?

—আমাদের কলেজে একজন ফ্রেঞ্চ ফাদার পড়াতেন। তিনি যে কোনো বাঙালির মত বাংলা বলতে পারতেন।

আমি বুকপকেট থেকে একটা নেমকার্ড ওকে দিলুম। সুদক্ষিণা পড়তে থাকল—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। নেচারোলজিস্ট! কী আশ্চর্য! প্লিজ কর্নেল সরকার! আপনি বর্ষীয়ান মানুষ, আপনার সামনে আমরা বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি।

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম—যৌবন যৌবনের ধর্ম পালন করবে। যদিও প্রায় তরুণ বয়স থেকে আমার জীবন পাহাড় জঙ্গল মরুভূমিতে যুদ্ধ করে কেটেছে, আমি একজন অ্যাডভেঞ্চারারও বটে, কিন্তু যৌবনের বাচালতা আমার স্মৃতি থেকে মুছে যায়নি। হ্যাঁ সুদক্ষিণা, আমি উপভোগ করেছি!

এভাবেই হাওড়া-রাঁচি-হাতিয়া এক্সপ্রেস ট্রেনে যেতে যেতে আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সুদক্ষিণা সেন, বল্লরী দাশগুপ্ত, সৌরজ্যোতি সিংহ এবং তারপর ইন্দ্রনীল রায়ের। ওরা চার বন্ধু বেড়াতে যাচ্ছে পঞ্চগড়। পঞ্চগড়ে ইন্দ্রনীলের ঠাকুরদার একটা বাড়ি আছে। ওদের পূর্বপুরুষ নাকি পঞ্চগড় জায়গির পেয়েছিল মোগল বাদশাহ আকবরের কাছে। তারপর সব উবে গেছে। এখন শুধু ওই হাভেলিবাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। বাড়ির একজন কেয়ারটেকার আছে। তার নাম ঝাব্বুলাল। সে সপরিবারে সেখানে বাস করে। ইন্দ্রনীলের বাবার এক বন্ধু ওখানে আছেন। তিনি বাঙালি। তাঁর নাম ডাক্তার শচীন্দ্র অধিকারী। আগে হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। এখন ঘরে বসে ডাক্তারি করেন। তিনিই গাড়ি নিয়ে স্টেশনে আসবেন এবং চারজনকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবেন।

আমি সেখানকার আতিথ্যে থাকব, তাদের জানিয়ে দিয়েছিলুম। ওরা কেউ ডঃ সুরজপ্রসাদ মিশ্রকে চেনে না। তাঁর নামও শোনেনি, যদিও কয়েকবার তারা দলবেঁধে পঞ্চগড়ে বেড়াতে গেছে।

কথায়-কথায় জানতে পেরেছিলুম, ইন্দ্রনীল একটা ব্যবসা-সংস্থার মালিক। সৌরজ্যোতি একটা কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত। বল্লরী একটা ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। আর সুদক্ষিণা একটা বিজ্ঞাপন সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। এই সংস্থার তৈরি বিশাল সব সচিত্র বিজ্ঞাপন কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আকাশ দখল করে শোভা বাড়ায়। সে যাই হোক, বাইরের জগতে পা দিলেই বিশেষত যুবক-যুবতীরা প্রকৃতির মত স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, তা সত্য। প্রতি ক্যুপে দুটো করে বার্থ। বল্লরী আমার উপরের বার্থে শুয়ে ছিল। সুদক্ষিণা আমার উল্টোদিকে লোয়ার বার্থে এবং সৌরজ্যোতি তার উপরের বার্থে শুয়েছিল।

আলো নিভিয়ে দিয়েছিল ওরা। ক্যুপের দরজাও বন্ধ করে দিয়েছিল। একবার আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। তখন দেখেছিলুম, বল্লরী বাইরে থেকে নিঃশব্দে ঢুকে দরজা আটকে আমার উপরের বার্থে উঠল। হয়তো বাথরুমে গিয়েছিল। আর একবার ঘুম ভেঙে দেখেছিলুম, সৌরজ্যোতি বাইরে থেকে ঢুকল এবং সুদক্ষিণাকে একটু খুঁচিয়ে দিয়ে উপরে উঠে গেল। সুদক্ষিণা ঘুমের ঘোরে বলল—উঃ! কী হচ্ছে?

কিন্তু তৃতীয়বার আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল কী একটা শব্দে। চোখ খুলে দেখলুম, সৌরজ্যোতি আমার উপরের বার্থ থেকে নেমে দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। একটু পরে বল্লরীও নেমে বাইরে গেল। আমার রুচিবোধে আঘাত লাগার পক্ষে এই ধারণাটা যথেষ্ট যে, আমার উপরের বার্থে সৌর আর বল্লরী একত্র হয়েছিল। ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকলুম। পাশের লোয়ার বার্থে সুদক্ষিণা বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। সুদক্ষিণা বলেছিল—এই দেশটা ভারত। সেই কথাটা মনে পড়ে গেল। একবার আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো থেকে গ্রে হাউন্ড বাসে লস অ্যাঞ্জেলসে যাওয়ার পথে রাত্রিবেলা আমার ডানদিকের দুটি সিটে এক মার্কিন যুবক আর এক মার্কিন যুবতীকে নিঃসঙ্কোচে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলুম। আমার পাশের সিটে বসে এক হিপ্পানি প্রৌঢ় দিব্যি সেই জান্তব ক্রিয়া উপভোগ করছিলেন। সুদক্ষিণার কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। এই দেশটা ভারত।

তারপরই মনে পড়ল সৌরজ্যোতির কথা। 'আমাদের পূর্বপুরুষেরা সেক্সকে এসেন্স অব লাইফ মনে করতেন।' কিন্তু সে তো অতীতের কথা। তাছাড়া সেই কামচর্চা ছিল ধর্ম ও শিল্পের ব্যাপার। কিন্তু এই নতুন প্রজন্ম কি ধর্ম ও শিল্পের খোসা ছাড়িয়ে কদর্য বাস্তবকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে চাইছে? নাঃ! একটা শ্বেতকায় জাতির জীবনযাত্রার একটা বিকৃত অংশের অনুকরণ ছাড়া কিছু নয়।

মনটা তেতো হয়ে গেল। ঘড়ি দেখলুম। রাত তিনটে চল্লিশ। চোখ বুজে ঘুমোতে চেষ্টা করলুম। সামরিক জীবনে আমি জঙ্গলে গাছের ডালে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারতুম। কিন্তু এ রাতের ট্রেন জার্নিতে চওড়া বার্থে শুয়ে আর

ঘুম এল না। চোখ বুজে শুয়ে থাকলুম। একটু পরে বল্লরী ও সৌরজ্যোতি ফিরে এসে যে যার বার্থে শুয়ে পড়ল।.....

স্টেশনের প্লাটফর্মে গেটের কাছে আমার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ডঃ সুরজপ্রসাদ মিশ্র। চার যুবক-যুবতী ব্যাগেজ গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর আমি বেরিয়েছিলুম। যাত্রীদের ভিড়ে তারা মিশে গিয়েছিল। ডাঃ মিশ্র আমাকে দূর থেকেই দেখতে পেয়ে হাত নাড়ছিলেন। আমার ব্যাগটা ওজনদার। কারণ তার মধ্যে ফোটো ডেভালাপ করার প্রিন্টের সরঞ্জাম আছে। সেটা তিনি আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে তাঁর গাড়ির ব্যাকসিটে ঢোকালেন। আমার পিঠে আঁটা কিটব্যাগ খোলার দরকার ছিল না। গলায় ঝোলানো ক্যামেরা আর বাইনোকুলার পেটের কাছে আটকে থাকল। ডঃ মিশ্র গাড়ি স্টার্ট দিয়ে স্টেশন চত্বর থেকে পিচে ঢাকা সংকীর্ণ রাস্তায় পৌঁছুলে নেহাত কৌতূহলে সেই দলটিকে খুঁজছিলুম। দেখলুম, তাদের নিয়ে একটা সাদা গাড়ি আমাদের পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল। তারা আমাকে লক্ষ্য করেনি। করলে হয়তো ভব্যতা বশে অন্তত হাত নাড়ত কেউ।

ডঃ মিশ্রকে জিজ্ঞেস করলুম—পঞ্চগড়ের বাঙালি ডাক্তার শচীন অধিকারীকে কি আপনি চেনেন?

ডঃ মিশ্র বললেন—হ্যাঁ। ওই সাদা গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন শচীনবাবু। স্টেশনে দেখা হয়েছে। আপনি কি ওঁকে চেনেন?

বললুম—না নাম শুনেছিলুম।

—ডাক্তারবাবু বলছিলেন, কলকাতা থেকে তাঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিরা আসবে।

ভাগ্নে-ভাগ্নি শুনে হাসি পেল। কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে গেলুম—পঞ্চগড়ের রাজা ছিলেন নাকি এক বাঙালি। আপনি এ বিষয়ে কিছু জানেন? ডঃ মিশ্র একটু হেসে বললেন—সঠিক ইতিহাস জানি না। তবে শোনা কথা। মোগল আমলে এক রাজপুত সেনানী বাঙালি মেয়ে বিয়ে করে জাতিচ্যুত হয়েছিলেন। তিনি বাংলা মুলুকে বাস করতেন। পরে মোগল বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহকে পাঠানদের সঙ্গে যুদ্ধে সাহায্য করে ওই অঞ্চলে জায়গির পান। তাঁর বংশধররা শুনেছি বাঙালি হয়ে যান। প্রবাদটি নিশ্চয় জানেন? 'এক রাজপুতের বারোটি হাঁটি।' বাঙালি না হয়ে উপায় ছিল না।

—তাঁদের বংশধর নিশ্চয় আছেন?

—ছিলেন। তাঁকে আমি দেখিনি। বেণীমাধব রায় তাঁর নাম। তাঁর ছেলে প্রদীপ্ত নারায়ণ রায় কলকাতায় চলে যান। শুধু ওদের বাড়িটা বাঙালিটোলায় আছে। লোকে বলে, 'বাঙালি হাভেলি।' ইংরেজদের কুঠিবাড়ি আর মোগল স্থাপত্যের জগাখিচুড়ি বলা যায়। একজন কেয়ারটেকার ফ্যামিলি নিয়ে সেখানে থাকে। কেউ বেড়াতে এলে ভাড়া দিয়ে গোপনে দু'চার পয়সা রোজগার করে। কখনও-সখনও

প্রদীপ্তবাবুর ছেলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে ফুর্তি করতে আসে। আমি তাকে চিনি না। কেয়ারটেকার ঝাব্বুলালের মুখে শুনেছি। তবে—

ডঃ মিশ্র হঠাৎ চুপ করলে বললুম—তবে কী?

ডঃ মিশ্র হেসে উঠলেন—বাড়িটা নাকি ভূতুড়ে বলে বদনাম আছে। ঝাব্বুলাল নিজেও তা বিশ্বাস করে। সে নাকি বহুবার রাত দুপুরে দেখেছে, একজন তাগড়াই চেহারার লোক ঘোড়া ছুটিয়ে এসে হাভেলিতে ঢোকে। ঘোড়াটা লনে দাঁড়িয়ে থাকে। একটু পরে সেই লোকটা বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চেপে চলে যায়।

—গেট নেই বাড়ির?

—গেট কবে ভেঙে পড়েছে। ঝাব্বুলাল কাঠের আগড় দিয়ে রেখেছে। ঘোড়সওয়ার ভূতের কাছে ওটা কোনো বাধাই নয়।

ডঃ মিশ্র হেসে উঠলেন। সংকীর্ণ পিচের রাস্তার দুধারে জঙ্গল। কোথাও রুক্ষ মাটির তরঙ্গায়িত বিস্তার। ইতস্তত জঙ্গলে ঢাকা টিলা পাহাড়। আর চোখে পড়ে উঁচু শৈলশিরা চারদিক ঘিরে ঘন নীল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝেমাঝে একটা করে আদিবাসীদের গ্রাম। প্রায় তিন কিলোমিটার পরে ডানদিকে একটা চওড়া নদী দেখতে পেলুম। নদীটা বালির চড়া আর পাথরের ভর্তি। ডঃ মিশ্র বললেন—এটা কৈলি নদী। বর্ষায় নদীর রূপ ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। আর ওই দেখুন!

নদীর ওপারে পশ্চিমে পঞ্চগড়ের ধ্বংসাবশেষ ঘিরে ঘন জঙ্গল। এই জঙ্গলেও নাকি ভূতের ডেরা।

বাইনোকুলারে ধ্বংসাবশেষ আর জঙ্গল দেখছিলুম। বললুম—ঘোড়সওয়ার ভূত কি?

—না! শুনলে অবাক হবেন, গড়ের জঙ্গলের ভূত সুন্দরী যুবতীর বেশে ঘুরে বেড়ায়। দিন দুপুরেও নাকি অনেকে দেখেছে।

একটু হেসে বললুম বাঃ! তা হলে তো ওখানে গিয়ে দৈবাৎ তার দেখা পেলে ক্যামেরায় ছবি তুলব।

—ভূতের ছবি নাকি ক্যামেরায় তোলা যায় না। ছবি ওঠে না। তবে আপনার পক্ষে একটা সুখবর দিতে পারি। ওই গড়ের জঙ্গলে বিরল প্রজাতির একরকম অর্কিড আছে, যার ফুলে রোদ পড়লে রামধনুর ছটা দেখা যায়।

চমকে উঠে এবং খুশি হয়ে বললুম—ডঃ মিশ্র! আপনি রেনবো অর্কিডের কথা বলছেন। এই এপ্রিলেই ওই দুষ্পাপ্য প্রজাতির অর্কিডের ফুল ফোটে।

—তা হলে আপনি রেনবো অর্কিড আর সুন্দরী যুবতী ভূতের ছবি তুলতে ওখানে যেতে পারেন।

—আপনি আমার সঙ্গী হবেন তো?

—হব। আমার অর্কিড দেখার ইচ্ছে না থাক, ভূত দেখার ইচ্ছে আছে। একা যেতে সাহস পাই না। এবার পূর্ব-পশ্চিমে একটা হাইওয়ে। হাইওয়ে পেরিয়ে

চড়াইয়ে উঠল ডঃ মিশ্রের গাড়ি। তারপর সামনে একটু নিচু জনপদ দেখতে পেলুম। ডঃ মিশ্র বললেন—সোজা উতরাইয়ে নেমে গেলে বাঙালিটোলা। আমরা যাব ডাইনে। ওই এলাকাটায় বিত্তবানদের বাংলো বা রিসর্ট প্রচুর। আমি তত বিত্তবান না হলেও এই এলাকায় একটা বাংলোবাড়ি করেছি। পৈতৃক বাড়িটা ছিল শহরের ভিতরে ঘিঞ্জি গলিতে। সেটা বিক্রি করে ফাঁকা জায়গায় এসে আরাম পেয়েছি।

ডঃ মিশ্রের বাংলোবাড়িটা উঁচু জায়গায় সুন্দর ছবি হয়ে আছে। বোঝা যাচ্ছিল, একটা অনতিউচ্চ টিলার মাথা ছাঁটাই করে ওটা তৈরি করা হয়েছে। সঙ্কীর্ণ একটা পিচ রাস্তা বাংলোর গেটের সামনে বাঁক নিয়ে উত্তরে গাছপালার ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেছে। হাফ প্যান্ট গেঞ্জি পরা একটা মধ্যবয়সী লোক গেট খুলে দিয়ে আমার উদ্দেশে কপালে হাত ঠেকাল। সুদৃশ্য ফুলবাগিচার মধ্যে দিয়ে নুড়ি বিছানো পথে এগিয়ে বারান্দার সামনে মিঃ মিশ্র গাড়ি দাঁড় করালেন। এক প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা বারান্দায় আমাকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন। ডঃ মিশ্র আলাপ করিয়ে দিলেন—রোমিলা! ইনিই সেই কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। কর্নেল সায়েব! নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন এই মহিলাটি কে?

বললুম—আপনার সহধর্মিণী মিসেস রোমিলা মিশ্র। আপনি বলেছিলেন, আপনার মিসেস এখানকার গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা। পরস্পর নমস্কার বিনিময় করলুম। তারপর ডঃ মিশ্র ডাকলেন—রামভকত! সায়েবের ব্যাগটা গেস্টরুমে রেখে এসো।

অর্ধবৃত্তাকার প্রশস্ত বারান্দায় বসলুম। মিসেস মিশ্র বললেন আপনার বিচিত্র কীর্তিকলাপ সম্পর্কে আমার স্বামীর কাছে শুনেছি তাই আপনার সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয়ের আগ্রহ আমার তীব্র ছিল। আমার সৌভাগ্য, আপনাকে সত্যিসত্যি মুখোমুখি পেলুম।

ডঃ মিশ্র বললেন—খুলেই বলি। আসলে কলকাতার প্রকৃতি-পরিবেশ সম্মেলনে হোটেল এশিয়ায় থাকার সময় ডঃ নরেন্দ্র গোস্বামী কর্নেল সায়েব সম্পর্কে অনেক রোমহর্ষক ঘটনার কথা আমাকে শুনিয়েছিলেন আমি ফিরে এসে সেগুলোই রোমিলাকে শুনিয়েছি।

বললুম—ডঃ গোস্বামী? ওঁর ওই এক অভ্যাস। তিলকে তাল করে ফেলেন।

রোমিলা একটু হেসে বললেন—শুনেছি, আপনি যেখানে যান, সেখানেও নাকি রহস্য আপনার পিছু ছাড়ে না? আশা করি, পঞ্চগড়ে আপনি পেছনে রহস্য নিয়েই এসেছেন!

একটু মজা করার জন্য বললুম—কথাটা হয়তো ঠিকই। আমার পেছনে দু'জন যুবক আর দু'জন যুবতীর রহস্য নিয়ে এসেছি।

পরিচারিকা মাথায় ঘোমটা দিয়ে ট্রেতে প্রচুর স্ন্যাকস আর কফির ট্রে এনে

টেবিলে রাখল। রোমিলা তাতে দেহাতি হিন্দিতে ন'টার মধ্যে ব্রেকফাস্ট রেডি রাখতে বললেন। মেয়েটি চলে গেল! তারপর ডঃ মিশ্র মিটিমিটি হেসে বললেন—পেছনে রহস্য মানে ডাক্তার অধিকারীর ভাগ্নে-ভাগ্নিরা। তাই না?

রোমিলা কৌতূহলী হয়ে বললেন—ব্যাপারটা একটু খুলে বল সুরজ।

—শুনলে না? কর্নেল সায়েব বললেন দু'জন যুবক আর দু'জন যুবতীর রহস্যই। স্টেশনে বাঙালিটোলার ডাক্তার শচীন অধিকারীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি বললেন, কলকাতা থেকে ওঁর ভাগ্নে-ভাগ্নিরা পঞ্চগড়ে বেড়াতে আসছে। কর্নেল সায়েব নিশ্চয় তাদের মধ্যে কোনো রহস্য খুঁজে পেয়েছেন। কী কর্নেল সায়েব?

কফিতে চুমুক দিতে দিতে ট্রেন জার্নির আড়ষ্টতা কেটে যাচ্ছিল। ডঃ মিশ্রের কথার জবাবে বললুম—এমনিতেই একালের যুবক-যুবতীদের আচরণ আমাদের মত প্রবীণদের কাছে রহস্যময়। কিন্তু এক্ষেত্রে রহস্যটা হল, ওরা মোটেও ডাক্তার অধিকারীর ভাগ্নে-ভাগ্নি নয়।

রোমিলা জিজ্ঞেস করলেন—আপনি কী করে জানলেন?

—আমরা ট্রেনের একই কামরায় এসেছি। ওদের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। ওদের মধ্যে একজনের নাম ইন্দ্রনীল রায়। ডঃ মিশ্রের মুখে 'বাঙালি হাভেলি'র প্রদীপ্ত নারায়ণ রায়ের নাম শুনেছি। ইন্দ্রনীল তাঁরই ছেলে। সে তার একজন বন্ধু আর দু'জন বান্ধবীকে নিয়ে নিজেদের বাড়িতেই বেড়াতে এসেছে। এই প্রথম আসা নয়, আগেও কয়েকবার সে এসেছে।

রোমিলা একটু হেসে বললেন—রহস্যটা কি এই যে, ডাক্তারবাবু কেন তাদের নিজের ভাগ্নে-ভাগ্নি বলছেন? কী সুরজ?

ডঃ মিশ্র বললেন—কর্নেল সায়েবকে জিজ্ঞেস কর উনি কী রহস্য টের পেয়েছেন!

বললুম—কিছু না। আমি মিসেস মিশ্রের সঙ্গে একটু কৌতুক করছিলুম। নিছক মজা করা।

রোমিলা বললেন—কিন্তু ডাক্তারবাবুই বা কেন ওঁদের ভাগ্নে-ভাগ্নি বলেছেন সুরজকে?

—সম্ভবত ডাক্তারবাবুকে ইন্দ্রনীল ডাক্তারমামা বলে। কোনো আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতেও পারে অবশ্য।

রোমিলা ঘুরে আঙুল তুলে উত্তর-পশ্চিম কোণে নিচু জায়গায় একটা পুরোনো ক্ষয়াটে বাড়ির উপরটা দেখিয়ে বললেন—ওই দেখুন 'বাঙালি-হাভেলি।' এখান থেকে বাড়িটা দেখা যায়।

বাইনোকুলারে বাড়িটা স্পষ্ট ধরা দিল। আমি উঁচুতে আছি বলে গাছপালার ফাঁকে নীচের সমতল ভূমিতে অনেকগুলো পুরোনো বাড়ি দেখতে পাচ্ছিলুম। কিছু

বাড়ি জরাজীর্ণ আর আগাছার জঙ্গলে ভরা। 'বাঙালি হাভেলি'র ছাদের উপর একঝাঁক বুনো পায়রা খেলা করছে। দোতলা বাড়ির মুখটা পশ্চিমে। তাই এখান থেকে বাড়িটার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের অংশ দেখা যাচ্ছে। বাইনোকুলার নামিয়ে চুরুট ধরালুম। ডঃ মিশ্র বললেন—ঘোড়সওয়ার ভূতটা দেখতে পেলেন নাকি?

—নাঃ! সে তো রাত্রে যাতায়াত করে।

রোমিলা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন। বাড়িটা ভুতুড়ে বলে বদনাম আছে। প্রদীপ্তবাবুর ছেলের সঙ্গে কর্নেল সায়েবের আলাপ হয়েছে। সেই সূত্রে ও বাড়িতে একরাত্রি সুরজকে সঙ্গে নিয়ে কাটিয়ে আসতে পারেন।

ডঃ মিশ্র বললেন—আপাতত ঘোড়সওয়ার ভূত নয়। আগে কর্নেল সায়েবের সঙ্গে পঞ্চগড়ের জঙ্গলে ঢুকে সেই সুন্দরী যুবতী ভূতকে দেখে আসতে চাই!

রোমিলা বললেন—দেখ! যেন তার প্রেমে পড়ো না, বাগে পেলে ঘাড় মটকে দেবে। গত বছরও একজনের লাশ পাওয়া গিয়েছিল না?

তার আগেও তো লাশ পাওয়া গিয়েছিল। আমার মনে হচ্ছে, দু'বছরে অন্তত তিনটে লাশ।

ডঃ মিশ্র নড়ে বসলেন—কী আশ্চর্য! কথাটা কর্নেল সায়েবকে বলতে ভুলে গেছি। পঞ্চগড়ের জঙ্গলে গত দু'বছরে চারটে না পাঁচটা লাশ পাওয়া গিয়েছিল।

জিজ্ঞেস করলুম—তারা সবাই কি স্থানীয় লোক?

—না। সবাই নয়। একজন স্থানীয় লোক। বাকি সবাই বাইরের থেকে বেড়াতে এসেছিল।

—স্থানীয় লোকটিকে চিনতেন?

—চিনতুম মানে, লোকটা ছিল পঞ্চগড় বাজারের এক ব্যবসায়ী। নামটা মনে নেই। বড় ব্যবসায়ী নয়। নেহাত চুনোপুঁটি বলা যায়। সে কেন পঞ্চগড়ের জঙ্গলে ঢুকেছিল, এটাই একটা রহস্য।

—লোকগুলোকে কি একইভাবে মারা হয়েছিল?

—হ্যাঁ। বুকে তিনটে ক্ষতচিহ্ন ছিল।

—প্রত্যেকের?

—হ্যাঁ। আমি অবশ্য সবগুলো লাশ দেখিনি। শুধু পঞ্চগড়ের রামেশ্বর রাওয়ের লাশটা দেখেছিলুম। কারণ সেদিন ওই জঙ্গলে একটা উড়ডাকের খোঁজ পেয়েছিলুম। ফেরার সময় দেখি, কয়েকজন আদিবাসী একটা গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে উত্তেজিতভাবে কথা বলছে। আমাকে তারা ডাকতেই দৌড়ে গেলুম। গিয়ে দেখি ভয়ঙ্কর দৃশ্য। বুকের উপর তিনটে ক্ষতচিহ্নে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। মুখ দেখেই চিনতে পেরেছিলুম রামেশ্বর রাওকে। প্রথমে ভেবেছিলুম, ভালুকের নখের আঘাত। পরে বুঝতে পেরেছিলুম, ত্রিশূলজাতীয় কোনো অস্ত্রের আঘাতে রামেশ্বর মারা পড়েছে।

—পোস্টমর্টেম রিপোর্টে কী বলা হয়েছিল জানেন?

—আমার এক আত্মীয়, তখন পুলিস অফিসার ছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছিলুম, ত্রিশূল নয়। বাঘনখ নামে একরকম সেকেলে অস্ত্র আছে, তারই আঘাতে রামেশ্বর মারা পড়েছে। কোনো শত্রু ওঁকে ফাঁদে ফেলে মেরেছে।

রোমিলা বললেন—চুপ করো। ওটা বাসি রহস্য। কর্নেল সায়েবকে রামেশ্বরের ভূতের পিছনে ছুটতে বোলো না।

বললুম—না! ছুটছি না। সুন্দরী ভূতের সঙ্গে রামেশ্বরের ভূত এবং আরও কয়েকজনের ভূতের বোঝাপড়া হয়ে গেছে এতদিনে। ডঃ মিশ্র বললেন—কর্নেলসায়েব অবশ্য পঞ্চগড়ের জঙ্গলে রেনবো অর্কিডের জন্য ছুটতে চান। আমি ওঁর সঙ্গী হবো বলে কথা দিয়েছি। ওঃ! রামেশ্বরের লাশ দেখার পর থেকে এ যাবৎ উডডাক পাখির খোঁজে একা ওদিকে পা বাড়াতে সাহস পাইনি।

বললুম—ডঃ মিশ্র মেয়েদের খবর রাখেন না। তাই মিসেস মিশ্রকে জিজ্ঞেস করি। গড়ের জঙ্গলে ওই সুন্দরীর ইহজীবনের কোনো হদিস কি আপনার জানা আছে?

রোমিলার মুখে যেন ছায়া ঘনিয়ে এলো। নাকি আমরই দেখার ভুল?

একটু চুপ করে থাকার পর তিনি বললেন—যখন বাজারের ওদিকে একটা ঘিঞ্জি গলির ধারে সুরজের পৈতৃক বাড়িতে থাকতুম, তখন হড্ডুলাল নামে একজন বুড়ো চাকর ছিল। তার কাছে শুনেছিলুম, কী একটা অদ্ভুত গল্প, এখন সবটা মনে নেই। শুধু যেটুকু মনে আছে, বলছি।

ডঃ মিশ্র সকৌতুকে তাঁর কাঁচা-পাকা গোঁফের দুই ডগা পর্যায়ক্রমে সূক্ষ্ম করতে থাকলেন। তাঁর চোখে হাসির উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। রোমিলা আস্তে আস্তে বললেন—বাঙালিটোলায় এক বিপত্নীক কবিরাজের একটিমাত্র মেয়ে ছিল। সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে। তার নামটা হড্ডুলাল বলেছিল। মনে পড়ছে না। রায়রাজাদের এক বংশধর তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কিন্তু কবিরাজ রাজি হননি। কারণ রায়-রাজারা জাতে দো-আঁশলা। লোকে এখনও তামাসা করে বলে 'আরে ছো ছো! বাঙালি রাজপুত!' তো কবিরাজ জাতিতে ব্রাহ্মণ। তারপর সেই রাজবংশধর লোকটি এক রাত্রে মেয়েটিকে বাড়ি থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যান। পরদিন সকালে মেয়েটির লাশ পাওয়া যায় গড়ের জঙ্গলে। তার বাবা শোকে দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে যান। হড্ডুলালের এ কথাটাও মনে আছে। অনেক বছর পরে গড়ের জঙ্গলে এক সাধু ঘুরে বেড়াতেন। হড্ডুলাল নাকি স্বচক্ষে দেখেছিল। সেই সাধু তারপর কোথায় চলে গেলেন বা তাঁর কী হ'ল, হড্ডুলাল জানত না।

ডঃ মিশ্র বললেন—হ্যাঁ। আইনস্টাইন বলেছেন, কাল চিরবর্তমান। কর্নেলসায়েব! উঠে পড়ুন। প্রাতঃকৃত্য করে পোশাক বদলে তাজা হয়ে নিন। আজ রোমিলা কলেজে যাচ্ছে না। আপনার সম্মানে একটা দিন ছুটিতে কাটাবে।

গেস্টরুমটা দক্ষিণ-পূর্ব কোণে। সেখানে গিয়ে চোখে পড়ল নীচে একটা বিস্তীর্ণ উপত্যকা। কোথাও সবুজ ঝোপঝাড়, কোথাও একলা একটি গাছ, কোথাও তরঙ্গায়িত নগ্ন প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা নানা আয়তনের কালো-কালো পাথর। তার ওধারে ঘন নীল উঁচু পাহাড়। ল্যান্ডস্কেপটা বাইনোকুলারে একবার দেখে নিলুম। উত্তর-পূর্ব আমার বাঁদিকে দূরে একটা বিস্তীর্ণ জলা দেখা যাচ্ছিল। ডঃ মিশ্রকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন—ওটা ধরমতাল। প্রাকৃতিক জলাধার। ওখানে ধর্মদেবের মন্দির আছে। থাকুন তো। একদিন ওখানে আমরা তিনজনে পিকনিক করতে যাব।.....

পাখিগুড়া পথে পঞ্চগড়ের জঙ্গলের দূরত্ব প্রায় এক কিলোমিটার। কিন্তু নাক বরাবর পায়ে হেঁটে সেখানে পৌঁছনোর বাধা আছে। ডঃ মিশ্র বলেছিলেন—শুকনো কৈলি নদী পেরিয়ে যাওয়া সোজা। কিন্তু ওপারে বিষাক্ত আলকুশির জঙ্গল আছে। তা ছাড়া কয়েকটা দুর্গম টিলা আর প্রকাণ্ড সব গ্রানাইট শিলাখণ্ডে ঢাকা জায়গা পেরোনো মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

তাই তাঁর গাড়িতে চেপে বেরিয়েছিলুম। তখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। রোমিলা দেবী বারবার আমাদের সাবধান করে দিয়েছিলেন। সুন্দরী ভূতিনী সম্পর্কে নয়, বিষধর সাপ সম্পর্কে। গড়ের জঙ্গলে নাকি সংঘাতিক সাপের ডেরা আছে। এই এপ্রিল মাসে তারা ক্ষুধার্ত হয়ে শিকারের খোঁজে গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়ে।

আমাদের দুজনের পায়েই হাঁটুঅব্দি পরা শক্ত চামড়ার হান্টিং বুটজুতো। ডঃ মিশ্র পক্ষীতত্ত্ববিদ। তাই তাঁর গলায় আমার মতই বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝুলছিল। গাড়ি সেই হাইওয়েতে গিয়ে পশ্চিমে ঘুরল। তারপর চড়াইয়ে উঠে দেখলুম আদিবাসীদের কয়েকটা দোকান। কাঠ বা বাঁশ খুঁটির উপর শালপাতার ছাউনি। চা, তেলেভাজা, শুকনো কাঠ বা লকড়ির পাঁজা ছাড়াও বুনো শুয়োরের মাংসের দোকান চোখে পড়ল। গাড়ি দাঁড় করিয়ে কয়েকজন যুবক সেখানে আড্ডা দিচ্ছে। কেউ-কেউ মাঠের বেঞ্চে বসে চায়ের লিকার খাচ্ছে ভেবেছিলুম। ডঃ মিশ্র মুচকি হেসে বলল—টাটকা মহুয়ার মদ খাচ্ছে ওরা।

সেখানে একটা দোকানের পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে আমরা নামলুম। ডঃ মিশ্রকে দেখে আদিবাসী এক দোকানি সেলাম দিয়ে ঝকমকে দাঁত বের করে হাসল। আমার কাছে সরল আদিবাসীদের এই হাসি বরাবর শিশুর মত অনাবিল ও নিষ্পাপ মনে হয়। লোকটি দেহাতি হিন্দিতে বলল—দুই সাহেব মনে হয় গড়ের জঙ্গলে পাখির ছবি তুলতে যাচ্ছেন।

ডঃ মিশ্র বললেন—ঠিক বলেছ ইমানুয়েল। দেখ, তোমার কাছে আমার গাড়ি রেখে যাচ্ছি। লক্ষ্য রাখবে।

সে বলল—আপনার গাড়িতে কেউ হাত দেয়, সাধ্য কি মিছিরসায়েব। তবে একটা কথা বলি। ওই জঙ্গলে খালি হাতে যাচ্ছেন কেন? বন্দুক কই আপনার?

ডঃ মিশ্র বললেন—বন্দুক নিইনি আজ। দুটো লাঠি কেটে নেব কোনো গাছের ডাল থেকে।

ইমানুয়েল নিঃশব্দে হেসে বলল—আমি মনে মনে প্রভু যিশুকে আপনাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব।

ফাঁকা জায়গায় রোদ তত প্রখর না হলেও আরামদায়ক নয়। হাঁটতে হাঁটতে বললুম—এই অঞ্চলে আদিবাসীরা কি খ্রিস্টান?

ডঃ মিশ্র বললেন—না। ইমানুয়েল ওই পাহাড়ের নীচের গ্রামে থাকে। ওই গ্রামের সবাই খ্রিস্টান। পঞ্চগড় শহরে একটা খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল আছে।

একটু পরে বাঁদিকে নেমে আমরা ঝোপঝাড় আর পাথরে ভর্তি একটা মাঠ পেরিয়ে গেলুম। আমরা সতর্কভাবে যতটা সম্ভব ফাঁকা জায়গা দিয়ে হাঁটছিলুম। একটু পরে বাঁদিকে শালবন আর ডানদিকে একটা টিলার মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ডঃ মিশ্র বাইনোকুলারে সম্ভবত পাখি দেখে নিলেন। এখানে পাখিদের তুমুল কলরব কানে আসছিল।

ডঃ মিশ্র বললেন—উডডাক এই দিকটায় বাসা বাঁধতে পছন্দ করে। শালের জঙ্গলের মধ্যে শ্যাওড়াজাতীয় একরকম গাছ আছে। স্থানীয় লোকেরা বলে সেড়ু গাছ। ছোটছোট পাতা আর অজস্র ডালপালায় গাছটার চেহারা দেখার মত। চলুন! আগে আপনাকে রেনবো অর্কিডের এলাকায় নিয়ে যাই।

—সেটা কি গড়ের জঙ্গলে?

—হ্যাঁ। কিছুটা দুর্গম জঙ্গল। দুর্গের ধ্বংসাবশেষ প্রায় এক বর্গকিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। কোথাও অসাবধানে পা ফেললে গভীর গর্তে পড়ার ভয় আছে।

টিলার নীচে একটা পায়ে চলা পথ দেখে জিজ্ঞেস করলুম—এ পথে লোকজন যাতায়াত করে মনে হচ্ছে!

—হ্যাঁ। গড়ের জঙ্গলে আদিবাসীরা লুকিয়ে কাঠ কাটতে বা শিকার করতে যায়। তাছাড়া এই বনেই সাহসী ট্যুরিস্টরাও গড়ের জঙ্গলে ঢোকে।

একটু এগিয়ে চোখে পড়ল একটা ধ্বংসস্তূপ। পাথরের বড়-বড় ইটও দেখতে পেলুম। ধ্বংসস্তূপ থেকে ঝোপঝাড় আর অজস্র গাছ গজিয়েছে। পায়ে চলা পথটা ছেড়ে ডঃ মিশ্র দক্ষিণে পা বাড়ালেন। পথটা পশ্চিমে চলে গেছে। কিছুক্ষণ পরে আমি বললুম—ডঃ মিশ্র! আমার কিটব্যাগে জঙ্গলকাটা অস্ত্র আছে! এভাবে লতাপাতা ঝোপের মধ্যে হাঁটলে শিগগির আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব।

পিঠের কিটব্যাগ থেকে সামরিক 'জঙ্গল-নাইফ' বের করলুম। ওজনদার ভোজালির মত গড়ন। এবার আমি সামনে এবং ডঃ মিশ্র পিছনে। সামরিক

জীবনের অভ্যাসে রাস্তা পরিষ্কার করতে করতে ঘাসে ঢাকা একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলুম। ডঃ মিশ্র বললেন—শর্টকাটে আসতে চেয়েছিলুম। ডানদিকে ওই যে উঁচু পাথরটা দেখছেন, ওটার উপর উঠে দাঁড়িয়ে রেনবো অর্কিডের খোঁজ করতে হবে। প্রকাণ্ড পাথরটা চৌকো। সম্ভবত কোনো তোরণের উপরকার ছাদ ছিল। দু'ধারে আরও চৌকো পাথর পড়ে থাকায় ওটার শীর্ষে উঠতে অসুবিধে হ'ল না। ডঃ মিশ্র নীচে দাঁড়িয়ে থাকলেন। আমি প্রথমে খালি চোখে, পরে বাইনোকুলারে ওপাশের ঘন জঙ্গল খুঁজেও রেনবো অর্কিডের দেখা পেলুম না।

ডঃ মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন—দেখতে পেলেন কি?

বললুম—আমারই দুর্ভাগ্য ডঃ মিশ্র।

—আপনি উত্তর-দক্ষিণ কোণের গাছগুলো লক্ষ্য করেছেন?

— এক মিনিট। বলে অমি এক বর্গমিটার পাথরের উপরে সাবধানে সেদিকে ঘুরে বসলুম। তারপর বাইনোকুলারে যা দেখলুম, তা রেনবো অর্কিড নয়। উঁচু গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে নগ্ন পাথরের একটু উঁচু চত্বরে বসে থাকা ইন্দ্রনীল-সুদক্ষিণা-বল্লরী। সৌরজ্যোতি তাদের একটু তফাতে দাঁড়িয়ে আছে। হাত নেড়ে যেন বক্তৃতা করছিল সে। ডঃ মিশ্র ব্যস্তভাবে বললেন—দেখতে পাচ্ছেন?

—পাচ্ছি। বলে পাথরটা থেকে সতর্কভাবে নেমে এলুম। —ডঃ মিশ্র! আপনি এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন। আমি রেনবো অর্কিডের ফুলগুলোর ছবি তুলে নিয়ে আসছি।

ডঃ মিশ্র একটু অবাক হলেন যেন — আমি সঙ্গে গেলে কি অসুবিধে হবে আপনার?

মোটেও না। অকারণ দুর্গম জঙ্গলে ঢোকার পরিশ্রম করে লাভ নেই। আপনি এখানে ততক্ষণ বিশ্রাম করুন। আমার দেরি হবে না। ডঃ মিশ্র একটা গাছের মোটা শেকড়ে বসে বললেন—ঠিক আছে। কিন্তু সাবধান! বুনো ভালুকের উৎপাত হয় এসময়। মহুয়ার ফল পেকে ওঠার গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ওরা চলে আসে। বাঁদিকে কয়েকটা মহুয়া গাছ আছে দেখলুম।

তাঁকে আশ্বস্ত করে আমি স্তূপটার ওধারে চলে গেলুম। তারপর কখনও গাছের বা ধ্বংসস্তূপের আড়ালে উঠে দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নিয়ে পা টিপে টিপে এগাতে থাকলুম। পাথরের চত্বরটার দূরত্ব বাইনোকুলারে দেখে যতটা ভেবেছিলুম, তারও বেশি। প্রায় মিনিট দশেক হাঁটার পর দু'পাশে দুটো ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে গিয়ে গুঁড়ি মেরে বসলুম। সামনে দুটো লতায় ঢাকা গুল্ম থাকায় দলটিকে দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছিল। কিন্তু ওদের কথাবার্তা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

পরক্ষণে মাথায় এল, এ আমি কী করছি? কেন করছি? আড়ি পেতে প্রেমিক-প্রেমিকাদের কথা শোনার মধ্যে মানসিক বিকার থাকে। এই বৃদ্ধ বয়সে সেই কদর্য মনোবিকারে কি আক্রান্ত হয়েছি আমি? এই চিন্তার সময় কানে এল সুদক্ষিণার

কথা—তোমরা এসব কাণ্ড করবে জানলে আমি কিছুতেই তোমাদের সঙ্গে আসতুম না! কোনো মানে হয়?

সৌরজ্যোতি বলল—কাণ্ডটা কী দেখলে তুমি? বোঝাপড়া করে নেওয়াটা কোনো ব্যাপারই নয়।

ইন্দ্রনীল বলল—সৌর! তুই কি আমার সঙ্গে ডুয়েল লড়তে চাস?

সৌরজ্যোতি বলল—ডুয়েল কীসের? নেচারের মধ্যে এসে কনফেশন। বল্লরী! তুমি বলো!

বল্লরী বলল—আমার কিছু বলার নেই।

সৌরজ্যোতি বলল—নিশ্চয় আছে। তুমি সত্য কথাটা কেন স্বীকার করছ না?

—কী সত্য কথা?

—ইন্দ্রনীল তোমার কাছে ঋণী। অথচ আমি জানি, তার সঙ্গে সারা জীবনটা এক শয্যায় কাটানো তোমার পক্ষে সম্ভব নয়।

ইন্দ্রনীল বলল—সৌর! আমার শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে বল্লরীকে আমি কল্পনাও করিনি। তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে। ভবিষ্যতেও না থাকার কারণ নেই।

সুদক্ষিণা বলল—তা হলে তো বোঝাপড়া হয়ে গেল। ইন্দ্রনীল আর বল্লরী কখনও স্বামী-স্ত্রী হবে না।

বল্লরী বলল—স্টপ ইট! আমার এসব ভাল লাগে না।

সৌরজ্যোতি বলল—বল্লরী! এখনও বলছি মুখ বুজে থেকো না। তুমি অতল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছ!

বল্লরী উঠে দাঁড়াল। তারপর পাথর থেকে লাফ দিয়ে নেমে হাঁটতে থাকল। সুদক্ষিণা দ্রুত নেমে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল। ইন্দ্রনীল উঠে দাড়িয়ে বলল—সৌর! আমার সন্দেহ হচ্ছে, বল্লরীকে তুই ব্ল্যাকমেল করতে পা বাড়িয়েছিস।

সৌরজ্যোতি হাসতে হাসতে বলল—শালুক চিনেছে গোপালঠাকুর! আয়! ওরা জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলবে।

ইন্দ্রনীল ক্ষোভের সঙ্গে বলল—তুই এভাবে এখানে একটা সিনক্রিয়েট করার জন্য এসেছিস, আমি বুঝতে পারিনি।

দু'জনে চত্বর থেকে নেমে হাঁটতে থাকল। এই সময় একটা ভূতুড়ে বাতাস ঢুকল যেন। গাছপালা ঝোপঝাড় লতাপাতায় অদ্ভুত শনশন শব্দ উঠল। চারপাশে আলোড়নের মধ্যে মনে হল, কী যেন ঘটতে চলেছে কোথাও। আমার ইনট্যুইশন?

ডঃ মিশ্রের কাছে গিয়ে বললুম—যে অর্কিডের ফুল দেখলুম, তা রেনবো নয়। চলুন! অন্য কোথাও খুঁজে দেখি।

ডঃ মিশ্র বললেন—আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বরং আজ থাক। রাতে লং ট্রেন জার্নির পর অন্তত একটা দিন বিশ্রাম নেওয়া উচিত। বরং আজ ফিরে চলুন। আদিবাসীদের মধ্যে আমার চেনাজানা লোক অনেক আছে। বিশেষ করে যারা

জঙ্গলে ঘোরে, তাদের কাউকে বলে রাখলে সঠিক রেনবো অর্কিডের কাছে নিয়ে যাবে। ঠিক ক্লান্তি নয়, কী এক আচ্ছন্নতা আমাকে পেয়ে বসেছিল। ইন্দ্রনীল-সৌরজ্যোতি-সুদক্ষিণা-বল্লরী এই চার যুবক-যুবতীর মধ্যে কী একটা গুরুতর সমস্যা আছে, এতে ভুল নেই। কিন্তু কি সেটা? সৌরজ্যোতি এবং বল্লরী সম্পর্কে আমার মনে ঘৃণা ভাবটা কিছুতেই যাচ্ছে না। আমারই ওপরের বার্থে সৌরজ্যোতি ও বল্লরী—ছিঃ! এটা যে আসলে আমার মত এক বৃদ্ধকে, প্রখ্যাত কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে চরমতম অপমান!

হাইওয়েতে পৌঁছে একবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে পঞ্চগড়ের জঙ্গলের দিকটা খুঁটিয়ে দেখলুম। ওদের দেখতে পেলুম। ওদের কথাগুলো মাথায় ঢুকে মাছির মত ভনভন করছিল। অর্থ বুঝে নিতে পারছিলুম না। ওদের মধ্যে কী একটা ঘটেছে। সেটা কী? সৌরজ্যোতি বলল, 'বল্লরী একটা অতল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে।' এর মানেই বা কী?

বাংলোয় ফেরার পর মিসেস মিশ্র একটু হেসে বললেন—কর্নেল সায়েব রেনবো অর্কিডের ফুল নিয়ে আসবেন ভেবেছিলুম। কোথায় সেই ফুল?

বললুম—আমার দুর্ভাগ্য মিসেস মিশ্র! রেনবো অর্কিড বা সুন্দরী ভূতিনী কিছুরই দর্শন পাইনি।

ডঃ মিশ্র বললেন—একটু সময় লাগবে। দুটোরই দেখা আমরা পেয়ে যাব। ওয়েট রোমিলা।

কোথাও নিছক বেড়াতে কিংবা বিশেষ উদ্দেশ্যে গিয়ে চুপচাপ একস্থানে বসে সময় কাটানো আমার ধাতে নেই। ডঃ মিশ্রের বাংলোতে গেস্টরুমের বারান্দায় বসে নীচের উপত্যকার বিচিত্র রূপদর্শন করে অবশ্যই আনন্দ পাচ্ছিলুম। কিন্তু বিকেল চারটেয় মিশ্র দম্পতির সঙ্গে কফি পানের পর বেরিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা তীব্র হয়ে উঠেছিল। কৈলি নদীর তীরে পাহাড়ি জনপদ দর্শনের কথা তুলতেই ডঃ মিশ্র উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন। রোমিলা দেবীরও আমাদের সঙ্গিনী হওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে শুনে তিনি সংযত হলেন। সন্ধ্যার পর এই পশ এলাকা নাকি নিরাপদ নয়। বাংলোটা একেবারে শেষপ্রান্তে এবং রামভকত রোগা মানুষ। একটা ডোবারম্যান কুকুর পুষেছিলেন ডঃ মিশ্র। কিন্তু কুকুরটা গত মাসে অজানা অসুখে মারা পড়ার পর ডঃ মিশ্র আর কুকুর কেনেননি। যদিও উঁচু পেডিগ্রির একটা কুকুরের খোঁজে তিনি আছেন। ডঃ মিশ্র রোমিলাকে বন্দুকটা লোড করে রাখার পরামর্শ দিয়ে বেরোলেন। রামভকতকেও সাবধান করে দিলেন। গাড়িতে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল, সৌন্দর্যের সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে থাকাটা মানুষকে অসুখী করে। কিন্তু মিশ্র দম্পতির মধ্যে ওই জিনিসটা দেখছিলুম না। তাঁদের একটি মাত্র সন্তান ঊর্মিলা দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে। প্রায়

প্রতিদিন রাত্রে সে বাবা মায়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে। গত রাতে রোমিলা মেয়েকে আমার সম্পর্কে জানিয়েছেন। উর্মিলা নাকি খুবই আগ্রহী। 'কর্নেল সায়েব'-কে দেখতে সে সুযোগ পেলেই চলে আসবে।

উতরাইয়ে নেমে গাড়ি উত্তরমুখী হল। রাস্তাটা মোটামুটি চওড়া আর মসৃণ। বাঁদিকে কৈলি নদীর তীরে গাছের সারি আর ঝোপঝাড়। নানা রঙের বুনো ফুল চোখে পড়ছিল। ডান দিকে উঁচু জমির উপর পাঁচিল ঘেরা নতুন বা পুরোনো বাড়ি। সমতলে গিয়ে ডঃ মিশ্র বললেন—এখান থেকে বাঙালিটোলা শুরু হল। ডাইনে লক্ষ্য করুন। একসময় বাঙালিটোলায় জমটমাট অবস্থা ছিল। দুর্গাপুজো কালীপুজোর ধুমধাম ছিল। প্রবীণদের মৃত্যুর পর নতুন প্রজন্ম এখানে বাস করতে চাইছে না।

বললুম—'বাঙালি হাভেলি' কোনটা?

ডঃ মিশ্র হাসলেন—আপনি নিজেই চিনে নিতে পারবেন।

—তা হলে চিনেছি। ওই বাড়িটা।

—ইচ্ছে করলে বলুন, ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে-ভাগ্নিদের সঙ্গে দেখা করবেন কি না।

—করব। চলুন তো!

ডঃ মিশ্র একটু এগিয়ে ডাইনে, একটুখানি চড়াই বেয়ে ওঠার পর 'বাঙালি রাজপুতে'র বাড়ির সামনের চত্বরে গাড়ি দাঁড় করালেন। গাড়ি থেকে নেমে দেখলুম, উঁচু বাউন্ডারিওয়ালে ঘেরা অনেকটা জায়গা নিয়ে দোতলা বাড়িটা মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। ভেঙেপড়া গেটে কাঠের আগড়। পাশে একতলা কয়েকটা ঘর। লনের দু'ধারে আগাছার জঙ্গল। লনের শেষে গাড়িবারান্দা। উপরে ও নীচে প্রকাণ্ড করিন্থিয়ান স্তম্ভের সারি। কিন্তু জানালাগুলোর ওপরে মোগল স্থাপত্যের ধাঁচে কারুকার্য করা অর্ধবৃত্তাকার খিলান। বাড়িটা দেখে কেন কে জানে একটু অস্বস্তি জাগল। নিষ্প্রাণ স্তব্ধ একটা পুরোনো বাড়ি যেন অজস্র চোখ দিয়ে আমাদের দেখছে। অবশ্য নির্জন পুরোনো বিশাল স্থাপত্যের সামনে দাঁড়ালে অনেকের মনে হয়.তো এমন একটা অস্বস্তি হয়।

ততক্ষণে ডঃ মিশ্রের ডাকে একটা পালোয়ান চেহারার মধ্যবয়সী লোক আগড় খুলে বেরিয়ে এসেছিল। তার মাথার চুল কাঁচাপাকা এবং মাঝখানে সিঁথি। দুই কানে রুপোর আংটা। গলায় একটা রুপোর চেন। বাঁ হাতের কব্জিতে তামার বালা। পরনে ফুলপ্যান্ট আর স্পোর্টিং গেঞ্জি। গোঁফটা মোটা এবং ঠোঁটের দু'ধার দিয়ে একটু নেমে এসেছে। চেহারা যা-ই হোক লোকটি বিনীত। সেলাম দিয়ে হিন্দিতে সে একটু হেসে বলল—মিছরিসায়েব কি এই হাভেলিতে পাখি দেখতে এলেন? তা স্যার, ছাদের উপর অনেক জংলি কবুতর আছে।

ডঃ মিশ্র বললেন—ঝাব্বুলাল! কলকাতা থেকে এই হাভেলির মালিকের ছেলে

এসেছে। সঙ্গে বন্ধু-বান্ধবী নিয়ে এসেছে। তারা কোথায়?

ঝাব্বুলাল বলল—হ্যাঁ স্যার। তবে ওঁরা হাভেলিতে বসে থাকার জন্য তো আসেন না। দু'বেলা কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ান। দুপুরে এসে খানাপিনা করে আবার কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন।

ডঃ মিশ্র আমাকে দেখিয়ে বললেন—ইনি কর্নেল সায়েব। কলকাতা থেকে তোমার মালিকের ছেলের সঙ্গে এসেছেন। তাদের সঙ্গে ট্রেনে আলাপ হয়েছিল। তাই কর্নেল সায়েব দেখা করতে এসেছেন।

ঝাব্বুলাল আমাকে সেলাম দিয়ে বলল—সন্ধ্যার আগেই বাবুসায়েবরা ফিরে আসবেন। আমি ওঁদের বলব কর্নেল সায়েবের কথা।

ডঃ মিশ্র বললেন—চলুন কর্নেল সায়েব! আপনাকে পুরোনো টাউন আর নতুন টাউন দেখিয়ে আনি। কৈলি নদীর উপর হাইওয়েতে একটা ব্রিজ দেখেছেন। দ্বিতীয় ব্রিজটা পেরিয়ে পশ্চিমে একটুখানি গেলে নতুন টাউন।

পা বাড়িয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালুম—আচ্ছা ঝাব্বুলাল এই বাড়ি সম্পর্কে একটা কথা শুনেছি। দুপুর রাতে নাকি কে ঘোড়ায় চেপে এই বাড়িতে ঢোকে। তারপর আবার চলে যায়। সত্যি?

ঝাব্বুলাল হাসল—না স্যার! লোকে মিথ্যা রটিয়েছে।

ডঃ মিশ্র বললেন—সে কী ঝাব্বুলাল! লোকে বলে, তোমার কাছেই ঘোড়সওয়ার ভূতের কথা তারা শুনেছে!

—মিছরিসায়েব! আমি তামাশা করে ভূতের গল্প বলি। সব মিথ্যা কথা। ঝাব্বুলাল মিঃ মিশ্রের কাছে এলো। চাপা স্বরে বলল—আপনি পঞ্চগড়ের সবচেয়ে খাঁটি মানুষ স্যার! কর্নেলসায়েব তো বাইরের লোক। উনি শুনলেও ক্ষতি নেই। ইন্দরবাবু এই হাভেলি বেচতে চান। আমার তাতে ক্ষতি হবে। মাসে মাত্র দুশো টাকা মাইনে পাই। আপনি নিশ্চয় জানেন মিছরিসায়েব, এই হাভেলি আমি বাইরের ট্যুরিস্টদের ভাড়া দিয়ে কিছু রোজগার করি। এখন ভূতুড়ে বাড়ির বদনাম রটেছে বলে কেউ এ বাড়ি কিনতে চায় না।

ডঃ মিশ্র একটু হেসে বললেন—এমন করে কতদিন বিক্রি আটকে রাখবে তুমি?

—যতদিন পারি। মিছরিসায়েব! আমি বেঁচে থাকতে এ বাড়ি বিক্রি হতে দেবো না।

—ঝাব্বুলাল! কর্নেলসায়েব কথাটা যদি ওঁর চেনা ইন্দুরবাবুর কানে তোলেন?

ঝাব্বুলালের চোখের চাউনি সহস্য বদলে গেল। আমার দিকে দৃষ্টি রেখে সে বলল—এই সায়েব ইন্দুরবাবুর কানে কথাটা তোলার আগে ওঁকে একটুখানি ইশারা দেবেন, এই ঝাব্বুলাল লোকটা কে আর কী তার পরিচয়।

আমি চুপ করে থাকলুম। ডঃ মিশ্র বললেন—না, না কর্নেল সায়েব ক'দিনের

জন্য বেড়াতে এসেছেন। উনি কাকেও এসব কথা বলবেন কেন? ঠিক আছে। চলি ঝাব্বুলাল!

গাড়িতে উঠে বললুম—লোকটা অদ্ভুত চরিত্রের!

ডঃ মিশ্র গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বললেন—আমিও খুব অবাক হয়েছি।

হঠাৎ ওর এসব কথা শুনে মনে হচ্ছে, প্রদীপ্তবাবুর ছেলে সম্ভবত বাড়িটা বিক্রি করার জন্যই এখানে এসেছে।

—লোকটা আপনার সামনে এসব কথা খুলে বলল। এর আগে কি আপনি এমন কোনো আভাস তার কথায় পেয়েছিলেন?

—না। তবে নিজের সম্পর্কে ও যা বলল, তা কিছুটা সত্যি। এলাকার দুর্বৃত্তদের সঙ্গে ওর গোপন সম্পর্কের কথা অনেকে জানে।

—লোকটার স্পর্ধা দেখে আমি চমকে উঠেছিলুম। আপনাকে প্রকারান্তরে যেন সে অপমান করল। এর কি কোনো কারণ আছে?

—না! আমার মনে হ'ল ঝাব্বুলাল মদ খেতে খেতে উঠে এসেছিল। ওর কথা শুনে আমি ধরেই নিয়েছিলুম, নেশার ঘোরে কথা বলছে। আপনার দৃষ্টি আমার চেয়ে তীক্ষ্ণ।

একটু হেসে বললুম—আমি এই প্রথম ওকে দেখলুম। বুঝতে পারিনি ও মদ খেয়েছে।

ডঃ মিশ্র জোর দিয়ে বলল—হ্যাঁ। নেশার ঘোরেই কথা বলছিল ঝাব্বুলাল। এ ছাড়া ওর আচরণের আর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। পুরোনো টাউনের রাস্তায় যানবাহন আর মানুষজনের ভিড় চোখে পড়ছিল। হর্ন দিলেও লোকেরা রাস্তা থেকে সরতে চায় না। ডঃ মিশ্র বললেন—এই জন্যই ওই পশ এলাকায় চলে গিয়েছিলুম। আর একটু পরেই অবশ্য ভিড় থাকবে না। নিউ টাউন প্ল্যান করে গড়া হয়েছে।

কৈলি নদীর ব্রিজ পেরিয়ে দেখলুম মসৃণ রাস্তার দু'ধারে অনেকটা জায়গা রেখে ছিমছাম দোকান-পাট গড়ে উঠেছে। সামনে অস্তগামী সূর্য দূরের পাহাড়ের চূড়াকে রক্তিম করেছে। কিছুদূর চলার পর দু'পাশে সুন্দর বাড়ি দেখতে পেলুম। লনে বর্ণাঢ্য ফুলবাগান। ডঃ মিশ্র বললেন—আমার এক বন্ধু ডঃ সুরেশ্বর শর্মার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। উনি পদার্থবিজ্ঞানী। কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু এখন হয়তো কলেজ থেকে ফিরে উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন! পরে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে আসা যাবে।

বলে উনি বাঁদিকে একটা রাস্তায় গাড়ি ঘোরালেন। এই ধরনের বেড়ানো আমার পছন্দ নয়। জিজ্ঞেস করলুম—এখন আমরা কোথায় যাচ্ছি?

ডঃ মিশ্র হাসলেন—এই রাস্তা দিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছব। তারপর হাইওয়ে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে বাড়ি ফেরার পথ ধরব। আপনাকে পঞ্চগড়ের একটা আইডিয়া

দিলুম আর কী। অর্থাৎ মোটামুটি টপোগ্র্যাফিক্যাল পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলুম। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছেন, কেন বাইরে থেকে লোকেরা পঞ্চপাড়ে বেড়াতে আসে? সায় দিলুম—হ্যাঁ। অসাধারণ বিউটি স্পট। পাহাড় জঙ্গল নদী আর ওই প্রাচীন ঐতিহাসিক দুর্গের ধ্বংসাবশেষে রহস্যময় পরিবেশ।

—শুধু বাকি রইল রেনবো অর্কিড। আশা করি কাল সকালে বেরিয়ে জায়গাটা খুঁজে বের করব।

হাইওয়ে থেকে বাঁদিকে উত্তরে পিচরাস্তায় গাড়ি ঘোরালেন ডঃ মিশ্র। সবে আলো জ্বলে উঠেছে তখন। এরপর ডাইনে পূর্বে বাঁক নিয়ে চড়াইয়ে ওঠার সময় নীচে বাঙালিটোলা হয়ে পুরোনো টাউনে যাওয়ার রাস্তায় হঠাৎ চোখে পড়ল, আমি যেহেতু গাড়ির বাঁদিকে বসে ছিলুম। ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি আর সুদক্ষিণা হন্তদন্ত হেঁটে চলেছে। বল্লরীকে দেখতে পেলুম না। হয়ত ওদের আগে আছে। গাছপালা আর বাড়ির ফাঁক দিয়ে মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওদের দেখেছি।

অবাক লাগল, ওরা পায়ে হেঁটে কোথায়-কোথায় ঘুরে বেড়ায়? ডাক্তারমামার গাড়িটা চাইলে নিশ্চয় ওরা পেয়ে যেত। পাহাড় জঙ্গল সম্পর্কে ওদের অভিজ্ঞতা কতটুকু, তা অবশ্য জানি না।

রোমিলা অর্ধবৃত্তাকার বারান্দায় বসে আমাদের প্রতীক্ষা করছিলেন।

ডঃ মিশ্র গ্যারাজে গাড়ি রাখতে গেলেন। রোমিলা বললেন—কতদূর ঘুরলেন আপনারা?

বললুম—অনেকদূর। আপনার হাতে লোডেড গান দেখব ভেবেছিলুম।

রোমিলা হাসলেন। আপনার বন্ধুর চেয়ে আমার সাহস বেশি। বসুন। কফির ব্যবস্থা করি।

বাইরে কোথাও গেলে আমার প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস আছে। ভোর পাঁচটায় উঠে বেরিয়ে পড়েছিলুম। রামভকতকে রাত্রেই বলা ছিল। তাই সে গেটের তালা খুলে দিয়েছিল। মিশ্র দম্পতি তখনও শয্যা ত্যাগ করেননি। অবশ্য ডঃ মিশ্র আমার সঙ্গী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভোরের ভ্রমণে আমি একলা বেরোতেই চাই। এ আমার দীর্ঘকালের অভ্যাস। তাই তাঁকে ডাকিনি।

বাংলোর পেছনে পূর্বের উপত্যকায় তখনও গাঢ় ধূসরতা। উঁচু জমি থেকে ঝোপজঙ্গলের ভিতর ঢালু জায়গা দিয়ে নীচে নেমে নগ্ন ঊষর প্রান্তরে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটছিলুম। কিছুদূর হেঁটে যাওয়ার পর একখানে আমাকে চমকে দিয়ে লালঘুঘুর একটা দল উড়ে গেল। ডঃ মিশ্র না বললেও বুঝতে পেরেছিলুম, এইসব নগ্ন প্রান্তরে ক্ষয়াখর্বুটে গুল্ম ও পাথরের টুকরো ওই বিরল প্রজাতির ঘুঘুদের বিচরণক্ষেত্র।

কিন্তু বরাবর দেখেছি, কোথাও আমার লালঘুঘুদের দর্শন পাওয়ার সঙ্গে হত্যাকাণ্ডের রহস্যের যোগসূত্র থেকে যায়। হয়তো এটা আমার নিছক কুসংস্কার। একটা আকস্মিক দৈবাৎ যোগাযোগ মাত্র।

কিন্তু আমার অস্বস্তি জেগে উঠল। সুন্দর এই উপত্যকায় রক্তাক্ত কোনো লাশের মুখোমুখি আমি হতে চাইনে। তাই ঘুরে পশ্চিমে এগিয়ে চললুম। একটা টিলার গায়ে আদিবাসীদের বসতি দেখা যাচ্ছিল। বসতিটা এড়িয়ে আমি শালবনের ভিতর দিয়ে হেঁটে একটা পিচরাস্তা দেখতে পেলুম। এই রাস্তা দিয়েই কাল ভোরে আমি স্টেশন থেকে ডঃ মিশ্রের গাড়িতে তাঁর বাংলোয় গিয়েছিলুম।

রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে কৈলি নদীর শুকনো খাতে একটা পাথরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিলুম। তারপর বালির চড়া পেরিয়ে গিয়ে দেখলুম, নদীর পশ্চিমপাড়ের নীচে এক ফালি স্বচ্ছ জলধারা দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে যাচ্ছে। জলটুকু ডিঙিয়ে পাড়ে উঠতেই পঞ্চগড়ের সেই ঐতিহাসিক ধ্বংসস্তূপ চোখে পড়ল। বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গলে কিছুক্ষণ দেখার পর ঠিক করলুম, সেখানে গিয়ে রেনবো অর্কিড খুঁজে বের করব।

তখন পূর্বের দিগন্তে উঁচু পাহাড়ের শীর্ষে সূর্যের লাল ছটা আকাশের গায়ে কয়েকখণ্ড মেঘকে রঙিন করেছে এবং চরাচরে সেই রক্তিম আভা ঈষৎ প্রতিফলিত হয়েছে। কোথাও তরঙ্গায়িত নগ্ন, প্রান্তর, কোথাও ঝোপঝাড় আর নিঃসঙ্গ কোথাও গাছের তলা দিয়ে নেশাগ্রস্তের মত হাঁটতে হাঁটতে গড়ের জঙ্গলে পৌঁছুলাম। ততক্ষণে কোমল রোদ স্পষ্ট করেছে নিসর্গকে! গড়ের জঙ্গলে পাখির কলরব চারপাশে। কিন্তু পাখি দেখার দিকে আমার মন নেই। ধ্বংসস্তূপের ভেতরে আঁকাবাঁকা পথে মাঝেমাঝে থমকে দাঁড়িয়ে পরজীবী রেনবো অর্কিড খুঁজছি। কখনও বাইনোকুলারে, কোথাও খালি চোখে। কিছুক্ষণ পরে দেখলুম, কালকের দেখা সেই পাথরের চতুষ্কোণ চত্বরের কাছে এসে পড়েছি।

চত্বরে উঠে চারদিকে দেখে নিয়ে পা বাড়ালুম, তারপর পশ্চিমপ্রান্তে গিয়েই থমকে দাঁড়ালুম। মাথার ভিতরে যেন একটা ঠাণ্ডাহিম ঢিল গড়িয়ে গেল। নিজের ভাগ্যকে অভিশাপ দিয়ে একলাফে নীচে নামলুম। একটা গভীর ও প্রশস্ত গর্তের মধ্যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি রক্তাক্ত লাশ। মেয়েরই লাশ। পরনে জিনসের প্যান্ট আর গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। মুখটা একপাশে কাত হয়ে আছে। মুখটা দেখেই চমকে উঠেছিলুম। গর্তে নেমে সাবধানে মুখটা সোজা করতেই চিনতে এক মুহূর্ত দেরি হল না। মেয়েটি বল্লরী দাশগুপ্ত!

তার নিস্পন্দ দেহটা চিত করে দেখে নিলুম, বুকের দু'পাশে আর গলার নীচে তিনটি ক্ষতচিহ্নে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। লাশটা যে অবস্থায় ছিল, তেমনই রেখে চত্বরের দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল চাপ-চাপ রক্তের চিহ্ন। বল্লরীকে চত্বরের কিনারায় ত্রিশূল বা বাঘনখ জাতীয় অস্ত্রে (ডঃ মিশ্র যেমনটি বলেছিলেন) হত্যা

করা হয়েছে। আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই সে ছিটকে এই গভীর গর্তে উপুড় হয়ে পড়েছে।

চত্বরে উঠে আবার সতর্কভাবে চারদিক দেখে নিয়ে আমি দক্ষিণে নেমে গেলুম। তারপর পূর্বে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে কালকের সেই যুগল ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে একটা পাথরে বসলুম। এতক্ষণে মনে পড়ল, গতকাল সন্ধ্যার সময় ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি ও সুদক্ষিণাকে খুব ব্যস্তভাবে বাঙালিটোলার রাস্তায় হেঁটে যেতে দেখেছিলুম। বল্লরীকে দেখতে পাইনি। তা হলে কি বল্লরী কোনো কারণে দলছাড়া হয়ে পড়েছিল এবং তাঁকে খুঁজে না পেয়ে বাকি তিনজন ফিরে যাচ্ছিল?

একটা কথা অবশ্য স্পষ্ট। গড়ের জঙ্গলে কোনো মাংসাশী প্রাণী নেই। আদিবাসীরা ক্রমশ তাদের শেষ করে ফেলেছে। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের পরোয়া এই এলাকায় তারা করে না। তাই বল্লরীর লাশে কোনো প্রাণী কামড় বসায়নি।

এরপর অনেক প্রশ্ন মাথায় এল। ইন্দ্রনীলরা কি পুলিশকে খবর দেয়নি যে তাদের এক সঙ্গিনী দলছাড়া হয়ে জঙ্গলে হারিয়ে গেছে? নাকি তারা ঘটনাটা একেবারে চেপে গিয়ে কলকাতা চলে গেছে? ট্রেনে আসবার সময় যা-যা দেখেছিলুম এবং কাল এখানে বসে ওদের যে-সব কথা শুনেছিলুম, তাতে স্পষ্ট বুঝেছিলুম, তাদের মধ্যে একটা সমস্যা আছে এবং তারা একটা বোঝাপড়া করতে চায়। বল্লরীর এই পরিণতি কি সেই সমস্যার সঙ্গে যুক্ত?

কিছুক্ষণ পরে মনে হল, আমি এখানে চুপচাপ বসে আছি কেন? কীসের প্রতীক্ষা করছি? কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের সামনে এ একটা স্পর্ধিত চ্যালেঞ্জ নয় কি?

তখনই উঠে দাঁড়ালুম। বোঝা যাচ্ছে, বল্লরীর মৃতদেহ সারারাত এখানে যখন কোনো প্রাণী ছোঁয়নি, তখন মৃতদেহ ফেলে চলে যাওয়া যায় এবং পুলিশকে ডিঃ মিশ্রের বাংলো থেকে ফোনে খবর দিতে কোনো অসুবিধে নেই।

তারপরই মাথায় এলো শকুনের কথা। রোদ আরও উজ্জ্বল হলে ফাঁকা জায়গায় গর্তে পড়ে থাকা লাশটা আকাশ থেকে শকুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যাবে না। একটু ভেবে নিয়ে আমার পিঠে আঁটা কিটব্যাগ থেকে জঙ্গল নাইফটা বের করলুম। তারপর চত্বরের পশ্চিমে গিয়ে অনেকগুলো ঝোপ কেটে ফেললুম।

ঝোপগুলো লাশের উপর ফেলার আগে বল্লরীর লাশের তিনটে ফোটো তুলে নিলুম ক্যামেরায়। তারপর লাশটা ঝোপের তলায় একেবারে ঢেকে ফেললুম। এবার আর কিছু করার নেই। ফিরে গিয়ে পুলিশকে টেলিফোনে খবর দিতে হবে।

লম্বা পা ফেলে চত্বরের পশ্চিম দিক দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলুম। কারণ সোজা উত্তরে এগিয়ে গেলে হাইওয়েটা আধ কিলোমিটারের মধ্যে পাওয়া যাবে। কাল ডঃ মিশ্রের সঙ্গে আমি গড়ের জঙ্গলের পূর্বপ্রান্ত দিয়ে ঢুকেছিলুম।

বাঁদিকে একটা শালবন, ডাইনে নগ্ন খানিকটা জায়গা। শালবনের দিকে না গিয়ে আমি নাক বরাবর হাঁটছিলুম। একটু পরে রোদে কী একটা জিনিস চকচক করছে দেখলুম। নেহাত কৌতূহলে কাছে গিয়ে দেখি, একটা সোনার চেনের টুকরো। চমকে উঠেছিলুম। এটা কি বল্লরীর গলায় দেখেছিলুম? মনে পড়ল না। কিন্তু একটা পাথরের ছায়ায় চেনের বাকি অংশটা কুড়িয়ে পেলুম। তারপর একটা লতাঢাকা গুল্মের কাছে দেখলুম, একটা ভ্যানিটি ব্যাগ পড়ে আছে। এটা বল্লরীর ব্যাগ কি না, তা পরীক্ষার ধৈর্য ছিল না। পিঠে আঁটা কিটব্যাগে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসগুলো ঢুকিয়ে হাইওয়ে লক্ষ্য করে হাঁটতে থাকলুম। অবশ্য মাঝেমাঝে একটু দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে দেখে নিচ্ছিলুম ইন্দ্রনীলরা পুলিশের সঙ্গে গড়ের জঙ্গলের দিকে আসছে কি না। নাকি গত রাতে পুলিশবাহিনীর সাহায্যে তারা গড়ের জঙ্গলে বল্লরীকে খুঁজতে বেরিয়েছিল এবং খুঁজে না পেয়ে ফিরে গেছে?

পরক্ষণে মনে হল, এমন কোনো চেষ্টা তারা করলে বল্লরীর মৃতদেহ খুঁজে পেত। ওই চত্বরটা তাদের চেনা জায়গা। সবচেয়ে অদ্ভুত মনে হল, গড়ের জঙ্গলে গত দু'বছরে তিন-চারটে লাশ একই অবস্থায় পাওয়া গেছে। তা হলে এমন কি হতে পারে না কোনো 'হোমিসাইড্যাল ম্যানিয়াক' সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে ওই জঙ্গলে কোনো গোপন ডেরায় বাস করে এবং কাকেও একলা পেলেই 'বাঘনখ' নামক সেকেলে অস্ত্র দিয়ে খুন করে?

ডঃ মিশ্রের বাংলোয় পৌঁছুতে সাড়ে সাতটা বেড়ে গিয়েছিল। তিনি আমাকে দেখে একটু কিছু আঁচ করে বলে উঠলেন—কর্নেল সরকার! আপনাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছে কেন?

বললুম—ডঃ মিশ্র! আমি এখনই পুলিশকে একটা ফোন করতে চাই।.....

ডঃ মিশ্রের ড্রয়িং রুমে ঢুকে সোফায় বসলুম। তারপর আমার বুকপকেট থেকে ছোট্ট নোটবইটা বের করে পঞ্চগড় পুলিশ স্টেশনের নাম্বার দেখে নিলুম। ডঃ মিশ্র টেলিফোন গাইড বের করেছিলেন। রিসিভার তুলে আমি ডায়াল করছি দেখে তিনি গাইডটা হাতে নিয়ে বসে রইলেন। তাঁর উদ্বিগ্ন দৃষ্টি আমার দিকে। চোখের কোনা দিয়ে লক্ষ্য করলুম রোমিলা দেবীও দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

কয়েকবার রিং হওয়ার পর সাড়া এলো হিন্দিতে—নমস্তে! পঞ্চগড় পোলিস টিশান।

হিন্দিতেই বললুম—অফিসার-ইন-চার্জ গোপেশ্বর সিনহার সঙ্গে কথা বলতে চাই। খুব জারুরি কথা।

—সিনহা সায়েবকে ন'টার আগে পাওয়া যাবে না। আপনি কে বলছেন?

—আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। কলকাতা থেকে পঞ্চগড়ে এসেছি। আপনি কি ডিউটি অফিসার?

—এক মিনিট। ডিউটি অফিসারকে দিচ্ছি।

কানে ভেসে এলো ডিউটি অফিসারকে ডাকা হচ্ছে। কেউ হাসতে হাসতে বলল, শর্মাজি বাথরুমে। দু'ঘন্টা পরে বেরোবেন। সকালের দিকে সর্বত্র পুলিশ স্টেশনে এক ঢিলেমি লক্ষ্য করেছি। তাই ধৈর্য ধরে বসে থাকলুম। প্রায় পাঁচমিনিট পরে গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সাড়া এলো।

—ডিউটি অফিসার বলছি। হয়েছেটা কী? কে আপনি?

—আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার।

—কে? কানিল নিলদারি সরকার! তাজ্জব নাম। একটু স্পষ্ট করে বলুন।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললুম—তামাশা করলে এর ফল আপনাকে ভুগতে হবে। ও. সি. গোপেশ্বর সিনহাকে জরুরি খবর দিন। কলকাতা থেকে রিটায়ার্ড মিলিটারি অফিসার কর্নেল সায়েব কথা বলবেন। দেরি করবেন না। তাঁকে লোক পাঠিয়ে বলুন, গড়ের জঙ্গলে একটি মেয়ে খুন হয়েছে। তার লাশ দেখে এসেছি।

আমার কথা শেষ হওয়ার পরই লাইন কেটে গেল। রিসিভার রেখে ডঃ মিশ্রের দিকে তাকালুম। তিনি হতবাক হয়ে শুনছিলেন। বললেন—গড়ের জঙ্গলে কোনো মেয়ের লাশ! হায় ভগবান!

বললুম—হ্যাঁ। সব বলছি। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি চাই।

রোমিলা দরজার পর্দা সরিয়ে ডাকলেন—চামেলি! দেরি করছ কেন?

একটু পরেই ঘোমটা ঢাকা চামেলি কফি ও স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল। রোমিলা বসলেন। তারপর দ্রুত আমাকে একটা লম্বা কাপে কফি তৈরি করে দিলেন। ওই কাপটি কাল সন্ধ্যায় আমার কফির তৃষ্ণা লক্ষ্য করে মিসেস মিশ্র বরাদ্দ করেছেন। কফি খেতে খেতে সংক্ষেপে সব বললুম। থানার ডিউটি অফিসারের হঠাৎ ফোন রেখে দেওয়ার কথা শুনে মিঃ মিশ্র বললেন—আমি পুলিশের সার্কেল ইন্সপেক্টর বদ্রীনাথ রাওয়ের কোয়ার্টারের নাম্বার জানি। উনি আমার বিশেষ পরিচিত। এক মিনিট।

বললুম—সম্ভবত সিংভূমের পুলিশ সুপার তাঁকে আমার কথা বলে থাকবেন। আপনি কথা বলে আমাকে ফোনটা দেবেন।

ডঃ মিশ্র টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা নোটবই নিয়ে এলেন। তারপর বদ্রীনাথ রাওয়ের নাম্বার দেখে নিয়ে ডায়াল করলেন। সাড়া এলে তিনি বললেন—ডঃ সুরজ প্রসাদ মিশ্র বলছি, রাওজির সঙ্গে জরুরি কথা আছে। ....নমস্তে রাওজি। কলকাতা থেকে কর্নেল সরকার এসেছেন।....তা হলে তো ভাল কথা। ....উনি আমার অতিথি। উনি থানায় ফোন করেছিলেন। ডিউটি অফিসার শর্মা তাঁর কথা

শুনে ফোন রেখে দিয়েছেন। অথচ উনি একটা জরুরি খবর দিচ্ছিলেন। ...রাওজি! কর্নেল সায়েব আমার পাশেই আছেন। ওঁর সঙ্গে কথা বলে জেনে নিন।

ডঃ মিশ্র আমাকে রিসিভার দিলেন। সি. আই. বদ্রীনাথ রাও আমার সাড়া পেয়ে বললেন—সুপ্রভাত কর্নেল সরকার! এস পি সায়েব না বললেও আমি নানাসূত্রে আপনার নাম শুনেছিলুম। আমার সৌভাগ্য! আপনার সেবার জন্য আমি সবসময় প্রস্তুত।

মনে হল, ভদ্রলোক বড্ড বেশি কথা বলেন। তাঁকে থামিয়ে সংক্ষেপে শুধু বললুম, প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গড়ের জঙ্গলে রেনবো অর্কিডের খোঁজে গিয়েছিলুম। একটা চওড়া চৌকো পাথরের চত্বরের ধারে গভীর গর্তে একটি মেয়ের লাশ দেখেছি।

লাশের বর্ণনা দিয়ে শকুনের হাত থেকে বাঁচাতে আমি কী ব্যবস্থা করে এসেছি, তা-ও বললুম। আমার কথা শোনার পর মিঃ রাও বললেন—আমি গোয়েন্দা পুলিশের সূত্রে গতরাতে খবর পেয়েছিলুম, কলকাতা থেকে 'বাঙালি হাভেলি'র মালিকের ছেলে এক বন্ধু আর দুই বান্ধবীকে নিয়ে বেড়াতে এসেছে। তার এক বান্ধবী কাল বিকেলে বেড়াতে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে। যাই হোক, আমি ও.সি. মিঃ গোপেশ্বর সিনহাকে তাঁর কোয়ার্টারে রিং করে জানাচ্ছি। আশা করি শিগগির আপনার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে। নমস্তে!

রিসিভার রেখে বললুম—কলকাতা থেকে বেড়াতে আসা যুবক-যুবতীদের মধ্যে কাল বিকেলে এক যুবতী নিখোঁজ হওয়ার খবর রাওজি জানে, তার মানে, ইন্দ্রনীল কাল সন্ধ্যায় পুলিশকে খবর দিয়েছিল। কিন্তু বুঝতে পারলুম না, বল্লরী দাশগুপ্ত কোথা থেকে কখন দলছাড়া হয়েছিল।

রোমিলা বললেন—ওদের হাভেলিতে বিদ্যুৎ বা টেলিফোন কিছুই নেই।

ডঃ মিশ্র বললেন—আপনার সঙ্গে ওদের আলাপ হয়েছিল। আপনি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার। বাঙালি। কলকাতার মানুষ আপনি ওদের নিশ্চয় বলেছিলেন, কোথায় উঠবেন?

বললুম—হ্যাঁ। বলেছিলুম। সুদক্ষিণাকে একটা নেমকার্ডও দিয়েছিলুম।

—আশ্চর্য ব্যাপার! ওরা আপনাকেও ব্যাপারটা জানাতে পারত! জানাল না কেন? তা ছাড়া ঝাব্বুলাল নিশ্চয় ওদের বলেছে, আপনি আমার সঙ্গে ওই হাভেলিতে গিয়েছিলেন!

—আপনি ঠিক বলেছেন ডঃ মিশ্র। বাইরে গিয়ে কেউ বা কারা বিপদে পড়লে তাদের ভাষা যা বা যাদের মাতৃভাষা, তাছাড়া একই জায়গার লোক—সে বা তারা এমনটি করবে না। ভাষা আর বাসস্থান অন্যত্র একটা পৃথক সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক যোগসূত্র গড়ে তোলে।

রোমিলা বিষণ্ণ মুখে বললেন—হতভাগিনী একইভাবে খুন হয়েছে। ত্রিশূল বা

বাঘনখ, অস্ত্রটা একই। এর আগেও অন্তত তিনবার....ডঃ মিশ্র বললেন—না। চারবার।

—তো চারবার এবং এই নিয়ে পাঁচবার গড়ের জঙ্গলে লাশ পড়ল। আমি বলছি, খুনী একজনই। অনেকবছর আগে যে সন্ন্যাসীকে লোকে দেখতে পেত, আমার ধারণা, সে এক তান্ত্রিক। সে ওই জঙ্গল ছেড়ে চলে যায়নি। কোথাও গোপন ডেরায় সে লুকিয়ে থাকে।

কফি শেষ করে চুরুট ধরালুম। রোমিলা সিগারেট বা চুরুটের ধোঁয়া সহ্য করতে পারেন না। কিন্তু আমার এখন চুরুট না টানলে মাথা কাজ করবে না।

একটু পরে মনে পড়ল সৌরজ্যোতির কথা "বল্লরী! এখনও বলছি মুখ বুজে থেকো না। তুমি একটা অতল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছ।" তা হলে সত্যি সে অতল খাদে গড়িয়ে পড়ে গেল অবশেষে? সৌরজ্যোতি কি 'অতল খাদ' বলতে এইরকম কিছু বুঝিয়েছিল? অঙ্কটা মিলছে না। শরীরে তিনটে ক্ষতচিহ্ন এর আগেই চারটে লাশে দেখা গিয়েছিল। তবে ডঃ মিশ্রকে তাঁর আত্মীয় পুলিশ অফিসার মার্ডার উইপনটা 'বাঘনখ' বলেছিলেন, বল্লরীর ক্ষত দেখে আমার তা মনে হয়নি। 'বাঘনখ' প্রাচীন অস্ত্র। ওই অস্ত্র ব্যবহারের পরিণামে ক্ষতের সঙ্গে গভীর আঁচড়েরও চিহ্ন থাকবে। তিনটে গভীর ক্ষতচিহ্ন দেখে আমার মনে হয়েছে কোনো ভারী ও মোটা ত্রিশূলের আঘাত। বারুদ আবিষ্কারের আগে ত্রিফলা ভল্ল ব্যবহার করা হত যুদ্ধে। প্রাচীন যুগের যুদ্ধাস্ত্র বিষয়ে আমার সংগ্রহে একটা বই আছে। কিন্তু সেটা তো কলকাতায় আমার ড্রয়িংরুমের শেলফে এখন বন্দি।

হঠাৎ মাথায় এলো, মিসেস রোমিলা মিশ্র গার্লস কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপিকা। চুরুটটা চুপচাপ শেষ করলুম। ডঃ মিশ্র অ্যাশট্রেটা সামনে তুলে ধরলেন। তখনই সম্বিৎ ফিরল। বললুম—ছি ছি! আমি চুরুটের ছাইয়ে কার্পেট নোংরা করে ফেলেছি! খুবই দুঃখিত ডঃ মিশ্র! ডঃ মিশ্র একটু হেসে বললেন—দুঃখিত হওয়ার কারণ নেই। আমিও তো আপনাকে অ্যাশট্রেটা দেখাতে ভুলে গিয়েছিলুম। চুরুটটা শেষ করে কোথায় ফেলবেন ভাবছিলেন দেখে অ্যাশট্রেটার কথা আমার মনে পড়ল।

বেরিয়ে গিয়ে দেখলুম, রোমিলা উত্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সম্ভবত 'বাঙালি হাভেলি'র দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু ইতস্তত করে ডাকলুম—মিসেস মিশ্র! আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই। রোমিলা দ্রুত কাছে এলেন—বলুন কর্নেল সরকার!

—আপনি ইতিহাসের অধ্যাপিকা। আপনার কাছে কি প্রচীন যুগের সুদ্ধাস্ত্র সম্পর্কে লেখা কোনো বই আছে?

—দুঃখিত কর্নেল সরকার! আমি আধুনিক ইতিহাস পড়াই। প্রাচীন যুগের যুদ্ধাস্ত্র সংক্রান্ত বই আমার সংগ্রহে নেই। তবে আমার কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

—আপনি পঞ্চগড়ের প্রাচীন ইতিহাস সংক্রান্ত কোনো বই কি কলেজ লাইব্রেরিতে দেখেছেন?

—পঞ্চগড়ের ইতিহাস বই আমার বাড়িতেই আছে। আঠারো শতকে লেখা এক ব্রিটিশ লেফটন্যান্ট কর্নেলের বই।

ডঃ মিশ্র বললেন—১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে লেখা বই। আমি রোমিলার পড়ার আগেই পড়েছি। রবার্ট ক্লিকটন তখন বিহারের এই অঞ্চলে ছিলেন। তবে রোমিলার কথা শুনে মনে হবে তখনকার ছাপা বই। তা কিন্তু নয়। বইটা দিল্লি ইউনিভার্সিটিতে ছাত্রজীবনে কিনেছিলুম। ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে রিপ্রিন্ট এডিশন। তখন কি জানতুম, আমি যাকে বিয়ে করব, সে ইতিহাসের অধ্যাপিকা হবে?

রোমিলা স্বামীর দিকে কপট রোষে কটাক্ষ করে ভেতের ঢুকে গেলেন। আমি বারান্দায় বসলুম। পুলিশের আবির্ভাবের জন্য মনের ভেতর তীব্র প্রতীক্ষার আলোড়ন চলেছে। ডঃ মিশ্র আমার পাশে বসলেন। একটু পরে রোমিলা মোটাসোটা একটি বই এনে দিলেন। বইটির পাতা উল্টে টেবিলে রেখে দিলুম।

একটু পরে টেলিফোন বেজে উঠল। ডঃ মিশ্র দ্রুত উঠে গেলেন। একটু পরে তিনি ফিরে এসে বললেন—ও.সি. মিঃ গোপেশ্বর শর্মা অ্যাম্বুল্যান্স এবং ফোর্স পাঠিয়ে দিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসছেন। প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। আমার মনে হয়, আপনি এখনই ব্রেকফাস্ট করে নিন। মিঃ শর্মা একটু অপেক্ষা করলে ক্ষতি কী? রোমিলা! তুমি দেখ, শিগগির ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করা যায় কি না। কর্নেল সায়েব মিঃ শর্মার সঙ্গে গড়ের জঙ্গলে যাবেন, তা নিশ্চিত। আমিও যেতে চাই।

ব্রেকফাস্ট শেষ করার পর পুলিশের একটা জিপ চোখে পড়ল। জিপটা এসে বাংলোর গেটের ওধারে থামল। রামভকত গেট খুলে দিয়েছিল। কিন্তু জিপ থেকে তাগড়াই চেহারার একজন পুলিস অফিসার নেমে এগিয়ে এলেন। ডঃ মিশ্র বললেন—মিঃ সিনহা! আশাকরি কর্নেল সরকারকে চিনতে পেরেছেন?

লনে দাঁড়িয়ে মিঃ সিনহা করজোড়ে নমস্কার করে বললেন—দেরি হয়ে গেছে। কর্নেল সায়েব বুঝতেই পারছেন, পঞ্চগড়ের মত নকল শহরে কী অব্যস্থার মধ্যে আমাকে কাজ করতে হয়।

বললুম—নকল শহর বললেন কেন? আমি তো কাল ডঃ মিশ্রের গাড়িতে ঘুরে দেখেছি, অসাধারণ বিউটি স্পট। শহর বলতে যা বোঝায়, তার সব নিদর্শনই আছে।

—যাই হোক, আমি ডিউটি অফিসার জ্ঞানেশ শর্মার হয়ে ক্ষমা চাইছি। ভদ্রলোক পেটের অসুখে ভুগছেন। রিটায়ার করার বয়স হয়েছে। কানেও ভাল শুনতে পান না। তাই ওঁকে মর্নিং ডিউটি দিই। এই অঞ্চলে প্রধান অপরাধ বলতে জমি নিয়ে দাঙ্গা। সেগুলো বেশির ভাগই সন্ধ্যার দিকে বাধে।

নেমে গিয়ে বললুম—চলুন! যেতে যেতে কথা বলব।

ডঃ মিশ্র বললেন—জিপে তো আমার স্থান হবে না। পেছনে আর্মড ফোর্স দেখতে পাচ্ছি। আমি বরং আমার গাড়ি নিয়ে আপনাদের অনুসরণ করব। গড়ের জঙ্গলে তো কোনো গাড়িই ঢুকবে না। হাইওয়েতে গাড়ি রেখে সবাইকে হাঁটতে হবে।

মিঃ সিনহা আমাকে সঙ্গে নেবেন বলে নিজে ড্রাইভ করে এসেছেন। জিপে তাঁর ডানদিকে উঠে বসলুম। কানে এলো, রোমিলা দেবী তাঁর স্বামীকে আসতে নিষেধ করছেন। সম্ভবত ডঃ মিশ্র পুলিশের সঙ্গে গিয়ে কোনো ঝুট ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বেন বলে তাঁর আশঙ্কা আছে। সেটা স্বাভাবিক। ডঃ মিশ্র সরল মানুষ। গতকাল বিকেলে ঝাব্বুলালের মুখে শোনা কথাগুলো আমার সামনেই ডঃ মিশ্র তাঁর স্ত্রীকে বলছিলেন। কাজেই আমারও মনে হল, ডঃ মিশ্রকে কোনো সুযোগে ঝাব্বুলাল সম্পর্কে কিছু বলতে নিষেধ করব।

জিপ স্টার্ট দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে মিঃ সিনহা যেতে যেতে বললেন—আগে আপনার কথা শুনতে চাই। তারপর আমি যা জানি বলব। আমি সংক্ষেপে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে গড়ের জঙ্গলে রেনবো অর্কিডের খোঁজে যাওয়ার কথা বললুম। তারপর একটা পাথরের চত্বরে উঠে চারদিকে রেনবো অর্কিড খোঁজার পর কী ভাবে লাশটা আবিষ্কার করেছি, তা জানালুম। শকুনের চোখের আড়ালে রাখার জন্য ঝোপঝাড় কেটে লাশটা ঢেকে রাখার ব্যবস্থা করেছি শুনে মিঃ সিন্‌হা বললেন—আপনি প্রাক্তন সামরিক অফিসার। এ ধরনের উপস্থিত বুদ্ধি আপনার থাকা স্বাভাবিক।

বললুম—কলকাতার দলটি থানায় নিখোঁজ এক সঙ্গিনীর খবর দিয়েছিল কখন?

—তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। ওরা নিজেরা গড়ের জঙ্গলেও নাকি খোঁজাখুঁজি করে এসেছিল। জানি না এটা সত্যি কি না। কারণ লাশটা আপনার চোখে পড়েছে। অথচ ওদের চোখে পড়েনি কেন?

—ওরা কাল কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল?

—হাইওয়েতে হাঁটতে হাঁটতে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিমে পাতালভৈরবীর মন্দিরে গিয়েছিল। মন্দিরটা মাটির তলায়। সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। নীচে সেবায়েত দেবীর সামনে ধ্যানমগ্ন থাকে, সেখানে একটা প্রদীপ জ্বলে মাত্র। আমি একবার সস্ত্রীক গিয়েছিলুম।

—তা হলে ওরা চারজনেই পাতাল মন্দিরে নেমেছিল?

—'বাঙালি হাভেলি'র মালিকের ছেলে ইন্দ্রনীল রায়—অবশ্য এখন নাকি সে তার বাবার মৃত্যুর পর নিজেই মালিক হয়েছে—

—হ্যাঁ, বলুন!

—সে কথাটা ঠিকই বলেছে। চারজন দাঁড়ানোর মত জায়গা নেই পাতাল মন্দিরে। কাজেই সে লক্ষ্য করেনি বল্লরী দাশগুপ্ত নামে তার বান্ধবী সিঁড়ি বিয়ে নেমেছিল কি না। তার বন্ধু সৌরজ্যোতি এবং অন্য বান্ধবী সুদক্ষিণাও লক্ষ্য করেনি। বেরিয়ে আসার পর তারা বল্লরীকে খুঁজে পায়নি। তারা ভেবেছিল, বল্লরী তাদের সঙ্গে কৌতুক করার জন্য আশে-পাশে কোথাও লুকিয়ে আছে। কিন্তু তন্নতন্ন করে খুঁজেও তাকে দেখতে পায়নি। তারা হাইওয়েতে পঞ্চগড়ের দিকে হাঁটতে থাকে। ভেবেছিল, বল্লরী কোনো বাস থামিয়ে তাতে চেপে হাভেলিতে ফিরে গেছে। হ্যাঁ—দুপুরে গড়ের জঙ্গলে বেড়াতে গিয়ে বল্লরীর সঙ্গে নাকি সৌরজ্যোতির ঝগড়া হয়েছিল। সুদক্ষিণা অবশ্য বলেছে, বল্লরীর গলায় সোনার চেনটা নাকি নিছক কৌতুকের ছলে সৌর ছিঁড়ে দূরে ছুড়ে ফেলে। তাই তারা ভেবেছিল, হারটা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে বল্লরী গড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকেছে।

—তারা কি গড়ের জঙ্গলে গিয়েছিল?

—তারা জঙ্গলের আশেপাশে ঘুরে তার নাম ধরে ডাকাডাকি করেছিল। বেলা পড়ে আসছে। তাই বিশেষ করে সাপের ভয়ে তারা চলে আসে। তারা ভেবেছিল, হার খুঁজে পেয়ে বল্লরী ফিরে গেছে। গাড়ি হাইওয়েতে পৌঁছে পশ্চিমে ঘরল। তখন বললুম—আপনার কি মনে হয়নি তারা আগে থেকে তৈরি করা একটা ঘটনা অর্থাৎ বানানো কথা বলছে?

মিঃ সিনহা একটু পরে বললেন—তখন অবশ্য পৃথকভাবে প্রত্যেককে জেরার প্রশ্ন ওঠেনি। তাই আমিও ততকিছু লক্ষ্য রেখে তাদের কথা শুনিনি। একসঙ্গে গিয়ে একেকজন কথা বলছিল। তাতে গরমিল কিছু ছিল না। পরস্পর একটা ঘটনার বর্ণনা দিচ্ছিল। একজনের কথার সঙ্গে অন্যজন কথা জুড়ে দিচ্ছিল।

—আচ্ছা মিঃ সিনহা, এর আগে গত দু'বছরে নাকি চারটে লাশ একই অবস্থায় গড়ের জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছিল?

শুনেছি। কেস হিস্ট্রি থানায় আছে। পড়ে দেখেছিলুম। রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড মনে হয়েছিল।

—এবং এটাও!

মিঃ সিনহা ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন—আমার মনে হয়, আপনি আমার মুখ দিয়ে কিছু বলাতে চাইছেন।

—আপনি বুদ্ধিমান মিঃ সিনহা।

বাঁ হাতে স্টিয়ারিং ধরে ডান হাত কপালে সেলামের ভঙ্গিতে ঠেকিয়ে মিঃ সিনহা বললেন—সি. আই. সায়েবের কাছে আপনার সম্পর্কে অনেক আশ্চর্য কথা শুনেছি। আপনার নাকি তৃতীয় একটা চোখ আছে।

হাসলুম—না! তবে সামরিক জীবনে বেশি সময় জঙ্গলযুদ্ধে কাটিয়েছি। তা থেকে যেন একটা অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় আমার জন্মে গেছে। জানি না, আমি নিজেই

ভুল বলছি কি না। তবে জঙ্গলে ঢুকলে আমার ওই বাড়তি ইন্দ্রিয় যেন সক্রিয় হয়ে ওঠে। বল্লরীর মৃতদেহ আবিষ্কার সেই অদ্ভুত ইনট্যুইশনের ফলাফল। সিওর নই। তবে এরকম আমার মনে হয়।

—কর্নেল সায়েব! আমার মতে, এটা অন্যের চারটে ঘটনার মত নয়। শুধু এটুকুই বলতে পারি। কারণ আগের চারটে লাশ যাদের, তারা কেউ দল বেঁধে বেড়াতে যায়নি গড়ের জঙ্গলে। আর পঞ্চগড়ের ব্যবসায়ী লোকটি সম্পর্কে পুলিশ ফাইলে তদন্তকারী অফিসার নোট দিয়েছিলেন, সম্ভবত কেউ তাকে মূল্যবান জিনিস বিক্রির লোভ দেখিয়ে নির্জন জঙ্গলে ডেকেছিল। টাকা আর দামী জিনিস খুনী তাকে মেরে হাতিয়ে নেয়।

—বুকে ও গলায় তিনটে একই রকমের ক্ষতচিহ্ন এই পাঁচটি কেসেই দেখা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ। এই পয়েন্টটা গুরুত্বপূর্ণ।

—এবং এই পয়েন্টেই অন্তত বল্লরীর হত্যা রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজলে মিলতে পারে।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত। আমরা এসে গেছি। এবার আমাদের হেঁটে যেতে হবে।

আদিবাসীদের সেই দোকানগুলোর কাছে নেমে দেখলুম, পুলিশের একটা বেতার ভ্যান এবং আরও একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। অ্যাম্বুল্যান্সও চোখে পড়ল। ডঃ মিশ্র তাঁর গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন—ডাক্তার শচীন অধিকারীর গাড়িতে কলকাতার দলটি এসেছে। ওই দেখুন গাড়িটা।

ও. সি. মিঃ গোপেশ্বর সিনহাকে একজন পুলিশ অফিসার গোপনে কিছু বলছিলেন। সেই সুযোগে আমি ডঃ মিশ্রকে কাল বিকেলে ঝাব্বুলাল যে-সব কথা বলেছিল, তা চেপে যেতে বললুম। তারপর দু'জনে মিঃ সিনহার কাছে গেলুম। মিঃ সিনহা বললেন—আমাদের এক্সপার্ট টিম ইতিমধ্যে ওখানে পৌঁছে গেছে। এস. আই. রহমত খান বললেন, আদিবাসীদের মধ্যে ইমানুয়েল নামে একজন খ্রিস্টানের দোকান আছে এখানে। সে রহমত সায়েবকে বলেছে, কাল সূর্যাস্তের আগে ইমানুয়েল এখান থেকে একটা মেয়েকে গড়ের জঙ্গলের দিকে দেখেছিল। গড়ের জঙ্গলে মাঝে মাঝে নাকি সুন্দরী মেয়ের বেশে ভূত ঘুরে বেড়ায়। এই এলাকার লোকেরা এটা বিশ্বাস করে। তাই ইমানুয়েল সেই ভূত দেখেতে পেয়েই ভয় পেয়ে তার দোকানে এসে ঢোকে। সে গড়ের জঙ্গলের ওই ভূতকে দেখতে পায়, তার নাকি আপদ বিপদ ঘটে। তাই কাল বিকেলে দোকানে ঝাঁপ ফেলে সে খ্রিস্টান মিশনের গীর্জায় পাদরিবাবার কাছে গিয়েছিল।

বললুম—রহমত সায়েবকে কি ইমানুয়েল নিজে থেকে এই কথা বলেছে?

—না। রহমত সায়েব আদিবাসী দোকানদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করছিলেন, কাল

বিকেলে গড়ের জঙ্গলে তারা কাকেও যেতে দেখেছিল কি না। ওরা সরল মানুষ। অন্য কেউ কিছু দেখেনি বা লক্ষ্য করেনি। ইমানুয়েল জৈবকৃত্যের জন্য বেরিয়েছিল। তাই সে ভূতটাকে দেখতে পেয়েছিল।

—তার পোশাকের বর্ণনা দেয়নি ইমানুয়েল?

মিঃ সিনহা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন—কর্নেল সায়েব! আপনি একটা মূল্যবান সূত্রের কথা তুলেছেন। রহমত সায়েবের মাথায় ওই প্রশ্নটা জাগেনি। কারণ তিনি ধরেই নিয়েছেন মেয়েরা শাড়ি পরে। ইমানুয়েলের কাছে কথাটা জানা দরকার। এখনই জেনে আসছি। প্লিজ, একটু অপেক্ষা করুন।

চারজন আর্মড কনস্টেবলকে এগিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়ে মিঃ সিনহা হাইওয়ের ধারে গেলেন। ডঃ মিশ্র বললেন—কথাটা শুনে আমার অবাক লাগছে! একা কলকাতার দলভ্রষ্ট এক তরুণী গড়ের জঙ্গলের দিকে কোন সাহসে যাবে? তার চেয়ে বড় কথা, কী উদ্দেশ্যে সে যাবে?

বললুম—কাল দুপুরে এখানে বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। ও.সি. মিঃ সিনহাকে সুদক্ষিণা বলেছে, সৌরজ্যোতি বল্লরীর গলা থেকে সোনার চেন খোলার ছলে টেনে ছিঁড়ে নাকি ছুঁড়ে ফেলেছিল।

—মিঃ সিনহা আপনাকে বলছিলেন?

—হ্যাঁ। হয়তো তখন হারটা ওরা খুঁজে পায়নি। তারপর বল্লরী হারটা বিকেলে খুঁজতে গিয়েছিল?

—অবিশ্বাস্য! অসম্ভব ব্যাপার। একা একটি মেয়ে—

ডঃ মিশ্র হঠাৎ থেমে গেলেন। আমি বাইনোকুলারে গড়ের জঙ্গল দেখতে থাকলুম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছিল। উৎসুক আদিবাসীদের পুলিশ লাঠি উঁচিয়ে হটিয়ে দিচ্ছে। ইন্দ্রনীলদের দেখতে পেলুম না। পাথরের চত্বরটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছিল না।

ও.সি. মিঃ সিনহা এসে বললেন—ঝোপের মধ্যে ইমানুয়েল শুধু মেয়েটির মাথা দেখেছে। মেয়েটি মাঝেমাঝে এদিকে মুখ ঘুরিয়ে কী দেখছিল। মুখটা সুন্দরী মেয়ের এ বিষয়ে ইমানুয়েল নিশ্চিত। সে পোশাক দেখতে পায়নি। শুধু মুখ দেখেই ভয় পেয়ে দোকানে ঢুকে পড়েছিল।

বললুম—এটা স্বাভাবিক। ফাঁকা নগ্ন জায়গাটায় না গেলে এখান থেকে তার পোশাক দেখতে পাওয়া যাবে না।

পাথরের চত্বরের কাছে পৌঁছুতে আমাদের প্রায় কুড়ি মিনিট লাগল। গিয়ে দেখলুম, চত্বরে মুখ দু'হাতে ঢেকে সুদক্ষিণা বসে আছে। সে কাঁদছে। ইন্দ্রনীল তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে বিস্ময় আর শোকের ছাপ স্পষ্ট। সৌরজ্যোতি গর্তটার কাছে নিস্পন্দ মূর্তির মত দাঁড়িয়ে নীচের গর্তে বল্লরীর মৃতদেহ দেখছে। ঝোপগুলো পুলিশ আর অ্যাম্বুলেন্সকর্মীরা তুলে উপরে ফেলেছে। একজন

ফোটোগ্রাফার চারদিক ঘুরে ছবি তুলছিলেন। আমাকে দেখে ইন্দ্রনীল কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। কিন্তু বলল না। এক বাঙালি ভদ্রলোক ডঃ মিশ্রকে দেখে বলে উঠলেন—মিছরসায়েব! আবার একই ঘটনা ঘটল।

বুঝলুম, তিনি ডাক্তার শচীন অধিকারী। ও. সি. মিঃ সিনহা লাশটা দেখে নিয়ে একজন অফিসারকে বললেন—লাশ খাটিয়ায় তুলে নিয়ে যেতে বলুন। আপনি সঙ্গে যাবেন। তারপর অ্যাম্বুলান্সে চাপিয়ে হাসপাতালের মর্গে নিয়ে যাবেন।

বল্লরীর রক্তাক্ত মৃতদেহ যখন হাসপাতালের কর্মীরা ওঠাচ্ছিলেন, ডঃ মিশ্র আমাকে খুব চাপা স্বরে বললেন—কর্নেল সায়েব! ডেডবডি উপুড় হয়ে পড়েছে। অথচ খুনী তার সামনের দিকে আঘাত করেছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত মনে হয়নি আপনার!

বললুম—অবশ্যই।

ও. সি. মিঃ সিনহা আমার কাছে এলেন—কী মনে হচ্ছে কর্নেলসায়েব?

—আপনার কী মনে হচ্ছে আগে শোনা যাক!

—এই গর্তে মেয়েটিকে খুন করা হয়নি। কারণ বডি উপুড় হয়ে পড়েছিল।

—পাথরের চত্বরের গায়ে রক্তের ছোপ দেখে মনে হচ্ছে, চত্বরের উপর থেকে গড়িয়ে গর্তে ফেলেছিল খুনী।

মিঃ সিনহা পাথরের চত্বরের কাছে গিয়ে বললেন—আপনার ধারণা হয়তো ঠিক। কিন্তু চত্বরের উপরে কোথাও রক্তের চিহ্ন নেই।

এই সময় একজন পুলিশ অফিসার সৌরজ্যোতিকে বলল—আপনি আপনার বন্ধুদের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। আমাদের তদন্ত করতে দিন। সৌরজ্যোতি চুপচাপ চত্বরের অন্যপ্রান্তে ইন্দ্রনীল ও সুদক্ষিণার কাছে চলে গেল। মিঃ সিনহা খুঁটিয়ে চত্বরের উপরের দিকটা দেখে নিলেন। তারপর আমাকে চাপাস্বরে জিজ্ঞেস করলেন—আপনি চত্বরের এখানে এসে গর্তের মধ্যে লাশটা দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তো? বললুম—হ্যাঁ।

—অন্য কোথাও কি রক্তের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিলেন?

—না। তবে আমি তখন কোথাও রক্তের চিহ্ন খুঁজতে যাইনি।

ডাক্তার শচীন অধিকারী তাঁর তথাকথিত 'ভাগ্নে-ভাগ্নি'র কাছে গিয়ে চাপাস্বরে কিছু আলোচনা করছিলেন। ডঃ মিশ্র চত্বরের নীচ দিয়ে ঘুরে তাঁদের কাছে গেলেন।

মিঃ সিনহা বললেন—আমাদের অফিসাররা চারদিক খুঁজতে বেরিয়েছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মেয়েটিকে অন্য কোথাও খুন করে এই গর্তে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। রক্তের চিহ্ন খুঁজলে পাওয়া যেতে পারে। তবে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। গড়ের জঙ্গলের আয়তন কম নয়।

একটু দূরে কয়েকজন আদিবাসী পুলিশের তাড়া খেয়েও পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। আমি একজন পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলুম—আপনারা কি ওদের কাছে কোনো খোঁজখবর নিয়েছেন?

তিনি বললেন—না স্যার! কারণ ওরা কী বলবে তা জানা কথা।

—ভূতের কীর্তি?

কথাটা আমি গম্ভীর মুখেই বললুম। অফিসারটি হেসে ফেললেন।—ঠিক বলেছেন স্যার!

তাদের দিকে তাকিয়ে আমি বললুম—লাশ তো চলে গেছে। ওরা এখনও দাঁড়িয়ে আছে কেন?

অফিসার বললেন—আমরা কী করছি তা দেখছে।

ডাকলুম—ডঃ মিশ্র! একবার এদিকে আসুন!

ডঃ মিশ্র চত্বরের উপর দিয়ে আমার কাছে এলেন। বললেন—কিছু কি বুঝতে পেরেছেন?

—না ডঃ মিশ্র। আমি আপনাকে একটা কারণে ডাকলুম। আপনি আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলতে পারেন। আমার সঙ্গে ওই আদিবাসীদের কাছে চলুন। মিঃ সিনহা চত্বরে রক্তের চিহ্ন খুঁজছেন। ততক্ষণ আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলি।

কয়েকজন কনস্টেবল লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিল। আদিবাসীরা যাতে চত্বরের কাছে না আসতে পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখাই সম্ভবত ওদের ডিউটি। পাশ কাটিয়ে আমি ও ডঃ মিশ্র আদিবাসী দলটির দিকে এগিয়ে গেলুম। বললুম—আপনি ওদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিন, এই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে ওদের বক্তব্য কী? তাছাড়া কাল বিকেলে কেউ এদিকে এসেছিল কিংবা সন্দেহজনক কিছু দেখেছিল কি না, তা-ও জেনে নিন।

ডঃ মিশ্র আর আমাকে দেখে ওরা পরস্পর কিছু বলাবলি করল। তারপর ওদের চাঞ্চল্য দেখে মনে হল, ওরা এখনই ছুটে পালিয়ে যাবে। ডঃ মিশ্র একজনকে চিনতে পেরে দেহাতি হিন্দিতে বললেন—তুমি ভারুয়া না?

মাথায় একরাশ পাকা চুল আর প্রকাণ্ড সাদা গোঁফওয়ালা লোকটির পরনে ঢোলা হাফপ্যান্ট আর নোংরা গেঞ্জি। তার হাতে একটা ছোট্ট ভোঁতা দা ছিল। সে সেই দা দিয়ে হাঁটুর কাছটা চুলকে নিয়ে হাসল। তার নীচের পাটির কয়েকটা দাঁত ভাঙা দেখলুম। সে যা সব বলল, আমার বুঝতে তত অসুবিধে হচ্ছিল না।

ভারুয়া বলল—আমি সেই লোকটাই বটে। আপনি মিছরিজি। আমিও আপনাকে চিনি।

ডঃ মিশ্র বললেন—আবার লাশটা পাওয়া গেল গড়ের জঙ্গলে! তোমার কী মনে হয় ভারুয়া?

—মনে যা হবার তা হয়েছে।

—খুলে বলবে বলেই তো তোমার কাছে এসেছি। তুমি যা বলবে, পুলিশকে তা জানাব না।

—এই বুড়ো দাড়িওয়ালা সায়েব কি মিশনের নতুন পাদরিবাবা?

ডঃ মিশ্র এবং আমি দুজনেই হেসে উঠলুম। ডঃ মিশ্র বললেন—না। উনি কলকাতার লোক। বাঙালি। ভারুয়া! উনি তোমার ভাষা বুঝতে পারছেন না। তোমাদের ছবি তুলতে এসেছেন। উনি ছবি তুলুন। তুমি আমাকে বলো, আবার গড়ের জঙ্গলে এই লাশের ব্যাপারে তোমার কী মনে হচ্ছে?

আমি ডঃ মিশ্রের ইঙ্গিতে ক্যামেরায় ওদের ছবি সত্যিই তুলে নিলুম।

ভারুয়া বলল—আমাদের সবাইকে একখানা করে ছবি দিতে হবে মিছরি সায়েব।

ডঃ মিশ্র বললেন—নিশ্চয় ছবি পাবে। এই বাঙালি সায়েব এখানে বেড়াতে এসেছেন। তোমাদের গ্রামেও এঁকে নিয়ে যাব। এবার তুমি কথাটা বলো!

ভারুয়া চাপা স্বরে বলল—কাল বিকেলে আমি পাখি মারতে এসেছিলুম। ওই উঁচু পাথরে বসে ঘুঘু বা পায়রা খুঁজছিলুম। আমার হাতে বাঁটুল আর গুলতি ছিল।

বলে সে গুলতি থেকে বাঁটুল ছোড়ার ভঙ্গি করল। ডঃ মিশ্র বললেন—তারপর কী হল বলো।

ভারুয়া তেমনই চাপাস্বরে বলল—ওই মেয়েটা ফুলপ্যান্ট আর গেঞ্জি পরে আপনারা যেদিক থেকে আসছিলেন, সেইদিক থেকে এল। আমি ভয় পেয়েছিলুম। এই সেই ভূত কি না। কিন্তু মেয়েটা শুকনো মাটিতে—ওই যে টাঁড় মাটি, পাথর পড়ে আছে—

—বুঝেছি। বলো।

—সেখানে কী খুঁজে বেড়াল। তারপর চলে গেল। হ্যাঁ মিছরি সায়েব! সেই মেয়েটাই বটে।

—মানে, তারই লাশ! তুমি এতদূর থেকে চিনতে পারলে?

—চিনব না কেন মিছরি সায়েব? একই পোশাক। ফরসা রঙ। মাথার ছোট চুলে ঝুঁটি বাঁধা!

—মেয়েটিকে তা হলে তুমি সোজা চলে যেতে দেখেছিলে?

—হ্যাঁ। সে বড় রাস্তায় উঠে গেল।

বললুম—তাহলে মিঃ সিনহা, আপনি এবং আমার ধারণা ঠিক। বল্লরীকে বাইরে কোথাও খুন করে ওই গর্তে ফেলে দিয়েছিল খুনী।

ডঃ মিশ্র বললেন—মর্গের রিপোর্টে খুনের সময় মোটামুটি জানা যেতে পারে।

ভারুয়া একটু হেসে বলল—আপনারা কী কথা বলছেন মিছরি সায়েব?

—বলছি মেয়েটিকে বাইরে খুন করে এখানে এনে ফেলে দিয়েছে খুনী।

—কিন্তু রক্ত তো পড়বে। কোথায় রক্ত?

বললুম—ডঃ মিশ্র! ওকে বলুন, এমন কি হতে পারে না কোথাও পলিথিন বা তেরপলের শক্ত কাপড়ে মুড়ে লাশটা এখানে এনেছিল খুনী?

ডঃ মিশ্র কথাটা বললেন। ভারুয়া গম্ভীর মুখে কী ভাবতে লাগল। তারপর সে আস্তে আস্তে বলল—ওদিকে পুলিশেরা রক্ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমাকে যেতে দেবে ওদিকে?

বলে সে আঙুল তুলে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা জঙ্গলে ঢাকা উঁচু ধ্বংসস্তূপ দেখাল। ডঃ মিশ্র বললেন—পুলিশ কিছু বলবে না। তুমি একা আমাদের সঙ্গে এসো।

আমরা দুজনে ভারুয়াকে নিয়ে এগোচ্ছি, মিঃ সিনহা বললেন—কর্নেল সায়েব! ওই লোকটাকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?

একটু হেসে বললুম—আপনারা আপনাদের কাজ করুন। আপাতত আমি রেনবো অর্কিডের সন্ধান পেয়েছি এর কাছে। আপনি শুনে থাকবেন, বিরল প্রজাতির অর্কিড সংগ্রহ আমার বাতিক।

ভারুয়া ও আমরা সেই উঁচু ধ্বংসস্তূপের কাছে যেতেই কানে এলো কোথাও কেউ মাটি খুঁড়ছে। আমি ডঃ মিশ্র ও ভারুয়াকে চুপচাপ দাঁড়াতে ইশারা করে নিঃশব্দে গুঁড়ি মেরে ডানপাশ দিয়ে এগিয়ে গেলুম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। একটা আলগা পাথর পায়ের চাপে নড়ে ওঠার শব্দেই সেই শব্দটা থেমে গেল এবং কারও ছুটে পালিয়ে যাওয়ার শব্দ কানে এলো। আমি স্তূপের উল্টোদিকে গিয়ে দেখি, কেউ একটা আগে বোজানো গর্ত থেকে মাটি খুঁড়ে পাশে জড়ো করছিল।

এই সময় উত্তেজিত ভারুয়া ও ডঃ মিশ্র এলেন। ভারুয়া চাপাস্বরে বলল, আজ সকালে এখানে লাশ দেখতে আসবার সময় সে ঝোপের মধ্যে বোজানো গর্তটা দেখেছিল। নিশ্চয় এই গর্তে কিছু পুঁতে রেখেছে খুনী।

আমি কিটব্যাগ থেকে একটা ছোট্ট কিন্তু ভারী খন্তা বের করে ভারুয়াকে দিলুম। কিছুক্ষণের মধ্যেই মাটির তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল একটা যেমন-তেমন করে গুটিয়ে রাখা সস্তা তেরপল। সেটা টেনে বের করে একটু ছড়িয়ে দিতেই চাপ-চাপ রক্ত দেখা গেল। বললুম—ডঃ মিশ্র! মিঃ সিনহাকে খবর দিন। ভারুয়াকে এখানে থাকতে বলে যান। আমি ততক্ষণ ধ্বংসস্তূপের উপরে উঠে লোকটাকে খুঁজে দেখব।

ডঃ মিশ্র চলে গেলেন। আমি অনেক চেষ্টার পর প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু স্তূপের শীর্ষে উঠে বাইনোকুলারে পূর্ব ও দক্ষিণ দিকটা খুঁটিয়ে দেখতে থাকলুম। কিন্তু ওদিকটায় জঙ্গল খুব ঘন। দৃষ্টি বেশিদূর পৌঁছুল না। ও.সি. গোপেশ্বর সিনহা একা ছুটে এলেন। ততক্ষণে আমি স্তূপ থেকে নেমে এসেছি। মিঃ সিনহা রক্তমাখা

তেরপল এবং গর্তটা দেখেই হাঁটু দুমড়ে বসে বললেন—ধন্যবাদ কর্নেল সায়েব! আপনার সত্যি তৃতীয় নয়ন আছে। আমাকে এ কথা বিশ্বাস করতেই হচ্ছে!

বললুম—মিঃ সিনহা! এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসটি আবিষ্কারের কৃতিত্ব এই সরল আদিবাসী মানুষটির।

ডঃ মিশ্র বললেন—ওকে পুলিশের পক্ষ থেকে যেন বকশিস পাইয়ে দেবেন মিঃ সিনহা! ভারুয়ার সঙ্গে কর্নেল আমাকে কথা বলার জন্য ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা আদিবাসীদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মিঃ সিনহা একই ভঙ্গিতে বললেন—ব্যাপারটা তো শেষাবধি আমার পয়েন্টেই দাঁড়াচ্ছে। কর্নেল সায়েব আদিবাসীদের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন মনে করেছিলেন। আর আমরা ওদের হটিয়ে দিয়েছিলুম।

গর্তের কাছে দাঁড়িয়ে চুরুট ধরালুম। সেই সময় আমার চোখের সামনে দুটি দৃশ্য ভেসে উঠল। হাইওয়ের ধার থেকে ইমানুয়েল দেখেছিল কাল বিকেলে একটি মেয়ে গড়ের জঙ্গলের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদিকে ভারুয়া মেয়েটিকে পুরো দেখতে পেয়েছিল। পরনে প্যান্ট গেঞ্জি পরা মেয়েটি কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছিল। তারপর সে চলে গিয়েছিল। বড় রাস্তার দিকে। তার মানে, বল্লরী একা এসেছিল এবং একা ফিরে গিয়েছিল।

সে যা খুঁজতে এসেছিল, তা আমি আজ প্রত্যুষে কুড়িয়ে পেয়েছি। ছেঁড়া সোনার চেনের দুটো অংশ আর একটা ভ্যানিটি ব্যাগ।

সুদক্ষিণা বলেছে, কৌতুকের ছলে সৌরজ্যোতি বল্লরীর সোনার চেন টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু বল্লরীর ব্যাগটা কে ছুড়ে ফেলেছিল? বল্লরী তার ব্যাগ রাগ করে নিজে ছুঁড়ে ফেলে দেবে কেন? সৌরজ্যোতি কি তার ব্যাগটাও ছুঁড়ে ফেলেছিল? তা যদি হয়, কোথায় চেন বা ব্যাগ পড়েছে, তা তখনই ওরা খুঁজে বের করতে পারত।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বল্লরীকে এমন নৃশংসভাবে হত্যার মোটিভ কী? কিংবা যে-ভাবেই হোক, তাকে হত্যার মোটিভ কী?

কাল দুপুরে ওই চত্বরে দাঁড়িয়ে বল্লরীকে সৌরজ্যোতি বলছিল, বল্লরী এক অতল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। এ কথার অর্থ কী? সৌরজ্যোতিকে জেরা করে এ-কথার মানে জেনে নিতেই হবে।

সৌরজ্যোতির সঙ্গে বল্লরীর যৌনসম্পর্ক ছিল। এ ব্যাপারে দুজনেরই স্থান কাল পরিবেশ জ্ঞান ছিল না। দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কখনও প্রেমের নয়, নিছক জৈবতার, তার সাক্ষী আমি নিজে।

এটুকু ভেবেই হঠাৎ মনে হল, আমি ঘটনাটার ভুল ব্যাখ্যা করছি না তো? অন্য কোনো উদ্দেশ্যে বল্লরীর বার্থে সৌরজ্যোতি উঠতে পারে। ধরা যাক, কোনো

গোপন জিনিস সুদক্ষিণার ও ইন্দ্রনীলের অজ্ঞাতসারে সৌরজ্যোতি বল্লরীকে রাখতে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সে মেঝেয় দাঁড়িয়ে জিনিসটা দিতে পারত! কিন্তু এমন হতেই পারে। আমি পাছে জেনে যাই এই ভয়ে সে চুপিচুপি আমার পায়ের দিকে বার্থে ওঠার সিঁড়ি বেয়ে উঠে গিয়েছিল। কোনো গোপন আলোচনাও করছিল। ট্রেনের শব্দের জন্য আমি কিছু শুনতে পাইনি।

—কর্নেল সায়েব!

ও. সি. গোপেশ্বর সিনহার ডাকে সচেতন হয়ে বললুম—বলুন মিঃ সিনহা!

—তেরপলটা ছেঁড়াখোঁড়া। এটার তলায় কয়েকটা নাইলনের দড়ি পাওয়া গেছে। তা হলে লাশটা তেরপলে ভরে দড়িতে বেঁধে বয়ে এনেছিল খুনী।

—খুনী যদি একে বয়ে আনে, তা হলে তার গায়ে যথেষ্ট শক্তি থাকা দরকার। বল্লরী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে ছিল।

—ঠিক বলেছেন কর্নেল সায়েব!

—একটা লাশ বয়ে আনার সময় খুনীর পায়ের দাগ বা জুতোর ছাপ পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু এলাকায় গত তিনমাস বৃষ্টি হয়নি! গড়ের জঙ্গলে প্রায় সর্বত্র ঘন ঘাস। আবার যেখানে মাটি নগ্ন, সেখানটা পাথরের মত শক্ত। এই গর্তটা খুঁড়তে খুনীর প্রচুর সময় লেগেছিল, তা অনুমান করা সহজ নয়।

ডঃ মিশ্র বললেন—কর্নেল সায়েব! খুনী আবার গর্ত খুঁড়ে তেরপলটা নিয়ে যেতে এসেছিল। সেই কথাটা মিঃ সিনহাকে বলুন।

ডঃ মিশ্র আমার হাতের একটা তাস পুলিশকে দেখিয়ে দিলেন। পুঁতে রাখা তেরপল খুনী কেন আবার খুঁজে ফেরত নিতে এসেছিল—এই ব্যাপারটা আমার একটা নিজস্ব তদন্তের সূত্র ছিল। ডঃ মিশ্র সম্পর্কে তাঁর বাংলো থেকে বেরোনোর সময় এই ভয়ই করেছিলুম। কিন্তু এখন কী আর করা যাবে। কথাটা মিঃ সিনহাকে বলতে হল। মিঃ সিনহা শুধু বললেন—খুব অদ্ভুত ঘটনা বলতে হবে।

বললুম—মিঃ সিনহা! খুনী যে আবার গর্ত খুঁড়ে তেরপল নিয়ে যেতে এসেছিল, এমন না হতেও পারে। সম্ভবত কোনো আদিবাসী জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসে টাটকা বুজিয়ে রাখা গর্ত দেখে ভেবেছিল, ওখানে কেউ কিছু লুকিয়ে রেখেছে। আমাদের সাড়া পেয়ে ভয়ে সে পালিয়ে গেছে।

আমার যুক্তিটা মিঃ সিনহার মনঃপুত হল। তিনি বললেন—হ্যাঁ। এটা হতে পারে। খুনীর সাহস হবে না এসময়ে গড়ের জঙ্গলে ঢুকতে। কারণ পুলিশ ফোর্স জঙ্গলে এখনও আছে।

তিনি ধ্বংসস্তূপের অন্যপাশে গিয়ে হাতের ইশারায় কনস্টেবলদের ডাকলেন। তারা এলে তেরপলটা গুটিয়ে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন।

আমরা সেই পাথরের চত্বরের কাছে গেলুম। দু'জন অফিসার আর সশস্ত্রবাহিনী ইন্দ্রনীলদের কাছাকাছি দাঁড়িয়েছিল। ডাক্তার শচীন অধিকারী

আমাদের দেখে ঘুরে দাঁড়ালেন। গম্ভীর মুখে তিনি বললেন—মিঃ সিনহা কি মার্ডার উইপন খুঁজে পেয়েছেন?

মিঃ সিনহা একটু হেসে বললেন—না ডাক্তারবাবু! আমরা একটা পুরোনো তেরপল খুঁজে পেয়েছি। ওই দেখুন! তেরপলে জড়িয়ে লাশ বয়ে এনে ওই গর্তে খুনী ফেলে দিয়েছিল। তেরপলটা ধুয়ে রক্ত পরিষ্কার করলে আবার ওটা কাজে লাগবে। তাই খুনী ওটা পুঁতে রেখেছিল।

আমি এই সময় ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি ও সুদক্ষিণার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলুম। শুধু ইন্দ্রনীলের মুখে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চমকে ওঠার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ্য করলুম।

মিঃ সিনহা এবার গম্ভীর মুখে বললেন—রহমত সায়েব! আপনি আর পাণ্ডেজি দু'জন আর্মড কনস্টেবল আর বাকি সবাইকে নিয়ে থানায় যান। ইন্দ্রনীলবাবুদের কাছে আমরা আরও কথা শুনতে চাই।

ওঁরা তিনজন থানায় যাবেন। ডাক্তারবাবু নিজের কাজে যেতে পারেন। আপনার সঙ্গে আপাতত কথা বলার কিছু নেই।

ডাঃ অধিকারী বললেন—ইন্দ্রদের কি আপনারা অ্যারেস্ট করলেন?

—না। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

দলটির সঙ্গে ডাঃ অধিকারী কী সব কথা বলতে বলতে হাইওয়ের দিকে হাঁটতে থাকলেন। মিঃ সিনহা বললেন—ডাক্তারবাবু এই কেসে ইন্দ্রনীলদের জন্য উদ্বিগ্ন হতেই পারেন। কিন্তু ওঁর আচরণে উদ্বেগের খুব বাড়াবাড়ি লক্ষ্য করছি।

ডঃ মিশ্র বলে উঠলেন—ইন্দ্রনীল নাকি তার বাবার হাভেলি বিক্রি করতে এসেছে।

বেগতিক দেখে বললুম—আপনার কাজের লোক রামভকতের শোনা কথা। একে গুরুত্ব দেওয়ার মানে হয় না।

ডঃ মিশ্র আমার দিকে তাকিয়ে সংযত হলেন। একটু হেসে তিনি বললেন—আমি বলতে চাইছিলুম, ইন্দ্রনীল যদি সত্যি হাভেলি বেচতে চায়, ডাক্তার অধিকারী দালালির কমিশন খাবেন। সম্ভবত তাই ইন্দ্রনীলকে নিয়েই ওঁর মাথাব্যথা।

আমি পাথরের চত্বরে দাঁড়িয়ে বাইনোকুলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা দেখতে থাকলুম। মিঃ সিনহা আবার গর্তের কাছে গিয়ে কী পরীক্ষা করতে মন দিলেন। একটু পরে আমি বাইনোকুলার নামিয়ে ফেললুম—মিঃ সিনহা! আমি রেনবো অর্কিড দেখতে পেয়েছি। ভারুয়াকে নিয়ে যাচ্ছি। ডঃ মিশ্র কি আমার সঙ্গে যাবেন?

ডঃ মিশ্র বললেন, অবশ্যই যাব।

মিঃ সিনহা গর্তের ধারে দাঁড়িয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন—কর্নেল সায়েব!

আমি যথাসময়ে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। আমি জানি, অপরাধ রহস্যের চেয়ে প্রকৃতিতে আপনার আকর্ষণ বেশি।....

আমি পূর্ব-দক্ষিণে উঁচু ধ্বংসস্তূপের দিকে এগিয়ে গেলুম। ডঃ মিশ্র ভারুয়াকে ডেকে নিয়ে আমাকে অনুসরণ করলেন। সেই গর্তটার কাছে গিয়ে ভারুয়াকে আমি পঞ্চাশ টাকা বখশিস দিলুম। সে খুশি হয়ে টাকাটা নিয়ে তার হাফপ্যান্টের পকেটে রাখল। ডঃ মিশ্র অবাক হয়ে ইংরেজিতে বললেন—আপনি অতগুলো টাকা ওকে দিলেন! টাকা তো পুলিশের দেওয়ার কথা।

বললুম—ডঃ মিশ্র! ভারুয়াকে বখশিস দিলুম অন্য উদ্দেশ্যে। আপনি এই জঙ্গলে কোথায় রেনবো অর্কিড দেখেছিলেন, ঠিক করতে পারছেন না। এখন ভারুয়াকে রেনবো অর্কিডের কথাটা বুঝিয়ে বলুন। সে বনচর মানুষ। নিশ্চয় ওই আশ্চর্য অর্কিডের ফুল তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে খোঁজ দিতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

ডঃ মিশ্র দেহাতি ভাষায় ভারুয়াকে কথাটা বলতেই সে আমাদের ইশারায় অনুসরণ করতে বলল। জঙ্গল ক্রমশ দুর্গম হচ্ছিল। তাই আমি ভারুয়াকে আমার কিটব্যাগ থেকে নাইফ বের করে দিলুম। সে এবার ঝোপ লতাপাতা কাটতে কাটতে এগিয়ে চলল। সবখানেই প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আর ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা চৌকো গ্রানাইট পাথর। তাই হেঁটে যাওয়া বেশ কষ্টকর ব্যাপার। কিন্তু বনচর লোকটির উদ্যম অবাক হবার মত। বোঝা যাচ্ছিল, সে আমাদের রেনবো অর্কিডের এলাকায় পৌঁছে না দিয়ে থামবে না। প্রায় আধঘন্টা পরে একটা ঘাসে ঢাকা খোলা জায়গায় সে থামল। দক্ষিণে একটা টিলা দেখা যাচ্ছিল। সে আমাদের দাঁড়াতে ইশারা করে টিলাটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর টিলার নীচে হাতির মত উঁচু পাথরে উঠে গিয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে ঘুরে তর্জনী দিয়ে সংকেত করল। আমি বাইনোকুলারে সেদিকটা দেখেই আনন্দে অস্থির হয়ে উঠলুম। নিবিড় এবং উঁচু গাছপালার ডালে ইতস্তত রামধনুর ছটা চোখে পড়ল। তখনই সেই দিকে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলুম।

বেনবো অর্কিড পরজীবী। গাছের ডালে এদের আশ্রয়। প্রায় দেড়ফুট লম্বা সবুজ পাতা গাছের ডাল থেকে ঝুলছে। পাতার কেন্দ্রে প্রকাণ্ড লালচে ফুল ফুটেছে। সেই ফুলে রোদ পড়ে ইন্দ্রধনুর বিচিত্র বাহার দেখা যাচ্ছে। আমি ক্যামেরায় পরপর অনেকগুলো ছবি তুলে নিলুম। ডঃ মিশ্র বললেন—জায়গাটা এবার চিনতে পেরেছি। উডডাক পাখিটাকে এই গাছের ডালে দেখেছিলুম।

তিনি গাছটা দেখিয়ে দিলেন এবং বাইনোকুলারে উডডাকটা খুঁজতে থাকলেন। ততক্ষণে ভারুয়া আমাদের কাছে এসেছিল। সে তার ভাষায় বলল, সামনে কৈলি নদী। নদীর কাছে জঙ্গলের গায়ে মৌচাক ভাঙতে এসে ফুলগুলো সে দেখতে

পেয়েছিল। দেবতার ফুল এ গুলো। তাই তাকে যদি ওই ফুল পেড়ে আনতে বলা হয়, সে হাজার টাকা বখশিস পেলেও তা পাড়বে না। ওই ফুলে হাত দিলে হাতে কুষ্ঠ হবে।

তার মনোভাব বুঝতে পারলুম, সে নিজে রেনবো অর্কিডের ঝাড় তো পেড়ে আনবেই না, আমরা যদি পেড়ে আনার চেষ্টা করি সে বাধা দেবে।

এমন একজন উপকারী লোকের সংস্কারে আঘাত দেওয়াটা উচিত মনে করলুম না। পরে গোপনে এসে ওই অর্কিড সংগ্রহ করে নিয়ে যাব। আমি জানি রেনবো অর্কিডের পরাগের নীচে বীজ কণিকার একটা ছোট্ট থলে আছে। একেকটা থলেতে প্রায় ৪৭ লক্ষ অর্কিডের বীজকণিকা থাকে।

ডঃ মিশ্রকে বললুম—ভারুয়াকে বিদায় দেওয়া যাক। আমরা বরং শুকনো কৈলি নদী পেরিয়ে গিয়ে স্টেশন থকে আসা পিচ রাস্তায় উঠব। তারপর হাইওয়েতে গিয়ে গাড়িতে চাপব।

ডঃ মিশ্র তাকে বুঝিয়ে দিলেন, এবার আমরা বাড়ি ফিরব। এখান থেকে রাস্তায় পৌঁছানোর কোনো অসুবিধে হবে না।

ভারুয়া তখনই যে-পথে এসেছিল, সেই পথে চলে গেল। একটু পরেই জঙ্গলের ভেতর সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরা ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে কৈলি নদীর ধারে পৌঁছালুম। একফালি জলস্রোত ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। নদীর পূর্ব পাড় রাস্তা থেকে ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। ঢালু অংশে উঁচু ঘাসের জঙ্গল।

নদীর জলটুকু ডিঙিয়ে গিয়েই থমকে দাঁড়ালুম। ডঃ মিশ্র বললেন—কী ব্যাপার?

এখানে বালির চড়ায় তত উঁচু পাথর নেই। ইতস্তত যে সব পাথর ছড়িয়ে আছে, তা আকারে ছোট। কিন্তু আমার চোখে পড়েছিল বালির চড়ার পূর্ব দিকে ঢালের নীচে মোটর গাড়ির টায়ারের গভীর দাগ। কোনো গাড়ির দুটো চাকা কিনারার বালি পর্যন্ত এসে থেমে গিয়েছিল।

আর যেখানে থেমেছিল, সেখানে লম্বা অস্পষ্ট কিছু ছাপ। গুঁড়ি মেরে বসে সেই ছাপের একপ্রান্তে কালচে ছোপটা আতশ কাচে দেখে নিলুম। ডঃ মিশ্র উত্তেজিত ভাবে বললেন—কী এগুলো? উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—কেউ রাস্তা থেকে ঢালু ঘাসের জমিতে একটা মোটরগাড়ির পেছনের দিকটা নামিয়ে এনেছিল। ওই দেখুন চাকার দাগে গর্ত হয়ে গেছে। আর ওখানে এককোঁটা রক্ত।

—তার মানে? কী বলতে চাইছেন কর্নেল সায়েব?

—আমার মনে হচ্ছে, বল্লরীর লাশ খুনী মোটরগাড়ির ডিকিতে ঢুকিয়ে এনে এখানে ফেলেছিল। তারপর গাড়িটা চলে যায়। তেরপলে মোড়া লাশটা কেউ বা কারা তুলে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই চত্বরের পাশের গর্তে ফেলে দেয়।

—কিন্তু কোনো পায়ের দাগ নেই কেন?

—জল ছিটিয়ে পায়ের দাগ নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। বালিতে জলের দাগ স্পষ্ট। খুনী এবং তার সহচর বুদ্ধিমান লোক। লক্ষ্য করে দেখুন ডঃ মিশ্র! স্টেশন রোডের ধারে ঘন জঙ্গল। শুধু একটা জায়গা সামান্য ফাঁকা। ওখান দিয়ে গাড়ি পিছু হটিয়ে চালু ঘাসের জমিতে নামলে রাস্তা থেকে চোখে পড়ার চান্স কম।

—হেড লাইট?

—গাড়ি হেডলাইট বন্ধ রাখা হয়েছিল। খুনী এই জায়গাটা আগে থেকে দেখে রেখেছিল! হাইওয়ে বা এই স্টেশন রোডের অন্যত্র কোথাও গাড়ি থামিয়ে লাশ নামালে লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। আর গাড়ি ছাড়া লাশ পঞ্চগড়ের বাঙালিটোলা থেকে কাঁধে বয়ে আনলে অসংখ্য লোকের চোখে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। গভীর রাতে লাশ বয়ে আনলে হাইওয়েতে পুলিশ পেট্রল আছে। তা ছাড়া ওই মোড়ে একটা গুমটি ঘর আছে পুলিশের। হাইওয়েতে প্রায়ই ডাকাতি হয়। তাই এই ব্যবস্থা।

বললুম—দুঃখের বিষয়, গাড়িটার চাকার দাগের ছাপ পড়েনি। বালিতে শুধু গর্ত হয়েছে। তবু দেখি, একটু ছাপও খুঁজে পাই নাকি। আমার কাছে ছাপ তোলার সরঞ্জাম নেই। ক্যামেরাই যথেষ্ট।

বলে বালির দুটো গর্তের উপর ইঞ্চি কয়েক অংশের যে অস্পষ্ট ছাপ ছিল, তার ছবি ক্যামেরায় তুলে নিলুম। তারপর বললুম—চলুন ডঃ মিশ্র! ঢালু ঘাসজমি বেয়ে আমরা রাস্তায় যাই।

ঢালু ঘাসজমিতে গাড়ির চাকার চাপে ঘাস চ্যাপটা হয়ে যাওয়ার দাস স্পষ্ট। আমরা দুজনে রাস্তায় উঠে গেলুম। একটা এক্কাগাড়ি ট্রেনযাত্রীর আশায় স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। সেটা থামিয়ে কোথায় যাব বলতেই এক্কাওয়ালা রাজি হয়ে গেল। ভাড়াটা অবশ্য একটু বেশিই হাঁকল সে। কিন্তু এখন ডঃ মিশ্রের বাংলোয় ফিরে গোপনে আমাকে বল্লরীর ভ্যানিটি ব্যাগটা খুলে দেখতেই হবে।

ডঃ মিশ্রের গাড়ি হাইওয়েতে যেখানে রাখা আছে, এক্কাগাড়ি সেখানে যাবে না। কারণ হাইওয়েতে এসব গাড়ি যাতায়াত নিষিদ্ধ। হাইওয়ের মোড়ে তাই আমাদের নামতে হল।

দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে আদিবাসীদের দোকানের কাছে গিয়ে দেখলুম, সেখানে পুলিশের গাড়ি নেই। কাজ শেষ করে পুলিশ চলে গেছে। ইমানুয়েল বিষণ্ণভাবে বলল—মেয়ে মানুষটাকে আমি ভূত ভেবেছিলুম! আমারই ভুল।

ডঃ মিশ্রের বাংলোতে পৌঁছুতে সওয়া একটা বেজে গিয়েছিল। রোমিলা দেবী কলেজে গেছেন। ডঃ মিশ্র আমাকে স্নান করতে বলে নিজে স্নান করতে গেলেন। কিন্তু আমি গ্রীষ্মকালে সপ্তাহে তিনবার স্নান করি। এখানে অবশ্য গ্রীষ্মের প্রখর

তাপ নেই। কিন্তু আজ আমার স্নানের দিন নয়। সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে হাতদুটো সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেললুম। দাড়ি ভিজে যাবে বলে শুধু চোখে ও কপালে জল ছেটালুম। টাক ভেজা তোয়ালেতে মুছে নিলুম। এতেই শরীর স্নিগ্ধ হয়ে উঠল।

ডাইনিং রুমে মালতী আমাদের খাবার পরিবেশন করল। ডঃ মিশ্র জাতিভেদ প্রথা মেনে চলেন তা জানতুম না। জানতে পারলুম, যখন তিনি জানিয়ে দিলেন রামভকত এবং তার স্ত্রী মালতী জাতিতে ব্রাহ্মণ।

খেতে বসে আমি কথা বলা পছন্দ করি না। কিন্তু ডঃ মিশ্র বল্লরীর খুনের ব্যাপারে তাঁর মাথায় যতরকম থিয়োরি এসেছে, তা জানাতে থাকলেন। আমি শুধু হুঁ দিয়ে গেলুম। তাঁর একটা প্রধান থিয়োরি, বল্লরী ঝগড়া করে দলছাড়া হয়ে বাঙালিটোলায় ফেরার সময় কোনো লম্পটের পাল্লায় পড়েছিল। বাঙালিটোলা নির্জন এলাকা। তাই তাকে জোর করে তুলে নিয়ে কোনো পোড়ো বাড়িতে কেউ ধর্ষণ করে এবং গলা টিপে মেরে ফেলে। সে বল্লরীর চেনা কোনো লোক। বল্লরী ইন্দ্রনীলদের সঙ্গে এখানে আগেও কতবার বেড়াতে এসেছে। নিশ্চয় লোকটার সঙ্গে তার পরিচয়ও হয়েছিল।

আর ওই ত্রিশূল বা বাঘনখের ক্ষতচিহ্ন বল্লরীর মৃতদেহে আঘাতের ফলে হয়েছে। এই ক্ষত তৈরির কারণ গড়ের জঙ্গলে আরও চারটে একইভাবে মৃত লোকের দলে বল্লরীকে শামিল করা। পুলিশ এবং লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হবে।

ডঃ মিশ্রের এই থিয়োরির শেষ অংশটুকু আমার যুক্তিযুক্ত মনে হল। তবে তার মৃতদেহে আঘাত করা হয়েছিল কি না, তা নিখুঁতভাবে পোস্টমর্টেমের ফলে জানা যেতে পারে।

খাওয়ার পর আমি গেস্টরুমে গিয়ে একটুখানি ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করার জন্য দরজা বন্ধ করে দিলুম। জানালাগুলোতে পর্দা টানা ছিল। কিটব্যাগ থেকে সোনার হারের টুকরো আর ভ্যানিটি ব্যাগটা বের করে টেবিলে রাখলুম।

তাড়াহুড়ো না করে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করার জন্য চুরুট ধরালুম। ফ্যান ফুল স্পিডে ঘুরছিল। তাই চুরুটের গন্ধে ঘরে দম আটকানো অবস্থা সৃষ্টি করতে পারছিল না। মাঝে মাঝে চুরুটের গন্ধ আমার নিজেরই কটু মনে হয়। কিন্তু এখন আমি একটি মৃত মেয়ের কুড়িয়ে পাওয়া ছোট্ট ব্যাগের সামনে বসে আছি। এর মধ্যে তেমন কিছু নাও পেতে পারি, যা আমাকে সত্যে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। আবার এমনও তো হতে পারে, যা আমাকে সত্যে পৌঁছুতে সাহায্য করবে, তাকে আমি ভুল করে গুরুত্বই দিলুম না!

আসলে একটা সন্ধিকালের দিকে এগিয়ে চলার পথে এখন হাঁটছি। জানি না আমার জন্য কী অপেক্ষা করছে। সাফল্যের সূত্র, না কি ব্যর্থতা?

একটু পরে মনে হল, ব্যাগটাকে আমি যুক্তিহীনভাবে গুরুত্ব দিচ্ছি। অবহেলার ভঙ্গিতে মধ্যেকার জিপটা টেনে ব্যাগ খুলে দিলুম। দু'পাশে আরও

ছোট জিপ আছে। মাঝখানের অংশ থেকে বেরিয়ে এল একটা সাদা রঙের গুটিয়ে রাখা রুমাল। রুমালের চারদিকে হাল্কা নীলপাড় এবং নীচে কয়েকটা হাল্কা নানা রঙের রেখা। বল্লরীর ঠোঁটে আমি রঙ দেখিনি। রুমালটা নেহাত মুখ মোছার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। তার তলায় একটা ছোট্ট চিরুনি, ছোট্ট গোল আয়না, কয়েকটা চুলের কালো ক্লিপ।

সেগুলো টেবিলে রুমালের নীচে রেখে অ্যাশট্রে চাপা দিলুম। তারপর বেরোলো একটা ইঞ্চি তিনেক লম্বা এবং স্প্রে-আঁটা পারফিউমের শিশি। একটা ডট পেন। তারপর খুদে প্যাড। প্যাডটা ইঞ্চি তিনেক চওড়া, ইঞ্চি চারেক লম্বা। ওপরে আলমারির ছাঁদে ছাপা মনোগ্রাম। আতস কাঁচের সাহায্যে পড়া গেল, ইংরেজি তিনটে অক্ষর : ও এ বি। প্যাডটায় কিছু লেখা নেই। তবে বেশ কিছু পাতা খরচ করা হয়েছে।

পেছনের সরু জিপটা টেনে খুললুম। একটু ফাঁক করতেই কতকগুলো ঝকঝকে সাদা নেমকার্ড দেখা গেল। বের করে দেখলুম, লেখা আছে : বি দাশগুপ্ত। তার নীচে 'ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ওভারসিজ এশিয়ান ব্যাঙ্ক লিমিটেড। সার্কাস অ্যাভিনিউ। কলকাতা।' ব্যাঙ্কের ফোন নাম্বার এবং বাড়ির ফোন নাম্বার ওপরে-নীচে দেওয়া আছে। বোঝা গেল, এটা অফিসের কার্ড। তবে বাড়ির ফোন নাম্বার থাকায় বাড়ির ঠিকানা জানবার অসুবিধে নেই।

কিন্তু বল্লরী দাশগুপ্ত একটা বড় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার ছিল, এটা ভাবতে অবাক লাগছে। ট্রেনে তার সঙ্গে পরিচয়ের সময় এই বিস্ময়টা জাগেনি। ভেবেছিলুম সাধারণ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার হওয়াটা তার মত শিক্ষিত এবং স্মার্ট যুবতীর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

কার্ডগুলোর তলা থেকে বেরিয়ে এলো হিরে বসানো সোনার আংটি। আংটিটা আমি বল্লরীর আঙুলে দেখিনি। এটা কি কারও উপহার দেওয়া আংটি বলেই ব্যাগে লুকিয়ে রেখেছিল বল্লরী! সৌরজ্যোতির উপহার? আংটিটা টেবিলে রেখে বের করলুম একটা ভাঁজ করা কাগজ।

কাগজটা দেখে খুব আশা করেছিলুম, এতে অভাবিত কিছু পেয়ে যাব। কিন্তু ভাঁজ খুলে দেখলুম, ওতে হিজিবিজি অঙ্ক কষে কেটে দেওয়া হয়েছে। কাগজটা ছ'ইঞ্চি লম্বা আর চার ইঞ্চি চওড়া। ব্যাঙ্কেরই প্যাডের কাগজ। কারণ উপরে ঠিক মাঝখানে 'ও এ বি' মনোগ্রাম ছাপানো। আতস কাচের সাহায্যে অঙ্কগুলো পড়ার চেষ্টা করলুম। পড়া গেল না। ডটপেনের কালো কালিতে লেখা হিসেব। কিসের হিসেব? একখানে পার্সেন্টেজের প্রতীক চিহ্ন % পড়া গেল কালিতে ঘষে ফেলা। বর্ণমালা কিংবা সংখ্যা পড়ার যন্ত্র আমার কিটব্যাগে নেই। কলকাতার পুলিশ হেড কোয়ার্টার লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ওই যন্ত্র দেখেছিলুম। পঞ্চগড় থানায় তা থাকবে বলে মনে হল না। কিন্তু এই কাগজটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ

মনে হল দুটি কারণে। এক : কাগজটা বল্লরী তার হ্যান্ডব্যাগে রেখেছে। দুই : ওই পার্সেন্টেজের প্রতীকচিহ্ন। ওটা কি শতকরা বার্ষিক সুদের হিসেব? এবার তৃতীয় একটা কারণ মাথায় এসে গেল। বল্লরী একটা বিদেশি ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

এই একটা কাগজ কী কাজে লাগবে জানি না। কিন্তু আমি কিটব্যাগের ভিতরে একটা খোপে চালান করে দিলুম। তারপর এ ব্যাগের সরু জিপটা টেনে খুললুম।

প্রথমে বেরিয়ে এলো চারটে একশো টাকার নোট। রেলের রিটার্ন টিকিট। তারিখ ২৪ এপ্রিল। তার মানে মাত্র চারদিনের জন্য বেড়াতে এসেছিল বল্লরী ও তার বন্ধুরা।

একটু খটকা লাগল। বল্লরী তার টিকিটটা আলাদা রেখেছে কেন? দলবেঁধে এলে একজনের কাছে টিকিট রাখা স্বাভাবিক।

কিছু খুচরো পয়সা আছে টাকার তলায়। তারপর হাতে শক্ত কী একটা জিনিস ঠেকল। সেটা বের করেই আমি চমকে উঠলুম। পয়েন্ট ২২ ক্যালিভারের একটা সিক্স রাউন্ডের রিভলভার। এটা কি চোরাই অস্ত্র? সেই খোপটার ভিতরে নিচের দিকে একটা খুদে জিপ আবিষ্কার করলুম। সেটা খুলে অস্ত্রটার লাইসেন্স-বুক পাওয়া গেল। গত জানুয়ারিতে রিনিউ করা লাইসেন্স।

একটা মারাত্মক অস্ত্র থাকতেও হতভাগিনী মেয়েটি এমন নৃশংসভাবে মারা পড়ল!

কাল বিকেলে সৌরজ্যোতি নাকি বল্লরীর গলা থেকে হার খুলে ছুঁড়ে ফেলেছিল। হারটা সে জোরে টেনেছিল। বল্লরীর হ্যান্ডব্যাগটাও তা হলে সে মজা করার ছলে ছুঁড়ে ফেলেছিল।

ইমানুয়েলের কথা অনুসারে বোঝা যায়, বল্লরী একা হার ও ব্যাগটা খুঁজতে গিয়েছিল।

কিন্তু পরে সে একা গিয়েছিল কেন? সৌরজ্যোতি ছুঁড়ে ফেলার পর সে নিশ্চয় খুঁজে পায়নি। শুধু সে একা নয়, অন্যরাও খুঁজেছিল—তারাও খুঁজবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু জায়গাটা এমন যে ছুঁড়ে ফেলা জিনিস তারা খুঁজে বের করতে পারেনি।

নাকি খুঁজে দেখার সময় কোথাও বাধা এসেছিল? কী সেই বাধা? নাকি পাতালমন্দিরে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো ছিল? হয়তো সন্ধ্যা হয়ে গেলে পাতাল-মন্দিরে ঢোকা যায় না।

আমি সব জিনিস, যা যেখানে সেভাবে ছিল বল্লরীর হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে জিপ এঁটে দিলুম। শুধু ভাঁজ করা কাগজটা আমার কিটব্যাগে থেকে গেল।

ঘড়ি দেখলুম, প্রায় তিনটে বাজে। বল্লরীর ব্যাগ আমার কিটব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলুম। ছেঁড়া হারটা বুকপকেটে রাখলুম।

উনি বিশ্রাম নিচ্ছেন। খুব বেশি রকমের হাঁটাহাঁটি হয়েছে। মিঃ সিনহা বললেন, কর্নেল সায়েবকে তাঁর কোয়ার্টারে কফি পানের আমন্ত্রণ জানাতে চান।

আমি বললুম, উনি উঠলে জানিয়ে দেব। আপাতত রোমিলা কলেজ থেকে না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আপনার আপত্তি নেই তো?

একটু হেসে বললুম—মোটেও না। রোমিলা দেবী এলে একসঙ্গে কফি খেয়ে তারপর বেরোব।

ডঃ মিশ্র খুশি হয়ে বললেন ঠিক বলেছেন। রোমিলা ফোন করেছিল। সাড়ে তিনটেয় পৌঁছে যাবে। আজ বিকেলে তার কোনও ক্লাস নেই।....

কিছুক্ষণ পরে গেটের দিকে চাপা হর্নের শব্দ শুনে দেখলুম, রামভকত গেট খুলে দিল এবং একটা সবুজ রঙের মারুতি গাড়ি চালিয়ে রোমিলা দেবী লনের উত্তর দিকে অদৃশ্য হলেন। বাংলোর উত্তর-পূর্বে গ্যারাজ ঘর আছে দেখেছিলুম। কিন্তু লক্ষ্য করিনি যে ডঃ মিশ্রের গাড়িটা ছাড়াও তাঁর স্ত্রীর একটা সুন্দর গাড়ি আছে। রোমিলা দেবীর কাঁধে ব্যাগ ঝুলছিল। তিনি সোজা আমাদের কাছে চলে এলেন। ডঃ মিশ্র একটু হেসে বললেন—তোমার সঙ্গে কফি পান না করে কর্নেল সায়েব বেরোবেন না। ওদিকে ও.সি. মিঃ সিনহার কোয়ার্টারে তাঁর কফিপানের আমন্ত্রণ আছে।

রোমিলা কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে রেখে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। তারপর ব্যাগ খুলতে খুলতে বললেন—কর্নেল সায়েব নিশ্চয় টের পেয়েছিলেন, আমি তাঁর জন্য একটা অসাধারণ জিনিস এনেছি। ডঃ মিশ্র জিজ্ঞেস করলেন—শিগগির বের কর। দেখি, কী এনেছ! রোমিলা সাদা পলিথিন ব্যাগে মোড়া একটা চৌকো জিনিস বের করে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—বলুন তো এটা কী হতে পারে?

বললুম—ইতিহাসের অধ্যাপিকা কলেজ থেকে ফিরলেন। আমার জন্য অসাধারণ যে জিনিসটা এনেছেন, তা সম্ভবত কলেজ লাইব্রেরিতে খুঁজে পাওয়া কোনো পুরনো বই। বইটা ইতিহাস ছাড়া আর কী হতে পারে? সেটা ধুলো ময়লা লেগে এবং প্রাচীনতার কারণে নোংরা ও জীর্ণ। তাই পলিথিনের মোড়ক।

রোমিলা হাসলেন—আপনি সত্যি ধুরন্ধর মানুষ কর্নেল সায়েব।

আপনি ঠিকই ধরেছেন।

আমি তা বলে আর ময়লা ঘাঁটছি না। এটা আপনি রাখুন।

ডঃ মিশ্র বললেন—কী বই ওটা?

রোমিলা বললেন—আমার এক ছাত্রী ক্যাটালগে কী একটা বই খুঁজছিল। আমি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, তুমি তো প্রায়ই দেখি ক্যাটালগ খুঁজে বই বের কর। পঞ্চগড়ের ইতিহাস সংক্রান্ত একটা বই এক সায়েবের লেখা। সেটা নয়।

অন্য কোনও বইয়ের খোঁজ রাখ? তখনই সে ক্যাটালগ খুঁজে একটা নাম্বার নিয়ে ড্রয়ারের সামনে গেল। তারপর একটা কার্ড খুঁজে বের করল।

ডঃ মিশ্র বললেন—আহা, বইটা কী বলো?

—বেণীমাধব রায় তাঁর লাইব্রেরির সব বই কলেজকে দান করেছিলেন। তাঁর ঠাকুরদা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের লেখা ইংরেজি বই 'দি ওরিজিন অব রাজ ফ্যামিলি অব পঞ্চগড় অ্যান্ড দা হিস্টরি অব দেয়ার রাইজ অ্যান্ড ডিক্লাইন।' তখনকার দিনে এইরকম লম্বা টাইটেলে বই লেখা হতো।

বইটা হাতে নিয়ে বললুম—ধন্যবাদ মিসেস মিশ্র!

রোমিলা উঠে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বললেন—নাকে রুমাল বেঁধে পড়বেন। দুই হাতে রবারের গ্লাভস পরা উচিত। আমার গ্লাভস আছে। কিন্তু আপনার হাতে তা ঢোকানো যাবে না। আচ্ছা সুরজ! পাখি ঘাঁটাঘাঁটির জন্য একজোড়া গ্লাভস তুমি ব্যবহার করতে না?

ডঃ মিশ্র হাসলেন—আমার গ্লাভস কর্নেল সায়েবের প্রকাণ্ড হাতে ঢুকতে ফেটে যাবে।

বললুম—চিন্তা করবেন না মিসেস মিশ্র! আমার কিটব্যাগে মানুষের দরকারি সবরকম জিনিস আছে। মালতীকে কফি করতে বলে শিগগির এখানে চলে আসুন।

বইটা আমি ঘরে ঢুকে টেবিলে রেখে এলুম। পঞ্চগড়ের ইতিহাস বা তার রাজাদের পারিবারিক কাহিনী আমার কী কাজে লাগবে জানি না। কিন্তু কী একটা অবচেতন কৌতূহল আমাকে এগুলো জানাবার জন্য মাঝেমাঝে তাগিদ দিচ্ছে, এটা সত্য।

কিছুক্ষণ পরে তিনজনে একত্র কফিপান এবং বল্লরীর হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে এলোমেলো আলোচনার পর উঠে পড়লুম। ডঃ মিশ্র গ্যারাজ থেকে গাড়ি আনতে গেলেন। আমি বাইনোকুলার, ক্যামেরা গলায় ঝুলিয়ে পিঠে কিটব্যাগ এঁটে বেরোলে রোমিলা দেবী সকৌতুকে বললেন—ও.সি. মিঃ সিনহার কোয়ার্টার কি গড়ের জঙ্গলে যে, আপনি এই বেশে সেজেগুজে বেরোচ্ছেন?

বললুম—মিঃ সিনহার কোয়ার্টার গড়ের জঙ্গলে নয়। কিন্তু কিছু বলা যায় না। ওঁর কোয়ার্টার থেকে গড়ের জঙ্গলে গিয়ে ঢুকতেও পারি!

—প্লিজ কর্নেল সায়েব! বিকেলের পর ওদিকে পা বাড়াবেন না। সুরজকেও আমি নিষেধ করে দিচ্ছি।

হাসতে হাসতে বললুম—না! আজ আর গড়ের জঙ্গলে যাচ্ছি না। আপনি চিন্তা করবেন না।....

বাঙালিটোলা তেমনই নিঝুম। পুরোনো জনপদের ভিড় থেকে বাঁদিকে কৈলি নদীর সেতু পেরিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যে থানা এলাকায় পৌঁছে গেলুম। থানার সামনে একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়েছিল। সে সেলাম দিয়ে বলল—ও.সি. সায়েব

তাঁর কোয়ার্টারে আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। ওই গেট দিয়ে ঢুকে ডানদিকে প্রথম বাড়িতে ও.সি. সায়েব থাকেন।

বলে সে হন্তদন্ত গাড়ির রাস্তা পেরিয়ে নাকবরাবর হেঁটে সেই বাড়ির কাছে গেল এবং অদৃশ্য হল। দুধারে সবুজ ঘাস আর রঙিন ফুল বাগানের মধ্য দিয়ে গাড়ি এগিয়ে গেল।

লনের একপাশে গাড়ি রেখে ডঃ মিশ্র বেরোলেন। আমি গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে ফুলবাগানে একটা প্রকাণ্ড প্রজাপতি দেখে ক্যামেরা তাক করেছিলুম। বিকেলের আলোয় প্রজাপতিরা চঞ্চল হয়ে উড়ছিল। একবার কোথাও তার বসার প্রতীক্ষা শুধু। ডঃ মিশ্র একটু তফাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন—কী ব্যাপার!

প্রজাপতিটা একটা ফুলে বসামাত্র শাটারে চাপ দিলুম। তারপর গাড়ি থেকে নেমে বললুম—এখানে 'কণিষ্ক কানাসে' প্রজাতির প্রজাপতি দর্শনের আশা করিনি।

ও.সি. মিঃ সিনহা এগিয়ে আসছিলেন। তিনি সহাস্যে বললেন—বিরল প্রজাতির প্রজাপতি যদি হয়, তা হলে কর্নেল সায়েব আমার কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন!

বললুম—অবশ্য মিঃ সিনহা। শিকারীদের মত প্রকৃতিবিদদেরও কিছু সু বা কু সংস্কার থাকে। আমারও আছে। এই প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মিললে আমি বুঝতে পারি, আমার সাফল্য সুনিশ্চিত।

ডঃ মিশ্র সকৌতুকে চাপা স্বরে বললেন—সাফল্য বর্তমান হত্যারহস্য বিষয়ে কি?

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—হ্যাঁ।

মিঃ সিনহার বসার ঘরটা সুন্দর সাজানো। সোফায় আমাদের বসতে বলে তিনি ভিতরে গেলেন। একটু পরে ফিরে এসে বললেন—কফি আসবার আগে কয়েকটা জরুরি কথা বলে নিই। বল্লরী দাশগুপ্তের বাবাকে কলকাতার পুলিশের মাধ্যমে খবর দেওয়া হয়েছিল। ভদ্রলোক একজন রিটায়ার্ড গভর্নমেন্ট অফিসার। বল্লরীর মা বেঁচে নেই। তার বাবা শুভময় দাশগুপ্তের সঙ্গে তার মামা নীতীশ সেন এসেছেন। মিঃ সেন একটা ফিনান্সিয়াল সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ওঁরা উঠেছেন গ্রিনভিউ হোটেলে। ওঁরা বডি শনাক্ত করেছেন মর্গে।

জিজ্ঞেস করলুম—ওঁরা কি বডি কলকাতা নিয়ে গিয়ে শেষকৃত্য করবেন?

—না। বাঙালিটোলায় কয়েকজন বাঙালি এখনও আছেন। কৈলি নদীর ধারে ওঁদের একটা শ্মশান আছে। ডাঃ শচীন অধিকারীর সঙ্গে ওঁদের আলাপ করিয়ে দিয়েছি। এতক্ষণে বডি ওঁরা ডেলিভারি নিয়ে শ্মশানে গেছেন।

—ওঁরা সৌরজ্যোতি, ইন্দ্রনীল আর সুদক্ষিণার সঙ্গে কথা বলেছেন কি?

—আমি দেখা করে ইচ্ছে মত প্রশ্ন করার প্রস্তাব দিয়েছিলুম। শুভময়বাবু

বললেন, ওদের সঙ্গে কথা যা বলার কলকাতায় ফিরে বলবেন। ভদ্রলোক সামনে পেলে ওদের গুলি করে মারবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন।

—সৌরজ্যোতিরা কোথায় আছে?

—ওকে আর ইন্দ্রনীলকে থানার হাজতে রেখেছি। ওদের কথায় কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছি। আজ রাতভর জেরা চলবে।

—সুদক্ষিণাও কি হাজতে আছে?

মিঃ সিনহা ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন—আমাদের থানায় মেয়েদের জন্য একটামাত্র সেল আছে। সেখানে তিনটে চুরি, একটা খুন আর একটা ডাকাতি কেসে জড়িত মেয়ে আসামি আছে। ওদের পুলিশ হাজতে থাকার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি। বিভিন্ন দিনে ওদের কোর্টে তোলা হবে।

—সুদক্ষিণা তাদের সঙ্গে আছে?

মিঃ সিনহা আস্তে বললেন—কাল ইন্দ্রনীলদের সঙ্গে ওকে কোর্টে তুলতে হবে। তবে সুদক্ষিণাকে যা ভেবেছিলুম আমরা, সে তা নয়। তার সরলতা নিছক অভিনয় বলে আমার ধারণা। এই কেসে প্রকৃত তথ্য তার কাছেই পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

ডঃ মিশ্র বললেন—তা হলে নিজে বেঁচে যাওয়ার জন্য পুলিশকে তার সব খুলে বলা উচিত। বলছে না কেন সে?

গোপেশ্বর সিনহা একটু চুপ করে থাকার পর বললেন—নিছক ধারণা। তবু বলছি, সুদক্ষিণা সম্ভবত ভেবেছে, দৈবাৎ ইন্দ্রনীল বা সৌরজ্যোতি এই কেসে রেহাই পেয়ে গেলে অথবা যদি তাদের শাস্তিও হয়, ওদের এমন কোনো বন্ধু বা স্বজন আছে, তাদের হাতে তার প্রাণ চলে যাবে।

বললুম—অর্থাৎ প্রাণের ভয়?

—ঠিক তা-ই। মিঃ সিনহা হাসলেন। —অন্তত চব্বিশটা ঘন্টা চুন্নী, ডাকাতনী আর খুনী দেহাতি মেয়ের সংসর্গে কাটালে সুদক্ষিণা সব ঝুঁকি নিয়েও মুখ খুলতে বাধ্য। দেখা যাক।

—বল্লরীকে খুনের মোটিভ কি খুঁজে পেয়েছেন আপনি?

—ত্রিকোণ প্রেমের পরিণাম। সৌরজ্যোতি আর ইন্দ্রনীল দুজনেই বল্লরীর প্রতি অনুরক্ত। সুদক্ষিণার কথায় এর আভাস পেয়েছি। 'বাঙালি হাভেলি'র কেয়ারটেকার ঝাব্বুলাল বলেছে, খুন হওয়া মেয়েটাকে নিয়ে দুই বাবুর মধ্যে ঝগড়া লক্ষ্য করেছিল সে। এর আগেও বল্লরী, ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি আর অন্য একটি মেয়ে বেড়াতে এসেছিল। সেবারও বল্লরীকে নিয়ে দুই বাবুর ঝামেলা বেধেছিল।

—কতদিন আগে?

—বাঙালিটোলায় গতবছর কালীপুজো হয়েছিল। পুজোর সময় তার মালিকের

ছেলে ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি, বল্লরী আর একটা মেয়েকে নিয়ে এসেছিল। তার নাম ঝাব্বুলাল ভুলে গেছে। তবে ইন্দ্রনীল আমাদের কাছে স্বীকার করেছে, তাদের সেই বান্ধবীর নাম লোপামুদ্রা গুহ। সে এখন নাকি মুম্বাইতে চাকরি করে।

এতক্ষণে একজন পরিচারিকা কফির ট্রে আনল। তার সঙ্গে যে মহিলা এলেন, তিনি নিশ্চয় মিসেস সিনহা। মিঃ সিনহা আলাপ করিয়ে দিলেন। —কর্নেল সায়েবকে একটা চমক দেব বলে এই কফির আসর। স্বাগতা! তোমার আরাধ্য দেবতাকে চিনতে পারছ তো? স্বাগতা আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে এলেন। বাংলায় বললুম—জুতো প্রণামের যোগ্য বস্তু নয়।

মিঃ সিনহা হাসতে হাসতে ইংরেজিতে বললেন—কর্নেল সায়েবের সত্যি তৃতীয় একটি চোখ আছে।

ভুরু কুঁচকে মৃদু হেসে বাংলায় বললুম—পাটনার বাঙালি মেয়ে। তাই না?

স্বাগতা হাসল—হ্যাঁ। আমি কলেজে পড়ার সময় থেকে কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা পড়তুম। জয়ন্ত চৌধুরীর লেখায় আপনার কত রোমাঞ্চকর কীর্তিকলাপ.....

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম—আমার এই এক দুর্ভাগ্য স্বাগতা দেবী! এসেছিলাম গড়ের জঙ্গলে রেনবো অর্কিডের খোঁজে। চিরকালের এক আততায়ী আমার সামনে একটা মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলে চ্যালেঞ্জ জানাল। তো আপনার জীবনসঙ্গীকে বাংলা শেখাননি কেন? ইংরেজিতে কথা বলে আনন্দ পাই না—বিশেষ করে আমাদের স্বদেশ এই ভারতভূমি।

—গোপেশ্বর তো ভাল বাংলা জানে!

গোপেশ্বর সিনহা বাংলায় বললেন—বলিনি আপনাকে এই চমকটা দেবার জন্য।

বললুম—দু'জনেই তা হলে পাটনার অধিবাসী। সম্ভবত একই পাড়ার বাসিন্দা।

মিঃ সিনহা বললেন—পাটনার গর্দানিবাগে বাঙালির বাস। বাবা ছিলেন অধ্যাপক।

—বুঝেছি! তা সন্তানদি?

—এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে পড়াশোনা করছে। মেয়ে ডঃ মিশ্রের মেয়ের সহপাঠিনী দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে।

স্বাগতা বললেন—জয়ন্তবাবু আপনার সঙ্গে আসেননি শুনেছি। কলকাতায় আমার মামার বাড়ি। কলকাতা গেলে আপনার সাহায্যে তাঁরও দেখা নিশ্চয় পাব।

ডঃ মিশ্র এতক্ষণে একটু হেসে বললেন—আমি ভি কুছু কুছু বাংলা বোলতে জানি। কিন্তু আমি জানতে না পারছে, মিঃ সিনহার ওয়াইফ বাঙালিনী, কর্নেলসাব ক্যায়সে বুঝ করলেন?

বললুম—আমার প্রথম সন্দেহ ছিল, ও.সি. মিঃ সিনহা তাঁর কোয়ার্টারে কফি পানের আমন্ত্রণ জানালেন কেন? তারপর আমাদের বসিয়ে তিনি ভেতরে গেলেন কেন? তৃতীয় সূত্র সন্দেহ হয়, স্বাগতা দেবীর চেহারা। বাঙালি যেখানেই বাস করুক, বিশেষ করে মেয়েদের চেহারায় কী একটা পৃথক লালিত্য আছে—না, আমি জানি অবাঙালি মেয়েদের তুলনায় বাঙালি মেয়েরা তত সুন্দরী নয়, হিন্দি ফিল্মই এর উদাহরণ—তো যাই হোক, মিঃ সিনহার অভিনয় তুলনাহীন। আজ কতক্ষণ গড়ের জঙ্গলে আমরা ঘুরেছি, উনি ঘূণাক্ষরে জানতে দেননি, উনি ভাল বাংলা জানেন এবং ওঁর স্ত্রী বাঙালি মহিলা।

মিঃ সিনহা বললেন—এবং কর্নেল নীলাদ্রি সরকারের গুণমুগ্ধ ভক্ত। সত্যসেবক পত্রিকায় ছাপা আপনার কত ছবি স্বাগতা খাতায় পেস্ট করে রেখেছে, কর্নেল সায়েব দেখলে অবাক হবেন।

ডঃ মিশ্র বললেন—মেয়েদের বয়স যা-ই হোক, মনে মনে বালিকা থেকে যায়।

—আপনার স্ত্রী তো ইতিহাসের অধ্যাপিকা!

—তাতে কী?

মনে মনে বিব্রত এবং একটু বিরক্ত হচ্ছিলুম। এভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছে না। মিঃ সিনহা একজন পুলিশ অফিসার। তাঁর চিন্তাধারা তার কাজের পদ্ধতি আমার চেয়ে পৃথক। কফি শেষ করে বললুম— মিঃ সিনহাকে এই চমকের জন্য ধন্যবাদ। আর স্বাগতা দেবীকে তাঁর তৈরি উৎকৃষ্ট কফির জন্য ধন্যবাদ।

মিঃ সিনহার এখন পুলিশের মেজাজ নেই। প্রশ্ন করলেন—কী করে জানলেন কফি স্বাগতারই তৈরি।

বললুম—স্বাগতা দেবী জানেন আমি কড়া কফি পান করি!

—ওঃ! তাই ডঃ মিশ্র বারবার দুধ মেশাচ্ছিলেন?

স্বাগতা বললেন—এবং তুমিও।

স্বাগতাকে আবার ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লুম। বললুম—মিঃ সিনহা কি এখন অফিসে যাবেন না?

—অবশ্যই যাবো। এক মিনিট। আমি তৈরি হয়ে আসছি। আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

ও.সি. গোপেশ্বর সিনহা ভিতরে গেলেন। আমরা বেরিয়ে লনে নামলুম। ডঃ মিশ্র গাড়িটা ঘুরিয়ে আনতে গেলেন। এই সময় স্বাগতা সিনহা আমাকে চাপা স্বরে বললেন—কর্নেল সায়েব! সব ঘটনা আমি জেনে নিয়েছি ওর কাছে। আমি কিন্তু শুনেছি ঝাব্বুলাল আর ডাক্তার অধিকারী রায়রাজাদের বাড়িটা বিক্রির তালে আছে। আমার সোর্স, কাজের মেয়ে লছমি। সে ঝাব্বুলালের খুড়তুতো বোন। আমার ধারণা, বল্লরী টের পেয়েছিল, ইন্দ্রনীল রায়কে খুন করা হবে। তাই—

সে থেমে গেল কারণ ডঃ মিশ্রের গাড়ি আমার কাছে এসে গেছে।

একটু হেসে বললুম—ধন্যবাদ.....

ও.সি. গোপেশ্বর সিনহার সঙ্গে আমি হেঁটে যাচ্ছিলুম। ডঃ মিশ্রকে থানার পার্কিং জোনে গাড়ি রেখে অপেক্ষা করতে বলেছিলুম। হাঁটতে হাঁটতে স্বাগতার কথাগুলো বাজিয়ে দেখছিলুম। স্বীকার করা উচিত, তার ধারণা আমার থিয়োরির কাছাকাছি। কিন্তু থিয়োরি যতক্ষণ না একটা ভিত্তি পাচ্ছে, ততক্ষণ তা নিছক ধারণা। ঝাব্বুলাল মদের নেশার ঘোরে হোক বা যে অবস্থায় হোক, আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে বলেছে, সে রায়রাজাদের হাভেলি কিছুতেই বেচতে দেবে না। সম্ভবত সে জানে না, ইন্দ্রনীলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। ওদিকে ডঃ মিশ্রকে সে পরোয়া করে না। না করতেই পারে। ডঃ মিশ্রের সঙ্গে বাঙালিটোলার কোনো সম্পর্ক নেই, সে তা জানে। তা ছাড়া ডঃ মিশ্র যে তাকে ভয় করেন, ঝাব্বুলাল তাও জানে।

স্বাগতার ধারণার সঙ্গে আমার চিন্তার একটু মিল এখানেই। এই ঘটনায় ডাঃ অধিকারীর ভূমিকা কী? তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট, ডাঃ অধিকারীর একটা গাড়ি আছে। স্টেশন রোডে কৈলি নদীতে পিছু হটে যাওয়া গাড়িটার চাকার কয়েক ইঞ্চি দাগের ছবি তুলেছি। আজ রাতেই ছবিগুলো ডেভালাপ এবং প্রিন্ট করতেই হবে। কয়েকটি ফিল্ম নষ্ট হবে। তা হোক।

হাঁটতে হাঁটতে মিঃ সিনহা বললেন—আপনি দুপুরে সেই বিরল প্রজাতির অর্কিড খুঁজে পেয়েছিলেন কি?

বললুম—হ্যাঁ। ভারুয়া শুধু বনচর নয়, গড়ের জঙ্গল তার সবটাই চেনা।

—আপনাদের ফিরতে দেখিনি। কোন্‌দিক দিয়ে ফিরছিলেন?

—কৈলি নদী পেরিয়ে স্টেশন রোড। তারপর হাইওয়েতে বাঁদিকে ঘুরে ইমানুয়েলের দোকানের পাশে রাখা ডঃ মিশ্রের গাড়িতে চেপেছিলুম। তখন আপনাদের সবাই চলে এসেছিলেন। তো, আপনি চত্বরটার পাশে গর্তের মধ্যে যেন কোনো সূত্র খুঁজে পেয়েছেন মনে হচ্ছিল?

—আমি বুঝবার চেষ্টা করছিলুম, খুনী লাশটা অন্য কোথাও না ফেলে ওই গর্তে কেন ফেলেছিল?

—কী মনে হয়েছে আপনার?

—খুনীর মনে হয়েছিল, লাশটা খুব শিগগির যেন কারও চোখে না পড়ে।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু ওই চত্বরটা কীসের জানেন?

—শুনেছি রায়রাজারা বৈদিক মতে যজ্ঞ করতেন ওখানে। ওটা চল্লিশ ফুট লম্বা চল্লিশ ফুট চওড়া। ১৬০০ বর্গফুট চত্বর। গ্রানাইট পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছিল। হ্যাঁ—ফেরার সময় নগ্ন পাথরে ভর্তি অসমতল মাঠ দিয়ে আসার সময়

একটুর জন্য বেঁচে গেছি। পেছনে আর্মড কনস্টেবল ছিল দু'জন। তারাও কী করবে ঠিক করতে পারেনি।

—বিষধর সাপ?

মিঃ সিনহা আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন—আপনার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করছি।

—এলাকায় বিষধর সাপ থাকার কথা আগে শুনেছিলুম।

—সাপ কী বলছি! শঙ্খচূড়! আচমকা পায়ের শব্দ শুনে একটা পাথরের পাশ থেকে ফণা তুলল! মাত্র দু'মিটার দূরত্ব! আমার বুকে ইচ্ছে করলেই ছোবল দিতে পারত।

—তারপর?

—আমার স্থির থাকা উচিত ছিল তারপর খুব আস্তে লোডেড রিভলভার বের করে গুলি করতে পারতুম। কিন্তু এক লাফে পিছিয়ে এসেছিলুম। কে বলে সাপ তাড়া করে না? সাপটা প্রায় লেজে ভর দিয়ে ছুটে এলো। অমনি ডাইনে সরে গেলুম। কনস্টেবল চিৎকার করছে সাপ! সাপ! বুঝুন অবস্থা। ওদের হাতে রাইফেল। যাই হোক, সাপটা আমার দিকে ঘুরতে একটু সময় লাগাল। তখন রিভলভার বের করে ফেলেছি। মাথা লক্ষ্য করে গুলি করলুম। পর-পর তিনটে গুলি।

—জায়গাটা কি ইমানুয়েলের দোকানের সোজা দক্ষিণে?

মিঃ সিনহা অবাক হলেন। —আপনি কি ওর পাল্লায় পড়েছিলেন? মিথ্যা কথা বললুম—হ্যাঁ। তবে পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিলুম। সম্ভবত ওর একটা জুটি আছে ওখানে। আর একটা কথা, কাছাকাছি কোথাও জলভরা ডোবা আছে। শঙ্খচূড় জলের কাছাকাছি এলাকায় থাকে।

কথা বলতে বলতে আমরা থানায় ঢুকলুম। ডঃ মিশ্র আমাদের অনুসরণ করছিলেন। থানার বাড়িটা নতুন। পুলিশের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম লক্ষ্য করলুম। করিডরের শেষপ্রান্তে ও.সি.-র ঘর খুলে দিল একজন কনস্টেবল। মিঃ সিনহা বললেন—বসুন আপনারা!

সেই কনস্টেবল ঘরে আলো জ্বালিয়ে পাখা চালিয়ে দিল। তারপর সেলাম ঠুকে বেরিয়ে গেল। মিঃ সিনহা বললেন—কর্নেল সায়েব যদি আসামীদের সঙ্গে কথা বলতে চান, ডাকব। প্রথমে কাকে ডাকব বলুন!

বললুম—সৌরজ্যোতিকে।

মিঃ সিনহা টেবিলে আটকানো সুইচ টিপলেন। ঘন্টা শুনে একজন কনস্টেবল এসে সেলাম দিল। মিঃ সিনহা বললেন—এস. আই. শিউলাল প্রসাদকে গিয়ে বলো আর্মড কনস্টেবল নিয়ে কাস্টডি থেকে সৌরজ্যোতি সিংহকে এখানে যেন নিয়ে আসেন। দেরি নয়। শিগগির।

কিছুক্ষণ পরে সৌরজ্যোতিকে নিয়ে এলেন একজন এস. আই.। ও.সি.-র ইঙ্গিতে এস. আই. শিউলাল ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। দেখলুম, সৌরজ্যোতির মধ্যে সেই স্মার্টনেস একটুও নেই। অবিন্যস্ত চুল। কয়েক ঘন্টার হাজতবাস আর জেরা অবশ্য যে কোনো মানুষকেই এমন নিষ্প্রভ করে তোলে। আমাকে দেখে সে বিস্মিত হয়েছিল। তাকে একটু তফাতে একটা চেয়ার দেখিয়ে মিঃ সিনহা বললেন—বসুন!

ডঃ মিশ্র আর আমি মিঃ সিনহার মুখোমুখি বসেছিলুম। সৌরজ্যোতি বসল টেবিলের অন্যপ্রান্তে। তারপর একটু কেসে গলা ঝেড়ে সে আমার দিকে তাকাল। তারপর ভাঙা গলায় বলল—ট্রেনে আসবার সময় আমরা বুঝতে পারিনি আপনি কে। আপনার সামনে অনেক বাচালতা করেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন কর্নেল সায়েব, বল্লরীকে কে কী কারণে এমন সাংঘাতিকভাবে মারল, আমরা একটুও বুঝতে পারছি না। আপনি এই ঘটনায়—

তাকে থামিয়ে দিয়ে বললুম—আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। সৌরজ্যোতি করজোড়ে বলল—আপনি আমাকে তুমি বলুন!

—হ্যাঁ। তুমি বললে কাছাকাছি দাঁড়ানো যায়। কাজেই তুমিই বলব। কিন্তু প্রশ্নের সঠিক উত্তর চাইব।

—আপনি যা জানতে চাইবেন, আমি যতটুকু জানি তা নিশ্চয় বলব।

—শোনো সৌরজ্যোতি! তোমরা আমার কার্ডে যে পরিচয় দেখেছ, তা সত্যি। আমি সত্যই একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। এখানে এসেছিলুম এক বিরল প্রজাতির অর্কিডের খোঁজে। আমি বৃদ্ধ মানুষ। আড়ি পেতে যুবক-যুবতীদের কথা শোনা অনেক বৃদ্ধের অভ্যাস। সেই অভ্যাস আমার নেই।

আমার এইসব কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি। লক্ষ্য করলুম, সৌরজ্যোতির চোখদুটো ঈষৎ উজ্জ্বল হয়েছে। নিভে যাওয়া চুরুটটা লাইটার জেলে ধরিয়ে নিলুম। মিঃ সিনহা অ্যাশট্রেটা আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। ধোঁয়ার মধ্যে বললুম—কাল দুপুরে গড়ের জঙ্গলে তোমরা চারজন বেড়াতে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। এখানে এলেই আমরা—

—পাথরের বিশাল চত্বরটার উপর দাঁড়িয়ে তোমরা একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছুতে চাইছিলে!

সৌরজ্যোতি চোখ নামিয়ে আঙুল খুঁটতে থাকল। একটু পরে বলল—আপনি শুনেছিলেন?

বললুম—কীসের বোঝাপড়া? সৌরজ্যোতি! আশা করি, সঠিক উত্তর পাব।

—ইন্দ্রনীল আর বল্লরী পরস্পরকে ভালবাসত একসময়। এরা বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারপর ওদের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরেছিল। ওদের আগের

সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনতে আমি আর সুদক্ষিণা চেষ্টা করছিলুম। ভেবেছিলুম, পঞ্চগড়ে খোলামেলা পরিবেশে প্রকৃতির মধ্যে ফিরে গেলে যদি ওদের ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়।

—বাঃ! তো কিসের ভুল বোঝাবুঝি?

—ইন্দ্রনীল বল্লরীকে চরিত্রে সন্দেহ করেছিল!

—সৌরজ্যোতি! কাল তুমি বলছিলে, বল্লরী একটা অতল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কেন?

সৌরজ্যোতি মুখ নামাল আবার। অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যের ছাপ পড়েছে দেখলুম।

বললুম—দেরী করো না। আমার হাতে সময় কম। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। সঠিক উত্তরের উপর তোমাদের তিনজনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।

সৌরজ্যোতি মুখ তুলল। তারপর মৃদুস্বরে বলল—বল্লরী একটা ওভারসিজ ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার।

—জানি। সার্কাস অ্যাভেনিউ ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ছিল সে।

—আপনি জানেন?

—জানি। আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।

—বল্লরী ঝুঁকি নিয়ে ইন্দ্রনীলকে পাঁচ লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে ধার পাইয়ে দিয়েছিল। সুদ বছরে শতকরা আঠারো টাকা। সুদে আসলে দু'বছরে তা বাড়লে কত হয় ভাবুন। অথচ ইন্দ্রনীলের ব্যবসা শেষ পর্যন্ত মার খেয়ে অচল অবস্থায় পৌঁছেছে। এমন কী, যে অ্যাসেট ব্যাঙ্ক বন্ধক নিয়েছিল, আর্থিক হিসেবে তা পঞ্চাশ হাজার টাকাও নয়।

—ইন্দ্রনীলের কথা ইন্দ্রনীলের মুখেই শুনব। কিন্তু ইন্দ্রনীল বল্লরীকে বিয়ে করলে কী ভাবে সেই আর্থিক সমস্যা মিটে যেত বলে তোমার ধারণা ছিল?

—ইন্দ্রনীলের পঞ্চগড়ের বাড়িটা বিক্রি করলে বল্লরীর ব্যাঙ্কের টাকা শোধ হয়ে যেত।

—বল্লরীকে বিয়ে না করেও তো ইন্দ্রনীল এখানকার বাড়ি বিক্রি করে দেনা শোধ করতে পারত।

—হ্যাঁ। কিন্তু ইন্দ্রনীলের হাবেভাবে আমার আর সুদক্ষিণার সন্দেহ হয়েছিল, সে বল্লরীর ওপর যেন প্রতিশোধ নিতে চায়।

—কীসের প্রতিশোধ?

—প্রেমে বিশ্বাসভঙ্গের। আপনি ট্রেনেই দেখেছেন, ইন্দ্রনীল বল্লরীর সঙ্গে যেভাবে কথা বলছিল, তা ছাড়া তার ঠোঁটে প্রকাশ্যে বল্লরীর কিস চাইছিল—আপনারই সামনে!

—হ্যাঁ। আমার সামনে। তার মানে কি তুমি বলতে চাইছ—আমার কথার ওপর সৌরজ্যোতি বলে উঠল—হি ওয়াজ ট্রিটিং হার অ্যাজ আ হোর!

দ্রুত বললুম—রাত তিনটের সময় ট্রেনে তুমি বল্লরীর বার্থে উঠেছিলে। কিছুক্ষণ পরে তুমি নেমে বেরিয়ে গিয়েছিলে। তারপর বল্লরী বার্থ থেকে নেমে বেরিয়ে গিয়েছিল!

সৌরজ্যোতি চমকে উঠেছিল। তার মুখ আবার আগের মত নিষ্প্রভ হয়ে গেল। সে মুখ নামাল।

—তোমার স্বীকার করার সাহস থাকা উচিত যে বল্লরীর সঙ্গে তোমার যৌন সম্পর্ক ছিল। আর ইন্দ্রনীল তা যেভাবেই হোক, জানতে পেরেছিল। তুমিই বললে, হি ওয়াজ ট্রিটিং হার অ্যাজ আ হোর! সৌরজ্যোতি মুখ নামিয়ে বসে রইল।

বললুম—গড়ের জঙ্গলে আবার কাল বিকেলে তোমরা কেন গিয়েছিলে?

—আমরা জানতুম জঙ্গলের ওই বিশাল পাহাড়ের চত্বরটা ইন্দ্রনীলের পূর্বপুরুষের যজ্ঞবেদি। সুদক্ষিণার বিশ্বাস, পূর্বপুরুষের ওই যজ্ঞবেদিতে ইন্দ্রনীলকে নিয়ে গিয়ে বল্লরীর সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব। ইন্দ্রনীল নিজেই বলল, ওই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে দাঁড়ালে তার মনে কী একটা পরিবর্তন ঘটে যায়। আমি জানি ওটা ইন্দ্রনীলের একটা সংস্কার। সুদক্ষিণার কথায় আমি ইন্দ্রনীলকে ওখানে একরকম জোর করে নিয়ে যাই। ইন্দ্রনীল কিন্তু যজ্ঞবেদিতে দাঁড়িয়ে বলেছিল, বল্লরীকে বিয়ে না করলেও এখানকার হাভেলি বেচে তার টাকা শোধ করে দেবে। তখন আমরা সোজা হেঁটে পাতালভৈরবীর মন্দির দর্শনে যাচ্ছিলুম।

আমি দ্রুত বুক পকেট থেকে ছেঁড়া সোনার চেনটা বের করে বললুম—সুদক্ষিণা পুলিশকে বলেছে, তুমি হঠাৎ বল্লরীর গলা থেকে সোনার এই চেনটা হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছিলে। কেন?

—বল্লরী, আশ্চর্য লেগেছিল আমার, ইন্দ্রনীলের গা ঘেঁষে তার একটা হাতের আঙুলে নিজের হাতের আঙুল ভরে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ বলল, তুমি ঠোঁটে চুমু চেয়েছিলে, এই নাও—অ্যান্ড শি রিয়্যালি কিসড অন হার লিপ! ব্যাপারটা আমার অসহ্য লেগেছিল। বল্লরীর ওই সোনার চেনটা ওর গলা থেকে টেনে ছিঁড়ে জোরে ছুঁড়ে ফেলেছিলুম! বল্লরীর ওই ছেনালি—সরি!

—তোমার অসহ্য লেগেছিল!

—হ্যাঁ।

—তাতেও তোমার রাগ পড়েনি! বল্লরীর হ্যান্ডব্যাগটা তুমি ছুঁড়ে ফেলেছিলে। বলে আমি পিঠের কিটব্যাগ খুলে বল্লরীর ব্যাগটাও বের করলুম।

ও.সি. মিঃ সিনহা অবাক চোখে তাকিয়ে দেখার পর সহাস্যে বললেন—আপনি ভারুয়ার চেয়েও বনচর।

সৌরজ্যোতি বলল—তারপর আমরা চারজনেই খুঁজছিলুম। কিন্তু হঠাৎ—

বললুম—শঙ্খচূড় সাপের আবির্ভাব!

—হ্যাঁ একটা সাংঘাতিক সাপ। আমাদের সামনে লেজে ভর দিয়ে ফণা তুলেছিল। আমরা চারজনেই দৌড়ে হাইওয়েতে উঠেছিলুম।

—তারপর পাতালমন্দিরে গিয়েছিলে?

—হ্যাঁ। কিন্তু সুড়ঙ্গে নামবার সময় কখন চুপিচুপি বল্লরী চলে এসেছিল বুঝতে পারিনি।

—বল্লরী তার ব্যাগটার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল। সে মরিয়া হয়ে আবার এটা খুঁজতে গিয়েছিল। আদিবাসী ইমানুয়েল হাইওয়ে থেকে আর ভারুয়া তাকে যজ্ঞবেদির ওধার থেকে দেখতে পেয়েছিল!

মিঃ সিনহা বললেন—মেয়েটিকে তাহলে দুঃসাহসী বলতে হয়। ব্যাগের সেই জিপটা খুললুম, যে খোপে বল্লরীর ছোট্ট রিভলভারটা আছে। সেটা দেখিয়ে বললুম—মিঃ সিনহা! বল্লরীর এই ফায়ার আর্মসটা লাইসেন্সড। বল্লরী এবার এই অস্ত্রটা সঙ্গে এনেছিল কেন, এটাই প্রশ্ন। সৌরজ্যোতি! তুমি কি জানতে বল্লরীর কাছে এই অস্ত্রটা ছিল?

সৌরজ্যোতি বলল—না।

—সৌরজ্যোতি! তুমি জানতে বল্লরীর একটা রিভলভার ছিল এবং সেটা সবসময় সঙ্গে রাখার জন্য হ্যান্ডব্যাগে রেখেছিল। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমিই তাকে তার অস্ত্রটা নিয়ে আসার জন্য পরামর্শ দিয়েছিলে।

সৌরজ্যোতি মুখ নামিয়ে কী বলল, বুঝতে পারলুম না।

বললুম—তুমি আশঙ্কা করেছিলে, ইন্দ্রনীল তাকে কোনো সুযোগে মেরে ফেলবে। তাই না?

এবার সৌরজ্যোতি আস্তে বলল—হ্যাঁ।

—কিন্তু তুমি ইচ্ছে করেই কাল বিকেলে বল্লরীকে নিরস্ত্র করার জন্য তার ব্যাগটা ছুঁড়ে ফেলেছিলে!

সৌরজ্যোতি দু'হাতে মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় বলল—শঙ্খচূড় সাপ ওখানে আছে, তা আমি কেমন করে জানব? ব্যাগটা আমরা নিশ্চয় খুঁজে পেতুম। আমি বল্লরীকে বাঁচাতেই চেয়েছিলুম।

—তোমার কথায় যুক্তি আছে। এবার বলো, ইন্দ্রনীলদের হাভেলিতে গিয়ে কাল সন্ধ্যায় তোমরা কেয়ারটেকার ঝাব্বুলালকে নিশ্চয় জিজ্ঞেস করেছিলে, বল্লরী একা ফিরে এসেছে কি না?

—জিজ্ঞেস করলুম। ঝাব্বুলাল বলল, আমাদের দলের কেউ একা ফিরে আসেনি।

—ঝাব্বুলালকে কি তখন মাতাল মনে হচ্ছিল?

—হ্যাঁ। আগে এসেও দেখেছি, বিকেল থেকে সে মদ খেতে শুরু করে। তার একটা সাইকেল আছে। আমি বা ইন্দ্রনীল নিউ টাউনশিপের হোটেল গ্রিনভিউ থেকে প্যাকেটভর্তি খাবার নিয়ে আসি।

—কাল সন্ধ্যায় বল্লরীকে হাভেলিতে খুঁজে না পেয়ে তোমরা কী করেছিলে?

—থানায় এসেছিলুম। ডিউটি অফিসারকে অনুরোধ করেছিলুম। কিন্তু উনি শুধু নিখোঁজ হওয়ার একটি ডায়েরি নিয়েছিলেন। ও.সি. সায়েব বাইরে ছিলেন।

মিঃ সিনহা বললেন—হ্যাঁ। কর্নেল সায়েবকে তা বলেছি।

সৌরজ্যোতির দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তকিয়ে বললুম—ইন্দ্রনীলের সঙ্গে সুদক্ষিণার কোনো এমোশনাল সম্পর্ক আছে?

—জানি না। তবে থাকতেও পারে। বল্লরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুদক্ষিণা। কিন্তু সুদক্ষিণা তত বেশি স্মার্ট নয়। তত সাহসী নয়।

—সৌরজ্যোতি! আমার শেষ প্রশ্ন। বল্লরীকে কে অমন নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে তোমার ধারণা?

—গতরাতে আমার ঘুম আসছিল না। আমি আর ইন্দ্রনীল একটা ঘরে ওদিকে পাশের ঘরে বল্লরী আর সুদক্ষিণা, শোওয়ার ব্যবস্থা ছিল এরকম। যতবার এখানে এসেছি, এরকমই থেকেছি।

—গতরাত্রের কথা বলো!

—গতরাত্রে তখন কটা বাজে ঘড়ি দেখিনি, পাশ ফিরে শুয়েছিলুম। তখন গাড়ির শব্দ শুনেছিলুম। বাঙালিটোলার নীচের রাস্তায় রাত্রে গাড়ি চলাচল স্বাভাবিক। তবে গাড়িটা কাছাকাছি থেমে গেল মনে হয়েছিল। তবে সে ব্যাপারে মন ছিল না। বল্লরী কোথায় গেল, এটাই চিন্তা ছিল। তারপর আস্তে দরজা খোলার শব্দে পাশ ফিরে বলেছিলুম, ইন্দ্র? ইন্দ্রনীল বলেছিল, বাথরুমে গিয়েছিলুম। বেশ কিছুক্ষণ পরে আবার গাড়ির শব্দ কানে এলো। গাড়িটা চলে গেল। এ থেকে আমি কোনো নির্দিষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে পারিনি কে খুনী হতে পারে।

—ঠিক আছে। মিঃ সিনহা! সৌরজ্যোতিকে পাশের কোনো ঘরে রাখুন। আর ইন্দ্রনীলকে নিয়ে আসতে বলুন।....

সাব-ইন্সপেক্টর শিউলাল প্রসাদ ইন্দ্রনীল রায়কে নিয়ে এলেন। ও.সি. মিঃ সিনহা তাকে সৌরজ্যোতি যেখানে বসেছিল, সেখানে বসতে বললেন। শিউলাল প্রসাদ বেরিয়ে গেলেন।

ইন্দ্রনীল বসল। তার চেহারায় রুক্ষতার ছাপ। চোখ দুটো আবছা লাল। দৃষ্টি বেপরোয়া মানুষের মত নির্বিকার। সে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—ট্রেনে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আপনি নাকি একজন রিটায়ার্ড কর্নেল। আপনি এখানে কী করছেন?

মিঃ সিনহা পুলিশি মেজাজে বললেন—কর্নেল সরকার আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান।

—তাঁর প্রশ্ন করার কোনো অধিকার কি আছে?

—আছে। সেটা কী ধরনের অধিকার আপনাকে জানাতে আমি বাধ্য নই। তবে এটুকু মনে রাখবেন, উনি আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। তাই উনি আপনার মুখে তাঁর প্রশ্নের সঠিক উত্তর চান।

ইন্দ্রনীলের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। সে বলল—ওকে কর্নেল সরকার! প্রশ্ন করুন।

বললুম—ওভারসিজ এশিয়ান ব্যাঙ্কের সার্কাস অ্যাভেনিউ ব্রাঞ্চের কাছে আপনি দু'বছর আগে পাঁচ লাখ টাকা শতকরা বার্ষিক আঠারো টাকা সুদে ঋণ নিয়েছিলেন। ব্রাঞ্চ ম্যানেজার বল্লরী দাশগুপ্ত ঝুঁকি নিয়ে আপনাকে ঋণ মঞ্জুর করেছিল। আপনার ব্যাবসার স্থাবর অস্থাবর অ্যাসেট বা সম্পত্তির বাজারদর তখন সেই ঋণের টাকার তুলনায় অনেক কম ছিল। তাই না?

ইন্দ্রনীল নির্বিকার মুখে বলল—সো হোয়াট?

—কথাটা সত্য কি না তা-ই বলুন।

—সত্য। ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের ঋণ দেয়। এটা নতুন কথা নয়।

—কিন্তু বল্লরীর সঙ্গে আপনার এমোশনাল সম্পর্ক না থাকলে আপনি কোনোভাবেই অত টাকা ঋণ পেতেন না।

—ঠিক আছে। এমোশনাল সম্পর্ক ছিল।

—পরে সম্পর্কটা ভেঙে যায়। আর বল্লরী আপনার ঋণশোধের জন্য চাপ দিচ্ছিল। ঠিক বলছি?

—ঠিক! কিন্তু সেই জন্য তাকে আমি খুন করিনি।

—আমি বলছি না বল্লরীকে আপনি খুন করেছেন। কারণ বিষয়টা এখনও তদন্তসাপেক্ষ। আমি বলছি, এবার আপনি বল্লরীকে আপনার পঞ্চগড়ের হাভেলি বিক্রি করে ঋণের টাকা সুদসহ শোধ করার কথা বলে এখানে ডেকে এনেছিলেন! তাই না?

—কর্নেল সরকার! আপনি নিশ্চয় জানেন, টাকা বল্লরীর নয়, ওভারসিজ এশিয়ান ব্যাঙ্কের। কাজেই তাকে টাকা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। তাকে অন্যবারের মত আমাদের সঙ্গে বেড়াতে আসতে বলেছিলুম। সে রাজি হয়েছিল।

—নাকি তাকে স্বচক্ষে দেখাতে চেয়েছিলেন যে সত্যি আপনি এখানকার বাড়ি বিক্রি করছেন, পাছে বল্লরী ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আপনার ব্যবসার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এবং আপনার বাড়ি ক্রোক করার জন্য কোর্টে না যায়?

ইন্দ্রনীল আবার বাঁকা হেসে বলল—ধরুন, তা-ই যদি হয়, তাতে আমার কি কোনো অপরাধ হয়েছে?

—কাল বিকেলে গড়ের জঙ্গল থেকে হাইওয়ের দিকে হেঁটে আসার সময় বল্লরী আর আপনি ঘনিষ্ঠভাবে, সঠিক ভাষায় বললে অশালীনভাবে হেঁটে আসছিলেন।

—বল্লরী আফটার অল আমার বন্ধুও তো ছিল। ধরুন, তার সঙ্গে আবার আমার ভাব হয়েছিল!

—হুঁ। সৌরজ্যোতি সিংহ কি এর জন্যই বল্লরীর গলা থেকে সোনার চেন ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল?

ইন্দ্রনীল গম্ভীর মুখে বলল—আমি সন্দেহ করতাম বল্লরী এবার আমাকে ছেড়ে সৌরের সঙ্গে প্রেমের খেলায় মেতে উঠেছে। খুলেই বলছি। তার প্রতিক্রিয়া যাচাই করার জন্যই আমি বল্লরীর ঘনিষ্ঠ হয়েছিলুম। দেখলুম, আমার সন্দেহ অমূলক নয়। অবশ্য সে কৌতুকের ছলে সোনার চেনটা বল্লরীর গলা থেকে হ্যাঁচকা টানে ছিঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছে। আমি তখন দ্বিতীয় চালটা চাললুম! বল্লরীকে কিস করলুম। বল্লরী বাধা দেওয়ার সুযোগ পায়নি। অমনই সৌর বল্লরীর হ্যান্ডব্যাগটা কেড়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

—দেখুন তো, ও.সি. মিঃ সিনহার সামনে যে ব্যাগটা আছে, ওটা বল্লরীর সেই ব্যাগটা কি না।

ইন্দ্রনীল চমকে উঠেছিল। আস্তে বলল—বল্লরীর ব্যাগ। ব্যাগ খুঁজতে আমরা সাপের মুখে পড়েছিলুম। সাংঘাতিক সাপ ওটা। আমি জানি গড়ের জঙ্গলের আশেপাশে অনেক বিষাক্ত সাপ থাকে। ওই সাপটা শঙ্খচূড়।

মিঃ সিনহা বললেন—কর্নেল সায়েব বলেছিলেন, যে শঙ্খচূড়টা আমি গুলি করে মেরেছিলুম। তার একটা জুটি আছে। স্বভাবতই তার জুটি ক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল।

বললুম—ইন্দ্রনীলবাবু! পাতালকালীর মন্দির থেকে বেরিয়ে আপনারা বল্লরীকে দেখতে পাননি। আপনি তার সম্পর্কে তখন কী ভেবেছিলেন?

ইন্দ্রনীল শান্তভাবে বলল—আমি জানতুম, বল্লরীর একা ব্যাগ খুঁজতে যাওয়ার সাহস হবে না। সে সৌরজ্যোতির ওপর খাপ্পা হয়ে আমাদের বাড়িতে চলে গেছে!

—আপনাদের বাড়িতে ফিরে আপনি নিশ্চয় কেয়ারটেকারকে বল্লরীর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন!

—হ্যাঁ। ঝাব্বুলাল বলল, সে তাকে ফিরতে দেখেনি। তারপর আমরা দোতলায় বল্লরী আর সুদক্ষিণার ঘরে গেলুম।

—ওদের দরজায় তালা ছিল না?

—না। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে ওদের ঘরে যাওয়া যায়। আমাদের ঘরের দরজায় তালা ছিল না। কারণ ঝাব্বুলাল থাকলে তালা দেওয়ার দরকার মনে করি না। তা ছাড়া বাড়িটা ভূতুড়ে বলে বদনাম আছে।

—টাকা-পয়সা?

—টাকা-পয়সা সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকে। বাইরে গেলে প্রত্যেকে নিজের-নিজের পার্স সঙ্গে নিয়ে যাই।

—বল্লরীর ব্যাগেজ?

—ব্যাগেজ টেবিলে অ্যাজ হট ইজ রাখা ছিল। বাথরুমেও সবকিছু ঠিকঠাক ছিল।

—আপনি কি জানেন বল্লরীর একটা লাইসেন্সড রিভলভার ছিল?

—ছিল তা জানতুম। তবে কোনোদিন তা দেখিনি বা দেখতে চাইনি।

—আপনি কি আপনাদের হাভেলি সত্যিই বিক্রি করার জন্য এসেছেন?

—হ্যাঁ। ডাক্তার শচীন অধিকারীকে আমরা সবাই মামা বলে ডাকি। মা তাঁকে দাদা বলে ডাকতেন। ডাক্তার অধিকারীকে আগে ফোনে জানিয়েছিলুম, এবার বাড়ির খদ্দের দেখে রাখেন যেন। যে-কোনো দামে বাড়িটা বেচতে চাই।

—যে-কোনো দামে?

—ওটা কথার কথা। শচীন মামা জানতেন, বাড়িটার ন্যায্য দাম পনেরো লাখের কম নয়।

—ডাক্তারবাবু কি খদ্দের ঠিক করেই আপনাকে আসতে বলেছিলেন?

—হ্যাঁ। তাই শেষবারের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে এসেছিলুম। এখানে কাল সকালে পৌঁছুনোর পর শচীনমামার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। উনি বলেছিলেন, মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী বাড়ি কিনতে রাজি হয়েছেন। কিন্তু তিনি জরুরি কাজে রাঁচি গেছেন। সন্ধ্যায় ফিরে আসার কথা। কিন্তু বল্লরীর জন্য আমরা কাল সন্ধ্যায় উদ্বিগ্ন হয়ে থানায় এসেছিলুম। তারপর তো—

ইন্দ্রনীল চুপ করল। বললুম—ঝাব্বুলাল কি আপনাদের বাড়িতে একা থাকে?

—না ওর বউ আর তিনটে ছেলেমেয়ে থাকে। আমরা পৌঁছুনোর আগের দিন ওর বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে বাপের বাড়ি গেছে।

—ঝাব্বুলাল কি মদ খায়?

—খায়। ও বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত মদ খেয়ে মাতাল অবস্থায় থাকে। ওকে নিয়ে সমস্যা আছে। ঠাকুরদা ওকে বাড়ির পাঁচ ডেসিমেল অংশ দান করে গেছেন। ওই অংশটা গেটের কাছে। মূল বাড়ি এবং বাকি অংশে ওর কোনো অধিকার নেই। অথচ মাতাল অবস্থায় ঝাব্বুলাল বলে, এ বাড়ির মালিক সে। ওটা নিছক মাতলামি। অন্য সময় সে খুব অমায়িক আর নম্র লোক। খুব বিশ্বাসী। এত বছর ধরে বাড়িটা সে এলাকার দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রক্ষা করে আসছে। অন্য কেউ হলে বাড়িটা বেদখল হয়ে যেত।

লক্ষ্য করলুম, ইন্দ্রনীল ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। বললুম—বল্লরীকে কে খুন করেছে বলে আপনার ধারণা?

ইন্দ্রনীল একটু চুপ করে থাকার পর শ্বাস ছেড়ে বলল—আমার ধারণা, বাঙালিটোলায় সে কোনো দুর্বৃত্তের কবলে পড়েছিল।

—আপনি বলতে চাইছেন, শি ওয়াজ রেপড অ্যান্ড মার্ডার্ড?

—আমার তা-ই ধারণা। ও.সি. সায়েব বলতে পারেন মর্গের রিপোর্টে কী বলা হয়েছে।

ও.সি. মিঃ সিংহ বললেন—মর্গের ফাইনাল রিপোর্টে বল্লরীকে রেপ করার কথা বলা হয়নি। তাকে শ্বাসরোধ করে মারার পর ভারী আর মোটা ত্রিশূলের মত কোনো অস্ত্র তার বুকে বিদ্ধ করা হয়েছিল। আমি চমকে উঠিনি। কারণ আমার থিয়োরির সঙ্গে এটা মিলে গেছে। কিন্তু ইন্দ্রনীল প্রচণ্ড চমকে উঠেছিল। সে শ্বাসপ্রশ্বাসে মিশিয়ে উত্তেজিতভাবে বলল—তাকে কে শ্বাসরোধ করে মারবে? কেন মারবে?

বললুম—মর্গের রিপোর্ট অস্বীকার করার মত কোনো প্রমাণ কি আপনি দিতে পারে পারেন?

ইন্দ্রনীল একই ভঙ্গিতে বলল—বল্লরী গলায় ফাঁস এঁটে আত্মহত্যা করতে পারে!

—কেন?

—গড়ের জঙ্গলের কাছে সৌরজ্যোতির আচরণ, আমার অবহেলা—তা ছাড়া প্রায় সাত লাখ টাকার ঋণ আমি শোধ করব কি না, না করলে তাকে চাকরি থেকে তাড়িয়ে দিয়ে মামলায় ফাঁসাবে। এরকম অজস্র কারণ তাকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করতে পারে!

—পারে। কিন্তু তার মৃতদেহে ওই আঘাত করবে কে? কেন করবে?

ইন্দ্রনীল মুখ নামিয়ে বলল—আমি জানি না। বুঝি না।

—আপনাদের হাভেলিতে উপরে-নীচে কতগুলো ঘর আছে? আমার এই আকস্মিক প্রশ্নে ইন্দ্রনীল আবার চমকে উঠল। আমার দিকে তাকিয়ে বলল—গুনে দেখিনি। শুনেছি, পনেরোটা বা ষোলটা ঘর আছে। সবই তালাবন্ধ। কোন ঘরে কী আছে আমি জানি না।

—চাবি কার কাছে থাকে?

—সব চাবি কলকাতায় বাবার কাছে ছিল। আমি এখানে এলে শুধু আমাদের থাকার জন্য দু-তিনটে ঘরের চাবি নিয়ে আসি।

—কাল সন্ধ্যায় বল্লরীকে আপনাদের ঘর ছাড়া আর কোথাও খোঁজেননি?

ইন্দ্রনীল তাকাল। একটু পরে বলল—না।

—গতরাত্রে আপনি ঘর থেকে একবার বেরিয়েছিলেন। কোথায় গিয়েছিলেন?

—কে বলল? সৌর?

—হ্যাঁ।

—বাথরুমে গিয়েছিলুম।

—হাভেলির কাছে কোনো মোটরগাড়ির শব্দ শুনেছিলেন?

ইন্দ্রনীল ফেটে পড়ল—বোগাস! এসব কোনো প্রশ্নই নয়। আমি আপনার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবো না। ওই বাস্টার্ড সৌর—ওকে আমি ছাড়ব না। ওকে আমি গুলি করে মারব। দা সেক্স-পার্ভার্টেড ডগ!

ও.সি. মিঃ সিনহা টেবিলে বেটন ঢুকে ধমক দিলেন—স্টপ ইট! আনসার দ্য কোয়েশ্চন।

নো! আপনি যা খুশি করতে পারেন। আমি এই লোকটার কোনো প্রশ্নের উত্তর আর দেব না।

বললুম—দ্যাটস এনাফ মিঃ সিনহা! ওকে সোজা কাস্টডিতে নিয়ে যেতে বলুন। এবার জেনানা হাজত থেকে সুদক্ষিণাকে নিয়ে আসতে বলুন.

মিঃ সিনহার নির্দেশে এস. আই. শিউলাল প্রসাদ আর দু'জন আর্মড কনস্টেবল ইন্দ্রনীলকে নিয়ে বেরিয়ে গেল। ডঃ মিশ্র হাসবার চেষ্টা করে বললেন—গাড়ির কথায় ও এমন খেপে গেল কেন? অদ্ভুত তো!

বললুম—ঠিক বলেছেন ডঃ মিশ্র!

মিঃ সিনহা একটু হেসে বললেন—আমার মনে হয়, কর্নেল সায়েব ওর ক্ষতস্থানে খোঁচা মেরেছেন।

শিউলাল প্রসাদ সুদক্ষিণাকে নিয়ে এলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। সুদক্ষিণার চেহারায় এখন নাগরিক স্মার্টনেস নেই। গ্রাম্য মেয়ের মত বিপর্যস্ত ভাব। সে আমাকে দেখেই ফুঁপিয়ে উঠল—কর্নেল সরকার! আমাকে বাঁচান। আমি এদের সঙ্গে এসে এই সাংঘাতিক বিপদে পড়ব জানতুম না। আমার মানসম্ভ্রম বলতে আর কিছুই নেই। আপনি আমার বাবার মত!

ও.সি. সিনহা ধমক দিলেন—কান্নাকাটি নয়। ওই চেয়ারে বসুন।

বললুম—সুদক্ষিণা! তুমি কি বল্লরীকে খুন করেছ যে এমনভাবে ভেঙে পড়েছ? শান্ত হয়ে বসো। আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন করব। যেন অবশ্য-অবশ্য সঠিক উত্তর দেবে। মিথ্যা উত্তর দিলে তোমাকে আমি বাঁচাতে পারব না।

—আমি বল্লরীকে কেন খুন করব? আপনি যা জানতে চান, আমি বলব।

বলে সুদক্ষিণা রুমালে চোখ মুছল। তার পরনে জিনস এবং নীল হাতকাটা গেঞ্জি—মার্কিন মুলুকে এটাকে 'টপ' বলতে শুনেছি। কিন্তু টপের গলার কাছটা ছেঁড়া। তাই বুকের ঈষৎ অংশ দেখা যাচ্ছিল। মনে হল মেয়েটি এ বিষয়ে এখন অসচেতন।

বললুম—তোমার পোশাক ছিঁড়ল কী করে?

তখনই সে সচেতন হয়ে আব্রু রক্ষার চেষ্টা করে আস্তে বলল—যাদের সঙ্গে আমাকে রাখা হয়েছে, তারা আমাকে নেকেড করতে চাইছিল। সেন্ট্রি বাধা না দিলে—

সে হঠাৎ চুপ করল। বললুম—তোমাকে বেশি প্রশ্ন করব না। আমার প্রথম প্রশ্ন, তুমি কি জানতে ইন্দ্রনীল তাদের বাড়ি বিক্রি করবে বলেই এখানে আসছে?

—বল্লরী বলেছিল। আমি ইন্দ্রনীলকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি। সৌরজ্যোতি—

—বলো!

—সৌরজ্যোতি আমাকে বলেছিল, পঞ্চগড়ে গিয়ে বল্লরীর সঙ্গে ইন্দ্রনীলের মিটমাট করে দেবে। সে আমার সাহায্য চেয়েছিল।

—কীসের মিটমাট?

—ওদের মধ্যে ভুলবোঝাবুঝি চলছিল।

—তাতে সৌরজ্যোতির বা তোমার ইন্টারেস্ট কীসের?

—আফটার অল, আমরা পরস্পর বন্ধু।

—যদি বলি, বল্লরী সৌরজ্যোতির দিকে ঝুঁকেছিল এবং সৌরজ্যোতির সঙ্গে তোমার এমোশনাল সম্পর্ক ছিল এবং তুমি সৌরজ্যোতিকে ফিরে পেতে চেয়েছিলে?

সুদক্ষিণা মুখ নামিয়ে বলল—আমি মিথ্যা বলব না। সৌরজ্যোতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে কল্পনাও করিনি। তাই ভেবেছিলুম, আমি সৌরজ্যোতিকে আর পাত্তা দেবো না এবং বল্লরীকে তার হাত থেকে ছাড়িয়ে ইন্দ্রনীলের সঙ্গে মিলিয়ে দেব।

—বল্লরী ওভারসিজ এশিয়ান ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। ব্যাঙ্ক থেকে বল্লরী তাকে পাঁচ লাখ টাকা ঋণ দিয়েছিল। বল্লরী এতে ঝুঁকি নিয়েছিল। কারণ ইন্দ্রনীলের ব্যবসা সংস্থার কাগজপত্র ছিল ভুয়ো। তুমি কি একথা জানতে?

—জানতুম না। এখানে আসবার কয়েকদিন আগে বল্লরী একথা আমাকে বলেছিল।

—কাল সন্ধ্যায় বল্লরীর খোঁজে তোমরা তিনজন ইন্দ্রনীলের হাভেলিতে ফিরে এসেছিলে। বল্লরীর খোঁজে কি তোমরা বাড়ির অন্য ঘরগুলো খুঁজেছিলে?

—ঘরগুলো তালাবন্ধ ছিল। ইন্দ্রনীল বলেছিল আমাদের থাকার জন্য দু-তিনটে ঘর বাদে সব ঘর তালাবন্ধ আছে। সে-সব ঘরের চাবি কলকাতায় সে ভুল করে ফেলে এসেছে। তাই আমরা বাড়ির চারপাশ, উপরে করিডর, বাথরুম—সবখানে বল্লরীকে খুঁজেছিলুম। তাকে দেখতে পাইনি।

—তুমি কি জানো বল্লরীর একটা লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস ছিল? সুদক্ষিণা একটু পরে বলল—বল্লরী বলেছিল। আমি অস্ত্রটা দেখিনি।

—তাকে জিজ্ঞেস করেছিলে কেন সে ফায়ার আর্মস কিনেছে?

—হ্যাঁ। বল্লরী বলেছিল, সে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। আত্মরক্ষার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে তদ্বির করে তাকে অস্ত্রটার লাইসেন্স পাইয়ে দিয়েছে।

—একথা তুমি নিশ্চয় বিশ্বাস করোনি?

সুদক্ষিণা একটু ইতস্তত করে বলল—না। মানে ব্যাঙ্কের ম্যানেজারদের আর্মস রাখার ব্যাপারটা আমি জানি না। দেশে তো কত ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়। কখনও শুনিনি ম্যানেজার তার ফায়ার আর্মস ব্যবহার করেছে। ওকে বলেছিলুম, যদি কারও ভয়ে আত্মরক্ষার জন্য ওটা কিনে থাকিস, কাজে লাগাতে পারবি না। আত্মরক্ষার জন্য কাকেও গুলি করার পর মামলার ঝামেলা আছে। বরং—

—হুঁ। বলো!

—বরং আমার মত যোগব্যায়াম, জুড়ো এইসব ট্রেনিং নিতে পারিস!

—তুমি জুডো যোগব্যায়াম এসবে ট্রেনিং নিয়েছ?

—হ্যাঁ। জুডো না জানলে মেয়েগুলো আমাকে সত্যি নেকেড করে ফেলত। অবশ্য সেন্ট্রি বেয়নেট উঁচিয়ে ধমক দিয়েছিল। কিন্তু সে তো ঘরের বাইরে ছিল।

হাসতে হাসতে বললুম—বাঃ! মিঃ সিনহা, খবর নিন, সুদক্ষিণা সেই খুনী মেয়েটিকে মেরে শুইয়ে রেখেছে কি না।

মিঃ সিনহাও হাসছিলেন—শুধু মেয়েদের হাজতঘরে নয়, পুরুষদের হাজতঘরেও মারামারি হয়। ও নিয়ে পুলিশ বিশেষ মাথা ঘামায় না, যদি না সাংঘাতিক কিছু ঘটে।

বললুম—সুদক্ষিণা! কাল রাত্রে তুমি তোমাদের ঘরে একা শুয়েছিলে! ভয় করছিল না?

—না। দরজা কাল রাত্রে ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছিলুম।

—রাত্রে হাভেলির কাছে মোটরগাড়ির শব্দ শুনতে পেয়েছিলে? সুদক্ষিণা স্পষ্টত চমকে উঠল। আস্তে বলল—রাত্রে তো ও পথে মোটরগাড়ি যাতায়াত করে। আমি বল্লরীর কথা ভাবছিলুম শুধু।

—ঠিক আছে। আমার শেষ প্রশ্ন, তুমি কি জান সে-রাতে ট্রেনে আসবার সময় সৌরজ্যোতি চুপিচুপি আমার বার্থের ঠিক উপর বল্লরীর বার্থে উঠেছিল?

সুদক্ষিণা মুহূর্তে বদলে গেল। হিংস্র মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস জড়িত কণ্ঠস্বরে বলল—আমি ঘুমের ভান করে চোখ বুজে শুয়েছিলুম। ঘৃণায় দুঃখে রাগে আমি ভাবছিলুম, তখনই ওদের ধরে ফেলি। কিন্তু আপনার কথা ভেবে সিনক্রিয়েট করিনি। তারপর থেকে আমি নির্বিকার হয়ে উঠেছিলুম। তারপর থেকে যা-যা করেছিলুম, তা অভিনয় মাত্র।

—আমার প্রশ্ন শেষ মিঃ সিনহা, ওকে নিয়ে যেতে বলুন।....

সে রাত্রে ডঃ মিশ্রের বাংলোয় রোমিলা দেবীর কলেজ-লাইব্রেরি থেকে আনা জীর্ণ বইটা টেবিল ল্যাম্পের আলোয় পড়ার চেষ্টা করছিলুম। 'বাঙালি রাজপুত' রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের পূর্বপুরুষের কীর্তিকথার সঙ্গে অদ্ভুত সব দৈব ঘটনা মেশানো আত্মগৌরবের বাচালতা! পাতা উল্টে যাচ্ছিলুম। প্রায় দেড়শো পাতার

পর রায় রাজাদের অস্ত্রাগারের বর্ণনায় মন দিলুম। কয়েকটি পাতার পর অস্ত্রগুলোর রেখাচিত্র ব্লক করে ছাপানো আছে দেখে আগ্রহ জাগল। তারপর যা দেখলুম, তা আবিষ্কার বলা চলে। কাঠের দণ্ডের মাথায় বসানো ত্রিফলা ভল্ল। প্রতিটি অস্ত্র ব্যবহারের প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে। এই ত্রিফলা ভল্লটি অন্তত কুড়ি হাত দূর থেকে সবেগে নিক্ষেপ করলে একটি ফলা শত্রুর কণ্ঠমূলে অন্যদুটি বুকের দু'পাশে আমূল বিঁধে যাবে। সেই উদ্দেশ্যে ভল্লটির একটি ফলার মাপ অন্যদুটি থেকে একটু পৃথক। একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষকোণ যেন সেই বিশেষ ফলাটি। গোড়ার দিকটা প্রায় দেড়ফুট লম্বা এবং ওটার মধ্যে কাঠের দণ্ড ঢোকানো আছে।

পরবর্তী পাতায় তৎকালীন আগ্নেয়াস্ত্রের রেখাচিত্র। বন্দুক, পিস্তল, কামান। মোগল আমলে এইসব অস্ত্রও যুদ্ধে ব্যবহার করা হতো। কিন্তু এগুলো আমার বহুপঠিত মধ্যযুগের অস্ত্রশস্ত্রের বিবরণ। আমি সেই ত্রিফলা ভল্লটির দিকে তাকিয়ে রইলুম। যে-কোনো কাঠই কালক্রমে ভেঙে যেতে পারে। কিন্তু লোহায় মরচে ধরলেও ততকিছু ক্ষয় পাবে না। তা ছাড়া ফলার অংশে ইস্পাত ব্যবহারের নিদর্শন আমি অন্যত্র পড়েছি।

গত দু'বছরে গড়ের জঙ্গলে চারটি লাশ পাওয়া গেছে। এবার একটি পাওয়া গেল। পাঁচটি লাশেরই কণ্ঠমূলে ও বুকের দু'পাশে গভীর ক্ষত। ও.সি. গোপেশ্বর সিনহা বলেছিলেন, মর্গের ফাইনাল রিপোর্ট অনুসারে বল্লরীকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছিল। তারপর—হ্যাঁ কন্দর্পনারায়ণ রায় বর্ণিত ত্রিফলা ভল্লের আঘাত করা হয়েছিল বল্লরীকে। এর একমাত্র উদ্দেশ্য, গড়ের জঙ্গলে বল্লরীর লাশকে আরও চারটে লাশের শামিল করা, যাতে পুলিশ বিভ্রান্ত হয়। যেন একজন খুনীই কোনও গুপ্ততন্ত্র বা অকাল্টের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য যাকে বাগে পায়, তাকে ভুলিয়ে গড়ের জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে এভাবে হত্যা করে। এ রাতে বাথরুমকে যথারীতি ডার্করুম করে ছবিগুলো ডেভালাপের পর প্রিন্ট করে দড়িতে ক্লিপ এঁটে ঝুলিয়ে রেখেছিলুম। ভোর পাঁচটায় নীচে পূর্বের উপত্যকায় কিছুদূর হেঁটে ফিরে এলুম সাড়ে আটটায়। আগে বাথরুমে ঢুকে দেখে নিলুম, ছবিগুলো শুকিয়েছে এবং প্রত্যেকটি ছবিই স্পষ্ট হয়েছে। গাড়ির টায়ারের কয়েক ইঞ্চি অংশও স্পষ্ট। ছবিগুলো কিটব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলুম।

ডঃ মিশ্র এসে সম্ভাষণ করলেন—মর্নিং কর্নেল সরকার! আজ মর্নিং ওয়াকে আপনার সঙ্গী হব প্ল্যান করেছিলুম। কিন্তু অভ্যাস! অ্যালার্ম দিয়ে রাখব ঘড়িতে, তার উপায় নেই। রোমিলার অত সকালে ওঠার অভ্যাস নেই। ঘুম ভেঙে গেলে তার আর ঘুম আসবে না। সারাটা দিন নাকি শরীর ভাল থাকবে না। তো আসুন! সামনের বারান্দায় কফি খাওয়া যাক। রোমিলা স্নান করে পুজোআচ্চা সেরে এখনই এসে যাবে।

অর্ধবৃত্তাকার বারান্দায় গিয়ে বললুম—ও.সি. মিঃ সিনহাকে ফোন করতে চাই।

—করুন। আমি এখানে বসছি।

ড্রয়িং রুমে ঢুকে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলুম। স্বাগতার সাড়া এল। বললুম—মর্নিং স্বাগতা! কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি। আপনার সায়েব কি শয্যাত্যাগ করেছেন?

—মর্নিং কর্নেল সরকার! ধরুন! ওকে দিচ্ছি।

একটু পরে গোপেশ্বর সিনহা বললেন—মর্নিং কর্নেল সায়েব! নতুন কোনো খবর আছে কি?

বললুম—খবর আপনার কাছে জানতে চাই!

—কী খবর বলুন!

—গত দু'বছরে গড়ের জঙ্গলে যে চারটে লাশ একই অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, তাদের কেস হিস্ট্রি কি আপনি পড়েছেন?

—পাঁচনম্বর লাশ পাওয়ার পর খুঁটিয়ে পড়তে হয়েছে। আগের চারটে লাশকে আগে শ্বাসরোধ করে মারা হয়নি। সরাসরি ত্রিশূল বা ওইরকম অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছিল। চারজনই ব্যবসায়ী। তিনজন বাইরের এবং একজন স্থানীয়।

—মিঃ সিনহা! এখনই দায়িত্ববান একজন পুলিশ অফিসারকে ফোর্সসহ 'বাঙালি-হাভেলি'-তে কেয়ারটেকারের ঘর সার্চ করতে পাঠান!

—ঝাব্বুলালের ঘর? কেন?

—ওর ঘরে মার্ডার উইপন হয়তো পাবেন না। কিন্তু তার স্বনামে বা বেনামে কিংবা তার স্ত্রীর নামে স্থানীয় ব্যাঙ্কের পাস বই আর কিছু কাগজপত্র নিশ্চয় পাবেন।

—আপনি সিওর হলেন কী করে?

—এটা আমার অঙ্ক। কিন্তু একটা শর্ত আছে। যদি ঝাব্বুলালের ঘরে ওগুলো না পান, ডাক্তার শচীন অধিকারীর বাড়িতে পাবেন। পুলিশ এমনভাবে কাজ করে, যেন ডাঃ অধিকারী জানতে না পারেন। আমার ধারণা, তিনি এখন তার বাড়িতে রোগী দেখতে ব্যস্ত।

—ওকে কর্নেল সায়েব! কিন্তু দুজনের ঘরেই যদি ওসব না পাওয়া যায়?

—পঞ্চগড়ে কতগুলো ব্যাঙ্ক আছে?

—মাত্র দুটো।

—তা হলে দশটায় ব্যাঙ্ক খুললে ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। মনে রাখবেন, ঝাব্বুলালের বা তার স্ত্রীর নামে অ্যাকাউন্ট থাকবে। বেনামে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্ককর্মীকে চার্জ করবেন বেরিয়ে পড়বে।

কৌতূহলী ডঃ মিশ্র এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আমাকে চাপাস্বরে বললেন—ঝাব্বুলাল ডাকনাম। ওর আসল নাম ধরমচাঁদ ধানুকী। মিঃ সিনহা বললেন—ঝাব্বুলাল এবং ডাক্তার অধিকারীকে আমরা ইচ্ছে করলে অ্যারেস্ট করতে পারি।

—ঝাব্বুলালকে অ্যারেস্ট করবেন। ডাঃ অধিকারীকে এখন অ্যারেস্ট করা ঠিক হবে না। আর শুনুন! ডঃ মিশ্র বললেন, ঝাব্বুলালের আসল নাম ধরমচাঁদ ধানুকী!

মিঃ সিনহার হাসির শব্দ ভেসে এলো। —ধানুকী? ওর পূর্বপুরুষ কি রায়রাজাদের তিরন্দাজ বাহিনীর লোক ছিল?

—সম্ভবত। মিঃ সিনহা! এখনই এই অপারেশন শুরু করা উচিত।

—ওকে! ওকে!

রিসিভার নামিয়ে রেখে বাইরে এলুম। ততক্ষণে টেবিলে মালতী কফি ও স্ন্যাকসের ট্রে রেখে গেছে। রোমিলা দেবী চুপচাপ বসেছিলেন। আমাদের দেখে তিনি মৃদু হেসে বললেন—কারও সঙ্গে দুজনে চক্রান্ত করেছিলেন কেন?

বললুম—আপনাকে ধন্যবাদ। একটা মূল্যবান বই আমার জন্য সংগ্রহ করে এনেছেন!

—কিছু কাজে লাগল?

—হ্যাঁ। মার্ডার উইপনের খোঁজ পেলুম।

স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অবাক হয়ে বললেন—আশ্চর্য!

—একটু আশ্চর্য বলতেই হবে। রায়রাজাদের অস্ত্রাগারের একটা ত্রিফলা ভল্ল ওই হাভেলিতে এখনও আছে। হয়তো আরও কিছু অস্ত্রও থাকতে পারে। তবে ওই ভল্লটা আছে, যা দিয়ে মোট পাঁচজনকে আঘাত করা হল এ পর্যন্ত।

ডঃ মিশ্রের গাড়িতে বাঙালিটোলায় 'বাঙালি হাভেলি'র সামনে পৌঁছে দেখলুম, ঝাব্বুলালের কোমরে দড়ি বেঁধে একজন তাগড়াই চেহারার কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। এস. আই. রহমত খান আমাকে দেখে কপালে হাত ঠেকিয়ে 'আদাব' জানিয়ে বললেন—ঝাব্বুলাল দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করছিল। ওর হাঁটুর নীচে লাঠি ছুঁড়ে ওকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল ছোটেলাল সিং।

জিজ্ঞেস করলুম—ওর ঘর সার্চ করেছেন?

—জি কর্নেল সায়েব! ধরমচাঁদ ধানুকীর নামে দুটো ব্যাঙ্কে চল্লিশ আর তিরিশ মোট সত্তর হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট আছে। ও.সি. সায়েবকে বেতারে মেসেজ দিয়েছি। উনি এখনই এসে পড়বেন।

—কনস্টেবলরা ওকে পাহারা দিক। চলুন, হাভেলির দোতলায় গিয়ে ইন্দ্রনীল রায় আর তার বন্ধুদের থাকার ঘরটা দেখি।

—এই ঝাব্বু! সদর দরজার চাবি দে!

ঝাব্বু বলল—চাবি ছোট রায়সায়েবের কাছে আছে।

বললুম—তাহলে সেই চাবি থানার মালঘরে জমা পড়েছে। হাতে সময় নেই। দরজা ভাঙতে হবে। শুধু দরকার একটা মোটা হাতুড়ি। আমার কিটব্যাগের হাতুড়ি সম্ভবত কাজে লাগবে না।

রহমত খান একজন কনস্টেবলকে বললেন—তুমি ঝাব্বুলালের রান্নাঘর থেকে কয়লা ভাঙা হাতুড়িটা নিয়ে এসো। হাতুড়িটা মোটা।

কিছুক্ষণ পরে সদর দরজা ভেঙে হলঘরে এবং সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। চওড়া বারান্দা। বড় বড় করিন্থিয়ান স্তম্ভ। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে দেখলুম। থামে বাঁধা দড়িতে কয়েকটা কাপড় শুকোতে দেওয়া আছে। অতএব সামনের ঘরের দরজার তালা ভাঙা হল। ভেতরে ঢুকে দু'ধারে দুটো ক্যাম্পখাটে বিছানা পাতা দেখতে পেলুম। ভেতরের দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। ও ঘরেও দুটো ক্যাম্পখাট। দুটো ঘর খুঁটিয়ে দেখার পর বেরিয়ে এসে বাঁদিকে তাকালেই চোখে পড়ল একটা করিডর এবং তার শেষপ্রান্তে উপরে ওঠার সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে বিশাল খোলামেলা ছাদে দাঁড়ালুম। তারপর পূর্বের কার্নিশের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা ড্রেন পাইপের কাছে থমকে দাঁড়াতে হল। ড্রেন পাইপের মুখে কালচে লাল কিছু ছোপ। আতস কাচ দিয়ে পরীক্ষা করে বুঝলুম, রক্তই বটে। তার মানে, এখানে মৃত বল্লরীর বুকে গলায় ত্রিফলা ভল্ল বেঁধানো হয়েছিল। জল ঢেলে ধোয়া হয়েছে। কিন্তু কেউ ভাবতে পারেনি এখানে কেউ রক্তের দাগ খুঁজতে আসবে। কার্নিশ থেকে নীচের দিকে তাকালুম। বাউন্ডারি ওয়াল পর্যন্ত ঝোপজঙ্গল ও গাছপালা গজিয়ে আছে।

একটু পরে আবছা কী একটা জিনিস, যা প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই আমার চোখে পড়ল। সেটা কী তা স্পষ্ট করে দেখার জন্য বাইনোকুলারে চোখ রাখলুম। একপাটি জুতো। আরও একটু তফাতে ঝোপের ভিতর দ্বিতীয় পাটি জুতো আটকে আছে। বললুম—খানসায়েব! ভিকটিমের দু'পাটি জুতো নীচে ফেলে দেওয়া হয়েছে। একজন কনস্টেবলকে বলুন, ও দুটো কুড়িয়ে গেটের কাছে নিয়ে যাক।

এবার আমি সেই ড্রেন পাইপের পশ্চিমে লাইম কংক্রিটের ছাদের দিকে গুঁড়ি মেরে খুঁজতে থাকলুম—কী খুঁজছি আমি জানতুম না, হয়তো ইনট্যুইশন আমাকে নিয়ে একটা কাজ করাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরেই একটুখানি নীলাভ কাপড়ের ফালি চোখে পড়ল। আতস কাচ দিয়ে দেখার পর ওটা কুড়িয়ে নিলুম। একহাত দূরে পেয়ে গেলুম প্রায় দু ইঞ্চি চওড়া আর ইঞ্চি তিনেক লম্বা একটা নীলচে সিল্কেটিক পুরু কাপড়ের ফালি।

কুড়িয়ে নেওয়ার আগে দুটোরই ছবি তুলে নিলুম। ক্যামেরায় ফিল্মের একটা নতুন রোল লোড করেছিলুম আজ ভোরে। বললুম—খান সায়েব। আমাদের কাজ শেষ। চলুন, নীচে যাই।

গেটের কাছে তখনই জিপ থেকে নামছিলেন ও.সি. গোপেশ্বর সিনহা। তিনি কাছে এসে বললেন—আপনাকে অভিনন্দন জানিয়ে কী হবে! কর্নেল সায়েব, স্বাগতা আপনার সম্পর্কে যা বলেছিল, আশ্চর্যভাবে তা মিলে যাচ্ছে। আমরা এই দিকটা নিয়ে মাথা ঘামাইনি! বুঝতে পারছি, ঝাব্বুলাল এই হাভেলি বিক্রির লোভ

দেখিয়ে খদ্দেরকে অগ্রিম টাকা আনতে বলেছে এবং তাকে রায়রাজাদের যজ্ঞবেদিতে কোনো অজুহাতে নিয়ে গিয়ে খুন করেছে। কিন্তু মার্ডার উইপন? বললুম—মার্ডার উইপন একটা ত্রিফলা ভল্ল। যুদ্ধাস্ত্র। আমার ধারণা, ঝাব্বুলাল সেটা এমন কোথাও রেখেছে, যেখানে রাখার কথা কেউ কল্পনাও করবে না।

মিঃ সিনহা রুষ্ট মুখে ঝাব্বুলালের দিকে বেটন উঁচিয়ে বললেন—এই উল্লুক! কোথা রেখেছিস ওটা!

বললুম—ওকে থানায় পাঠিয়ে দিন। আপনি ফোর্স নিয়ে আমাদের সঙ্গে চলুন।

—কোথায়?

—ডাঃ অধিকারীর বাড়ি।

ডঃ মিশ্র বললেন—গাড়ি এখানেই থাক। ডাঃ অধিকারীর বাড়ি দুটো বাড়ির পরে।

ডাঃ শচীন অধিকারীর বাড়ির সামনের চত্বরে রোগীর ভিড় দেখলুম। আমাদের দেখে তিনি ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এসে নমস্কার করলেন।—আসুন! আসুন! আমার ভাগ্নে-ভাগ্নিদের এই বিপদে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, ততটা সাহায্য করব।

বললুম—আপনার গাড়িটা একবার দেখতে চাই ডাঃ অধিকারী! ডাঃ অধিকারীর মুখ শুকিয়ে গেল। তোৎলামি করে বললেন—গা-গা-ড়ি কেন? তা-তা ঠিক আছে। দেখবেন বৈকি।

গেটে ঢুকে বাঁদিকে গ্যারাজ ঘর। ঘরটায় তালা দেওয়া নেই। সম্ভবত একটু পরেই রোগী দেখতে যেতেন, কিংবা রোগী দেখার ছলে গাড়িটা কোনো মেকানিকের গ্যারাজে রেখে আসবেন।

গ্যারাজ খুলে ডাঃ অধিকারী বললেন—দে-দেখুন। কী-কী-কী....

বললুম—গাড়িটা বের করুন।

যা ভেবেছিলুম! তাঁর প্যান্টের পকেটেই গাড়ির চাবি ছিল। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে লনে আনলেন। আমি টায়ারের কিছু অংশের রঙিন ছবি দুটো বের করে পিছনের চাকার সঙ্গে মিলিয়ে নিলুম। বললুম—মিঃ সিনহা! আপনি মিলিয়ে দেখুন! এই গাড়ির ডিকিতে বল্লরীর লাশ সস্তা ধরনের তেরপলে মুড়ে শক্ত করে বেঁধে ডাঃ অধিকারী নিয়ে গিয়েছিলেন স্টেশন রোডে। ঢালু ঘাসে ঢাকা জমিতে গাড়ি ব্যাক করে ডিকি থেকে লাশটা নদীর বালিতে ফেলে দেয় ওঁর সঙ্গী ঝাব্বুলাল। জায়গাটা দেখিয়ে দেবো যথাসময়ে। ডাঃ অধিকারী! আপনি গাড়ির ডিকি খুলুন।

আড়ষ্টভাবে ডাঃ অধিকারী ডিকি খুললেন। সেই ত্রিফলা ভল্লটা দেখা গেল। মিঃ সিনহা গম্ভীরমুখে বললেন—মার্ডার উইপন!

ডাঃ শচীন অধিকারী ভাঙা গলায় বললেন—আমি বল্লরীকে খুন করিনি! ইন্দ্র-ইন্দ্রনীল—বিশ্বাস করুন, ইন্দ্রনীলের অনুরোধে গাড়িটা—গা-গা-গাড়িটাতে—

মিঃ সিনহা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—ইউ আর অ্যারেস্টেড।

আমরা গাড়িটাও আটক করে নিয়ে যাচ্ছি।

ডঃ মিশ্র আমাকে চাপা স্বরে বললেন—বড় রহস্যজনক ঘটনা। কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

বললুম—কিছুক্ষণ পর সব বুঝতে পারবেন। চলুন। থানায় যাওয়া যাক।....

থানার দোতলায় একটা বড় ঘরে যেন একটা কনফারেন্স আয়োজন করেছিলেন ও. সি. গোপেশ্বর সিনহা। সি. আই. বদ্রীনাথ রাও উপস্থিত ছিলেন। সশস্ত্র পুলিশের কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমাদের সামনে একটু তফাতে চেয়ারে বসেছিলেন ডাঃ শচীন অধিকারী। তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ঝাব্বুলাল। তারপর হাজত থেকে ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি ও সুদক্ষিণাকে নিয়ে এসেছিলেন দু'জন পুলিশ অফিসার এবং সশস্ত্র কনস্টেবল। তাদের মুখে যুগপৎ চমক আর আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করেছিলুম। ডাঃ অধিকারী আর ঝাব্বুলালকে দেখেই তাদের এই প্রতিক্রিয়া। এ ছাড়া আমার সামনে টেবিলের উপর রাখা ছিল দণ্ডবিহীন সেই ত্রিফলা ভারী ভল্ল।

সি. আই. বদ্রীনাথ রাও তাড়া দিলেন—কর্নেল সরকার! আপনি এবার রহস্যের পর্দা তুলুন।

বললুম—আপনারা এই যে ত্রিফলা অস্ত্রটি দেখতে পাচ্ছেন, সেটি রায়রাজার পূর্বপুরুষের একটি যুদ্ধাস্ত্র। একটি শক্ত কাঠের দণ্ড এই গোড়ার দিকে গর্তে আটকানো থাকত। কাঠের দণ্ডটি কবে ভেঙেচুরে গেছে। কিন্তু ভল্লটি ঠিকই আছে। ঝাব্বুলাল এটি রায়রাজাদের হাভেলির কোনো ঘর থেকে চুরি করে নিজের ঘরে রেখেছিল। যাই হোক, গত দু'বছরে গড়ের জঙ্গলে এই ভল্লের আঘাতে যে-চার জন খুন হয়, তারা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ী। আপনারা জানেন, বাঙালিটোলায় অনেক বাড়ি পরিত্যক্ত এবং কেয়ারটেকাররা সেইসব বাড়ি দখল করেছে। অনেকে সেইসব বাড়ি বিক্রি করেছে। অনেকে এখনও খদ্দের খুঁজছে। ঝাব্বুলালের প্রলোভনে পড়ে চারজন ব্যবসায়ী অগ্রিম টাকা নিয়ে আসে এবং ধূর্ত ঝাব্বুলাল ধর্মীয় আচার পালনের ছলে গড়ের জঙ্গলে রায়রাজাদের পবিত্র যজ্ঞবেদিতে তাদের নিয়ে যায়। তারপর এই ভল্ল দিয়ে তাদের খুন করে। ঝাব্বুলালের আসল নাম ধরমচাঁদ ধানুকী। তার ঘরে স্থানীয় ব্যাঙ্কের দুটি পাস বই আর কাগজপত্র পুলিশ খুঁজে পেয়েছে। দেখা যাচ্ছে, মোট সত্তর হাজার টাকা সে ফিক্সড ডিপোজিট রেখেছে।

ইন্দ্রনীল উঠে ঝাব্বুলালকে ঘুষি মারার জন্য হাত তুলতেই একজন পুলিশ অফিসার তাকে ঠেলে চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। ইন্দ্রনীল ঝাব্বুলালকে গালাগালি করছিল। তাকে ধমক দিয়ে চুপ করালেন সেই পুলিশ অফিসার।

ঝাব্বুলাল গলার ভিতরে বলল—আমি নেমকহারাম, না ছোটবাবুজি তুমি

নেমকহারাম। তোমাদের বাঁচাতে গিয়েই আমার এই অবস্থা। দ্রুত বললুম—ঝাব্বুলাল ঠিক বলছে। তার ছোটবাবুদের বাঁচানোর জন্য মৃত বল্লরীর গলায় ও বুকের দুপাশে ভল্ল বিঁধিয়ে একটা তেরপলে লাশটা মুড়ে ফেলেছিল সে। কিন্তু অত রাত্রে লাশ বয়ে নিয়ে অতদূরে গড়ের জঙ্গলে যেতে চায়নি সে। ইন্দ্রনীলরাও পালা করে লাশ বয়ে নিয়ে যেতে রাজি হয়নি। স্টেশন রোডে রাত্রেও যানবাহন চলে। কাজেই পরামর্শ নিতে ডাঃ অধিকারীর শরণাপন্ন হয় ওরা।

ডাঃ অধিকারী ভাঙা গলায় বললেন—আমি কী করব? ইন্দ্রনীলের বাবার অনেক নুন খেয়েছি। তিনি ছিলেন আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমাকে ঝাব্বুলাল ডেকে নিয়ে গেল। গিয়ে শুনলুম, কে বল্লরীকে আগেই হাভেলির ছাদে গলা টিপে মেরে ফেলে রেখেছিল। ইন্দ্রনীলদের বাঁচানো কর্তব্য মনে করেছিলুম। তাই গাড়িটা এনে ডিকিতে লাশটা ভরে সবাই মিলে চলে গেলুম স্টেশন রোডে। একটা ফাঁকা ঢালু জায়গায় গাড়ি পিছু হটিয়ে নদীর বালির চড়ায় থামিয়ে রাখলুম। ঝাব্বুলাল ডিকিতে ওই ভল্ল রেখে দিয়েছিল জানতুম না। সুদক্ষিণা গাড়িতে বসে রইল। ঝাব্বুলাল, ইন্দ্রনীল আর সৌরজ্যোতি লাশ ফেলতে গেল যজ্ঞবেদির কাছে।

বললুম—ধুরন্ধর ঝাব্বুলাল খন্তা নিয়ে গিয়েছিল। তেরলপটা পুঁতে রেখে এসেছিল। পরে তার খেয়াল হয়, গর্তটা কোনো আদিবাসীর চোখে পড়বে। সে খুঁড়ে তেরপলটা বের করে রক্তের দাগ দেখে হইচই বাধাবে। তাই ঝাব্বুলাল সকালে আবার খুঁড়ে ওটা আনতে গিয়েছিল। আমার আর ভারুয়ার সাড়া পেয়ে সে পালিয়ে যায়।

সি. আই. বদ্রীনাথ রাও বললেন—আপনি বললেন হাভেলির ছাদে বল্লরীকে কেউ গলা টিপে খুন করে ফেলে রেখেছিল।

বললুম—হ্যাঁ কাল বিকেলে পাতালকালীর মন্দির থেকে বেরিয়ে ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি আর সুদক্ষিণা তিনজনে বল্লরীকে দেখতে না পেয়ে হাভেলিতে ফিরে যায়। তখন প্রায় সন্ধ্যা। তারা তিনজন বাড়ির চারপাশে খোঁজাখুঁজি করে। ঝাব্বুলাল বল্লরীকে ফিরতে দেখেনি। কারণ তখন সে তার ঘরে বসে মদ খাচ্ছিল। ওদিকে বল্লরী সাপের ভয়ে তো বটেই, তার হ্যান্ডব্যাগ খোঁজার চেষ্টা করে হাভেলিতে ফিরে আসে। সে ছাদে উঠে গিয়েছিল। তার মাথার ঠিক ছিল না। ইন্দ্রনীলদের ডাকাডাকিতে সে সাড়া দেয়নি। তারপর একজন তাকে ছাদে নিশ্চয় নীচে থেকে দেখতে পেয়েছিল। সে অন্য দুজনের অজ্ঞাতসারে চুপিচুপি ছাদে উঠে যায় এবং বল্লরীকে সান্ত্বনা দেওয়ার ভান করে। কিন্তু তখনই তার মাথায় এসে যায়, এই তো একটা দারুণ সুযোগ। সে হঠাৎ বল্লরীর গলা দু'হাতে টিপে ধরে হাঁটু দিয়ে বুকের নীচে আঘাত করে। বল্লরী মরিয়া হয়ে আততায়ীর বুকের কাছে পোশাক খামচে ধরেছিল। আততায়ী তার হাত থেকে পোশাক ছাড়িয়ে নিলেও দুটো টুকরো পড়ে ছিল। আজ সকালে এস. আই. রহমত খান এবং আমার বন্ধু

ডঃ মিশ্রের সামনে তা কুড়িয়ে রেখেছি। মিঃ সিনহা বললেন—তা হলে ইন্দ্রনীল, সৌরজ্যোতি আর সুদক্ষিণার মধ্যে একজন খুনী। কে খুনী?

বললুম—কাল সন্ধ্যায় সুদক্ষিণা বলছিল হাজতের বন্দিনীরা তাকে নেকেড **করার চেষ্টা** করছিল। তারাই তার নীল রঙের টপের খানিকটা ছিঁড়ে ফেলেছে। **কিন্তু** এই দেখুন সেই ছেঁড়া টুকরো। আমি হাভেলির ছাদে কুড়িয়ে পেয়েছি। সুদক্ষিণা জুডোতে এক্সপার্ট, তা-ও স্বীকার করেছে। এবার দেখুন, বল্লরীকে কে একা পেয়ে গলা টিপে মেরেছিল।

মিঃ সিনহা এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলেন। বললেন—সুদক্ষিণা! বল্লরী দাশগুপ্তকে খুনের দায়ে তোমাকে অ্যারেস্ট করা হল।

সুদক্ষিণা প্রায় গর্জন করে উঠল—বেশ করেছি। বল্লরী ওয়াজ আ হোর! আমার চোখের সামনে ট্রেনের বার্থে সৌরকে সে সেক্সুয়্যাল প্লেজার দিচ্ছিল। এবার আমি সৌরকেও খুন করতুম। আমার দুর্ভাগ্য, সেই সুযোগ পেলুম না।

একজন অফিসার সুদক্ষিণার দু'হাতে হ্যান্ড কাফ পরিয়ে দিলেন। সে সৌরজ্যোতির মুখে থুথু ছেটাল। সৌরজ্যোতি রুমালে মুখ মুছে বিড়বিড় করে কী বলল, বোঝা গেল না।

সুদক্ষিণাকে সেই অফিসার মিঃ সিনহার নির্দেশে নিয়ে গেলেন। মিঃ সিনহা আমার কাছে এসে বললেন—আমি তো কল্পনাও করিনি সুদক্ষিণা বল্লরীকে মেরে ফেলেছে!

বললুম—সৌরজ্যোতি আর ইন্দ্রনীল ছাদে গিয়ে ব্যাপারটা নিশ্চয় দেখেছিল। **ওরা বলুক।**

ইন্দ্রনীল বলল—আমরা গিয়ে দেখি, সুদক্ষিণা বল্লরীর নিস্পন্দ শরীরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে সৌরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ঝাব্বুলাল আমাদের পেছনে ছিল। সে এসে সুদক্ষিণাকে সরিয়ে দিল। তারপর আমি আর সৌর পরস্পর কথা বলে ঠিক করলুম, যা হওয়ার হয়ে গেছে। এখন থানায় গিয়ে বল্লরীর নিখোঁজ হওয়ার কথা জানিয়ে আসি নাহলে কিন্তু এই খুনের ঘটনায় আমরাও জড়িয়ে পড়ব। তাই থানা থেকে ফিরে নিজেদের স্বার্থে একটা উপায় খুঁজছিলুম। ঝাব্বুলাল সেই উপায় বাতলে দিল। কর্নেলসায়েব! আপনি আমাদের সাহায্য করুন।

বললুম—আমি আইনজ্ঞ নই। আইন তার নিজের পথে চলবে।

ডঃ মিশ্র বললেন—চলে আসুন কর্নেল সায়েব! এবার পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। রোমিলা আমাদের জন্য ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রতীক্ষা করছে। চলুন।.....

ব্ল্যাক অ্যামবাসাডার

সেবার অক্টোবরের পুজোর সময় কর্নেলের কথা ছিল তিনি আমাকে নিয়ে বিহারের ছোটনাগপুর এলাকায় পাড়ি দেবেন। সেখানে তাঁর এক বন্ধুর প্রাসাদতুল্য বাড়ি আছে। কাজেই থাকবার জায়গার কোনও অসুবিধা নেই। কাছে নদী আছে। নদীর ওপারে পাহাড় আর ঘন জঙ্গল। নদীটার উৎস কয়েক মাইল দূরে একটা জলপ্রপাত।

কর্নেল বলেছিলেন এই প্রপাতের উৎস নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে। সেই গল্পগুলি অবশ্য তিনি বলেননি। যেটুকু আভাস দিয়েছিলেন গেলে দেখা যাবে জলটা ভূগর্ভ থেকে উঠে আসছে। অর্থাৎ প্রস্রবণ বলা চলে। কিন্তু এতবড় প্রস্রবণ নাকি ভারতের কোথাও নেই। কিন্তু তার চেয়ে রহস্যময় ব্যাপার, মাঝে মাঝে প্রস্রবণের ওপরে সূর্যের আলো পড়ে রামধনু দেখা যায়। এই সুন্দর দৃশ্য দেখার জন্য পর্যটকরা ওখানে হানা দেয়। জলপ্রপাতটার নাম ইন্দ্রধারা। তবে কর্নেলের আগ্রহ অন্যদিকে। তাঁর বন্ধু বিজয়নারায়ণ সিংহ সম্প্রতি খবর দিয়েছিলেন ইন্দ্রধারা এলাকায় তিনি এক বিশেষ প্রজাতির প্রজাপতি দেখেছেন। বিজয়বাবু লেপিডকটারিস্ট অর্থাৎ প্রজাপতি বিশারদ নন কিন্তু অনেক জাতের প্রজাপতি চেনেন। কিন্তু এই প্রজাপতি প্রজাপতি তাঁকে অবাক করেছে। কারণ এদের আকার প্রায় ছোট্ট একটা ঘুড়ির মতো। এরা যখন ফুলে বসে থাকে কান পাতলে ক্ষীণ একটা সুর শোনা যায় কতকটা চড়া সুরে বাঁধা বেহালার মতো।

কিন্তু অক্টোবরের পুজো শেষ হয়ে গেল তার পরেও কর্নেল সেখানে যাবার নাম করছেন না। যখনই আমার কাগজের অফিস থেকে সময় পেলে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে গেছি তখনই দেখেছি আমার বৃদ্ধ বন্ধু একটা প্রকাণ্ড বই খুলে ধ্যানমগ্ন। দাঁতের ফাঁকে চুরুট। একফালি নীল ধোঁয়া তাঁর টাক ছুঁয়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমি গিয়ে সোফায় বসলে তিনি বইয়ের দিকে তাকিয়ে শুধু বলেছেন—বোসো, ষষ্ঠীচরণকে আরেক রাউন্ড কফি আনতে বলেছি।

অক্টোবরের শেষ সপ্তাহের এক রবিবার সকালে আমার সল্টলেকের ফ্ল্যাটে সবে ঘুম থেকে উঠেছি এমন সময় টেলিফোন বাজল। আমি টেলিফোন এলে বিরক্ত হই কারণ খবরের কাগজে খ্যাতিমান রিপোর্টারদের সঙ্গে লোকেরা কথা বলতে চায়। কিন্তু টেলিফোনটা বেজেই চলেছে অগত্যা রাগ করে রিসিভার তুলে বললুম—রং নাম্বার।

সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলে উঠল, রাইট নাম্বার ডার্লিং। আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

কর্নেলের কণ্ঠস্বর শুনে আমি হাসতে হাসতে বললুম—মর্নিং কর্নেল, আমার সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানোর মতো কিছু ঘটেনি।

—জয়ন্ত তুমি তো কাগজের লোক হয়েও কাগজ পড়তে চাও না। তুমি কি আজকের কোনও কাগজ পড়েছ?

—না কেন বলুন তো, কিছু কি পড়ার মতো বেরিয়েছে?

—কর্নেল একটু পরে বললেন, আশ্চর্য!

তোমাদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় খবরটা প্রথম পাতায় ছেপেছে। অবশ্যই বেশি জায়গা দেয়নি। কারণ নিউজ এজেন্সির খবর। সিংহগড়ে তো তোমাদের সংবাদদাতা নেই।

আমি একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলুম।

বললুম—খবরটা কীসের বলুন তো।

—কর্নেল বললেন, খবরটার হেডিং : সিংহগড়ে সিংহের হুঙ্কার। আমি রাখছি, তুমি খবরে একবার চোখ বুলিয়ে এখনই চলে এসো।

রিসিভার রেখে সেদিনকার কাগজগুলো তুলে টেবিলে রাখলুম। তারপর দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার প্রথম পাতায় খবরটা খুঁজে বের করলুম। খবরটা নিয়ে যেন নাইট এডিটর কৌতুক করেছেন। একবার চোখ বুলিয়ে সারমর্ম বুঝে নিলুম।

ছোটনাগপুর অঞ্চলের সিংহগড়ে পরপর কয়েকটি রাত কোনও হিংস্র জন্তুর হুঙ্কার শোনা গেছে। সিংহগড়ের একদিকে শিল্পাঞ্চল অন্যদিকে পাহাড় আর জঙ্গল। সিংহগড় একটা সমৃদ্ধ শিল্পনগরী। সেখানে দক্ষিণপ্রান্তে এক সময় বাঙালিদের বসবাস ছিল। তাই বাঙালিটোলা বলা হয়। হুঙ্কার শোনা গেছে সেই এলাকায়।

সন্ধ্যার আগেই সেখানে সবাই বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তবে ওটা সিংহের হুঙ্কার কি না তা নিয়ে সন্দেহ করা যায় না কারণ বাঙালিটোলার এক পুরুতঠাকুর শপথ করে বলেছেন। তিনি একটা সিংহের প্রকাণ্ড ঢাকের মতো মাথা এক পলকের জন্য দেখতে পেয়েছেন।

এই খবর নিয়ে কর্নেলের এতো মাথাব্যথার কারণ বুঝতে পারলুম না। কেউ হয়তো নিছক আমোদ-প্রমোদের জন্যই সিংহ সেজে লোকেদের ভয় দেখাচ্ছেন। আর ওই হুঙ্কার ব্যাপারটা কীভাবে প্রচার করা যায় তা আমি কর্নেলের সঙ্গগুণে জানি। একবার মুখের কাছে জাপানি টেপরেকর্ডার বেঁধে একটা লোক বাঘের গর্জন শোনাত। ওই সব জাপানি যন্ত্রের এমন ক্ষমতা যে কোনও গর্জনকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিতে পারে।

কিছুক্ষণ পরে সেজেগুজে বেরিয়ে পড়লুম। সঙ্গে আমার একটা ব্যাগ। ব্যাগে কিছু জামাকাপড় আর আমার ফায়ার আর্মস ভরে নিলাম। কারণ, কর্নেলের এই ডাকাডাকি মানেই সিংহগড় অভিযানের প্রস্তুতি আমি জানি। ভাগ্যিস এই খবরটা

বেরিয়েছিল। পুজোর সময়ই বাইরে বেড়াতে যাবার অভ্যাস আমার আছে। বিশেষ করে কর্নেল পুজোর সময়টা কোনও সমুদ্রতীরে বা পাহাড়ে জঙ্গলে কাটিয়ে আসতেই ভালবাসেন। আমারও চমৎকার একটা ভ্রমণ হয়ে যায়।

আমার তেজি ফিয়াট গাড়িটা যখন ইলিয়ট রোড এলাকার কর্নেলের বাড়ির গেটে ঢুকল তখন আটটা বাজে। লনের একপাশে গাড়ি রেখে তিনতলায় কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে গেলাম। তারপর ডোর বেল সুইচ টেপার পর ষষ্ঠীচরণ দরজা খুলে ফিক করে হেসে চাপা স্বরে বলল, বাবুমশাইকে আজ এক ভদ্রলোক এসে বড্ড জ্বালাতন করছেন। আপনি গিয়েই দেখুন না।

ষষ্ঠী পাশের করিডর দিয়ে চলে গেল। এটা একটা ছোট্ট ওয়েটিং রুম বলা চলে। তারপর সামনে দরজার পর্দা সরালেই কর্নেলের জাদুঘর সদৃশ বিশাল ড্রইংরুম।

কানে এসেছিল কারও উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ড্রয়িংরুমে ঢুকেই দেখি কর্নেল ইজিচেয়ারে বসে আছেন। তাঁর চুরুট নিভে গেছে কারণ আর ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে না। আর সোফার ওপর একজন রোগাপটকা চেহারার ভদ্রলোক হাত নেড়ে তাঁকে বলছেন, এটা সামান্য ব্যাপার নয় কর্নেল সাহেব। বিজয় নারায়ণ আমাকে রাতের ট্রেনেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর আপনি বলছেন আমাদের কানের ভুল। কখখনো না। মা চণ্ডিকাদেবীর নামে দিব্বি দিয়ে বলছি আমার কানের ভুল নয়। ওহ! সে কি ভয়ঙ্কর গর্জন। ইন্দ্রধারা জলপ্রপাতের গর্জন তো শুনেছেন।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম। কর্নেল মুখ তুলে ঠোঁটের কোণে হেসে বললেন,

—বোসো জয়ন্ত। আলাপ করিয়ে দি। আমরা সিংহগড়ে বিচিত্র প্রজাতির প্রজাপতি দেখতে যাব ভেবেছিলাম। বার বার বাধা পড়ছিল। কিন্তু এবার মনে হচ্ছে না গিয়ে উপায় নেই কারণ ইনি সিংহগড়ের আমার বন্ধু বিজয়নারায়ণ সিংহের ছোট ভাই অজয়নারায়ণ সিংহ। অজয়বাবু, এর নাম জয়ন্ত চৌধুরী, দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার স্পেশাল রিপোর্টার।

অজয়বাবু করজোড়ে নমস্কার করে উত্তেজিত হয়ে বললেন—ট্রেনে আসতে আসতে আপনাদের কাগজে পড়েছি। আপনারা প্রথম পাতায় খবরটা ছেপেছেন। ভালই হল। আপনিও সেখানে চলুন। যেভাবে খবরটা ছাপা হয়েছে তাতে অনেককিছু বাদ গেছে। সব কথা আমি কর্নেল সাহেবকে জানিয়েছি। সোফার অন্য প্রান্তে বসে লক্ষ্য করলুম ভদ্রলোকের পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর ধুতি আর তার পাশে একটা ব্রিফকেস। আর সুদৃশ্য ছড়ি আছে। ট্রেনে ছড়ি নিয়ে আসার কোনও মানে খুঁজে পেলুম না। ইতিমধ্যে ষষ্ঠীচরণ কফি নিয়ে এল। কর্নেল বললেন আবার এক রাউন্ড কফি হোক অজয়বাবু।

অজয়বাবু হাসার চেষ্টা করে বললেন আপনার কফি খাবার অভ্যাস তো

দেখেছি। বারে বারে কফি খেলে আমার আবার ততটা সহ্য হয় না। কর্নেল হাসলেন—নিশ্চয় সহ্য হবে বরং আপনার নার্ভ আরও চাঙ্গা হবে। তিনি কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন এবার যাব আমার ভগ্নীপতির বাড়ি। আমার মেয়ে সুজাতা ওখানে থেকে যাদবপুরে এম. এ. পড়ছে। পুজোর আগেই তার যাবার কথা ছিল। কিন্তু কেন যে গেল না, চিঠি লিখে জানায়নি। এই একটা চিঠিরও জবাব পাইনি।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, সুজাতা সম্ভবত আপনার ওপর রাগ করেই যায়নি। আপনি সুজাতার পিসেমশাই বা পিসিমাকে কি যেতে লিখেছিলেন।

অজয়বাবু কাঁচুমাচু মুখে বললেন, আসলে, এখানে ওদের বাড়িতেই পাঁচশো বছরের পুরোনো পুজো হয় তাই ওদের যেতে বলি কী করে। কিন্তু সুজাতা প্রতিবছর সিংহগড়ে বাঙালিটোলার পুজোয় না গিয়ে পারে না। এবার কেন যে গেল না কে জানে। যাই হোক, ওকে সঙ্গে করেই সিংহগড়ে ফিরব। আপনারা আমাদের সঙ্গে গেলে খুব আনন্দ হত।

কর্নেল বললেন, খবরটা নিশ্চয় আপনার মেয়ে পড়েছে। সে কি সিংহের চোখে পড়ার জন্য বাবার বাড়ি যেতে চাইবে। যা অবস্থা বললেন তাতে তো টুরিস্টরা জলপ্রপাত বা প্রস্রবণ দেখতে যাবে বলে মনে হচ্ছে না।

অজয়বাবু বললেন—না দিনের বেলায় ভয়ের কোনও কারণ নেই। দাদা পুলিসকে জানিয়েছেন। পুলিস রাত্রে তো বটেই, দিনের বেলাতেও জলপ্রপাত অবধি টহল দিয়ে আসে।—আচ্ছা সবই তো শুনলেন। এবার আমি উঠি। পরের ট্রেন সেই এগারোটায়, তাই ভাবছি দুপুরের ট্রেন ধরব, সিংহগড়ে এই ট্রেনটা থামে না। আমরা আগের স্টেশনে নেমে বাসে চেপে চলে যাব।

অজয়বাবু এক হাতে ছড়ি, অন্য হাতে ব্রিফকেস তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। একটু পরে কর্নেল বললেন, এরা দুই ভাই পরস্পর বিপরীত, বিজয়বাবু মোটাসোটা বলিষ্ঠ গড়নের মানুষ, প্রায় আমার সমবয়সী; চালচলনেও আমার মতো বলতে পারো।

—বললুম, অর্থাৎ তিনি আপনার মতো সাহেব।

কর্নেল হাসলেন।

তা অবশ্য বলতে পারো তবে বিজয়বাবুর কণ্ঠস্বর এত চড়া না। তা ছাড়া কথা বলেন কম। একসময় ওঁর পূর্বপুরুষ ওই এলাকার জমিদার ছিলেন। তবে সেকথা আর যা বলছিল। ওঁর ছোটভাইকে তো দেখলে। রোগা পটকা মানুষ কিন্তু বেজায় সৌখিন। তারপর কথা বলেন খুব চড়া স্বরে।

—বললুম উনি ঢাক আর ইনি ঢাকী এই তো।

কর্নেল হাসতে গিয়ে হাসলেন না। চাপা স্বরে বললেন, আমার ধারণা সিংহগড়ে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটতে চলেছে। তা যাতে না ঘটে তার জন্যই আমরা আজই রাত এগারোটার ট্রেনে যাত্রা শুরু করব।

কথাটা বলে তিনি ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে তিনি নতুন একটা চুরুট ধরালেন তারপর চোখ বুজলেন। বুঝতে পারলুম তিনি কোনও গভীর বিষয়ে চিন্তাভাবনা করছেন। কিছুক্ষণ পরে ডাকলুম—আচ্ছা কর্নেল, কর্নেল চোখ বন্ধ করে থেকেই বললেন, বলো।

আপনাকে মনে মনে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে। তাছাড়া সাংঘাতিক ঘটনা বলতে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন? মার্ডার?

কর্নেল একই অবস্থায় থেকে বললেন—আমি সিওর নই। মার্ডারও হতে পারে আবার অভাবিত কিছু হতেও পারে।

—বিজয়বাবুরা বড়লোক তা এর আগে আপনার কথাতেই বুঝেছিলাম। কারণ তাঁরা প্রাসাদতুল্য বাড়িতে বাস করেন। আপনি কি ওঁদের বাড়িতে ডাকাতির কথা ভাবছেন। কারণ—একবার, আপনার মনে পড়তে পারে রামগড়ে আপনার সামরিক জীবনের এক বন্ধুর ফার্মহাউসে ডাকাতির আগে প্রতি রাত্রে বাঘের গর্জন শোনা যেত। এমনকী, সেখানে বাঘও দেখা গিয়েছিল। এভাবে ভয় দেখিয়ে ডাকাতদের চমৎকার একটা সুযোগ হয়, ভয়ে বাড়ি থেকে কেউ বেরোয় না। আর তারা নিশ্চিন্তে ডাকাতি করে চলে যায়।

কর্নেল আমার কথায় কান দিলেন না। তিনি সোজা হয়ে বসে হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুললেন। তারপর একটা নম্বর ডায়াল করে বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি...হ্যাঁ মিস্টার ব্যানার্জি আপনার ডিপার্টমেন্টে কি ছোটনাগপুর সিংহগড় এরিয়ার কোনও বিশেষ ঘটনার খবর এসেছে।... আসেনি। কিন্তু আজকের কাগজে সিংহের গর্জনের খবর বেরিয়েছে। পড়েছেন...। হ্যাঁ ইউ আর রাইট, তো শুনুন আমি আর জয়ন্ত সিংহগড়ে যাচ্ছি।... না, না, আপনি যাকে বলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার তাবৎ জঙ্গলের অধিপতি, তাই আপনাকে জানাতে হল। ওখানে যদি সম্ভব হয় একটা মেসেজ পাঠালে খুশি হব। ওখানে তো ট্যুরিস্ট লজ আছে। একটা টু বেড স্যুট। থ্যাঙ্কস মেনি থ্যাঙ্কস্ মিস্টার ব্যানার্জি।

রিসিভার রেখে কর্নেল আমার ব্যাগের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি রেডি হয়ে এসেছ। ভাল করেছ। যাও তোমার ঘরে গিয়ে ব্যাগ রেখে ব্রেকফাস্টের জন্য তৈরি হও। ব্রেকফাস্ট করে আমরা দু'জনে বেরবো।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল ড্রয়িংরুমে এসে আবার এক প্রস্থ কফি পান করলেন। তারপর উঠে দাঁড়াতে গিয়ে হঠাৎ সোফার তলা থেকে কী একটা কুড়িয়ে নিলেন।

—জিজ্ঞেস করলুম, কী ওটা।

—কর্নেল বললেন এটা সম্ভবত অজয়বাবু আমাকে দেখাতে চেয়েছিলেন। বারবার বলছিলেন তিনি এই জিনিসটা তাঁদের ঠাকুরবাড়ির পেছনে পুকুরের পাড়ে কুড়িয়ে পেয়েছেন।

—বলে কর্নেল জিনিসটা আমার হাতে তুলে দিলেন। অবাক হয়ে দেখলুম সেটা একটা রুপোর টাকার সাইজের চাকতি। ব্রোঞ্জের চাকতি বলেই মনে হল। চাকতির দুই পিঠেই কীসব আঁকাঝোকা আছে বোঝা গেল না। এই সময় কর্নেল হঠাৎ চাকতিটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে সোফার নিচে যেখানে পড়ে ছিল সেখানেই রেখে দিলেন। তার পর চাপা স্বরে বললেন, এটার কথা অজয়বাবুর মনে পড়েছে তাই উনি ফিরে এসেছেন।

—অবাক হয়ে বললাম, কী করে বুঝলেন।

—দোতলায় লিন্ডাদের কুকুরটা বেশ চেঁচামেচি করছে...

তুমি তো জানো একেবারে নতুন কোনও লোকের সাড়া পেলে জনি খুব রেগে যায়।

কর্নেলের কথা শেষ না হতেই ডোর বেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁকলেন, ষষ্ঠী।

অজয়বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢুকে বললেন কী সর্বনাশ! আমি আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলুম জিনিসটা, কোথায় যে ফেললুম মনে পড়ছে না।

কর্নেল হাসিমুখে সোফার তলায় দেখিয়ে বললেন, আপনি জিনিসটা ওখানেই ফেলে গেছেন। ওই দেখুন! ওটা এখনও অদৃশ্য হয়ে যায়নি।....

দুই

আমি ভেবেছিলুম, অজয়বাবু হয়তো কর্নেলকে ওই ব্রোঞ্জের চাকতিটা শুধু চোখে দেখে পরীক্ষা করতে বলেছিলেন। তাই এবার তিনি ওটা ফেরত নিতে এসেছেন।

কিন্তু উনি বললেন, কফি খাওয়ার সময় কখন ওটা হাত ফসকে নিচে পড়ে গিয়েছিল।

বলে তিনি কর্নেলকে চাকতিটা দিলেন। কর্নেল বললেন, তখন এটা আপনার হাতে দেখে বুঝেছিলুম এটা কোনও প্রাচীন যুগের সিল।

অজয়বাবু বললেন—কর্নেল সাহেব আসলে ওটা আপনার কাছে রাখতে বলেছিলেন দাদা। আপনি ওটা পরীক্ষা করে দেখে সব কথা দাদাকে জানাবেন। আমিও জানতে পারব।

বলে অজয়বাবু ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন এইসব ছোট ছোট ঘটনা থেকে মানুষের চরিত্র জানা যায়। চিন্তা করে দেখো জয়ন্ত, তিনি এই চাকতিটা হাতে নিয়ে কতক্ষণ ধরে আমাকে তাঁর পূর্বপুরুষের কাহিনি অনেক রঙ চড়িয়ে শোনাচ্ছিলেন। তিনি জানেন যে, আমি তাঁদের বাড়িতে গেছি এবং তাঁর দাদা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। যাইহোক, চলো যেখানে যাচ্ছিলে। নিচের লনে পার্ক করে রাখা গাড়িতে সামনের সিটে বসলেন। লক্ষ্য করলাম শুধু গলায় ঝুলছে ওঁর সেই

শক্তিশালী ক্যামেরা যা নাকি নিজেই আলো তৈরি করে অন্ধকারে ছবি তুলতে পারে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললেন অজয়বাবু সম্পর্কে আপনার ধারণাটা কী তা কিন্তু বলেননি।

গেট দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর কর্নেল মৃদু হেসে বললেন—মানুষটিকে বোঝা খুব সোজা, উনি সব ব্যাপারেই খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অনেক কিছুই তাঁর মনে থাকে না। তা ছাড়া অকারণ ব্যস্ততায় যারা মূল কাজটা ভুলে যায় তিনি সেই দলের মানুষ। হ্যাঁ, আমরা পার্ক স্ট্রিট দিয়ে যাব। কোথায় যেতে হবে তা যথাসময়ে জানতে পারবে। কর্নেলের নির্দেশে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ হয়ে শ্যামবাজারে পৌঁছলাম তারপর তাঁর নির্দেশে উত্তর কলকাতার বাঁকাচোরা পল্লী দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে কিছুক্ষণ পরে একটা পুরনো বাড়ির সামনে কর্নেল আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন। তার পরে গেটের পাশে আমাকে গাড়ি লক করতে বলে তিনি এগিয়ে গেলেন। গেটে দারোয়ান নেই কিন্তু উত্তর কলকাতার এই সব বাড়ি যে অভিজাত বনেদি পরিবারের বাড়ি তা আমি জানি। গেটের ভেতর দিক থেকে তালা বন্ধ ছিল। কর্নেল তালাটা বার কয়েক নাড়াতেই গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরে বলে উঠল—ওরে মঘা দেখতো কে এসেছেন।

তারপর দেখলুম ভেতরের ছোট্ট লনে এক পাশ থেকে একজন কালো বেঁটে ফতুয়া পরা লোক এসে কর্নেলকে দেখামাত্র করজোড়ে ঝুঁকে নমস্কার করল। তারপর সে বলল—বাবুমশাই নিজের হাতে জঙ্গল সাফ করতে ব্যস্ত হয়েছেন। আমার কোনও দোষ নাই কর্নেল সাহেব। আমার নাকি নিজে থেকেই এসব কাজ করা উচিত ছিল। হ্যাঁ স্বীকার করছি তা তো ছিলই তাই বলে আমার উপর রাগ করে তিনি নিজেই—

লোকটার কথা থেমে গেল। এবার দেখলুম ডানদিকের ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর থেকে এক ভদ্রলোক মুখ বের করেছেন। তিনি প্রায়ই চেঁচিয়ে উঠলেন—কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।

মঘা গেটের তালা খুলে আমাদের ভেতরে নিয়ে গেল। অপ্রশস্ত ইটে বাঁধানো একটা রাস্তা। গাড়ি বারান্দার তলায় পৌঁছেছে। তার মানে এক সময় এ বাড়িতে মোটরগাড়ি ছিল। কর্নেল লনের মাঝামাঝি গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বললেন আপনি একেবারে নিজেই মজুর খাটাতে শুরু করেছেন।

গায়ে গেঞ্জি, গোটানো ধুতি, পায়ে একটা চপ্পল এবং গায়ের রঙ পাতা-চাপা ফুলের মতো, এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতে কাটারি নিয়ে এগিয়ে এলেন। তাঁর মাথার চুল কর্নেলের মতোই সাদা। মুখে পেল্লাই গোঁফ আছে। শরীর দেখে বোঝা যায় একসময় নিশ্চয় তিনি নিয়মিত ব্যায়াম করতেন। তিনি মঘার হাতে কাটারি দিয়ে বললেন, আসলে আমি পরীক্ষা করে দেখছিলুম আমার শারীরিক ক্ষমতা আগের

মতো আছে কি না। তিনি কর্নেলের হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে গাড়ি বারান্দার তলায় দাঁড়ালেন। তারপর আবার বললেন, একটা ফোন করে এলে কী ক্ষতি হতো।

কর্নেল হাসলেন—এটাকে সারপ্রাইজ ভিজিট বলতে পারেন। রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী বরাবর অদ্ভুত অদ্ভুত কাজ করেন। এবারটা দেখে হতাশ হবেন। বুঝতে পারলুম ভদ্রলোকের নাম রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী, বেশ ভারিক্কি নাম। কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে বসার ঘরে তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন। ঘরের আসবাবপত্র সবই সেকেলে, পুরনো। তাহলেও এসব জিনিসের দাম বাজারে অনেক বেশি। বাকিটা দোতলা। সামনে দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছিল। রাঘবেন্দ্রবাবু বললেন, চলুন ওপরে ওঠা যাক।

কর্নেল বললেন—আমার হাতে সময় খুব কম। একটা জরুরী কথা জানবার জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি।

রাঘবেন্দ্রবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এই ছেলেটিকে তো কখনো দেখি নি।

কর্নেল বললেন, —ওকে ছেলে বলবেন না। বয়স লুকিয়ে ছেলেমানুষ হয়ে আছে। ওর নাম জয়ন্ত। পেশা সাংবাদিকতা।

বলে কর্নেল একটা চেয়ার টেনে বসলেন। শ্বেতপাথরের ডিম্বাকৃতি বিশাল টেবিলের চারপাশে অনেকগুলো গদিআঁটা চেয়ারে রাঘবেন্দ্র আমাকে ইশারায় বসতে বলে নিজে বসলেন কর্নেলের পাশে তারপর মৃদু হেসে বললেন—কফি খাওয়াতে পারছি না। কারণ আমি কফি খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। আপনি খবর দিয়ে এলে অবশ্য কফি আনিয়ে রাখতুম। তিনি এবার কণ্ঠস্বর চাপা করলেন, বললেন—সঙ্গে সাংবাদিক নিয়ে এসেছেন। খবরের কাগজে বুঝি কোনও খবর বেরিয়েছে!

কর্নেল মৃদু স্বরে বললেন খবর তো প্রতিদিনই বের হয় অনেক অদ্ভুত খবরও থাকে তবে আপনি ঠিকই ধরেছেন আজকের কাগজে সিংহগড়ের একটা মজার খবর বেরিয়েছে। সিংহগড়ে সিংহনাদ। কিংবা ওরকম কিছু হেডিং আপনার চোখে পড়েছে?

লক্ষ্য করলুম রাঘবেন্দ্রবাবুর মুখ অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে এল। একটু চুপ করে থাকার পর বললেন খবরের কাগজ আমি পড়া ছেড়ে দিয়েছি। খালি রাজনীতি, দলাদলি আর খুনোখুনি। কিন্তু সিংহগড়ের খবরে কী যেন বললেন—সিংহনাদ।

কর্নেল বললেন ওই রকম একটা কিছু ধরে নিন না। সিংহ এসে রাত-বিরেতে গর্জন করছে। অথচ ওখানে তো সিংহ থাকার কথা নয়। ভারতে সিংহ থাকে একমাত্র গুজরাতের গির অরণ্যে। কোথায় গুজরাত আর কোথায় বিহারের ছোটনাগপুর।

এবার দেখলুম রাঘবেন্দ্রবাবুর মুখে বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন আমি

সিংহগড় ছেড়ে এসেছি প্রায় পনেরো বছর আগে। বাড়িটাও বেচে এসেছি। কিন্তু আপনার কথা শুনে আমি চমকে গেছি।

কর্নেল বললেন, আমি ঠিক এটাই অনুমান করেছিলাম। আপনি সিংহগড়ের পুরনো বাসিন্দা। কখনো কি এধরনের কোনও অদ্ভুত ঘটনা ঘটতে দেখেছিলেন। রাঘবেন্দ্রবাবু আবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন—প্রায় বিশ বছর আগে সিংহগড়ে গুজব রটেছিল এক অলৌকিক শক্তিধর সাধুবাবার একটা পোষা সিংহ আছে। কিন্তু আমি সেই সাধুবাবাকে ইন্দ্রধারার ওপরদিকে জঙ্গলের ভিতর একবার দেখেছিলাম কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনও সিংহ দেখিনি। তার পরেই একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছিল। বিজয়নারায়ণের খুড়তুতো ভাই ছিলেন ব্রহ্মচারী। সাধুর মতোই থাকতেন। তার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ জলপ্রপাতের কাছে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। পুলিশের মতে কোনও জানোয়ারের আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছিল। বিজয়নারায়ণ তো আপনার বন্ধু। একথা আপনার কাছেই শুনেছি। কিন্তু সেকি তার খুড়তুতো ভাইয়ের শোচনীয় ঘটনার কথা আপনাকে বলেনি? কর্নেল অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। বললাম—না তো। তাঁর ছোট ভাই অজয়বাবু আজকে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনিও সিংহের গর্জন শোনার কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর খুড়তুতো ভাইয়ের ঘটনাটা বলেননি।

রাঘবেন্দ্রবাবু জোড়ে শ্বাস ছাড়লেন তারপর চাপা স্বরে বললেন—তারপর সেই ঘটনার সঙ্গে নারীঘটিত একটা কেলেঙ্কারি জড়িত ছিল। চিন্তা করে দেখুন, সত্যেন্দ্রনারায়ণের মতো ব্রহ্মচারীকে টলাতে পেরেছিল এক যুবতী। কুড়ি বছর আগের কথা বলছি। খেয়াল রাখবেন।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন—কে সেই যুবতী? তার নাম কী? সে কি বাঙালি ছিল?

রাঘবেন্দ্র বললেন—আপনার হাতে সময় নেই বলছেন। কিন্তু কথাটা যখন উঠল তখন আমি বাকিটুকু বলতে চাই। আর কথাটা আপনার জানাও দরকার। এক মিনিট, আমি এখনই আসছি।

বলে তিনি সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে গেলেন। আমি চাপা স্বরে বললুম—ব্যাপারটা রোমান্টিক এবং মিস্টিরিয়াস বলে মনে হচ্ছে।

কর্নেল ঠোঁটে আঙুল রেখে আমাকে চুপ করে থাকতে ইশারা করলেন। জিজ্ঞাসা করলুম এ-বাড়িতে কি আর কেউ নেই?

কর্নেল অন্যমনস্ক ভাবে বললেন—না। রাঘবেন্দ্রবাবু জীবন খুব ট্রাজিক। ওঁর স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র ট্রেন দুর্ঘটনায় মারা যায়। তারপর উনি এই পৈতৃক বাড়িতে এসে ওঠেন। আমার সঙ্গে রাঘবেন্দ্রবাবুর আলাপ হয়েছিল একটা সেমিনারে। ইনি একজন অর্নিথলোজিস্ট। পক্ষীবিশারদ, তুমি তো জানো আমারও—

তাঁর কথার উপর বললুম—জানি বই কী। আপনি বাইনোকুলার হাতে পাখির

পিছনে বনে জঙ্গলে উধাও হয়ে যান। কতবার আমি আপনার নাগাল না পেয়ে ফিরে এসেছি।

এই সময় রাঘবেন্দ্রবাবু নেমে এলেন। তাঁর হাতে একটা খাম। খামটা বিবর্ণ। খুব পুরনো বলেই মনে হচ্ছিল। তিনি এসেই কর্নেলের পাশে বসলেন। তারপর খামটা কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল খামটা সাবধানে খুলে একটা ফটোগ্রাফ বের করলেন। ফটোটা এক সুন্দরী মহিলার। যৌবনের দীপ্তি তাঁর চেহারায় জ্বল জ্বল করছিল। কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো পকেট থেকে একটা আতসকাচ বের করলেন। একটু অবাক হলাম। সঙ্গে তা হলে উনি আতস কাচ নিয়ে এসেছিলেন। তার মানে তিনি এই ছবিটা দেখার জন্যই এই ভদ্রলোকের কাছে এসেছেন।

আতস কাচ দিয়ে ছবিটা খুঁটিয়ে দেখার পর কর্নেল বললেন—এই মহিলার নাম কী?

রাঘবেন্দ্রবাবু আবার বাঁকা হেসে বললেন—প্রতিমা রায়। বাঙালি মা আর বিহারী বাবার একমাত্র সন্তান—কর্নেল জিজ্ঞাসা করলে এই ছবি আপনি কোথায় পেলেন?

—এই ছবিটা আমি বিজয়নারায়ণের সেই ব্রহ্মচারী খুড়তুতো ভাইয়ের বিছানার তলায় খুঁজে পেয়েছিলুম। হ্যাঁ স্বীকার করছি, আমি চোরের মতো ওদের বাড়ির পেছনদিকে ঠাকুরবাড়ির পাশে একটা ঘর থেকে চুরি করেছিলুম। আপনার কাছে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই। ওই ব্রহ্মচারীর সঙ্গে আমার ডুয়েল লড়ার প্রবৃত্তি হয়েছিল। আমি এই যুবকের সামনে সেই সব পুরনো কথা বলতে সঙ্কোচবোধ করছি। আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন কী ঘটেছিল।

কর্নেল শান্তভাবে বললেন এই মহিলা কি এখনও বেঁচে আছেন জানেন। রাঘবেন্দ্রবাবু বললেন—জানি না। কারণ পনেরো বছর আমি সিংহগড়ে যাইনি। তাকে শেষবার দেখেছিলাম সেই চলে আসার সময়।

ভাবছিলুম কর্নেল আর কিছু প্রশ্ন করবেন কিন্তু তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন ছবিটা আপনাকে আমি শিগগির ফেরত দেব। আমি শুধু এর একটা ফটোকপি তুলে রাখতে চাই। এই যে ক্যামেরাটা দেখছেন এটা দিয়ে সেই কাজ হবে না। আমাকে অন্য ক্যামেরা ব্যবহার করতে হবে।

রাঘবেন্দ্রবাবু খামটা কর্নেলের হাতে দিয়ে বললেন আমাকে আর ফেরত না দিলেও আর ক্ষতি নেই। এই মহিলা আমার জীবনের সুখ-শান্তি কেড়ে নিয়েছিল। এক ব্রহ্মচারীর জীবনেও নিষ্ঠুর আততায়ীর আঘাত নেমে এসেছিল। তাই এটা আমার কাছে একটা আতঙ্কের প্রতীক। আমার সমস্যা আপনি বুঝতে পারছেন কর্নেল সাহেব। এটাকে যে ছিঁড়ে ফেলব তাতে আমার হাত কেঁপেছে।

—ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ মিঃ রায়চৌধুরী। পরে যদি আপনি এটা ফেরত চান নিশ্চয়ই পেয়ে যাবেন। আপাতত এটা আমার কাছেই থাক।

আমাদের বিদায় দিতে রাঘবেন্দ্রবাবু গেট অবধি এলেন। তারপর বললেন, আপনি নিশ্চয়ই সিংহগড়ে যাচ্ছেন।

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ যাচ্ছি। তবে আমার উদ্দেশ্য সিংহগড়ের রহস্য উন্মোচন নয়। বিজয়বাবু খবর দিয়েছেন। ইন্দ্রধারার ওদিকে জঙ্গলের মধ্যে এক বিশেষ প্রজাতির প্রজাপতি তিনি দেখেছেন। প্রজাপতি বিশারদ হয়েও তিনি বুঝতে পারেননি ওগুলো কোন প্রজাতির, আমার সিংহগড়ে যাবার উদ্দেশ্য শুধু এটাই।

রাঘবেন্দ্রবাবু তখনই গম্ভীর কণ্ঠস্বরে মঘাকে ডাকতে ডাকতে চলে গেলেন। ফিরে আসার পথে আমি বললুম—ওই ভদ্রলোকের কাছে এই ফটো আছে আপনি তা কি জানতেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—জয়ন্ত, আমি তোমাকে বরাবর বলে আসছি অনেক সময় আমরা জানি না যে আমরা কি জানি। খবরটা পড়ার পর আমার মনে ভেসে উঠেছিল রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরীর মুখ। তিনি বেশ কয়েকবার আমাকে বলেছিলেন, তাঁর কাছে একটা বিচিত্র নিদর্শন আছে। তিনি আমাকে দেখাবেন। তারপর আমরা দুজনেই ভুলে গিয়েছিলুম কথাটা সেদিন হঠাৎ মনে পড়েছিল। কিন্তু সেটা যে একটা ছবি তা জানতাম না।

জিজ্ঞাসা করলুম—এর সঙ্গে কি সিংহগড়ের সিংহনাদের কী কোনও সম্পর্ক আছে?

সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে কর্নেল বললেন—তুমি সাবধানে গাড়ি চালাও। দেখছ না সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ-এ এমন গাড়ির উৎপাত বেড়ে গেছে হয়তো কোথাও জ্যাম ছিল।

তিন

সিংহগড়ে আমি কখনো না এলেও মোটামুটি এ ধরনের জনপদের চেহারাচিত্র আমার জানা। কর্নেলকে দেখে বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবে ট্যাক্সিওয়ালারা ঘিরে ধরেছিল। কিন্তু কর্নেল একটা এক্কাগাড়ি পছন্দ করলেন। কোচওয়ানের নাম আব্দুল। আমাদের গন্তব্য ট্যুরিস্ট বাংলোর পাশে আঁচ করে নিয়েছিল। ট্যুরিস্ট বাংলো যাওয়ার পথে যে ইন্দ্রধারার কাছে সেই প্রস্রবণের আশ্চর্য রামধনুর গল্প শোনাচ্ছিল। এই রাস্তাটা সিংহগড়ের এক প্রান্ত দিয়ে গেছে। ক্রমশ শহর এলাকা ছেড়ে চড়াই আর উতরাই হয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। ডানদিকে ঢেউখেলানো প্রান্তর। মাঝে মাঝে একটা করে টিলা পাহাড় আর কদাচিৎ ঝোপঝাড় বা গাছ।

এক সময় কর্নেল তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ট্রেনে আসবার সময় শুনে এলুম তোমাদের এই সিংহগড়ে নাকি রাতবিরেতে একটা সিংহ এসে উৎপাত করছে।

আব্দুল বলল—স্যার ওসব গুজবে কান দেবেন না। এটা কারা যে রটাচ্ছে তা জানি না।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, শুনলুম সন্ধ্যা হতে না হতেই সবাই বাড়ির ভেতর ঢুকে দরজা এঁটে দেয়।

আব্দুল হাসতে হাসতে বলল সেটা ঠিক স্যার। আমি যে মহল্লায় থাকি সেটা সিংহগড়ের শেষ দিকে। ওখানেই নদী আছে। কিন্তু সিংহটা নাকি এই শহরের সদর রাস্তা দিয়ে হাঁকডাক করতে করতে ছুটে যায়। পুলিশ অনেকবার টহল দিয়েছে শুনেছি। কিন্তু তারা কখনো সিংহের ডাক শুনতে পায়নি। আমার এক ভাতিজা থানার পাশেই চায়ের দোকান করেছে। তার নাম রশিদ। রশিদের কাছেই শুনেছি পুলিশ বলছে এই গুজব ছড়িয়ে কোনও ডাকাতের দল ডাকাতি করতে চায়। তাই পুলিশ মাঝে মাঝে টহল দেয় আর সবাইকে সাবধানে থাকতে বলে।

আমাদের বাঁদিকেও ঢেউখেলানো মাটির উপর ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একটা শালবনের ভেতর দিয়ে এগিয়ে এক্কাগাড়ি বাঁদিকে পূর্বে ঘুরল।

কর্নেল আমাকে বললেন—আমরা এবার বাঙালিটোলার শেষ প্রান্ত দিয়ে যাব। ট্যুরিস্ট বাংলো নদীর ধারেই।

সেখান থেকে বিজয়বাবুদের দোতলা প্রাসাদটা দেখা যায়।

বললুম—সত্যই কি প্রাসাদ?

কর্নেল বললেন হ্যাঁ। প্রকাণ্ড সব পিলার এবং সব মিলিয়ে ইটালিয়ান স্থাপত্যের আদল তুমি দেখতে পাবে। ওটা তৈরি করেছিলেন বিজয়বাবুর ঠাকুরদার ঠাকুরদা। তাঁর পদবি ছিল রাজাবাহাদুর।

কথাটা আব্দুলের কানে গিয়েছিল। সে বলল—স্যার, ওঁদের অবস্থা আগের মতো নেই। দুই ভাই আর কয়েকজন চাকরবাকর অতবড় বাড়িতে বাস করে। বড় রাজাবাবু বড্ড খেয়ালি মানুষ। একসময় জবরদস্ত শিকারি ছিলেন। এখন শিকার না করলেও বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান।

শালবন পেরিয়ে দুধারে সারবদ্ধ গাছ। আর ঝোপঝাড়ের মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ছিল। কর্নেলকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—এদিকটাই ছিল প্রাচীন আমলের সিংহগড়, এগুলি তারই ধ্বংসাবশেষ, বলে তিনি কৌতুকে চোখ নাচালেন। জয়ন্ত, হঠাৎ যদি এসব ধ্বংসাবশেষ থেকে সত্যই একটা সিংহ বেরিয়ে তাড়া করে।

—বললুম এ তো আফ্রিকা নয়, গুজরাটের গির অরণ্যও নয়। দিনের বেলায় সিংহ বেরবে না। বলে আমিও রসিকতা করলুম।

আব্দুলের এই ঘোড়াটা খাবার লোভে সিংহ বেরিয়ে পড়তেও পারে। আব্দুল কোচোয়ান হাসির চোটে অস্থির হয়ে বলল—স্যার, আমার কাজ সারাদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি স্টেশনে যাওয়া আর ফিরে আসা। এখন তো ট্যুরিস্টবাবুরা তত

বেশি আসছেন না। আসবেন সেই শীতের সময়। সিংহ থাকলে কি আর আমাদের রেহাই দিত?

আরও কিছুটা এগিয়ে সামনে এবং দুধারে ছবির মতো সুন্দর বাড়ি দেখতে পেলাম। একটা টিলার কাঁধের ওপর দিয়ে এই রাস্তার একটা শাখা এগিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়ে এগিয়ে ডাইনে ঘুরে দেখলুম এদিকেই একটা দোতলা সুদৃশ্য বাড়ি। গেটের কাছে এক্কা গাড়িটা থামল। তার পর কর্নেল তাঁর ব্যাগটা নামালেন। আমি আমার ব্যাগটা তুলে কাঁধে ঝোলালুম। আব্দুলকে কর্নেল ভাড়া মিটিয়ে দেওয়ার পর সেলাম ঠুকে চলে গেল।

তার পরই দেখলুম বাংলোর গেট খুলে একজন টাই স্যুট পরা ভদ্রলোক এসে করজোড়ে কর্নেলকে নমস্কার করলেন। আমাকেও তিনি নমস্কার করলেন। কর্নেল বললেন—আশা করি আপনি ঠিকসময় খবর পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে দুজন উর্দিপরা কর্মচারী এসে কর্নেল এবং আমার ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গেল।

কর্নেল বললেন জয়ন্ত, ইনি এই বাংলোর ম্যানেজার মিস্টার সূর্যকান্ত রায় ইনি কিন্তু বাঙালি। আশা করি তা বুঝতে পেরেছ। মিস্টার রায় এ আমার তরুণ বন্ধু খ্যাতনামা সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরী।

মিস্টার রায় বললেন—আপনার জন্য দোতলায় পূর্ব-দক্ষিণ কোণে একটা ডাবল স্যুইট বুক করে রেখেছি। কর্নেল বললেন—এখনো কি ট্যুরিস্ট মরসুম শুরু হয়নি।

প্রশস্ত সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় ওঠার পর মিস্টার রায় চাপা স্বরে বললেন এখানে বলতে গেলে প্রায় সারা বছরই দেশি-বিদেশি ট্যুরিস্টের ভিড় হয় কিন্তু এবার একটা বাজে গুজবে ভয় পেয়ে কিছু ট্যুরিস্ট চলে গেছেন। জনাতিনেক বিদেশি আছেন। তাঁরা এসেছেন আমেরিকা থেকে। দরজা খোলা ছিল। ভেতরে লাল কার্পেট ঢাকা প্রশস্ত লাউঞ্জ। তার ওপাশে বারও আছে দেখলাম। বারের সামনে উঁচু টুলে বসে দুজন যুবক মদ্যপান করছিল। রিসেপশান কাউন্টারে এক সুন্দরী যুবতী এবং একজন বলিষ্ঠ ধরনের যুবক আমাদের লক্ষ্য করছিল।

রায় বিনীতভাবে বললেন—জাস্ট একটা ফরমালিটি। রেজিস্টারে আপনাদের নাম-ঠিকানা লেখা আছে। শুধু আপনি সাইন করে দিলেই হবে।

সুষমা তুমি আশা করি বুঝতে পেরেছ। ইনিই সেই কর্নেল সাহেব। তোমাকে যাঁর কথা বলেছিলাম। আর প্রদীপ বুঝতে পারছ ইনি কে? যুবকটি নমস্কার করে একটু হাসল মাত্র। সুষমা রেজিস্টার খুলে দিল। কর্নেল সই করে একটু হেসে মৃদু স্বরে বললেন সিংহটা আশা করি এই ট্যুরিস্ট বাংলোয় রাতদুপুরে এসে রুম বুক করতে চায়নি। নাকি এসেছিল সে।

মিস্টার রায়, সুষমা এবং প্রদীপ এক সঙ্গে হেসে উঠেছিল। মিস্টার রায় বললেন প্রদীপ একজন রাইফেল শুটার।

সিঁড়িতে কার্পেট বিছানো। সেদিকে এগিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলাম, লাউঞ্জে এক বৃদ্ধ দম্পতি এবং অন্য দিকে একজন কাটখোট্টা চেহারার গুঁফো লোক বসে পাইপ টানছে। সে বারবার কর্নেলকে দেখছিল। দৃষ্টিটা আমার কেন জানি মনে হল কেমন অর্থপূর্ণ কিন্তু এখন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় না। উপরে চওড়া বারান্দা। উর্দি পরা লোক দুটি আমাদের সুইটের দরজা খুলে দিয়ে বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা ভিতরে ঢুকলুম। মিস্টার রায় বললেন—রঘু! জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে দেয়নি কেন? আর রামলাল। তুমি কর্নেল সাহেবের জন্য কফি আর স্ন্যাক্স নিয়ে এসো। কলকাতা থেকে মিস্টার মুখার্জি আমাকে জানিয়েছেন কর্নেল সাহেব বার বার কফি খান।

ঘরটা মোটামুটি প্রশস্ত। পূর্বে দুটো এবং দক্ষিণে দুটো জানালা দুপাশে দুটো নিচু খাট। একটা সোফা সেটও আছে মাঝামাঝি জায়গায়। সেন্টার টেবিলে ফুলদানিতে সুন্দর রঙবেরঙের ফুল সাজানো। দেয়ালে বিদেশি চিত্রকরদের বিখ্যাত সব ছবির কপি ঝুলছে।

মিস্টার রায় চলে যাওয়ার পর আমি বাথরুমে ঢুকে প্রাকৃতিক কর্ম করে এলাম। দেখলুম বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে দক্ষিণদিকের কিছু দেখছেন।

বললুম—সিংহ খুঁজছেন নাকি? কর্নেল একটু হেসে বললেন—দুটো টিলার ফাঁক দিয়ে জলপ্রপাতের দিকটা দেখছিলুম। তিন মার্কিন সাহেবকে দেখতে পেলুম।

বলে তিনি পূর্বদিকে গেলেন। আবার বাইনোকুলারে কিছু দেখার পর ফিরে এলেন। বললেন, বাঙালিটোলার রাজপ্রাসাদ তেমনি আছে। আসলে আগের দিনের স্থপতি এবং কর্মীরা নিজেদের কাজে খুব সিনসিয়ার ছিলেন। এখনকার কনট্রাকটরদের মতো ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস তাঁদের ছিল না। কর্নেলের কাছ থেকে বাইনোকুলারটা নিয়ে প্রাসাদটা দেখব ভাবছিলুম কিন্তু কর্নেল বললেন যথাসময়ে প্রাসাদে আমরা উপস্থিত হব। ভিতরে চলো। পোশাক বদলে নিতে হবে। অবশ্য তার আগে কফিটা আসুক।

কর্নেল পূর্বদিকে খাটটার কাছে গিয়ে বললেন—এটা আমি দখল করলুম। ঘরে একটা ইজি চেয়ারও ছিল। সেটা টেনে সোফার পাশে কর্নেল দুপা ছড়িয়ে বসলেন। ঘরের মেঝে পুরু কার্পেটে ঢাকা। আমি সোফায় বসে বললুম—সিংহের ব্যাপারটা নিয়ে আব্দুল কোচওয়ানের মতো ট্যুরিস্ট লজের লোকেরা হাসাহাসি করলেন। বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা এখনও অনেকেই সত্যি বলে মনে করে না।

এইসময় রামলাল ট্রে-তে কফি পট, দুটো সুদৃশ্য কাপপ্লেট, দুধ এবং চিনির পাত্র আর এক প্লেট পকোড়া রেখে সেলাম দিল। কর্নেল বললেন আচ্ছা রামলাল তোমাদের সিংহগড়ে নাকি সত্যি একটা সিংহ এসে রাত-বিরেতে উৎপাত করছে?

রামলালের মুখ মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল। সে চাপাস্বরে বলল হুজুর পরে সব খুলে বলব। শুধু এটুকু বলছি, কথাটা গুজব নয়। বলেই সে চলে গেল। কর্নেল কফি তৈরি করে বললেন রামলালের গল্পটা শোনা দরকার এতক্ষণে এই একটি লোককে পাওয়া গেল যে এই গুজবটা গুরুত্ব দেয়। আমি পকোড়া চিবোতে চিবোতে বললুম—কর্নেল, লবিতে একজন যণ্ডাগণ্ডা লোক বসে পাইপ টানছিল। আর আপনার দিকে কেমন সন্দেহজনক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিল। আপনি কি তা লক্ষ্য করেছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—করেছি। লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছি এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে এটা ঠিক যে আমি ওকে কোথাও দেখেছি।

বললুম লোকটাকে দেখে মনে হচ্ছিল ক্রিমিন্যাল টাইপ। আপনার তো সর্বত্র শত্রুর অভাব নেই। কর্নেল একটা পকোড়া তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে বললেন, এমন হতেই পারে লোকটা আমার শত্রু নয়। কোথাও তার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে এখানে বেড়াতে এসে আমাকে দেখবার আশা করেনি, তাই হয়তো আমাকে স্মরণ করার চেষ্টা করছিল। বললুম, আপনি কোলকাতা থেকে বেরোবার সময় বলেছিলেন—সিংহগড়ে যেন আমরা সব সময় সজাগ থাকি। আপনার ইনটিউশন নাকি বলছে এখানে কোনও সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে পারে। কথাটা আশা করি ভুলে যাননি। কর্নেল বললেন—না ভুলিনি। তবে সারা রাত জেগে ট্রেন জার্নিতে দুজনেই ক্লান্ত। অবশ্য ভোরবেলা পৌঁছলে আমি তোমাকে শুইয়ে রেখে ইন্দ্রধারার কাছে একবার যেতুম। কিন্তু ট্রেনটা বড্ড বেশি লেট করেছে। ন'টা বাজে। দশটায় ব্রেকফাস্ট করে আমরা বেরুব। তার আগে বিজয়বাবুকে খবর দিতে হবে। এইখানে টেলিফোন আছে দেখতে পাচ্ছ তো। —টেলিফোনটা দেখে বললুম আপনার এতে অনেক সুবিধা হবে।

ব্রেকফাস্টের পর কর্নেল বেরিয়ে পড়লেন। আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতেই হল। যদিও ট্রেন জার্নির ক্লান্তি তখনো আমাকে পেয়ে বসেছিল। বাংলোর বাইরে খানিকটা সমতল জমির পর উত্তর এবং দক্ষিণে দুদিকেই সংকীর্ণ পিচের রাস্তা। সমতল জমিতে কয়েকটা সাইকেল রিকশা দাঁড়িয়ে ছিল। কর্নেল একটা রিকশা ডেকে বললেন—রাজবাড়ি যাব। ডানদিকে এগিয়ে কিছুদূর চলার পর একটা প্রশস্ত রাস্তা দেখতে পেলুম। সেই রাস্তায় যানবাহনের কিছ ভিড় ছিল। পূর্বদিকে চলার পর দেখলুম নদীর ওপর একটি ব্রিজ আছে। নদীটা দেখে মনে হচ্ছিল যেন সিংহের মতোই গর্জন করে দক্ষিণ থেকে উত্তরে বয়ে চলেছে। ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে আমরা নিরিবিলি একটা জায়গায় পৌঁছলাম। এবার আমরা উত্তরের দিকে যাচ্ছিলুম। বাঁদিকে গাছপালার আড়ালে নদীটা দেখা যাচ্ছিল। ডানদিকে উঁচু জমির ওপরে মাঝেমাঝে একটা করে পুরনো বাড়ি। কোনও বাড়ির বাউন্ডারি ওয়াল আছে। কোনওটার নেই। কর্নেল বললেন—এটাই সিংহগড়ের বাঙালিটোলা।

বাঙালিটোলায় মানুষজনের চলাফেরা বেশি দেখলুম না। কিছুটা চলার পর ডানদিকে চোখে পড়ল মোরাম বিছানো একটা রাস্তা নেমে এসে পিচরাস্তার সঙ্গে মিশেছে। সেখানে আমাদের নামিয়ে দিল রিকশাওয়ালা। কর্নেল তাকে ভাড়া মিটিয়ে দিলেন, তারপর বললেন—চলো এই মোরাম রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গেলে রাজবাড়ি তোমার চোখে পড়বে। সামনে গাছপালার আড়াল বলে বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না।

আমরা এগিয়ে যাচ্ছিলাম। সেই সময় একজন কর্নেলের বয়সী এবং কর্নেলের মতই তাগড়াই চেহারার এক ভদ্রলোক কাঁধে বন্দুক বা রাইফেল নিয়ে কিছু দেখছিলেন। কর্নেল বলে উঠলেন—হ্যালো মিস্টার সিংহ!

ভদ্রলোক ঘুরে আমাদের দেখতে পেয়েই সহাস্যে বললেন—আসুন আসুন কর্নেল সাহেব। আমি অবশ্য রাইফেল হাতে সিংহ মারতে বেরোই নি। একটা পাগলা হনুমান বড্ড উৎপাত জুড়েছে। যাই হোক, আপনারা আসুন। অজয় তার মেয়েকে নিয়ে এসেছে সিংহ দেখাতে। বলে তিনি হাসি চাপলেন।

দেখলুম বাড়ির প্রকাণ্ড গেট পেরিয়ে জিনস আর হাতকাটা টপ পরে এক যুবতী বেরিয়ে আসছে।

চার

কথাটা বলেই বিজয়নারায়ণ জিভ কাটলেন। সহাস্যে বললেন—এই সুজাতা, আমার কথাটা শুনে ফেলিসনি তো।

সুজাতা চাপা হেসে বলল—জেঠু আমি সিংহ মারা দেখতে বেরোই নি।

তোমার হাতে রাইফেল দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম তুমি সেই হনুমান বেচারাকে বধ না করে ছাড়বে না।

বিজয়বাবু বললেন—তোর সৌভাগ্য সুজাতা এই ভদ্রলোককে কখনও দেখেছিস?

সুজাতা কর্নেলের দিকে নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ চিনে ফেলেছি। ইনি স্বনামধন্য কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আর ওই ভদ্রলোক তাঁর সাংবাদিক বন্ধু জয়ন্ত চৌধুরী।

বিজয়বাবু মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন—আশ্চর্য, তুই তো কখনো এঁদের দেখিস নি।

সুজাতা বলল—সব কি চোখে দেখে জানতে হয়।

বিজয় নারায়ণ বললেন—কলকাতা তোকে খুব স্মার্ট করেছে। যাইহোক, কর্নেল সাহেবরা এখন আমার অতিথি। আসুন কর্নেল সাহেব। ভেতরে গিয়ে বসা যাক। আর সুজাতা, তুই এখানে একা দাঁড়িয়ে থাকিস নে। সত্যি একটা পাগলা

হনুমান কদিন থেকে এই এলাকায় উৎপাত করে বেড়াচ্ছে। বাইরে থাকিস নে। সুজাতা জেদ করে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছিল। কিন্তু বিজয়নারায়ণ তার কান ধরে আমাদের অনুসরণ করতে বাধ্য করলেন। সুজাতা কপট রাগ দেখিয়ে বলল—জেঠু আমি কিন্তু আর ছোট হয়ে নেই।

বিজয় নারায়ণ বললেন—বলবি রীতিমতো লেডি হয়ে উঠেছি, কিন্তু তুই আমার কাছে এখনো সেই ছোট্ট বালিকা হয়েই আছিস। বলে সস্নেহে তিনি তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন—তোর বাবা কি বেরিয়েছে?

সুজাতা বলল—অনেকক্ষণ আগে সাইকেল নিয়ে বেরিয়েছে।

দেখলুম বিশাল গেটে দারোয়ান আছে। কিন্তু গেটের একটা পাশ খোলা। সেখান দিয়ে ভেতরে ঢুকে দেখলুম ডাইনে বাঁয়ে দুদিকেই মরসুমি ফুলের বাগান। উঁচু পাঁচিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে দেবদারু আর আম গাছের সারি। প্রশস্ত লনে নুড়ি বেছানো আছে। কর্নেল ঠিকই বলেছিলেন, ওপরতলায় এবং নিচের তলায় প্রকাণ্ড সব থাম। গথিক ভাস্কর্যের কথাই মনে করিয়ে দেন। আর দোতলার মাঝামাঝি শীর্ষদেশে ত্রিকোণ অংশটা ইটালিয়ান ভাস্কর্যের প্রতীক। এত বড় বাড়িতে এঁরা দুই ভাই থাকেন। তাছাড়া বাঁদিকের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে কয়েকটা একতলা ঘর আছে। ওখানে সম্ভবত দারোয়ান আর মালির পরিবার বাস করে। ঠাকুরবাড়িটা কোন দিকে বোঝা গেল না। হয়তো এই প্রাসাদের পেছনদিকে অর্থাৎ উত্তরে সেটা আছে। এক পলকের জন্য দোতলায় থামের পাশে এক প্রৌঢ়া মহিলাকে দেখতে পেলুম। সম্ভবত উনিই সুজাতার মা। আমরা পোর্টিকোর তলা দিয়ে একটা হলঘরে ঢুকলাম। এই ধরনের ঘর সব অভিজাত বনেদি পরিবারই দেখেছি।

সুজাতা বিবর্ণ কার্পেট পাতা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে হন হন করে ওপরে উঠে গেল। বিজয়নারায়ণ বললেন ওপরে চলুন। আমার ড্রয়িংরুমেই বসা যাক। দোতলায় উঠে প্রশস্ত মার্বেল টালি বসানো বারান্দায় হাঁটতে হাঁটতে শেষপ্রান্তে একটা ঘরের তালা খুললেন বিজয়নারায়ণ। এদিকটা পূর্বদিক। বিশাল ঘর সেকেলে এবং একেলে আসবাবে ভর্তি। আলমারিতে প্রচুর বই আছে। দেয়ালে স্টাফ করা হরিণের মাথা এবং একপাশে মেঝের উপর বেদিতে স্টাফকরা চিতাবাঘও দেখতে পেলুম। বিজয়বাবু জানাল খুলে পর্দা সরিয়ে দিলেন তারপর আমাদের বসতে বললেন। আমরা সোফায় বসলুম। তারপর বিজয়বাবু কর্নেলের মুখোমুখি বসে। বললেন—একটা ব্যাপার আমাকে অবাক করেছে, আপনি যখন ট্যুরিস্ট বাংলো থেকে ফোন করলেন তখনই একটু চমকে গিয়েছিলুম আমার এখানে থাকলে কি আপনার কোন অসুবিধা হত।

কর্নেল দাড়িতে হাত বুলিয়ে একটু হেসে বললেন তা হত কারণ প্রথমে আপনি আমাকে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির প্রজাপতির খবর দিয়েছিলেন। আপনার বর্ণনার সঙ্গে

আমি দেশ-বিদেশের প্রজাপতির মিল খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। তাই এখানে আমার দেরি হচ্ছিল। এমন সময় অজয়বাবু গিয়ে হাজির।

সিংহের গর্জন সিংহগড়ে।

বিজয়নারায়ণ হেসে উঠলেন। আমি এখনো গর্জন শুনি নি। গুজব শুনেছি। তবে আমার ইন্টারেস্ট অন্য একটা ব্যাপারে।

কর্নেল আস্তে বললেন—ব্রোঞ্জ চাকতির ব্যাপারে—

হ্যাঁ ওটা ঠাকুরবাড়ির দিকে পুকুরপাড়ে কুড়িয়ে পেয়েছিল অজয়। সে আমাকে ওটা দেখিয়েছিল। আমি লোশন দিয়ে কিছুটা পরিষ্কার করেছিলাম। কিন্তু পরীক্ষা করার পর মনে হয়েছিল—

কর্নেল সকৌতুকে তার কথার উপরে বললেন—গুপ্তধনের কথা?

বিজয়নারায়ণ বাঁকা মুখে হাসলেন। ওগুলো অজয় বিশ্বাস করে। আর আমি বিশ্বাস করি একটা ঐতিহাসিক তথ্যে। সিংহগড় সংক্রান্ত একটা পুরনো বই আছে। লেখক জনৈক টিম আর্টিংটন। তাতে পড়েছি, আমাদের গৃহদেবতা চণ্ডীর যে মূর্তিটা উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি ওটা নাকি হারিয়ে যাওয়া একটা মূল্যবান ধাতুর তৈরি দেবী চণ্ডীর নেহাত নকল। আপনি নিশ্চয় ব্রোঞ্জের চাকতিতে একটা অস্পষ্ট মূর্তি এবং কিছু তথ্য খোদাই করা আছে তা দেখে থাকবেন।

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর থেকে সেই চাকতিটা বের করতে যাচ্ছিলেন। বিজয়নারায়ণ চাপা স্বরে বললেন—ওটা এখন নয়। আপনি এসেছেন তা সুজাতার মা দেখেছে। কাজেই এখনই যে কোন মুহূর্তে কফি এসে যেতে পারে।

তাঁর কথা শেষ হবার পরেই একজন পরিচারিকা ট্রে হাতে ঘরে ঢুকল। আর তার পেছনে সেই মহিলা। তার মাথায় মাথা ঢাকা ঘোমটা। মহিলা যৌবনে সুন্দরী ছিলেন তা বোঝা যাচ্ছিল। ভাসুরের ঘরে তিনি যেভাবে সঙ্কোচে ঢুকলেন আমার মনে হল ইনি মেয়ের মতো স্মার্ট তো নন বরং হাবে ভাবে কিছুটা গ্রাম্য যেন।

কর্নেল তাঁকে বললেন, এই যে বউঠাকুরণ, এই বৃদ্ধকে যে আজ চিনতে পেরেছেন, এ আমার সৌভাগ্য।

বিজয়বাবু বললেন, রমলা কি সত্যই চিনতে পেরেছে নাকি মেয়ের মুখে শুনেছে।

রমলা সঙ্কোচে একটু হেসে বললেন কর্নেল সাহেবকে আমি দোতলা থেকে রিকশায় আসতে দেখেছি। ভেবেছিলাম এখানে উঠবেন কিন্তু সঙ্গে কোনো জিনিসপত্র নেই।

কর্নেল বললেন—আমি এসেছি বিজয়বাবুর মতো প্রজাপতির পেছনে ছোটাছুটি করতে। আপনাদের এখানে উঠলে অনেক নিয়ম-কানুন মেনে নিতে হত।

এই সময় সুজাতা এসে বলল, জেঠু শিগগির রাইফেল নিয়ে এসো। সেই হনুমানটা ঠাকুরবাড়ির ওদিকে একটা গাছে বসে কাকে ধমকাচ্ছে।

বিজয়বাবু বললেন, শ্রীরামচন্দ্রের চেলা। নিশ্চয় তোকে দেখতে পেয়ে সে আরও রেগে গেছে।

বিজয়বাবু নড়ছেন না দেখে সে তার মাকে টানতে টানতে বলল সত্যি বলছি মা তুমি জানালা দিয়ে দেখবে এসো। মধু পুকুরপাড়ে গিয়েছিল সে হন্তদন্ত হয়ে বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

রমলা বলে উঠলেন—কী সর্বনাশ, ও তো এবার আমাদের সবজি খেতে হামলা করবে।

ও মেয়ে চলে যাবার পর বিজয়বাবু বললেন পুকুরপাড়ে বেগুন ইত্যাদি কিছু কিছু তরিতরকারি ছিল। পাগলা হনুমানটা কবে তা শেষ করে দিয়ে গেছে। ওটাকে গুলি করে মারার হুকুম দিয়েছে বনদপ্তর। কিন্তু বিশেষ করে অবাঙালিদের যা সংস্কার ওরা ওই জন্তুটার হাতে প্রাণ হারাচ্ছে তবুও তার কিছু ক্ষতি করতে চায় না।

জিজ্ঞাসা করলুম প্রাণ হারাচ্ছে মানে? বিজয়বাবু বললেন—কিছু লোককে আঁচড়ে-কামড়ে দিয়েছিল। ঘা বিষিয়ে তারা মারা পড়েছে। এছাড়া আরও অনেককে আঁচড়ে দিয়েছে। তারা সব হাসপাতালে ভর্তি আছে।

বললুম—তাহলে এখনই আপনার দেখে আসা উচিত ওটা সেই পাগলাটা কি না। পাগলা হলে তাকে দোতলা থেকেই গুলি করে মারতে পারবেন।

বিজয়বাবু হাসতে হাসতে বললেন—এখন আর হনুমান বধের ইচ্ছে নেই। কর্নেলকে দেখে গুজবের সিংহটাকে গুলি করে মারার তীব্র ইচ্ছা জেগেছে।

কর্নেল চুপচাপ কফি খাচ্ছিলেন। একটু পরে বললেন সত্যিকার সিংহ ছোটনাগপুরে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই নেই। কাজেই সিংহটা মিথ্যে। এই মিথ্যে সিংহ এবং তার মিথ্যে গর্জনের পিছনে কি কোনও কারণ আছে। বিজয়বাবু নিশ্চয় রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরীর কথা তো আপনার মনে আছে।

বিজয়বাবু গম্ভীর মুখে বললেন, হ্যাঁ, এখানে অনেক কীর্তি করে বাড়ি বেচে দিয়ে তাকে পালাতে হয়েছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—কীর্তিমান কুকীর্তি। যাই হোক, তার সঙ্গে ঘটনা চক্রে কিছুদিন আগে আমাদের দেখা হয়েছিল। তিনি এখন নাকি কলকাতাবাসী। তাঁর কাছে শুনলুম আপনার এক খুড়তুতো ভাই সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। তিনি নাকি ঠাকুরবাড়ির ওখানেই একটা ঘরে বাস করতেন। পরে তাঁর মৃতদেহ জলপ্রপাতের ওপর দিকে জঙ্গলের মধ্যে পাওয়া যায়। সেই মৃতদেহ দেখে এখানকার লোকেরা নাকি বলেছিল সিংহের আক্রমণেই তিনি মারা গেছেন। তার মানে এর আগেও একবার সিংহের গুজব এখানে ছড়িয়েছিল।

বিজয়বাবু নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে কর্নেলের কথা শুনছিলেন। চাপা শ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, যাঃ, এই ঘটনাটা আপনাকে বলা হয়নি। আসলে বলার প্রয়োজন মনে করিনি। কারণ, আপনি সেবার এসেছিলেন দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির অর্কিডের খোঁজে। তাছাড়া তখন ইন্দ্রধারার প্রস্রবণের ওপর রামধনু দেখা যেত না।

কর্নেল বললেন—তাহলে বোঝা যাচ্ছে ঘটনাটা সত্যি।

এবার বিজয়বাবু মুখ নামিয়ে চাপা স্বরে বললেন—অভয়ানন্দ ছিল ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী ছদ্মবেশে এক লম্পট। আর রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরীও তেমনি এক লম্পট। তখন আমার এতটুকু প্রবৃত্তি হয়নি যে এর পেছনের কেলেঙ্কারি পুলিশের কাছে ফাঁস করে রাঘবেন্দ্রকে শাস্তি দি। তাই রাঘবেন্দ্রর নাকে আঁচড়টি লাগেনি। কিন্তু যে মহিলাকে নিয়ে এই কেলেঙ্কারি তার প্রভাব ছিল প্রচন্ড। তার এক মামা ছিলেন এম পি। কাজেই রাঘবেন্দ্র অভয়ানন্দর শোচনীয় হত্যাকান্ডের পরও কয়েক বছর এখানে থাকতে পেরেছিল। তারপর আমার দিক থেকে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা করে সে রাতারাতি পালিয়ে যায় বলতে পারেন।

কর্নেল কফি শেষ করে চুরুট ধরালেন তারপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, এখানকার সিংহের গুজবের পর অর্থাৎ মিথ্যা সিংহ এবং মিথ্যা গর্জনের পর আপনি কি তেমন কোনও হত্যাকান্ডের আশঙ্কা করছেন। বিজয়বাবু গলার ভিতরে বললেন ঠিক ধরেছেন। কর্নেল একটু হেসে বললেন আশাকরি এই সব ঘটনার সঙ্গে ব্রোঞ্জের চাকতিটার কোনও যোগসূত্র নেই।

বিজয়বাবু বললেন বুঝতে পারছি না, তবে আপনার জানা দরকার ঠিক এই রকম ব্রোঞ্জের চাকতি আমার খুড়তুতো ভাইয়ের বিছানার তলায় আমি খুঁজে পেয়েছিলুম। আসলে আমি চেয়েছিলুম একটা ফোটো খুঁজতে। কিন্তু সেটা—

তার কথার উপরে কর্নেল বললেন আগেই সেটা একজন চুরি করেছিল।

বিজয়বাবু চমকে উঠে বললেন—আপনি জানেন!

কর্নেল বললেন—জানি।

বিজয়বাবু বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। কিন্তু কিছু বললেন না।

পাঁচ

ঘরের আবহাওয়া একটু গুমোট হয়ে উঠেছিল। আমি সেটা হালকা করার জন্য হাসতে হাসতে বললুম-কর্নেল বলছিলেন মিথ্যা সিংহের মিথ্যা গর্জন। কিন্তু এর সঙ্গে কোনও মহিলার ছবি কিংবা এক ব্রোঞ্জের চাকতির কী সম্পর্ক। আমার মনে হচ্ছে কর্নেল একটা প্রকাণ্ড মিথ্যার পিছনে ছুটে এসেছেন।

আমার কথায় বিজয়বাবুর মুখে একটু হাসি ফুটল। তিনি বললেন—

আপনি সাংবাদিক, ব্যাপারটা ঠিকই ধরেছেন।

কর্নেল বললেন—তাহলে জলপ্রপাতের জঙ্গলের প্রকাণ্ড ডানাওয়ালা প্রজাপতির গল্প মিথ্যা।

এই নিয়ে কিছুক্ষণ হাস্য পরিহাসের ফলে গুমোট আবহাওয়াটা কেটে গেল। তার পর হন্তদন্ত হয়ে সুজাতা ঘরে ঢুকল। সে বলল জেঠু—শিগগির এসো। পাগলা হনুমানটা মন্দিরের চূড়ায় বসে দাঁত খিচোচ্ছে।

বিজয়বাবু বললেন—তাহলে তো আমায় সমস্যায় ফেলল হনুমানটা। মন্দিরে যে আশ্রয় নিয়েছে তাকে গুলি করব। এতে অধর্ম হবে যে। সুজাতা খাপ্পা হয়ে বলল, কোনও মানে হয়। বাবার বন্দুকটা যে আলমারির ভেতর রেখে গেছে, তা না হলে আমি নিজেই ওটাকে মেরে ফেলতুম। মা বলছিল পুরো সবজির বাগান হনুমানটা খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। আহ! এসো না জেঠু, তোমাকে মেরে ফেলতে বলছি না। অন্তত ভয় দেখিয়ে তাড়িয়ে দাও ওটাকে।

অগত্যা বিজয়বাবু রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়ালেন—চলুন কর্নেল সাহেব, পাগলাটাকে নিয়ে একটু মজা করা যাক।

বারান্দায় বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একেবারে উত্তরপ্রান্তে একটা ঘরে পৌঁছলুম। এই ঘরে কিছু ভাঙাচোরা আসবাব আর পুরনো লোহালক্কড় পড়ে আছে। ওদিকের দরজা খোলা। ওদিকটায় ব্যালকনি আছে। সেখানে দাঁড়িয়ে রমলা দেবী হনুমানটাকে অনুনয়-বিনয় করছিলেন। তিনি আমাদের দেখে চলে এলেন। ব্যালকনিতে প্রথমে রাইফেল হাতে বিজয়বাবু। তাঁর পেছনে কর্নেল, তার পর আমি এবং সুজাতা পেছনে গিয়ে দাঁড়ালুম। বাউন্ডারি ওয়ালের একখানে একটা দরজা যেটা বন্ধ আছে। তার ওধারে গাছপালার ফাঁকে মন্দিরের চূড়া দেখা যাচ্ছিল। হনুমানটা চূড়ার সোনালি রঙের কলম এবং ত্রিশূল আঁকড়ে ক্রমাগত গর্জন করছিল। বিজয়বাবু রাইফেলের নল তাগ করে জোরগলায় বললেন—ওহে পবনপুত্র, তোমার কি সাহস যে দেবতার মাথায় চেপে রয়েছ। মন্দিরের ভেতরে কিন্তু রামচন্দ্র নেই, আছেন দেবী চণ্ডী।

হনুমানটা তাঁর দিকে তাকিয়ে বার কয়েক ঘ্যাঁক ঘ্যাঁক গর্জন করল। তার পর সম্ভবত রাইফেলের নল দেখে বিপদ আঁচ করে একলাফে পাশের একটা একচালা ঘরের ছাদে লাফিয়ে পড়ল।

এর পরের ঘটনাটা আমার কাছে খুব নির্মম বোধ হল। বিজয়বাবু রাইফেল তাক করে সেফটিক্যাচ তুলে যে সত্যি ট্রিগার টানবেন আমি ভাবিনি, গুলি খেয়ে হনুমানটা ছিটকে ওধারে কোথায়ও পড়ে গেল তার পর আর কোনও সাড়া পেলুম না।

সুজাতা চোখ বড় করে বলল—জ্যেঠু তুমি সত্যই ওটাকে গুলি করে মেরে ফেললে!

বিজয়বাবু বললেন—কেন, তুই যে বললি ওটাকে মেরে ফেলতে।

সুজাতা ভয়ে চুপ করে গেল, তার মুখে একটা আতঙ্কের ছাপ লক্ষ্য করলুম।

রমলা দেবীও বললেন—ওকে কি সত্যিই মেরে ফেললেন বড়দা?

বিজয় নারায়ণ তাঁর কথার জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তার পর বারান্দা ধরে হন্তদন্ত এগিয়ে গেলেন। কর্নেল, আমি এবং সুজাতা তাঁকে অনুসরণ করলুম। নীচের তলায় নেমে একটা দরজা খুলে বাড়ির পেছনদিকে গেলেন তিনি। এদিকটায় ক্যাকটাস আর নানা আকারের ঝাউয়ের বাগিচা। পেছনে খোলামেলা একটা টানা বারান্দা আছে। মাঝামাঝি গিয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি বেয়ে নামলে নীচে নুড়ি বেছানো লন তার থেকে বাহির বাড়িটার দরজা। দরজাটা সাবধানে খুলে বিজয়বাবু বললেন এক মিনিট, আমি আগে দেখে নিই হনুমানটার সত্যিই গুলি লেগেছে নাকি ভয় পেয়ে নীচে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে।

মন্দির প্রাঙ্গণ টালি বাঁধানো কিন্তু স্থানে স্থানে টালি ফেটে গেছে কোথাও বা দু-একটুকরো নেই। সেখানে ঘাস গজিয়েছে। কর্নেল বিজয়বাবু এ কথার তোয়াক্কা না করে ভিতরে গেলেন। আমি একটু ইতস্তত করে প্যান্টের পকেটে হাত ভরে আমার রিভলবারটা ধরে রাখলাম তার পর মন্দিরের পাশ দিয়ে কয়েকপা এগিয়ে গেছি। বিজয়বাবুর ডাক শোনা গেল। সুজাতা দেখবি আয় তোর মায়ের সবজি খেত ধ্বংসের শোধ নিয়েছি।

সুজাতা আমার পাশ কাটিয়ে দৌড়িয়ে এগিয়ে গেল। সামনে আর একটা দরজা। কর্নেল ইতিমধ্যে সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছেন।

আমি লক্ষ্য করলুম যে ডাইনে একতলা ঘর। ঘরের সামনে নিচু একফালি বারান্দা আছে। বুঝতে পারলুম এই ঘরেই বিজয়বাবুর খুড়তুতো ভাই ব্রহ্মচারী অভয়ানন্দ বাস করতেন। কিন্তু এখন হনুমানটার অবস্থা দেখতে তীব্র ইচ্ছা ছিল। বেরিয়ে গিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ল একটা মাঝারি ধরনের চৌকো পুকুর। তা চার পাশে যে সবজি খেত ছিল তার অবস্থা শোচনীয়। সব মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে। পুকুরের স্বচ্ছ কালো জলে অজস্র পদ্ম ফুটে আছে। চারিদিকে কাঠ পুঁতে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। হনুমানটা রক্তাক্ত দেহে ডানদিকের বেড়ার কাছে পড়ে আছে। বেশ তাগড়াই চেহারার হনুমান। কর্নেল বললেন, সত্যি এটা সেই পাগলা হনুমান তো, যেটাকে বনদপ্তর মেরে ফেলতে হুকুম জারি করেছেন। বিজয়বাবু রাইফেল নল দিয়ে উল্টে পাল্টে মৃত জন্তুটাকে দেখে বললেন, হ্যাঁ, এটাই সেটা, কারণ একজন একে লক্ষ্য করে তির ছুড়েছিল। ওই দেখুন তিরের ডগাটা ভাঙা কিন্তু তিরটা পায়ের কাছে বিঁধে আছে। কর্নেল বাইনোকুলারে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে এদিক-ওদিক দেখছিলেন। তার পর দেখলুম তিনি পুকুরের ডান পাড় দিয়ে সোজা উত্তরে এগিয়ে যাচ্ছেন।

সুজাতা হনুমানের রক্ত দেখেই দুহাতে চোখ ঢেকেছিল সে চুপচাপ চলে গেল। আমার মনে হচ্ছিল এই পুকুরভরা পদ্মফুলের পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে একটা

ফটো তুললে দারুণ হতো। আমার কাছে ক্যামেরা নেই কিন্তু কর্নেলের কাছে আছে। এদিকে দরজা দিয়ে, রমলাদেবী একবার উঁকি মেরে দৃশ্যটা দেখেই ভিতরে অদৃশ্য হয়েছিলেন। তার পর বাড়ির কাছের লোকেরা এসে ভিড় জমাল, বিজয়বাবু বললেন তোরা এখানে থাক। আমি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বাবুদের টেলিফোনে খবর দিয়ে আসি।

আমি কর্নেলের দিকে এগিয়ে গেলুম। কর্নেল পুকুরের উত্তর পারে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাইনোকুলারে কিছু দেখছিলেন। কাছে গিয়ে বললুম—সেই মিথ্যা সিংহটা সত্যি দেখতে পাচ্ছেন নাকি।

কর্নেল বাইনোকুলার নামিয়ে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন। একটু হেসে বললেন—হনুমান বধ দেখে তোমার মনে কি কোনও কষ্ট হচ্ছে।

বললুম, একেবারে হচ্ছে না বললে মিথ্যা বলা হবে। হনুমানটার পায়ের ওপর দিকে একটা তির বিঁধে আছে। আমার ধারণা এলাকার কোনও আদিবাসী জন্তুটাকে মেরে খেতে চেয়েছিল। আদিবাসীদের কোনও কোনও গোষ্ঠী হনুমান বা বাঁদরের মাংস খায়।

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুটটা লাইটার দিয়ে ধরিয়ে বললেন—ঠিক বলেছ, সাংঘাতিক ক্ষুধার্ত বাঘ যেমন মানুষখেকো হয়ে ওঠে। তেমনি তিরবিদ্ধ হওয়ার পর হনুমানটা মানুষের ওপর খেপে গিয়েছিল। আর পাগলা হনুমানের মুখের লালায় সাংঘাতিক বিষ দেখা যায়। তবে এনিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

জিজ্ঞাসা করলুম—কিন্তু আপনি যেন কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাই না? কর্নেল বললেন, এই রাজবাড়ির পিছনের দিকটা খুঁটিয়ে দেখছিলুম। কোথাও কোথাও পোড়ো এবং পাথুরে মাটি ও বড় বড় পাথর পড়ে আছে। আর ওদিকে পাহাড়। তুমি খালি চোখেই দেখতে পাবে ছোটনাগপুরের একটা মাউন্টেন রেঞ্জ সিংহগড়ের পাশ ঘেঁসে গেছে তবে একটা জিনিস আমাকে অবাক করল।

জিজ্ঞাসা করলুম—কী সেটা?

কর্নেল চাপাস্বরে বললেন—রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী যে মহিলার ছবি দিয়েছেন সে যদি উপরের পশ্চিম দিয়ে ঘুরে উত্তর এবং দক্ষিণের পড়ে থাকা বড় বড় পাথরের আড়ালে এগিয়ে রাজবাড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করতে চায় তা হলে অসুবিধা নেই। ওই একতলা ঘরে থাকতেন বিজয়বাবুর খুড়তুতো ভাই। লক্ষ্য করো ঘরের পেছনের দেওয়ালে একসময় দরজা ছিল সেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাচটা খুলে নেওয়া হয়েছে কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা যাবে পুরনো আর নতুন পলেস্তারার মধ্যে তফাত আছে। হাসতে হাসতে বললুম—আপনি তাহলে সেই মহিলার অভিসারের পথও আবিষ্কার করে ফেলেছেন।

কর্নেল হঠাৎ বললেন—এসব কথা থাক। চলো, আমরা ভিতরে যাই। বাড়ির কাজের লোকেরা তখনও মৃত হনুমানটাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুরুষেরা বারবার

হাত জোড় করে কপালে ঠেকাচ্ছে। আর মেয়েরা ছলছল চোখে তাকিয়ে আছে। মন্দিরের কাছে পৌঁছতেই বিজয়বাবুকে দেখতে পেলুম। তিনি বললেন—এক মিনিট। ফরেস্ট ডিপার্টের রেঞ্জারকে খবর দিয়ে এলুম, ওরা এসে বডি নিয়ে যাবে।

বলে তিনি দরজার কাছে গেলেন তার পর বললেন—লালু, ফরেস্টের সাহেবরা লাস নিয়ে যেতে আসছেন, তুই সব ব্যবস্থা করবি, আমরা ওপরে যাচ্ছি। কর্নেল তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, এবেলা আমি ইন্দ্রধারা জলপ্রপাতের এদিকটা ঘুরে আসতে চাই। অসুবিধা না হলে আপনি আমাদের সাথী হতে পারেন।

আমি মনে করিয়ে দিলুম—আপনিই নাকি কর্নেলকে বিশাল আকারের প্রজাপতির খোঁজ দিয়েছেন। কাজেই আপনি সঙ্গী হলে ভাল লাগবে।

বিজয়নারায়ণ চাপা স্বরে বললেন—আমার সব কথা শেষ হয়নি। তা ছাড়া আপনাকে আমার খুঁজে পাওয়া ব্রোঞ্জের চাকতিটা দেখানো হয়নি।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, আপনি যখন বলছেন তখন এবেলা জলপ্রপাতের ওধারে যাচ্ছি না।

বিজয়বাবু বললেন, চলুন দোতলায় আমার ঘরেই গিয়ে বসবেন আরও এক রাউন্ড কফি খাওয়া যাবে।

এর পর আমরা আগে যে ঘরে বসেছিলুম, সেই ঘরে গেলুম। কিছুক্ষণ পরে সেই কাজের মেয়েটি ঘোমটা টেনে কফির ট্রেতে কফি রেখে গেল। কফি খেতে খেতে বিজয়বাবু বললেন যে—আপনাকে এবার রাঘবেন্দ্রর কীর্তিটা বলি। সে প্রতিমা রায়ের প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু প্রতিমা তাকে পাত্তা দিত না। আপনি জানেন কি না জানি না প্রতিমা ছিল বালবিধবা। তার বাবা ছিলেন এখানকার রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক। প্রতিমার মা তার বাল্যেই মারা যান। প্রতিমার বাবা জগদীশবাবু মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তার এক ছাত্রর সঙ্গে। ছাত্রটি কি একটা অসুখে মারা যায়। এর পর প্রতিমার বাবার মৃত্যু হলে তার মামা সত্যেন্দ্র রায় তাকে নিজের বাড়িতে রাখেন। তিনি ছিলেন একজন এম.পি.। কাজেই বুঝতে পারছেন প্রতিমার দিকে হাত বাড়ানো কারও পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না।

কর্নেল বললেন, এবার কথাটা খুলে বলতেই হয়, আপনার খুড়তুতো ভাইয়ের সঙ্গে প্রতিমার একটা গোপন সম্পর্ক ছিল এবং আপনি জানেন কি না জানি না। প্রতিমা আপনার ভাইয়ের ঘরে যাতায়াত করত।

বিজয়বাবু মুখ নামিয়ে বললেন—জানি। আমার রাইফেলের পাল্লা থেকে প্রতিমা একবার ছিটকে পড়ে নিজেকে বাঁচাতে পেরেছিল। তার পর অভয়ানন্দের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ জলপ্রপাতের উপরের জঙ্গলে পাওয়া যায়।

কর্নেল ঠোঁটের কোণে হেসে মৃদুস্বরে বললেন—তাঁর বিছানার তলা থেকে একটা ফোটোগ্রাফ উদ্ধার করেছিলেন রাঘবেন্দ্র।

বিজয়বাবু বললেন ছবিটা আপনি দেখেছেন?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ দেখেছি।

বিজয়বাবু বললেন—আমি জানতুম অভয়ানন্দের কাছে প্রতিমার একটা ছবি আছে। কিন্তু জানতুম না সেটা কখন রাঘবেন্দ্র চুপি চুপি এসে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল। এই ঘটনার পর অভয়ানন্দের ঘরের পেছন দিকের দরজার কপাট খুলে নিয়ে ইট দিয়ে গেঁথে বন্ধ করে দিয়েছিল। কর্নেল বললেন—সেবার যে মিথ্যা সিংহ গর্জন করে বেড়াত সেই সিংহই কি রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী। বিজয়বাবু হাসলেন। তার পর বাঁকা মুখে বললেন ওর পক্ষে অসাধ্য কিছু ছিল না। এমন হতেই পারে সে কাউকে নকল সিংহের চামড়া পড়িয়ে সিংহ সাজিয়ে গুজব সৃষ্টি করেছিল। আর গর্জনের কথাটা যদি বলেন তারও একটা ব্যাখ্যা আছে। সিংহগড়ের বাজারে টেপ রেকর্ডার যন্ত্র এসেছিল পনেরো-কুড়ি বছর আগে। খোঁজ নিয়ে জানতে পেরছিলুম জন্তু-জানোয়ারের ডাকের টেপরেকর্ডার আমদানি করা যায়।

আমি বলে উঠলুম—সেই রকম কিছু নয়তো?

বিজয়বাবু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। তার পর বললেন, তা হতেও পারে তবে রাঘবেন্দ্র চৌধুরীর যে ভূমিকা এখন কে আছে সেটা খুঁজে বের করার জন্যই কর্নেল সাহেবকে অনুরোধ করছি। সত্যি বলতে কী ওঁকে ডাকার উদ্দেশ্যও তাই।

ছয়

রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে নীচের পিচরাস্তায় পৌঁছে কর্নেল বলেছিলেন— এবেলা জলপ্রপাতের ওদিকে যাচ্ছি না। কারণ ওখানে পায়ে হেঁটে যেতে হলে অনেকটা সময় লাগবে। বিজয়বাবুর অবশ্য গাড়ি আছে কিন্তু আমি গাড়ি চেপে ওখানে যেতে চাই নি।

হাইওয়ের দিক থেকে একটা খালি রিকশা আসছিল, কর্নেল সেটা দাঁড় করিয়ে চেপে বসলেন। তার পর বললেন—বাজারের দিকে যাব।

রিকশাওয়ালা আমাদের টুরিস্ট ভেবে দর হেঁকেছিল পঞ্চাশ টাকা। শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা হয়েছিল। রিকশায় উঠে কর্নেল বললেন—পায়ে হেঁটে যাওয়া যেত কিন্তু তোমার ক্লান্তির কথা ভেবে রিকশায় চাপলুম। এর পর রাস্তা কখনও চড়াই কখনও উতরাই হয়ে বাজার এলাকায় পৌঁছল। প্রচণ্ড ভিড়ে আমাদের রিকশা আটকে গিয়েছিল। কর্নেল বললেন, এখানেই নেমে পড়া যাক।

রিকশাওয়ালাকে ভাড়া দিয়ে ভিড় ঠেলে তিনি এগিয়ে চললেন। আমি তাকে অনুসরণ করলুম। তার পর অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে কর্নেলকে জিজ্ঞাসা করলুম—এদিকে কোথায় যাবেন।

কর্নেল বললেন—কষ্ট করে এবার তোমাকে হাঁটতেই হবে।

বললুম—হঠাৎ আমার কষ্টের দিকে আপনার দৃষ্টিপাত কেন?

কর্নেল বললেন—কষ্টটা শুধু তোমার নয়। আমারও। কারণ অক্টোবরের এই চড়া রোদ আমার সহ্য হয় না।

—কিন্তু যাবেন কোথায়?

—চুপ-চাপ আমাকে ফলো করো। যথাসময়ে জানতে পারবে।

বাজার এলাকা ছাড়িয়ে গিয়ে বাঁদিকে একটা সংকীর্ণ রাস্তায় এগিয়ে চললেন কর্নেল। কিছুক্ষণ পরেই দেখলুম রাস্তাটা উঁচু হয়ে উঠে গেছে এবং দুধারে আধুনিক গড়নের বাড়ি এবং ফুলবাগিচা। কর্নেল বললেন—এটা সিংহগড়ের নিউটাউনশিপ এরিয়া।

চড়াই উঠে সমতল মাটির উপর কিছুটা এগিয়ে গিয়ে দেখলুম সামনে নদীর ঘাট। এখানে নদীটা খুব ভদ্র এবং শান্ত মনে হল। কর্নেল এবার বাঁদিকে ঘুরলেন। আমরা নদীর দুধারে সারিবদ্ধ গাছের ছায়ায় হাঁটছিলুম। এপথে মাঝে মাঝে মোটরগাড়ি দেখা যাচ্ছিল। এক ভদ্রলোক পায়ে হেঁটে আসছিলেন, পরনে প্যান্ট-শার্ট। হাতে একটা ব্রিফকেস। কর্নেল তাকে বললেন—যদি কিছু মনে না করেন আপনার কাছে একটা কথা জানতে চাইব।

ভদ্রলোক কর্নেলের চেহারা দেখে বিদেশি টুরিস্ট ভেবেছিলেন। কর্নেলকে বাংলায় কথা বলতে শুনে মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে বললেন আপনি বাঙালি! কর্নেল হাসলেন। আপনিও তো বাঙালি, যদি জিজ্ঞাসা করেন তা কী করে বুঝলুম। আমি বলব যদি মুখের গড়ন নয় বাঙালির দুটো চোখ লক্ষ্য করলেই একটা বিশেষ দীপ্তি চোখ এড়ায় না, দীপ্তিটা অবশ্যই বুদ্ধির। ভদ্রলোক কর্নেলের তোয়াজে অভিভূত হয়ে বললেন—নমস্কার। নমস্কার। আপনি কি এখানে বেড়াতে এসেছেন? বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি।

কর্নেল জ্যাকেটের ভেতর পকেট থেকে একটা খাম বের করলেন। খামটা চিনতে পারলুম। ওটার ভেতরে প্রতিমা রায়ের ছবি আছে। কিন্তু ওটা অনেক বছর আগের ছবি। চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে থাকলুম কর্নেলের ক্রিয়াকলাপ। তিনি ছবিটা বের করে ভদ্রলোকে দেখিয়ে বললেন এই মহিলা সম্পর্কে আমার আত্মীয়া হন। এটা অনেক পুরনো ছবি। হয়তো পনেরো বছর আগেকার। তবু আমি শুনেছি নদীর ধারে এই নিউটাউনশিপ এরিয়ায় ইনি তাঁর মামার বাড়িতে থাকেন। তাঁর মামা একসময় এম.পি. ছিলেন। জানি না এখন তিনি বেঁচে আছেন কি না।

ভদ্রলোক ছবিটা কিছুক্ষণ ধরে দেখলেন তার পর বললেন। খুব চেনা মুখ। আমি সিংহগড়ে ট্রান্সফার হয়ে এসেছি মাস তিনেক আগে। একজন বাঙালি এম.পি. এখানে ছিলেন শুনেছি। কিন্তু এই মহিলাকে চেনা মনে হচ্ছে। কর্নেল বললেন—সেই এম.পি.র বাড়িটা কি এই এলাকাতেই।

হ্যাঁ শুনেছি এখানেই তিনি একটা বাংলো বাড়িতে বাস করতেন। তার পর

বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে চলে যান। কিন্তু এই মহিলা...এক মিনিট। ওই ভদ্রলোক আসছেন ওকে জিজ্ঞাসা করি।

একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসছিলেন। তাঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি। আমাদের দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। তার পর প্যান্ট-শার্ট পরা ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলেন—কি প্রভাত, এঁরা কি তোমার পরিচিত?

প্রভাতবাবু বললেন—না প্রবীরদা। আচ্ছা আপনি তো এখানে অনেক বছর আছেন। দেখুন তো এই মহিলাকে চিনতে পারেন কি না, ইনি এই টুরিস্ট ভদ্রলোকের আত্মীয়া।

প্রবীরবাবু ছবিটা দেখেই বললেন—আরে কি কাণ্ড। এ তো সেই এম.পি.র ভাগ্নি। এম.পি. তো ভোটে হেরে বাংলো বাড়ি বেচে দিয়ে কোথায় গেছেন তা জানি না। কিন্তু ওর ভাগ্নি ওদিকটায় একটা আশ্রম করে সেখানে বাস করেন।

প্রবীরবাবু আমরা যেদিকে যাচ্ছিলুম সেদিকেই আঙুল তুলে দেখালেন। লক্ষ্য করলুম তাঁর মুখে কেমন একটা বাঁকা হাসি।

কর্নেল বললেন—প্রতিমা কি সন্ন্যাসিনী হয়েছেন?

প্রবীরবাবু তেমনই হেসে বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, সোজা চলে যান। নিউটাউনশিপের পরে একটা ছোট শালবন আছে। এই রাস্তাটা অবশ্য শালবনের গা ঘেঁষে বাঁদিকে ঘুরে গেছে। আপনারা শালবনের ভেতর দিয়ে পায়ে হাঁটাপথে আশ্রমে পৌঁছে যাবেন।

কর্নেল হন্তদন্ত হয়ে হাঁটতে থাকলেন। শালবনের কাছাকাছি গিয়ে দেখলুম এই সংকীর্ণ পিচ রাস্তাটা বাঁদিকে ঘুরে উতরাই নেমে গেছে। কর্নেল একটু দাঁড়িয়ে বললেন—যার কাছে ঠিকানা নিয়েছিলুম সে এখনকার সিংহগড় সম্পর্কে কিছু জানে না। আমরা বাজারের এলাকা থেকে সোজা এই রাস্তায় চলে আসতে পারতুম। অকারণ অতখানি ঘুরে আসতে হল। শালবনের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা রাস্তায় গিয়ে বললুম—আমাকে একেবারে হতবাক করে দিয়েছেন আপনি। কিছু যে জিজ্ঞেস করব, মাথায় কোনও কথা আসছে না।

কর্নেল বাইনোকুলারে নদীর ডাইনে দিকটা দেখে নিয়ে বললেন—কেন? বললুম—প্রতিমা দেবীর ঠিকানা তো আপনি বিজয়বাবুর কাছে জানতে পারতেন। তবে আমার সবচেয়ে আশ্চর্য লাগছে তিনি যেমন প্রতিমাদেবী সম্পর্কে কথা বাড়ালেন না, আপনিও আর কিছু জানতে চাইলেন না। তখন আমার মনে হয়েছিল এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে। কর্নেল বললেন—রহস্য খুঁজলে তুমি সর্বত্র সবকিছুতেই পাবে। তবে প্রতিমা যে আশ্রমবাসিনী তা আমি তোমাকে ইচ্ছা করেই বলিনি। বললে তুমি আমাকে প্রশ্নে উত্ত্যক্ত করে ছাড়তে। তার চেয়ে সঙ্গে এসেছ, স্বচক্ষে চুপচাপ সব দেখে যাও।

শালবন ছাড়িয়ে গিয়েই চোখে যেন অপার্থিব লাবণ্যের ছটা এসে পড়ল। নিচু

পাঁচিলে ঘেরা এবং বৃক্ষলতা গুল্মে আর রংবেরঙের ফুলে সাজানো একটা বাঙালি ধাঁচের বাড়ি। কর্নেল কিছু না বললেও বুঝতে পারলুম প্রতিমাদেবীর মামা তাঁকে নিজের বাড়িটা দান করে গেছেন। স্থানীয় লোকের ততকিছু খোঁজ খবর রাখেন না। গেট বন্ধ ছিল। কর্নেল গিয়ে প্রথমে একবার কাসলেন, তার পর একটু গলা চড়িয়ে বললেন—কেউ কি আছেন এখানে?

ভেতরে বাংলোর পাশেই একটা ছোট মন্দির। মন্দিরের বারান্দাটা বেশ উঁচু। গেটের কাছ থেকেই দেখতে পেলুম গেরুয়া রঙের শাড়ি পরা এক মহিলা মন্দিরের বারান্দা থেকে দ্রুত নেমে আসছেন। তাঁর চুল এখনও কালো। মুখের সৌন্দর্য যেন রঙিন পাথরে খোদাই করা ভাস্কর্য। কিন্তু ভয়ের ছাপ ক্রমশ যত তিনি কাছে আসছিলেন তত আমার চোখে পড়ছিল। তা হলেও তার সৌন্দর্যের কোনও তুলনা হয় না অন্তত আমি কোথাও এমন কোনও সন্ন্যাসিনীকে দেখিনি। তিনি লনের মাঝামাঝি এসে মৃদুস্বরে বললেন—গেট খোলাই আছে, আপনারা আসুন।

গেটের দুটি অংশ শুধু পরস্পরকে ছুঁয়ে ছিল। কর্নেল ঠেলতেই তা খুলে গেল। আমি ভেতরে ঢুকে আগের মতো গেট বন্ধ রাখলুম। কাছে গিয়ে কর্নেল বললেন—জানি না আপনার জীবনে কোনও ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি কি না। তবে অন্তত সজ্ঞানে তেমন কিছু করব না। আমার নাম কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। আর আমার সঙ্গী এই তরুণ বন্ধুর নাম জয়ন্ত চৌধুরী। কলকাতার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক।

প্রতিমাদেবী শীতল মুখে এবং নিষ্পলক চোখে আমাদের দেখছিলেন এবার লক্ষ্য করলুম তার ঠোঁটের কোনায় কেমন যেন বাঁকা হাসির রেখা অথবা আমারই দেখার ভুল। তিনি ধীরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—কর্নেল সাহেব কি আমার মামার কোনও নির্দেশ পেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন?

কর্নেল বললেন—আপনার মামা কোথায় আমি জানি না। আপনি জানেন? প্রতিমা ঠোঁট কামড়ে ধরে মাথা নাড়লেন। তার পর মৃদু স্বরে বললেন—মামা আমার উপর রাগ করে নিজের বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আমার মামিমা বেঁচে নেই। তাঁদের একমাত্র ছেলে বরুণ থাকে আমেরিকায়। আমার এখন মনে হচ্ছে মামা বরুণের কাছে গিয়ে আছেন। আপনারা আসুন। বাংলোতে আমার জিনিসপত্র সবই আছে। বসার ঘরটাও আমি আগের মতোই রেখেছি, হঠাৎ যদি তিনি ফিরে আসেন।

আমার মনে হল শেষ বাক্যটা বলতে প্রতিমার কণ্ঠস্বর যেন করুণ হয়ে এল।

কর্নেল জুতো খুলতে যাচ্ছিলেন। প্রতিমা বললেন—জুতো খোলার দরকার নেই। বাইরের লোকেরা এটাকে আশ্রম বলে জানে। কিন্তু এটা আশ্রম নয়।

কর্নেল বসার ঘরে ঢুকে বললেন কিন্তু আপনি সন্ন্যাসিনী। সন্ন্যাসিনী তো আশ্রমেই বাস করেন, কাজেই লোকে ভুল বলে না।

দেখলুম ঘরের ভেতরটা আধুনিক আসবাবপত্রে সাজানো। দুটো সেলফ ভর্তি বই। অন্যদিকে চিনা ফুলদানিতে সাজান এক গোছা ফুল। সোফার সেন্টার টেবিলেও ফুলদানিতে এদিনের তাজা ফুল সাজানো। দেওয়ালে দেশ-বিদেশের শিল্পীদের পেন্টিং ঝুলছে। বুকসেলফের ওপর রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ছবি। আমরা সোফায় বসে পড়লুম। প্রতিমা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্নেল বললেন আপনি বসবেন না?

প্রতিমা বললেন আমি আপনার জন্যে দুকাপ চা করে নিয়ে আসি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—সন্ন্যাস জীবনে চা খাওয়া নিষিদ্ধ কি না আমি জানি না তবে আপনাকে কষ্ট করতে হবে না। আমরা বেশিক্ষণ বসব না। আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে এসেছি। বাই-দা-বাই এখানে কি টেলিফোন আছে।

প্রতিমা দেবী বললেন—মামার দুটো টেলিফোন ছিল। আমি ফেরত দিয়ে এসেছি। কারণ আমার কাউকে টেলিফোন করার দরকার হয় না।

কর্নেল জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কি এখানে একা থাকেন।

প্রতিমা বললেন—না, একটি আদিবাসী মেয়ে আমার সঙ্গে থাকে। তাকে একটা কাজে পাঠিয়েছি।

কর্নেল তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন—আমি বুঝতে পারছি আপনার মনে প্রচণ্ড কৌতূহল জেগেছে আমি কেন আপনার কাছে এসেছি? যাই হোক আপনি সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। আপনার পিছু ফিরে তাকানো নিষিদ্ধ।

প্রতিমা মাথা নেড়ে বললেন—আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। আমার আরাধ্য দেবতা কৃষ্ণ। কিন্তু আমি বৈষ্ণবী নই। আমি আমার দেবতার ধ্যানে দিন কাটাই। নেহাত বেঁচে থাকার জন্যে কিছু খেতে হয়। আরও শুনুন, আমার কোনও দীক্ষাগুরু নেই। আমার আত্মাই আমার দীক্ষাগুরু। কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। সম্প্রতি এখানে নাকি কোনও কোনও রাত্রে সিংহের গর্জন শোনা যায়? কেউ কেউ নাকি সিংহটা দেখেছে?

লক্ষ্য করলুম, প্রতিমা একটু চমকে উঠেই নিজেকে সংযত করলেন। তার পর বললেন—আপনি কি সত্যিই সামরিক অফিসার? নাকি পুলিশের লোক?

কর্নেল তাঁর শার্টের বুকপকেট থেকে তাঁর একটা কার্ড বের করে বললেন—এটা আপনি দেখে নিয়ে কাছে রাখতে পারেন। এমনও হতে পারে আমি আপনার কাজে লাগতে পারি।

কার্ডটা দুহাত বাড়িয়ে করতলে নিয়ে চোখ বুলিয়ে দেখার পর প্রতিমার মুখে একটা উজ্জ্বলতা ফুটে উঠল। তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বললেন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকার! আপনার কথা আমি একজনের মুখে প্রায়ই শুনতুম।

রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী?

প্রতিমার মুখের উজ্জ্বলতা মুহূর্তে নিভে গেল। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, কর্নেল সাহেব! দয়া করে ওই নামটা আর উচ্চারণ করবেন না। দৈবাৎ ওই নামটা আমার মনে ভেসে উঠলে আমি ক্রোধে উন্মাদ হয়ে উঠি।

কর্নেল বললেন—যেবার রাজবাড়ির এক সন্ন্যাসী, অভয়ানন্দের ক্ষতবিক্ষত লাশ জলপ্রপাতের কাছে পাওয়া যায় সেবারও এমনি সিংহের গর্জন নিয়ে গুজব রটেছিল সিংহগড়ে। প্রায় আমার ভয় হচ্ছে এবারও তেমন কিছু সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে পারে।

প্রতিমা তীব্র স্বরে বললেন—ওই লোকটার কাছে সেই কথা শুনেই কি আপনি সিংহগড়ে ছুটে এসেছেন?

কর্নেল একটু হেসে বললেন—না, আমার উদ্দেশ্য বিরল প্রজাতির প্রজাপতি দর্শন। কিন্তু কলকাতার সেই লোকটা আমাকে আপনার একটা পুরনো ফটো দিয়ে আপনার কথা বলেছিল। তাই আমি কৌতূহল সম্বরণ করতে পারিনি।

প্রতিমা মুখ নামিয়ে বললেন, আপনাকে আমার কিছু বলার আছে।

সাত

আমি অবাক চোখে সন্ন্যাসিনী বেশে দাঁড়িয়ে থাকা প্রতিমা দেবীকে দেখছিলুম অনুমান করতে চেষ্টা করছিলুম তাঁর বলার কথাটা কী হতে পারে। তিনি কি একটা নষ্ট প্রেমের কথা শোনাবেন। নাকি অভয়ানন্দের মৃত্যুরহস্য কর্নেলকে জানিয়ে দেবেন?

কর্নেল বললেন—আমি চুরুট টানতে অভ্যস্ত। আপনার অসুবিধা না থাকলে আমাকে একটা অ্যাশট্রে দিন।

প্রতিমা বুক সেলফের ওপর থেকে একটা অ্যাশট্রে এনে কর্নেলের সামনে রাখলেন। তার পর বললেন—মামা একসময় খুব সিগারেট খেতেন। পরে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কর্নেল লাইটার জ্বেলে চুরুট ধরিয়ে বললেন—আপনি দাঁড়িয়ে না থেকে বসলে ভাল হয়।

প্রতিমা বললেন—আমাকে আপনি তুমি বলুন। আপনি আমার মামার বয়সী।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—হ্যাঁ, তুমি বললে একটু কাছাকাছি আসা যায়। সত্যি বলতে কি আমি কলকাতা থেকে তোমার কাছেই আসতে চেয়েছিলাম। যাইহোক, এবার বলো তুমি কী বলতে চাইছ।

প্রতিমা আবার ঠোঁট কামড়ে যেন নিজেকে সংযত করলেন। তার পর দেয়ালের কাছে রাখা কয়েকটা চেয়ারের মধ্যে একটা চেয়ার টেনে এনে কর্নেলের কাছাকাছি বসলেন।

বললেন—আমি অনেক বছর ধরে কোনও সোফা বা চেয়ারে বসিনি। মেঝেতে বসতেই অভ্যস্ত হয়েছি। কিন্তু আপনার কথায় এতদিন পরে আমি এইভাবে বসলুম। আমার একটু অস্বস্তি লাগছে। তা লাগুক, আপনাকে দেখে আমার মনটা কেন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

কর্নেল চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন বেশ তো তুমি কি বলতে চেয়েছ এবার তা নিঃসঙ্কোচে বলো। জয়ন্তের সামনে কথা বলতে কোনও বাধা নেই। প্রতিমা জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন—আপনি কি সত্যিই শুধু আমার কথা শুনেই আমার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন।

কর্নেল বললেন—তুমি ঠিকই ধরেছ। রাজবাড়ির ছোটবাবু অজয়নারায়ণ কলকাতায় তাঁর মেয়েকে আনতে গিয়েছিলেন। তিনি আমার সঙ্গেও দেখা করতে যান। কারণ তার দাদা জলপ্রপাতের ওপরের জঙ্গলে দুষ্প্রাপ্য প্রজাতির প্রজাপতি দেখেছেন। তুমি আমার কার্ডে দেখতেই পাচ্ছ প্রকৃতিবিজ্ঞান আমার নেশা। আর একটু পেশাও আমার আছে। এটা তোমার আগে জানা উচিত। আমি একজন রহস্যভেদী। অর্থাৎ কোথাও রহস্য দেখলে তা উন্মোচন করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি।

প্রতিমা হাসবার চেষ্টা করে বললেন—আমাকে আপনি কি কোনও রহস্যের বিষয় বলে ভেবেছেন।

কর্নেল হাসলেন—হ্যাঁ তুমি রহস্যময়ী। তোমাকে কেন্দ্র করে একটা রহস্য যেন দানা বেঁধে আছে। তবে সেসব কথা থাক। তুমি যা বলতে চাইছিলে এবার বলো।

প্রতিমা বললেন—মামা আমাকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই বয়সে আমার মধ্যে কী একটা আগুন ছিল, সবসময় তার উত্তাপ অনুভব করতুম। সেই উত্তাপ কখনও কখনও সহ্য করতে পারতুম না। রাঘবেন্দ্র এই সুযোগটা নিয়েছিল। কিন্তু পরে যখন বুঝতে পারলুম সে আসলে আমাকে বারবনিতার দলে ফেলেছে—আপনি পিতৃতুল্য। জয়ন্তবাবু আমার ছোট ভাইয়ের মতো। বলতে কুণ্ঠা নেই তার হাত থেকে আমাকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন এক আশ্চর্য মানুষ। রাজবাড়িতে ওদের সম্পত্তির একজন শরিকও তিনি।

কর্নেল বললেন—তুমি নিশ্চয় অভয়ানন্দের কথা বলছে।

প্রতিমা—হ্যাঁ। প্রথমে ছিলেন উনি অভয়নারায়ণ। পরে হিমালয়ে বেড়াতে গিয়ে এক সাধুর কাছে দীক্ষা নিয়ে আসেন। তার পর নিজের পরিচয় দিতেন অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী বলে। মামার সঙ্গে মাঝে মাঝে রাজবাড়িতে যেতুম। তার পর একদিন অভয়ানন্দকে দেখার ইচ্ছা হয়েছিল। হয়তো আমার ভুল, কিন্তু তাঁর চেহারার মধ্যে একটা আশ্চর্য প্রভা দেখতে পেতুম। একদিন চুপি চুপি রাজবাড়ির পিছন দিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেলুম। ঠাকুরবাড়ি সংলগ্ন একটা ছোট ঘরে সে থাকত। অভয়ানন্দ আমাকে দেখে চমকে উঠেছিল। কিন্তু আমি তাকে একটা মিথ্যে কথা বলেছিলুম। বলেছিলুম রাঘবেন্দ্র আমাকে উত্ত্যক্ত করছে। আপনাকে বলা

দরকার তখন রাজবাড়ির বড়বাবু, এমনকী, মামার চেয়েও রাঘবেন্দ্রের প্রভাব সিংহগড়ে বেশি ছিল। যত ডাকাত ও গুণ্ডা প্রকৃতির লোক ছিল তার হাতে। পুলিশও ছিল তার বন্ধু। আর আমাকে এসে উত্যক্ত করতে সাহস পেত না। আমি নিজেই তার কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলুম। কিন্তু পরে যখন তার মধ্যে আবিষ্কার করলুম সে শুধু আমাকে প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার বস্তু ভেবেছে, তখন তার ওপর আমার ঘৃণা জেগেছিল। হয়তো আমি নিজেই তাকে মেরে ফেলতে পারতুম কিন্তু তার ঝুঁকি ছিল। অভয়ানন্দের কাছে আমি ছুটে গিয়েছিলুম অনাদি স্বকীয় আলোতে নিজেকে আলোকিত করতে। কিন্তু ঝোঁকের বসে রাঘবেন্দ্রর সম্পর্কে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেললুম। অভয়ানন্দ আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—আমি সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী। তুমি আমার কাছে অন্য কোনও আশা কোরো না, তবে তুমি যে জন্য এসেছ বললে, আমি তার প্রতিকার করব।

কর্নেল চোখ বন্ধ করে কথা শুনছিলেন। এবার চোখ খুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন—তারপরেই কি সিংহ গর্জনের গুজব ছড়িয়ে ছিল?

প্রতিমা আস্তে বলল, হ্যাঁ।

কর্নেল বললেন—তার পর কি অভয়ানন্দের ক্ষতবিক্ষত দেহ জলপ্রপাতের কাছে পাওয়া গিয়েছিল?

প্রতিমার চোখ ছলছল করছিল। তিনি আত্মসম্বরণ করে বললেন—আমি একটা সৎ মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছিলুম। জানতুম না রাঘবেন্দ্র তার ক্ষতি করতে পারে।

কল্পনাও করিনি এমন কিছু ঘটবে। প্রতিমা এবার কান্নাজড়ানো গলায় বললেন— কর্নেল সাহেব, আমি ওই নিষ্পাপ মানুষটার মৃত্যুর কারণ। রাজবাড়ির লোকেরা নাকি এরকম কিছু একটা সন্দেহ করত। কিন্তু রাঘবেন্দ্রর কাছে তারা অসহায়। এর কিছুদিন পরে আমার দিক থেকে কোনও ক্ষতির আশঙ্কা করে রাঘবেন্দ্র সিংহগড় ছেড়ে চলে যায়।

কর্নেল বললেন—তোমার ছবিটা কে তুলেছিল।

প্রতিমা বললেন—ওটা আমি নিজেই স্টুডিওতে গিয়ে তুলেছিলুম। আমার ওই বয়সে আমি খুব খেয়ালি ছিলুম। কখন কি যে করতুম নিজেই বুঝতুম না।

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন—ছবিটা অভয়ানন্দের বিছানার তলায় কে রেখেছিল?

প্রতিমা ভিজে চোখ আঁচলে মুছে শান্তভাবে বললেন—যখন ছবিটা তুলি তখন তার একটা কপি রাঘবেন্দ্র চেয়েছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস সে অভয়ানন্দকে ফাঁসাতে চুপি চুপি তার বিছানার তলায় সেই কপিটা রেখে এসেছিল।

কর্নেল বললেন, তোমার নিজের কপিটা কি তোমার কাছে আছে?

প্রতিমা বললেন, না রাগ করে সেটা ছিঁড়ে ফেলেছি। নেগেটিভটা স্টুডিও দিয়েছিল আমাকে। সেটাও আগুনে পুড়িয়ে দিয়েছিলাম।

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চাই। অভয়ানন্দের কাছে কি তুমি কখনও ব্রোঞ্জের কোনও চাকতি দেখেছিলে?

প্রতিমা একটু চমকে উঠলেন। বললেন—অভয়ানন্দ বলেছিল তার দীক্ষাগুরু তাকে একজোড়া চাকতি দিয়েছিলেন। সেদুটো নাকি হাজার বছরের পুরনো দুটো সিল। হিমালয়ে সাধুবাবা ওদুটো কোথায় পেয়েছিলেন তা অভয়ানন্দকে বলেননি।

কর্নেল একটু হেসে বললেন—অভয়ানন্দের বিছানার তলায় একটা চাকতি আবিষ্কার করেছিলেন রাঘবেন্দ্র, ফটোর সঙ্গে সেটাও তিনি নিয়ে যান। এ ঘটনা সম্ভবত অভয়ানন্দের মৃত্যুর পর। আরেকটা চাকতি রাজবাড়ির ছোটবাবু অজয়নারায়ণ নাকি কুড়িয়ে পান ঠাকুরবাড়ির পুকুরপাড়ে। প্রতিমা অবাক চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। রাজবাড়ির ছোটবাবুর কথা আমি বিশ্বাস করি না। অভয়ানন্দের ঘর থেকে রাঘবেন্দ্র আর ছোটবাবু পরপর একটা করে চাকতি খুঁজে পেয়েছিলেন।

কর্নেল বললেন—তুমি সেসব কথা বললে তা আমার জানা ছিল না। আমি বুঝতে পারছি অভয়ানন্দ সম্ভবত রাঘবেন্দ্রকে চার্জ করতে গিয়েই মারা পড়েন। তার মৃত্যু কোনও জন্তুর আক্রমণে হয়েছে এটা সাব্যস্ত করতে রাঘবেন্দ্র মৃতদেহটা ক্ষত-বিক্ষত করেছিল। কিন্তু এবার আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করছি, আশা করি সঠিক উত্তর দেবে।

প্রতিমা বললেন—আপনি কথা দিন রাঘবেন্দ্রকে খুঁজে বের করে শাস্তি দেবেন। কারণ আপনি নিজেই বললেন, আপনি রহস্যভেদী।

কর্নেল মৃদু হেসে বললেন—তার শাস্তি দেবার জন্য দেশের আইন আছে। আদালত আর প্রশাসন আছে। অনেক বছর আগের ঘটনা। তাহলেও পুলিশ নতুন করে তদন্ত শুরু করতে পারে আমি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করব। এবার তুমিই বলো এবার যে সিংহ গর্জনের গুজব ছড়িয়েছে সে ব্যাপারে তোমার মত কী?

প্রতিমা একটু চুপ করে থাকার পর খুব আস্তে বললেন—গুজবটা শোনার পর আমার ভয় হচ্ছে। যে আদিবাসী মেয়েটা আমার কাছে থাকে সে খুব সাহসী। আর আমার কাছে আত্মরক্ষার একটা অস্ত্র আছে সেটা মামার একটা রিভলবার। উনি আমাকে অস্ত্রটা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। তবু কেন যেন মনে হয় একটা ভয়ঙ্কর পরিণাম আমার জন্য অপেক্ষা করছে। সিংহগর্জনের গুজব পুরনো ভয়ঙ্কর স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনেছে। দিনে আমি তত ভয় পাই না। তবে রাত্রে আমার ঘুম হয় না। আদিবাসী মেয়েটি তির-ধনুক নিয়ে আমাকে পাহারা দেয়। সারারাত এ বাড়িতে আলো জ্বেলে রাখি।

কর্নেল বললেন—তুমি যদি অন্তত দুটো দিন সতর্ক থাকো আমার মনে হয় তোমার ভয়ের কারণটা আমি নির্মূল করে দিতে পারব।

কর্নেল উঠে দাঁড়ালেন তার পর বললেন আমরা উঠেছি ট্যুরিস্ট লজে। তোমার এখানে ফোন থাকলে ভাল হত। প্রতিমা বললেন, নিউ টাটা টাউনশিপ এরিয়ায় কয়েকটি বাঙালি ফ্যামিলি আছে, তাদের টেলিফোন আছে। আমাকে তারা সন্ন্যাসিনী বলে শ্রদ্ধা-ভক্তি করে। দরকার হলে আমি আপনাকে কারুর বাড়ি থেকে ফোন করব।

কর্নেল বললেন—তোমাকে তো শালবনটা পেরিয়ে যেতে হবে।

প্রতিমা বললেন—শালবনের পূর্বদিকটায় ফাঁকা জমি আছে। আমি দরকার হলে ওখান দিয়ে যেতে পারি। যদিও কখনও কোনও বাড়িতে যাইনি। তবে ওইসব বাড়ির মেয়েরা আমার কাছে এসেছে, সেই সূত্রে পরিচয়।

আমরা দুজনে বেরিয়ে লনে নেমে গেলুম। কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন এতসব ফুল, এদের সেবা তুমিই করো!

প্রতিমা বললেন—হ্যাঁ, মামার একটা জলের পাম্প আছে। নদী থেকে জল তুলতে অসুবিধা নেই। কর্নেল সাহেব আমার জীবনে এখন এইসব ফুল আর আমার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আমাকে সুখি রেখেছেন। তাই যত ভয়ই পাই এই পরিবেশ থেকে যেন উঠে এসে আমাকে আশ্বাস দেয়। আমার ঠাকুর তো আছেনই।

কর্নেল পা বাড়িয়ে একটু হেসে বললেন—দেবতা বা প্রকৃতি সংসারে রক্তমাংসের মানুষকে রক্ষা করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। বরং আমি তোমাকে বলব তোমার ফায়ার আর্মস আর আদিবাসী মেয়েটির তির-ধনুক তোমাকে রক্ষা করবে।

প্রতিমা দেবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা তাঁর নির্দেশমতো বাংলো বাড়ির পাশ দিয়ে পায়ে চলা রাস্তায় এগিয়ে গেলুম। কিছুটা চলার পর শালবন। শালবনের শেষ প্রান্তে দেখলুম অনেকখানি অঞ্চল পোড়ো জমি। তার পরে সুন্দর ছবির মতো নিউ টাউনশিপের ঘরবাড়ি। জমিটা পেরিয়ে গিয়ে দেখলুম পায়ে চলা পথটা ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তার পর পিচ রাস্তার যানবাহন ও মানুষজনের ভিড় চোখে পড়ল।

এতক্ষণে বললুম—কর্নেল, আমার কিন্তু প্রতিমা দেবীকে প্রকৃত সন্ন্যাসিনী বলে মনে হয়নি। ওটা ওঁর ছদ্মবেশ। নিজেকে বৈষ্ণবী বলতে চান না অথচ তাঁর আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কপালে রসকলি আঁকেননি। আমার ধারণা এই মহিলা সরল প্রকৃতির নন। ওঁর মনে জটিলতা আছে। তা আমি টের পাচ্ছিলুম।

কর্নেল সহাস্যে বললেন—হ্যাঁ, প্রতিমা রহস্যময়ী মেয়ে। আর ওকে বলে এলুম আমি রহস্যভেদী।

বললুম আপনি তো ঠিক তাই। রহস্যভেদ করতেই তো সিংহগড়ে এসেছেন। দুষ্প্রাপ্য প্রজাপতি দেখা নেহাত একটা উপলক্ষ। কিন্তু আমার ধারণা—

কর্নেল আমাকে কথা শেষ করতে দিলেন না একটা সাইকেল রিকশা ডেকে তাতে উঠে বসলেন। আমিও উঠে বসলুম। তার পর কর্নেল গেলেন—সোজা ট্যুরিস্ট লজ। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। কিন্তু তত গরম টের পাচ্ছিলুম না। আবহাওয়া বেশ স্নিগ্ধ। আমি আবার অসমাপ্ত কথাটা বলতে গেলুম। কিন্তু চোখ কটমটিয়ে বললেন—নো কথা, চুপচাপ চারপাশে দৃশ্য দেখতে দেখতে চলো। এত সুন্দর পাহাড়ি দৃশ্য আর কোথাও পাবে না।

ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছনোর পর নিচের লাউঞ্জে ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে তিনি কর্নেলকে বললেন—দুবার ফোন এসেছিল। আমি বলেছি কর্নেল সাহেব এখনও ফেরেননি।

কে ফোন করেছিল জিজ্ঞাসা করেছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। রাজবাড়ি থেকে বড়বাবু ফোন করেছিলেন। কর্নেল রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকলেন। তার পর সাড়া এলে বললেন—কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি...হ্যাঁ বলুন বিজয়বাবু। সেকি উড়ো চিঠি। কী লিখেছে... আপনার অস্বস্তির কারণ নেই। আমি লাঞ্চের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আপনার কাছে যাব।

আট

লাঞ্চের পর আমি অভ্যাসমতো বিছানায় গড়িয়ে পড়েছিলাম। বাঙালির চিরাচরিত বদঅভ্যাস সম্ভবত 'ভাতঘুম'। আমি এর পাল্লায় প্রায়ই পড়েছি। কাল একে তো সারা রাত ট্রেনের জার্নি, তার পর প্রায় বেলা একটা অবধি কর্নেলের সঙ্গে সিংহগড়ে ঘুরে বেড়ানো। এর ফলে ভাতঘুম সহজেই আমাকে পেয়ে বসেছিল।

সেই ঘুম ভাঙল পরিচারকের ডাকে, তার হাতে চায়ের কাপ-প্লেট। তখনই বিছানায় উঠে বসে দেখলুম কর্নেল ঘরে নেই। বিকেলে আমার চা খাওয়ার অভ্যাস আছে। প্রায়ই কর্নেল সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন তা বুঝতে পারলুম। লোকটিও একটু হেসে বলল—বড়সাহেব ম্যানেজার বাবুকে বলে গিয়েছেন চারটে বাজলে আপনার কাছে যেন চা পাঠিয়ে দেওয়া হয়। লোকটি সেলাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শরীরটা এখন ঝরঝরে লাগছিল বটে, কিন্তু একটু অভিমান ও ক্ষোভও হল। কর্নেলের সঙ্গে আমার যাবার ইচ্ছে ছিল। কেন জানি না প্রতিমা দেবীর কথাবার্তা শোনার পর থেকে আমার মনে হচ্ছিল এত বছর পরে আবার সিংহ গর্জনের গুজব কোনও অঘটন ঘটাতে চলেছে। তাই কর্নেলের সঙ্গে থেকে রহস্যের সূত্রগুলো আঁচ করতে তীব্র ইচ্ছা ছিল। কর্নেল আমাকে ডাকলেই পারতেন। আমি ভাতঘুম ফেলে তার সঙ্গে বেরিয়ে পড়তুম। না হয় একটু কষ্ট হত।

কিন্তু কী আর করা যাবে, কর্নেলের হালচালই এরকম। মাঝে মাঝে ওর খেয়ালি স্বভাবের পরিচয় এভাবেই পেয়েছি। চা খাওয়ার পর উঠে দূরে টিলার পারে জঙ্গল

এবং তার পেছনে নীল পাহাড়ের রেখা চোখে পড়ছিল। দক্ষিণের এই বারান্দা—রোদ পড়েছে কোনাকুনি। একটা চেয়ার এনে বসলুম। এখন নিছক প্রকৃতির শোভা দর্শন করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। শরৎকালের শেষ সপ্তাহ। তাই যদি বিকেল ঘনিয়ে আসছিল। তত পাখিদের কলরব বেড়ে যাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পরে টেলিফোন বেজে উঠল। দ্রুত ঘরে গিয়ে রিসিভার তুলে সাড়া দিলুম। কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল—ডার্লিং, আশা করি তোমার ভাতঘুম ভালই হয়েছে। ক্লান্তিও ঘুচে গেছে।

আমি বললুম—আপনি আমাকে ঘুমোতে দিয়ে একা কেটে পড়েছিলেন, এটা আমার ভাল লাগেনি। আপনি কোত্থেকে বলছেন?

কর্নেল বললেন—রাজবাড়ি থেকে, তুমি যদি আসতে চাও, বিজয়বাবুকে বললে গাড়ি পাঠিয়ে দেবেন।

বললুম—তার আগে বলুন রহস্যময় কিছু ঘটেছে কি ওখানে।

কর্নেল বললেন—ঘটেছে, তবে খারাপ কিছু নয়। আমি তোমাকে ডাকছি। তার কারণ তুমি এই ঘটনা থেকে লেখার উপাদান পেতে পারো।

সঙ্গে সঙ্গে বললুম—তাহলে গাড়ি পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। কারণ গাড়িতে গেলে খুব শিগগির পৌঁছে যাব।

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে আমি এখনই বিজয়বাবুকে খবর পাঠাচ্ছি। উনি ঠাকুরবাড়িতে আছেন। আচ্ছা রাখছি।

তখন প্যান্ট-শার্ট এবং হালকা একটা জ্যাকেট পরে নেমে এলাম। কারণ এখনই এখানে বাতাসে হিমের ঈষৎ প্রভাব টের পাওয়া যাচ্ছিল। বিশেষ করে সন্ধ্যার দিকেতে উষ্ণতা আরও কমে যাবে। প্যান্টের ডান পকেটে রুমাল জড়িয়ে আমার পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের সিক্স রাউন্ডার রিভালবারটা নিতে ভুললুম না। তার পর দেখলুম সেন্টার টেবিলে এই ঘরের তালা ও চাবিটা রাখা আছে। জানাল বন্ধ করার পর বেরিয়ে গিয়ে দরজায় তালা এঁটে দিলুম। চাবিটা বুক পকেটেই থাকল। নীচে গিয়ে ম্যানেজারকে দেখতে পেলুম না। লাউঞ্জে ইতস্তত কিছু লোক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। তাদের ট্যুরিস্ট বলে মনে হল। কিন্তু সাহেব তিনজনকে দেখতে পেলুম না। তাঁরা নিশ্চয় জলপ্রপাতের ওদিকে জঙ্গল ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলুম।

আমার তর সইছিল না। বাংলোর গেট পেরিয়ে গিয়ে নিচে রাস্তায় দাঁড়ালুম। একটা কালো অ্যাম্বাসাডার নদীর ব্রিজ পেরিয়ে আসছে দেখতে পেলুম। গাড়িটা ঘুরে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। ড্রাইভারের চেহারা কালো পাথরে খোদাই করা যেন। সে একটা সেলাম ঠুকে পিছনের দরজা খুলে দিল। গাড়িতে উঠে বসলুম। ড্রাইভার ভাঙাভাঙা বাংলায় বলল—জানলা দুটোর কাচ তুলে দিতে কারণ এখন বিকেলের দিকে এখানে খুব জোরে বাতাস বয়। আমি বাইরের লোক ওই বাতাসে ঝাপটানিতে আমার ঠান্ডা লাগতে পারে।

লক্ষ্য করলুম ড্রাইভার বাঁদিকে জানালার কাচ তুলে দিয়েছে। তার ডান দিকের কাচ অল্প একটুখানি তোলা। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে সে এগিয়ে চলল। নদীর ব্রিজ পেরিয়ে গিয়ে সে গাড়ির গতি বাড়াল। তার পর যাচ্ছি তো যাচ্ছি। কাচের বাইরে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু ড্রাইভারের পাশ দিয়ে বাইরের কিছু অংশ চোখে পড়ছে।

ঘড়িতে দেখলুম সাড়ে চারটে বাজে। রাজবাড়ি পৌঁছতে বড়জোর পনেরো মিনিট লাগার কথা। এইবার সন্দেহ হল আমি কোনও ভুল গাড়িতে চড়িনি তো। এমন হতে পারে এই গাড়িটা অন্য কাউকে নিতে এসেছিল ভুল করে আমাকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই জিজ্ঞাসা করলুম তুমি রাজবাড়ির ড্রাইভার তো। লোকটা মুখ ঘোরাল না। গলার ভিতরে কী বলল বুঝতে পারলুম না। আরও কিছুক্ষণ পরে দেখলুম একটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেন গাড়ি ছুটে চলেছে। অমনি আমার বুকটা কেঁপে উঠল। পকেট থেকে সাবধানে রিভলবারটা বের করে প্যান্টের পাশে হাত রেখে ধমক দিয়ে বললুম—এই ড্রাইভার তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

ড্রাইভার তবু মুখ ঘোরাল না। গলার ভিতরে আবার কিছু বলল কিছুই বুঝতে পারলুম না। এবার আমার পক্ষে চুপ করে থাকা সম্ভব নয়। তার চোয়ালের নিচে রিভলবারের নল ঠেকিয়ে গর্জন করে উঠলুম—গাড়ি থামাও। এখনি গাড়ি থামাও। তা না হলে তোমার মাথা উড়ে যাবে। লোকটা এতক্ষণে মুখ ঘোরাবার চেষ্টা করল দেখলুম তার পাকানো গোঁফের নিচে বাঁকা হাসি। সে বলল, আমার মাথা যদি উড়ে যায় তাহলে এই স্পিডের গাড়ি আপনাকে তিনশো ফুট নিচে নিয়ে যাবে। তখন আপনার অবস্থা কী হবে ভেবে দেখুন।

আমি আবার গর্জন করে বললুম—গাড়ি থামাও বলছি। আমি গাড়ি চালাতে জানি।

এবার সে বলল—ঠিক জায়গায় এসে গিয়েছেন। খামোকা রাগারাগি করে লাভ নেই স্যার। আপনার একটা পিস্তল আর এখানে পাঁচ-ছটা পিস্তল আর বন্দুক। মাথা খারাপ না করে চুপচাপ বসে থাকুন।

হঠাৎ স্পিড কমতে কমতে গাড়িটা এক জায়গায় থামল। তখন রিভলবারটা আমার পকেটে ঢুকিয়ে রেডি রাখলুম। সে গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে দিল এবং নামতে ইশারা করল।

গাড়ি থেকে নেমে দেখলুম আমি একটা পুরনো একতলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটার দুধারে এবং পেছনে ঘন জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। দুজন লোক বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের দেখে ভদ্রলোক বলে মনে হল না। একজনের হাতে একটা বন্দুক। অন্য জনের হাতে একটা দেশি পিস্তল।

প্রথম কয়েক মুহূর্ত আমার আতঙ্কে অবশ হয়ে গিয়েছিল তার পর নিজেকে চাঙ্গা করে ফেললুম। এরকম অবস্থায় আগে কখন পড়িনি এমন নয়। ড্রাইভার দাঁত

বের করে হেসে বলল—স্যার, আমার চোয়ালের তলাটা গর্ত করে ফেলেছেন এবার আসুন কর্তা মশায়ের সঙ্গে আলাপ করবেন।

জিজ্ঞেস করলুম—কে তোমাদের কর্তা মশাই?

ড্রাইভার বলল—আমার সঙ্গে আসুন। পাহাড় জঙ্গল জায়গা বাঘ ভাল্লুকও আছে। কাজেই পালাবার চেষ্টা করবেন না। ঘরের দরজা খোলা ছিল। ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। দেখলুম কর্নেলের মতো গোঁফ দাড়িওয়ালা এক প্যান্ট শার্ট পরা একটা লোক বসে আছে। তার মাথার চুল অবশ্য লম্বা পিছনদিকে মেয়েদের চুলের মতো হর্স টেল।

লোকটি টেবিলের উলটো দিকে একটা নড়বড়ে চেয়ারে আমাকে বসতে বলল লক্ষ্য করলুম তার পিছনে একটা ক্যাম্প খাটে বিছানা পাতা। বিছানায় একটা বন্দুক রাখা আছে। লোকটার কণ্ঠস্বর অদ্ভুত। ভাঙা গলায় সে বলল—কান টানলে মাথা আসে। তোমাকে আনা হয়েছে এবার তোমার মাথাটিকেও আনা হবে।

বললুম কে আপনি? আমাকে এভাবে এখানে আনলেন কেন?

লোকটি বলল—তোমার কর্নেল বুড়োর কাছে দুটো ব্রোঞ্জের চাকতি আছে। তুমি চিঠি লিখে দাও। আমার লোককে যেন রাত আটটার মধ্যে চাকতি দুটো দেওয়া হয়। আর দেখো সাড়ে আটটা অবধি অপেক্ষা করে যদি চাকতি দুটো না পাই তাহলে তোমার মৃত্যু।

বলে সে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটা জরাজীর্ণ প্যাড এবং ডটপেন এগিয়ে দিল।

আমি চিন্তা করছিলুম—আমি নিরস্ত্র নই। ইচ্ছে করল এই লোকটিকে গুলি করে মেরে দরজায় দাঁড়ানো ড্রাইভারকেও মারতে পারি। বাইরের লোক দুটো দৌড়ে এলে আমার আর দুটো গুলি খরচ হবে চারটে বডি এখানে ফেলে রেখে অ্যাম্বাসাডার গাড়িটা চালিয়ে চলে যেতে পারি নিরাপদ জায়গায়। কিন্তু সেটা হয়তো ঝুঁকির ব্যাপার হবে। যদি দৈবাৎ বাইরের স্বতন্ত্র লোকদুটোকে ধরাশায়ী না করতে পারি?

তার চেয়ে ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় চুপচাপ দেখে নেওয়া ভাল। প্যাডটা টেনে নিয়ে আমি তার কথা মতো লিখতে শুরু করেছিলাম। এমন সময় ড্রাইভার বেটার ছেলে বলে উঠল—বাবুমশাই এই বাঙালিবাবুর পকেটে একটা পিস্তল আছে।

অমনি দাড়িওয়ালা লোকটা বিছানা থেকে বন্দুকটা তুলে নিয়ে আমার বুকে ঠেকাল তার পর বলল—আগে অস্ত্রটা দাও। তার পর লিখবে। বুকের বাঁদিকে ঠিক হার্টের উপর বন্দুকের নলের চাপ টের পাচ্ছি। সে সেফটি ক্যাচ তুলে নিল। ট্রিগারে হাত রেখে বলল, তোমার ফায়ার আর্মস আমাকে তুলে না দিলে আমি ট্রিগার টানব। সে সময় কেন যেন আমার মনে হল লোকটা তার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ইচ্ছে করেই বিকৃত করছে। মাঝে মাঝে দু-একটি কথায় ওর আসল কণ্ঠস্বর যেন

ধরা পড়ছে, যা আমার চেনা। কিন্তু আমার যা উদ্দেশ্য ছিল তা যখন কাজে লাগাতে পারিনি তখন আমার অস্ত্রটা ওকে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। তার দুচোখে হিংসার চাহনি জ্বলজ্বল করছিল। পকেট থেকে রিভলবারটা বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলুম—সে ওটা দেখার পর বন্দুকের নল সরিয়ে নিল। তার পর বলল—যা বলছি লিখে ফেলো।

ওর কথা মতো কর্নেলকে চিঠিটা লিখে তার তলায় নাম সই করলুম। চিঠিটা সে আমার হাত থেকে নিয়ে পড়ে দেখল। তার পর ড্রাইভারকে ডেকে সে বলল—এটা নিয়ে গিয়ে কার হাতে দিবি তা বুঝতে পারছিস।

ড্রাইভার এবার হিন্দিতে বলল—জি হাঁ সাব।

তাহলে দেরি করিস না। গাড়ি একটু তফাতে রেখে। চিঠিটা দিয়ে যতক্ষণ না সে ফিরে আসে তুই অপেক্ষা করবি। তবে আমাকে এখানে আর পাবি না। আমি আমার নিজের ডেরায় থাকব। এই ছোকরাকে সেখানে নিয়ে যাব।

ড্রাইভার চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল। তার পর আমারই রিভলবারের নল আমাকে তাক করে অন্য হাতে বন্দুক নিয়ে তাগড়াই চেহারার লোকটা বলল—চলো।

আমি বাইরে বেরুতেই সে ডাকল—তোরা এখানে আয়রে। সেই পিস্তল আর বন্দুকধারী লোক দুটো বারান্দার কাছে এল। দাড়িওয়ালা বলল—ঘরের ভিতরে দড়ি আছে, নিয়ে এসে এর হাত দুটো পিছন থেকে বেঁধে ফেল।

তারা দুজনে যখন আমার হাত দুটো পিছন দিয়ে বাঁধছে নিজের ওপর আমার রাগ হল। কর্নেল বলেন—তুমি বোঝো সবই কিন্তু বড় দেরিতে। কথাটা খুব সত্যি। আমি চারটে নরহত্যা করে অনায়াসে পালিয়ে যেতে পারতুম। এর দায় পুলিশ কোনওভাবেই চাপাতে পারত না। কিন্তু সেই শুভ মুহূর্ত হাতছাড়া করেছি।

তারা টানতে টানতে আমাকে বাড়িটার পিছনের জঙ্গলে ঢোকাল। বেলা পড়ে এসেছে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে জায়গাটা একটা টিলার মাথায় তাই সূর্যের আলোর ছটা এখনও সবকিছু স্পর্শ করছে। একটু পরেই সব স্পষ্টতা চলে গেল। জঙ্গলের ভিতরে ঘন ছায়া। তার পর দেখলুম বড়বড় পাথরের চাঁই ইতস্তত পড়ে আছে। সেগুলোর মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে একখানি সুন্দর একটা বাংলো বাড়ি দেখতে পেলুম। বাড়ির ওপাশে একটা নদীও চোখে পড়ল। পিস্তলওয়ালা লোকটি আমাকে দড়ি ধরে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছিল। বন্দুকওয়ালা লোকটি মনিবের হুকুমে এগিয়ে এগিয়ে বাংলোর গেটের তালা খুলল। তার পর দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম আমাকে খুব বেশি দূরে নিয়ে আসা হয়নি। আঁকাবাঁকা পথে ঘুরতে ঘুরতে গাড়িতে এসেছে। যাতে আমি বুঝতে না পারি কোথায় যাচ্ছি। কিন্তু এটা তো সিংহগড়ের সেই নিউটাউনশিপ এরিয়া, সকালে যেখানে কর্নেল আর আমি প্রতিমাদেবীর বাড়িতে এসেছিলুম। কিন্তু এখন

বুঝতে পারছিলুম না আমি, কোনও বাংলো বাড়িতে আমাকে বন্দি করে রাখা হচ্ছে। প্রথমে বসার ঘর তার পর দরজা খুলে একটা অপ্রশস্ত ঘরে আমাকে ঢোকানো হল। ঘরে একটা খাটিয়া পাতা আছে। তার উপর একটা বিছানা আর বালিস। বোঝা গেল এঘরে বাংলো বাড়িটার সাধারণ কর্মী বাস করে। একদিকে মাত্র একটা ঘুপচি জানলা। জানালার বাইরেটা অন্ধকার। সেই ঘরে আমাকে ঢুকিয়ে দিল। এক অসহ্য অবস্থা। কিন্তু কিছু করার নেই। শুধু ভাবতে থাকলুম শেষ অবধি কর্নেল নিশ্চয় এমন একটা কিছু করবেন যাতে আমি এই নিষ্ঠুর বজ্জাতদের হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যাই।

অনেক চেষ্টা করেও এক পাশে কাত কিংবা চিত হতে পারলুম না কারণ হাতটা এমনভাবে বেঁধেছে যে একটু নড়তে গেলে প্রচণ্ড ব্যথা করছে। অগত্যা ওই অবস্থায় শুয়ে রইলুম।

মুখে টেপ যেন আরও এঁটে গেছে। ঠোঁট দুটো ব্যথা করছে। অনেক চেষ্টা করেও হাতের বাঁধন আলগা করা গেল না। এখন শুধু প্রতীক্ষা। মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা। কিংবা কর্নেল নামক জীবনের জন্য প্রতীক্ষা।

নয়

কিছুক্ষণ ওই অবস্থায় থাকার পর দেয়ালের দিকে কাত হবার চেষ্টা করলুম এই অবস্থায় সেটাও কঠিন, কিন্তু একটা কিছু করতেই হবে। নিজের চেষ্টার ওপর ভরসা ফিরে এল যখন চিত হয়ে শুতে পারলুম। তার পর উঠে বসার জন্য চেষ্টা করতে থাকলুম। দুটো পা বিছানার নিচের দিকে একটু একটু করে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গেলুম। পা মেঝে স্পর্শ করার পর এতক্ষণে দুপায়ে ভর দিয়ে একটানে উঠে বসলুম। পেছন দিকে হাত বাঁধা থাকলে শরীরকে ইচ্ছেমতো চালনা করা যায় না। আমার সামনে হাত তিনেক দূরে দরজা। তা বাইরে থেকে বন্ধ করা আছে। ঘরের ভিতর উঁচুতে একটা কম পাওয়ারের বাল্ব জ্বলছে। মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিলুম। হাতের দড়ি কাটার কোনও অস্ত্র আছে কি না। কিছুই চোখে পড়ল না।

এইটুকু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এবার পেছনে দুহাতের কব্জিতে বাঁধা মোটা দড়িটা টানাটানি করে খোলার চেষ্টা করলুম কিন্তু দড়িটা এমনভাবে বাঁধা, টানাটানিতে একটু আলগা হলেও তা খোলা দুঃসাধ্য মনে হল।

এবার কী করব ভাবছি। এমন সময় বাইরে চাপা কথাবার্তার শব্দ কানে এল। তার পর এ ঘরের দরজার কপাটে তালা খোলার শব্দ শুনতে পেলুম। তখনই সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে দেওয়ালের এক কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। আমি মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম। যা কিছুই ঘটুক এবার আমাকে একটা চান্স নিতেই হবে।

দরজাটা খুলে গেল এবং সেই পিস্তলধারী লোকটা চাপাস্বরে বলে উঠল একি জানালা দিয়ে পালাল নাকি।

তার পর সে ভিতরে এক পা বাড়াতেই আমি তার ঘাড়ের নিচে প্রচণ্ড জোরে আমার মাথা দিয়ে আঘাত করলুম। অমনি সে বিছানার উপর পড়ে গেল। আমি এক সেকেন্ডও দেরি না করে পা দিয়ে কপাটগুলো ঠেকিয়ে দিলুম। পরমুহূর্তে ওর কোমরে বসে পড়লুম। মট করে একটা শব্দ হল। তার আধখানা শরীর ছিল বিছানার উপরে আধখানা নিচে। সে ককিয়ে উঠেই চুপ করে গেল। তার হাতের দেশি পিস্তলটা এক পাশে ছিটকে পড়েছিল। সেটা পা দিয়ে বিছানার তলায় ঠেলে দিলুম। লোকটার আর সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সে ধনুকের মতো বাঁকা অবস্থায় পড়ে রইল। অনুমান করলুম তার মেরুদণ্ডের কোনও অংশ নীচে নিশ্চয়ই ভেঙে গেছে এবং সে অজ্ঞান হয়ে গেছে। এবার দরজার দিকে ঘুরে খুব সাবধানে ভেজানো দরজা প্রায় নিঃশব্দে খুলে উঁকি মারলুম। ঘরের ভিতরে আলো নেই। শুধু বাইরের আলোর একটু ছটা পড়েছে। বাইরের দরজার পাশে বন্দুক হাতে ছায়ামূর্তির মতো সেই লোকটা দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারলুম এঘরে যে ঘটনা ঘটেছে তা সে টের পায়নি। তা ছাড়া সম্ভবত ওদের মনিবও এখন এখানে নেই। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখলুম বন্দুকওয়ালা লোকটা বাঁ দিকে বারান্দার ওপর এগিয়ে গেল। এবার আমি খুব সাবধানে পা টিপে টিপে এগিয়ে গিয়ে খোঁজার চেষ্টা করলুম। ঘরের মেঝেয় কার্পেট বিছানো তাই আমার হাঁটা-চলার শব্দ হল না। ডান দিকে একটা দরজা খোলা ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, সেটাই ডাইনিং এবং কিচেন। ঘরে আলো না থাকলেও আমি যে ঘরে বন্দি ছিলুম সেই ঘরের বাল্বটা কিচেনে আলো ছড়াচ্ছিল। বোঝা গেল আমি কিচেন সংলগ্ন ঘরেই বন্দি ছিলুম। এবার কিচেনের একটা তাকে ছুরি চোখে পড়ল। তাকটা আমার বুকের সমান উঁচু। আমি পেছন দিকে ঘুরে বাঁধা হাতদুটো অনেক কষ্টে তুলে ছুরিটা ডানহাতের মুঠোয় ধরে একটু আড়ালে সরে গেলুম তার পর ছুরির উপর বাঁ হাতের বাঁধনটা ঘষতে শুরু করলুম। ছুরিটা ধারাল। বাঁহাতের দড়ি কেটে গেল। এবার মুক্ত বাঁহাত এবং দড়িবাঁধা ডান হাত সামনে এনে ডাইনিং টেবিলের উপর ডান হাত রেখে বাঁ হাত দিয়ে ডান হাতের দড়িটা দ্রুত কেটে ফেললুম। তার পর মুখে আঁটা টেপটা খুলতে কষ্ট হল না। তার পর ছুরিটা হাতে নিয়ে উঁকি মেরে বন্দুকধারী লোকটাকে খুঁজলুম। কিন্তু তাকে দেখতে পেলুম না। এবার আমি যে ঘরে বন্দি ছিলুম সেই ঘরে গিয়ে বিছানার তলা থেকে দেশি পিস্তলটা বের করে পরীক্ষা করলুম। দেখলুম বুলেট কেসে অনেকগুলো গুলি ভরা আছে। আশ্চর্য লাগল, এগুলি সবই থ্রি-নট-থ্রি বুলেট! লম্বা নলওয়ালা এই পিস্তলটা যে দেশি তা আমি দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম। এতে থ্রি-নট-থ্রি বুলেট ব্যবহার করার ব্যবস্থা দেখে অবাক লাগল। আর দেরি করা চলে না। আমি ভেতরের ঘর দিয়ে এগিয়ে

বাইরের বারান্দায় সাবধানে উঁকি দিলুম। দেখলুম বন্দুকওয়ালা লোকটা একটা চেয়ারে বসে সিগারেট টানছে। দরজা থেকে তার দূরত্ব বড়জোর তিন মিটার। আমি তাকে রিভলবার দেখিয়ে বন্দুকটা কেড়ে নিতে পারি হয়ত। তাকে ভয় পাইয়ে দেওয়ার জন্য একটা গুলি ছোড়ার দরকার হতেও পারে।

আর দেরি করা চলে না। সিদ্ধান্ত নিয়েই দরজা দিয়ে বেরিয়ে এক লাফে এগিয়ে গিয়ে তার বুকে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে বললুম, চুপ একটি কথাও না। আচমকা আক্রমণে তার হাতের বন্দুক পড়ে গিয়েছিল। বন্দুকটা পা দিয়ে টেনে আমার পিছন দিকে সরিয়ে দিলুম। তার পর তাকে চাপাস্বরে বললুম—চুপ করে এখানে বসে থাকবে। একটু নড়লে বা চিৎকার করলে আমি গুলি করব। সে ভয়ে ভয়ে বসে পড়ল। আমি তার বন্দুকটা তুলে নিয়ে কার্টিজ কেস খুলে দেখলুম একটা চার নম্বর কার্টিজ ভরা আছে। বন্দুকটা আবার ঠিক করে নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেটের কাছে গেলুম। দেখলুম গেটটা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। লোহার গরাদ দেওয়া গেট তাই সেটা ডিঙিয়ে যেতে অসুবিধা হল না। বাংলো থেকে কোনও আলো আসছিল না। কারণ এই দাড়িওয়ালা লোকটা বাংলোর আলো নিভিয়ে দিয়ে গেছে। বেরিয়ে গিয়েই সংকীর্ণ পিচের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মনে হল আমি ভুল ভেবেছিলুম। এটা নিউটাউনশিপ এলাকা নয়, কারণ কাছাকাছি আর কোনও বাড়ি নেই। শুধু দূরে উত্তর দিকে গাছপালার ভিতর আলো দেখা যাচ্ছে। আমি সেই আলো লক্ষ্য করে কিছুটা এগিয়ে গেছি পিছন থেকে গাড়ির আলোর ছটা রাস্তায় পড়ল। ভাগ্যিস আমি রাস্তার ধারে ঝোপঝাড় এবং গাছপালার আড়াল দিয়ে হাঁটছিলুম। থমকে দাঁড়িয়ে পিছু ফিরে দেখলুম একটা গাড়ি এসে সেই দাড়িওলা লোকটার বাংলোর সামনে থামল। তার পর আলো নিভে গেল, ওটা যে সেই কালো অ্যাম্বাসাডার তা বুঝতে অসুবিধা হল না। আমি এবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে রাস্তায় উঠলুম তার পর বন্দুক কাঁধে এবং পিস্তলটা পকেটে ভরে কাঁটতে থাকলাম। হঠাৎ মনে হল আমার রিভলভারটা শয়তান দাড়িওয়ালা ঝেড়ে নিয়েছে। আমি কী করে সেটা তার কাছ থেকে উদ্ধার করব।

এবার অতখানি মরিয়া হতে সাহস পেলুম না, ভাগ্যিস ওই লোকটা বাংলোয় ছিল না বলেই আমি নিজেকে মুক্ত করে আনতে পেরেছি। বরং এবার রাস্তা খুঁজে আমাকে কর্নেলের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই হবে। কিন্তু আমার হাতে বন্দুক দেখলে কেউ কি তার বাড়িতে আমাকে ফোন করতে দেবে? একটু ইতস্তত করার পর আমি বন্দুকটা রাস্তার ধারে একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এগিয়ে গেলুম। এবার রাস্তার উপর আলো পড়েছে। বাঁ দিকে যে বাড়িটা দেখতে পেলুম সেই বাড়ির গেটের কাছে গিয়ে ডাকলুম কেউ কি আছেন, অমনি বাইরের আলোটা জ্বলে উঠল তার পর এক ভদ্রলোক হিন্দিতে প্রশ্ন করলেন—আপনি কাকে চান?

আমার ভাল হিন্দি আসে না তাই স্মার্ট হেসে ইংরাজিতে বললুম—আমি এদিকে এক বন্ধুর বাড়িতে এসেছিলুম কিন্তু তার বাড়ি খুঁজে পাচ্ছি না। তবে তার টেলিফোন নাম্বার আমি জানি। আপনি যদি আমাকে দয়া করে টেলিফোন করতে দেন বাধিত হব। ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বিধ্বস্ত চেহারা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথা থেকে আসছেন।

আমি বললুম—কলকাতায় থাকি। ট্রেন লেট করেছে। আমার বন্ধু প্রমোদ রায় শুধু বলেছিল নিউটাউনশিপ এরিয়ায় যাকে জিজ্ঞাসা করবে দেখিয়ে দেবে।

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বললেন—প্রমোদ রায় এই নামেতে নিউ টাউনশিপে কেউ থাকে না।

বললুম—সে নতুন এখানে এসেছে। সরকারি অফিসার। বাংলোটা নিজের না। ভাড়া দিয়ে থাকে। আপনি যদি প্লিজ আপনার টেলিফোনটা ব্যবহার করতে দেন।

ভদ্রলোক বললেন—আসুন।

ওঁর বসার ঘরে টেলিফোন ছিল। পর্দার ফাঁকে সম্ভবত তাঁর স্ত্রী উঁকি মারছিলেন। আমি সোফায় বসে প্রথমে রাজবাড়িতে বিজয়বাবুকে ফোন করলুম। একটু পরে সাড়া এল, কে বলছেন?

বললুম—আপনি কি বিজয়বাবু বলছেন? আমি জয়ন্ত চৌধুরী।

বিজয়বাবু চমকে ওঠা কণ্ঠস্বরে বললেন—কী সর্বনাশ! আপনি এখন কোথা থেকে ফোন করছেন?

বললুম নিউটাউনশিপ থেকে এক ভদ্রলোকের বাড়ি থেকে।

বিজয়বাবু বললেন—ফোনে সব কথা বলা যাবে না। কর্নেল সাহেব আপনার খোঁজে বেরিয়ে গেছেন। ওঁর সঙ্গে পুলিশ ফোর্স আছে; আপনি জেনে নিন। যে বাড়ি থেকে ফোন করছেন তাঁর নাম কী?

আমি ফোনের মাউথ পিসে হাত রেখে ভদ্রলোককে বললুম—আমার বন্ধুর খোঁজ পেয়ে গেছি। সে আমাকে নিতে আসছে। আপনি যদি দয়া করে আপনার নামটা বলেন। তাহলে সে এখান থেকে নিয়ে যাবে।

ভদ্রলোক বললেন—আমার নাম রামনাথ প্রসাদ। আমি একজন খনি ইঞ্জিনিয়ার, আপনি আপনার বন্ধুকে বলুন, আমার এই বাড়ির নাম্বার এ/৫, সেক্টর-৩।

আমি টেলিফোনে বিজয়বাবুকে কথাগুলো জানিয়ে দিলাম।

তিনি বললেন—বুঝেছি, অজয়কে পাঠাচ্ছি। সে এই এলাকার নাড়ি নক্ষত্র চেনে। ওর গাড়ি নেই। কর্নেল সাহেব আমার গাড়িটা নিয়ে গেছেন। বরং অজয়কে বলছি এখনে প্রাইভেট কার ভাড়া পাওয়া যায়। ট্রান্সপোর্ট কোম্পানি থেকে একটা গাড়ি নিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে। কারণ বুঝতেই পারছেন সিংহের গুজবে সন্ধ্যার পর থেকে কোনও রিকশাওয়ালা রাস্তায় বেরোতে চায় না।

টেলিফোন রেখে আমি ভদ্রলোককে বললুম—অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার বন্ধু একটু অসুস্থ তাই সে এক ভদ্রলোককে গাড়ি নিয়ে পাঠাচ্ছে। আমি বরং গেটের কাছে গিয়ে অপেক্ষা করি। রামনাথবাবু স্মিতভাবে একটু হেসে বললেন—আপনাকে খুব বিপর্যস্ত দেখাচ্ছে। অন্তত এক কাপ চা খান। বলে তিনি তার স্ত্রীকে চোখের ইশারায় চা করতে বললেন।

মিনিট দশের মধ্যেই গরম চা আর বিস্কুট এসে গেল। বিস্কুট খেলুম না। চা খেয়ে শরীর অনেকটা চাঙ্গা হল। আরও দশ মিনিট বসে থাকার পর গেটের কাছে আসতে গাড়ির হর্ন বাজতে শোনা গেল। আমি তখনই তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে নমস্কার করে বেরিয়ে এলুম। দেখলুম অজয়বাবু গাড়ির ব্যাকসিটে বসে আছেন। তিনি নামবার চেষ্টা করছিলেন। আমি বললুম, থাক আপনারা গাড়ি ঘুরিয়ে নিন। আমি যাচ্ছি। বলে আমি হন্তদন্ত পিছিয়ে গিয়ে সেই ঝোপ থেকে বন্দুকটা তুলে নিলাম তারপরে রামনাথবাবু যাতে না দেখতে পান সেই ভাবে শরীরের একপাশে লম্বালম্বি আড়াল করে এগিয়ে গেলুম। গেটের সামনে গাড়িটা দাঁড়িয়ে ছিল। এবার মুখ উল্টোদিকে ঘোরাল। আমি এগিয়ে গিয়ে ডানদিকের ব্যাকসিটে উঠে বসলুম। আমার হাতে বন্দুক দেখে অজয়বাবু চমকে উঠে বললেন—এটা কী!

চাপা স্বরে বললুম—কোনও কথা নয়। আগে আমরা নিরাপদ জায়গায় পৌঁছই তার পর সব বলব।

রাতের দিকে সত্যিই সিংহগড় নিঝুম হয়ে আছে। রাস্তাঘাটে আলো আছে, জনমানব নেই, রাজবাড়ির দরজার গেটের সামনে পৌঁছাতে মিনিট কুড়ি লাগল। আসলে ড্রাইভার শর্টকাট করে এগুতে গিয়ে গাড়ি খানাখন্দে পড়ে আটকে যাচ্ছিল। তাই এতটা দেরি। বুঝতে পারলুম যেন সিংহের ভয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চাইছে।

অজয়বাবু ড্রাইভারকে বললেন—জগদীশকে বোলো কাল সকালে গিয়ে পেমেন্ট করে আসব। ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে গেল। অজয়বাবু দারোয়ানকে গেট বন্ধ করতে বললেন তার পর পোর্টিকোর নীচে গিয়ে দেখলুম বিজয়বাবু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর চেহারায় স্পষ্ট উদ্বেগের ছাপ। আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে তিনি উপরে তাঁর ঘরে গিয়ে ঢোকালেন। আমি সোফায় হেলান দিয়ে বসে বন্দুকটা পাশে রাখলুম। অজয়বাবু ঘরে ঢুকেছিলেন।

বিজয়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি বন্দুক কোথায় পেলেন?

অজয়বাবু বললেন—আচ্ছা বরং এক কাপ চা বা কফি খেয়ে নিয়ে তার পর কথা শোনা যাবে।

বললুম, যাঁর বাড়ি থেকে ফোন করেছিলুম তিনি আমাকে চা পানে আপ্যায়িত করেছেন। আমি আগের মতো চাঙ্গা হয়ে গেছি।

বিজয়বাবু বললেন—এবার বলুন কী হয়েছিল?

আমি যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে কী ঘটেছিল পুরোটাই দুজনকে শুনিয়ে দিলুম। দুই ভাই আমার সাহস এবং দক্ষতার প্রশংসা করলেন তার পর আমি বললুম—এবার বলুন কর্নেলের কী খবর।

বিজয়বাবু যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

ট্যুরিস্ট লজে গাড়ি পাঠাতে একটু দেরি হয়েছিল। কারণ ড্রাইভার কী একটা কাজে বাইরে গিয়েছিল। অজয়বাবুও বাড়িতে ছিলেন না। বিজয়বাবু গাড়ি নিজে ড্রাইভ করতে পারেন কিন্তু কর্নেল ঘরে থাকায় তিনি কর্নেলের পরামর্শে ড্রাইভারের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তার পর ড্রাইভার এলে ট্যুরিস্ট লজে গাড়ি নিয়ে যায়। কিন্তু আমাকে খুঁজে পায়নি। একজন রিকশাওয়ালা সেখানে ছিল। সে বলেছিল—একজন বাবুকে একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। জোর করে নয় তিনি নিজেই উঠে গিয়েছিলেন গাড়িতে। ড্রাইভার ফিরে গিয়ে কথাটা জানাতেই কর্নেল ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তিনি তখনই থানায় ফোন করে খবরটা দেন। অবশ্য কর্নেল এখানে আসার আগেই পুলিশ সুপারকে তাঁর সিংহগড় আসার কথা জানিয়েছিলেন। কর্নেল কালো রঙের অ্যাম্বাসাডার সম্পর্কে পুলিশকে খোঁজ নিতে বলেছিলেন। তা ছাড়া একটা কালো অ্যাম্বাসাডার জয়ন্তকে তুলে নিয়ে গেছে তা খুঁজে বের করা খড়ের গাদায় ছুঁচ খোঁজারই মতো অসম্ভব ব্যাপার। ঠিক পাঁচটা নাগাদ একটা লোক এসে গেটে দারোয়ানকে একটা চিঠি দেয়। কর্নেল তখন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। চিঠিটা পেয়ে তিনি পত্রবাহককে একটু দাঁড়াতে বলেন। তার পর বেরিয়ে গিয়ে তাকে ধরে ফেলেন। কর্নেল তার হাত মুচড়ে ধরতেই তার কোনও দোষ নেই, ওখানে একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তার ড্রাইভার এই চিঠিটা দিয়ে একটা জিনিস আনতে বলেছে। টাকার লোভে একাজ সে করেছে। কর্নেল বাইনোকুলারে গাড়িটা দেখতে পান। গাড়িটার মুখ উল্টো দিকে ঘোরানো ছিল। ড্রাইভার বাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল। সে তার পাঠানো লোকটার অবস্থা দেখে তখনই গাড়িতে উঠে উধাও হয়ে যায়। তার পর কর্নেল বিজয়বাবুর গাড়িতে চেপে কালো গাড়িটাকে সম্ভবত অনুসরণ করার জন্য ছুটে যান। এখনও তিনি ফেরেননি। বিজয়বাবু এবং অজয়বাবু খুব চিন্তায় আছেন। তাঁরা বার বার থানায় টেলিফোন করছেন। থানা থেকে টেলিফোন আসছে। কর্নেল সাহেব ওসি এবং পুলিশ ফোর্স সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন তা বলে যাননি।

দশ

অবশেষে কর্নেলের সাড়া এল টেলিফোনে। বিজয়বাবু রিসিভার তুলেছিলেন। তিনি বললেন—কর্নেল সাহেব কোথা থেকে বলছেন? ...জয়ন্তবাবু কিন্তু ফিরে এসেছেন। আমার কাছেই বসে আছেন। বলে তিনি রিসিভারটা আমার হাতে দিলেন। আমি সাড়া দিতেই কর্নেলের উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল। জয়ন্ত তুমি নির্বিঘ্নে ফিরতে পেরেছ তো? বললুম—নির্বিঘ্নে ফিরতে পেরেছি বলা যায়। ফিরেছি নিরস্ত্র হয়ে। আমার অস্ত্রটা আপনার মতো দাড়িওয়ালা পেল্লাই চেহারার একটা লোক কেড়ে নিয়েছে।

কর্নেল বললেন—তাহলে এখনই তোমার থানায় আসা দরকার। আমি থানায় আছি। আমাদের অভিযান ব্যর্থ হয়েছে। যাইহোক, এবার তোমাকে আনতে পুলিশের গাড়ি যাচ্ছে। আশাকরি এখানে আমাদের শত্রুপক্ষের কোনও লোক নেই যে—কথাটা শুনে তোমাকে ট্রাপ করতে গাড়ি পাঠাবে। বললুম—আমার অস্ত্রের বদলে একটা বন্দুক পেয়েছি। সেটা হাতে নিয়েই যাব। তাতে একটা চার নম্বর কার্তুজ ভরা আছে। কর্নেল টেলিফোন রেখে দিলেন। কথাটা বিজয়বাবুকে বললুম। তিনি বললেন আমি টেলিফোনের কাছে বসে থাকছি, অজয় আপনাকে গেটের কাছে নিয়ে যাবে।

অজয়বাবু বললেন—হ্যাঁ তাকে শনাক্ত করার চেষ্টা করেছি কিন্তু এখনও বুঝতে পারছি না। তবে দাদা আর কর্নেল সাহেব দারোয়ানের কাছে জানতে পেরেছেন হরিয়া নামে যে ছোকরা মালির ভাগ্নে, সম্ভবত সেই শত্রুপক্ষকে খবরটা দিয়েছিল কারণ ড্রাইভারকে ডাকতে পাঠিয়ে ছিলুম হরিয়াকে দিয়ে। কর্নেল সাহেবের বিশ্বাস হরিয়া তখনই এ কাজটা করেছে আর আমাদের ড্রাইভারও এসে বলল সে রাস্তার ধারে বসে তাস খেলছিল। হরিয়াকে সে ছুটে যেতে দেখে। তার পর ড্রাইভার একটা কালো অ্যাম্বাসাডারও দেখতে পেয়েছিল। হরিয়া তার পর ফিরে এসে ড্রাইভারকে বলে—তোমাকে সাহেবরা ডাকছেন।

বললুম—হরিয়া এখন কোথায়?

অজয়বাবু বললেন—সে এখন থানার হাজতে ঢুকেছে।

গেটের একটা পাশ খোলা ছিল। সেই দিক দিয়ে আমরা বেরিয়ে গেলুম। আমার হাতে বন্দুক। রাজবাড়ির সামনের রাস্তায় ল্যাম্পপোস্ট থেকে আলো ছড়াচ্ছিল। রাত্রে এখানে কুয়াশা দেখা যায় তাই এখন আলোর ছটায় কুয়াশা সবকিছু আবছা করে তুলেছিল। একটু পরেই দূরে জোরাল দুটো আলো দেখা গেল। বুঝতে পারলুম পুলিশের গাড়ি আসছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই একটা জিপ এসে দাঁড়িয়ে গেল। একজন পুলিশ অফিসার আমাকে নমস্কার করার পর অজয়বাবুকে নমস্কার করে বললেন—কি মিঃ সিংহ চিনতে পারছেন?

অজয়বাবু সহাস্যে বললেন—আরে ছোটবাবু যে। আপনার সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় না। যাই হোক, আপনাকে দেখে ভরসা হল। কর্নেল সাহেবের সঙ্গী জয়ন্তবাবুকে আপনি নিয়ে যান।

জিপগাড়ির সামনের সিটে আমাকে উনি বসতে বললেন। তার পর আমার পাশেই উনি বসলেন। বললেন—একটু কষ্ট হবে কিন্তু এই জিপটার পিছনদিকে আর্মি ও ফোর্সের বসার জায়গা আছে। কাঠের বেঞ্চে আপনি বসতে পারবেন না।

কথাটা বলে তিনি আমার হাতে বন্দুকটা দেখে বললেন—আপনি কি সব সময় বন্দুক হাতে ঘোরেন?

আমি একটু হেসে বললুম—না; এটা যারা আমাকে কিডন্যাপ করেছিল তাদের একজনের বন্দুক। আমি এটা হাতিয়ে নিয়ে চলে এসেছি আর একটা দেশি পিস্তলও হাতাতে পেরেছি। সেটা আমার প্যান্টের পকেটে আছে। থানায় গিয়ে দেখতে পাবেন।

থানার ছোটবাবু বাঙালি। তিনিও হাসতে হাসতে বললেন—আপনি দেখছি একজন গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার, কর্নেল সাহেবের কথা আগেই বড়বাবুর কাছে শুনেছিলুম। আজ সন্ধ্যার অভিযানে তাঁদের সঙ্গী হবার সুযোগ পাইনি।

বললুম—আপনি বাঙালি! আপনার বাড়ি কি বিহারে না অন্য কোথাও! ছোটবাবু বললেন—আমার বাড়ি এখানেই। এই সিংহগড়ে। আমার নাম মৃণাল চ্যাটার্জি। বছর দুই হল অনেক চেষ্টা করে এই থানায় বদলি হতে পেরেছি। এর আগে ছিলুম রামপুরে। সে একটা সাংঘাতিক জায়গা।

একটু হেসে বললুম যা ঘটে গেল তাতে দেখছি এটাও সাংঘাতিক জায়গা। মৃণালবাবু একটু গম্ভীর হয়ে বললেন হ্যাঁ, আমার ছেলেবেলায় সিংহগড়ের দুর্নাম ছিল। কিন্তু তার পর এটা শিল্পনগরী হয়ে ওঠায় অনেক ভদ্রলোক এসে বসবাস করেন। গত দুবছরে এখানে কিন্তু তেমন কোনও খারাপ ঘটনা ঘটে নি। এবারই কেন জানি না আপনাকে কারা কিডন্যাপ করেছিল তা ছাড়া আমার ছোটবেলার মতো আবার এখানে সিংহের গর্জন শোনা গেছে বলে গুজব রটেছে। স্থানীয় লোকেরা বলেছেন একটা কিছু ঘটবে। আমরা অবশ্য অ্যালার্ট আছি।

রাত্রের দিকে রাস্তাঘাট বাজার এলাকা সবই জনমানবহীন। শুধু রাস্তার কুকুরগুলো এখানে ওখানে জটলা পাকিয়ে চেঁচামেচি করছে। বাজার ছাড়িয়ে গিয়ে ডাইনে ঘুরে কিছুটা চলার পর থানার গেটের সামনে জিপ দাঁড়াল। আমি বন্দুক হাতে মৃণালবাবুর সঙ্গে থানায় গিয়ে ঢুকলুম। বড়বাবু অর্থাৎ অফিসার-ইন-চার্জের ঘরে আমাকে নিয়ে গেলেন মৃণালবাবু। আমি ঘরে ঢুকতেই কর্নেল সহাস্যে বলে উঠলেন—বাঃ! জয়ন্ত একেবারে বন্দুক লুট করে এনেছ। বড় টেবিলের ওপাশে প্রায় দৈত্যাকার শ্যামবর্ণ এক গুঁফো ভদ্রলোক পুলিশের পোশাক পরে বসেছিলেন। তিনি হাত বাড়িয়ে বললেন—কাম অন মিঃ চৌধুরি। তাঁর সঙ্গে করমর্দন করতে

গিয়ে বুঝলুম ইনিই বড়বাবু। আমি কর্নেলের পাশে বসলুম তার পর বললুম—কিডন্যাপারদের কাছ থেকে শুধু বন্দুকটাই আনিনি, ওদের একটা দেশি পিস্তল কেড়ে এনেছি। কিন্তু এটার বুলেট কেস খুলে দেখলে অবাক হয়ে যাবেন। দেশি পিস্তলে থ্রি-নট-থ্রি বুলেট ভর্তি আছে।

প্যান্টের পকেট থেকে পিস্তলটাও বের করলুম। প্রথমে কর্নেল সেটা পরীক্ষা করে দেখলেন। তার পর বড়বাবুকে দিলেন। আমি বন্দুকটা এবার বড়বাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললুম—আইনত এটা আপনাদের কাস্টডিতে জমা থাকবে।

কর্নেল আমাকে খুঁটিয়ে দেখছিলেন। তাঁর মুখের চুরুট নিভে এসেছিল। লাইটার জ্বেলে আবার ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়লেন তার পর বললেন—তোমার একটা স্টেটমেন্ট দরকার। বাংলো থেকে শুরু করে উদ্ধার হয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে সব তুমি ও.সি. সাহেবকে বলো। উনি তোমার স্টেটমেন্ট লিখে সই করিয়ে নেবেন।

বড়বাবু একটা মোটা প্যাড বের করলেন। কাগজের ফাঁকে কার্বন পেপার গোঁজা আছে। আমি যা কিছু ঘটেছে সবটাই বর্ণনা করলুম। তার পর সই করে দিলুম।

কর্নেল বড়বাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন—মিঃ শর্মা, ওই বাংলোটা কি আপনি ডিটেক্ট করতে পারছেন?

ও.সি. সিংশর্মা ভুরু কুঁচকে গোঁফে তা দিচ্ছিলেন। একটু পরে বললেন—যতদূর মনে হচ্ছে ওটা নিউটাউনশিপের উত্তরে যে কয়েকটা পুরনো বাংলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটা হতে পারে। নদীর ধারে যখন, তখন বাংলোটা—এক মিনিট। বলে তিনি টেবিলের নিচে বোতাম টিপলেন।

একজন কনসটেবল এসে সেলাম দিল।

ও.সি.মি শর্মা বললেন—রমেশজি কো বোলাও।

কনসটেবল চলে যাবার একটু পরে একজন ফর্সা চেহারার প্রৌঢ় অফিসার এসে আমার পাশে বসলেন। মিস্টার শর্মা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন—প্রথম কথা এই বন্দুক আর পিস্তলটা আমাদের কাস্টডিতে মিস্টার চৌধুরী জমা দিচ্ছেন তার একটা রিসিট করে দিতে হবে। এগুলি কোথায় পেয়েছেন সেগুলি ওঁর স্টেটমেন্টে আছে। এবার দ্বিতীয় কথা—আপনি তো এ থানায় আমার চেয়ে বেশি দিন আছেন। নিউটাউনশিপের উত্তরে নদীর ধারে কয়েকটা পুরনো আমলের বাংলো বাড়ি আছে। ঠিক প্রথম বাড়িটা কার আপনি জানেন?

রমেশজি একটু হেসে বললেন ওটার মালিক তো হাজারিলাল চৌবে। উনি ওখানে মাঝে মাঝে গিয়ে বাস করেন। নতুন বাড়ি করেছেন বাজারের পূর্বদিকে। নীচের তলায় ওঁর কারবারের গদি। উপরতলায় উনি বাস করেন।

মিস্টার শর্মা বললেন—তাহলে আমরা একবার বেরুতে চাই। হাজারিলালজির টেলিফোন নম্বর কি আপনি জানেন?

রমেশবাবু বুক পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে পাতা উল্টে নম্বরটা খুঁজে বের করে বললেন—লিখে নিন স্যার।

মিস্টার শর্মা একটা নোট বইয়ে নম্বরটা লিখে নিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। তখনই সাড়া পাওয়া গেল।

মিস্টার শর্মা বললেন—আমি থানা থেকে ও.সি. বলছি। চৌবেজি আপনার পুরনো বাংলো কি এখন খালি আছে। নাকি কাউকে ভাড়া দিয়েছেন...

...কী নাম বললেন? চন্দ্রনাথ হাজরা? আপনার চেনা লোক?... ও আপনার শ্যালকের বন্ধু। আপনার শ্যালক কি এখানে আছেন?...

ও! বন্ধুকে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছেন। ঠিক আছে। রাখছি। কারণটা পরে জানাব। নমস্তে...

রিসিভার রেখে মিঃ শর্মা কর্নেলের দিকে তাকালেন। কর্নেল বললেন—আমার মনে হয় এখনই বেরানো দরকার। জয়ন্ত যে লোকটিকে ঢুঁ মেরেছে তাকে হয়তো এখন পাওয়া যাবে না, কারণ জয়ন্ত পালিয়ে আসার পর কোনও একসময় চন্দ্রকান্তবাবু সেখানে গেছেন।

কর্নেল বললেন—কালো অ্যাম্বাসাডারটার খোঁজ আশা করি রাতের মধ্যেই পাওয়া যাবে।

মিস্টার শর্মা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, হয়তো পাওয়া যেতে পারে, এখানে কালো অ্যাম্বাসাডার তত দেখা যায় না, এখন হাল আমলের গাড়ি সবাই ভালবাসে। যাইহোক, রমেশজি এই আর্মস দুটোর রিসিট রেডি করে রাখুন। পরে আমরা এসে নেব। কর্নেল এবং আমি আগে ঘর থেকে বেরোলাম। পিছনে ও.সি. মিঃ শর্মা—তিনি বললেন—আপনারা গেটের ওখানে গিয়ে দাঁড়ান। আমি রাজবাড়ির ড্রাইভারকে বলে দিচ্ছি পার্কিং জোন থেকে গাড়িটা গেটের সামনে নিয়ে আসতে। আমাদের জিপ আর একটা ভ্যান আপনার গাড়িকে এসকর্ট করে নিয়ে যাবে।

গেটে গিয়ে দাঁড়ানোর কিছুক্ষণ পরেই ছাইরঙা একটা ফিয়াট গাড়ি এসে দাঁড়াল। কর্নেল ড্রাইভারকে বললেন—তোমার কষ্ট হয়নি তো কিছু? ড্রাইভার বেরিয়ে সেলাম দিয়ে বলল—আমি সেপাইদের সঙ্গে গল্প করছিলুম। তাস খেলছিলুম।

কর্নেল বললেন—আরও কিছুক্ষণ তোমাকে কষ্ট করতে হবে। আমরা আর এক জায়গায় হানা দেব তার পর সেখান থেকে রাজবাড়ি।

কর্নেল তাঁর অভ্যাসমতো ড্রাইভারের পাশের সিটে বসলেন। আমি বসলুম তাঁর পিছনে। আমাদের সামনে ওসি শর্মার জিপ। জিপের পেছন দিকে একজন

অফিসার এবং কয়েকজন কনসটেবল। আমাদের পিছন দিকে একটা প্রিজন ভ্যান। গাড়ি মোড় ঘুরে উত্তরের দিকে চলল। কিছুটা চলার পর ডান দিকে ঘনবসতি এলাকা। রাস্তা জনহীন। বাঁদিকে গাছপালা ও ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা করে বাংলোর মতো বাড়ি। কিন্তু আমাদের অনেক ঘুরে নদীর সমান্তরালে দক্ষিণ দিকে এগোতে হল। কোনও কোনও বাংলো বাড়িতে আলো জ্বলছে কিন্তু এদিকটা গাছপালায় ঢাকা। কিছুটা চলার পর রাস্তার বাঁ ধারে একটা বাংলোর মাথায় আলো জ্বলতে দেখলুম। জিপটা এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। আমাদের গাড়ি দাঁড়াল এবং পিছনে ভ্যান দাঁড়িয়ে গেল। তার পর দেখলুম পুলিশ অফিসার ও কনস্টেবলরা জিপ থেকে নেমে বাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদিকে প্রিজন ভ্যান থেকে আরও কয়েকজন লাঠি ধারী কনস্টেবল বাংলোর চারপাশটা ঘিরে ফেলল। তাদের প্রত্যেকের হাতে টর্চ। গাড়ি থেকে নেমেই আমি বাংলোটা চিনতে পারলুম। দেখলুম বাংলোতে দারোয়ানের সেই চেয়ারটা এখনও আছে। কিন্তু সেই লোকটা বসে নেই, বাংলোর গেটে বাইরে থেকে তালা। একজন অফিসার একজন কনস্টেবলকে ডেকে তালাটা ভাঙার নির্দেশ দিলেন। কর্নেল এগিয়ে গিয়ে বললেন আমার কাছে 'মাস্টার কি' আছে। তালা খোলা কঠিন হবে না। দেখছি এটা সাধারণ তালা।

কর্নেল অনায়াসে তালাটা খুলে ফেললেন। তার পর আমরা ভেতরে গেলুম। গিয়ে দেখলুম বাংলোর দরজায়ও তালা দেওয়া আছে। কর্নেলের পিঠে কিট ব্যাগে অনেক সরঞ্জাম থাকে। তিনি সেখান থেকে একটা স্ক্রুড্রাইভার, হাতুড়ি বের করে তালাটা খুলে ফেললেন। তার পর ভেতরে টর্চের আলো ফেলে দেখে নিয়ে ঢুকে পড়লেন। তিনি সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। ঘরের ভেতরে কেউ নেই। আমাকে যে ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল সে ঘরের দরজা খোলা। সেই অজ্ঞান লোকটি নেই। বেডরুমে তালা আঁটা ছিল। এই তালাটাও কর্নেল সহজেই খুলে ফেললেন তার পর ভেতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলেন। বিছানার ওপর বেডকভার চাপানো। বেড কভারটা তুলে ফেললেন। তার পর বালিস দুটো সরাতেই অবাক হয়ে দেখলুম আমার রিভলবারটা বালিসের তলায় যত্ন করে রেখে গেছে সেই দাড়িওয়ালা লোকটা। এটা কি তার ইচ্ছাকৃত। নাকি এটা সঙ্গে নিয়ে গেলে দৈবাৎ যদি সে ধরা পড়ে তার বিপদ হবে। কর্নেল অস্ত্রটা তুলে নিয়ে বললেন— মিস্টার শর্মা এই পয়েন্ট বাইশ ক্যালিবারের সিক্স রাউন্ডার রিভলভারটার মালিক জয়ন্ত চৌধুরী।

—জয়ন্ত তোমার পকেটে কাগজপত্র নিয়ে কি বেরিয়েছিলে?

বললুম—হ্যাঁ। তার পর পকেট থেকে লাইসেন্সবুকটা বের করে মিঃ শর্মার হাতে দিলুম। উনি টর্চের আলোয় নাম্বার মিলিয়ে দেখার পর একটু হেসে বললেন—

পরে আপনি আর একটা স্টেটমেন্টে উল্লেখ করবেন আপনার হারানো অস্ত্রটা কী করে পাওয়া গেছে। ওটা আপনি এখনই নিয়ে নিন।

রিভলবারটার বুলেট কেস দেখে কথাচ্ছলে বললুম শয়তানটা একটা বুলেট রাখেনি। ছটা বুলেট বের করে নিয়েছে।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, তোমাকে আবার নিরস্ত্র করে গেছে।

এগারো

সে রাতে ট্যুরিস্ট লজে ফিরে যেতে প্রায় দশটা বেজে গিয়েছিল। রাজবাড়ির গাড়িটার সঙ্গে একটা পুলিশ জিপ আমাদের এসকর্ট করেছিল। ওটা কর্নেলের নয়, ওসি মিস্টার শর্মারই অতি সতর্কতা। তাঁর কাছ থেকে ফিরে আসার সময় তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন এ রাতে তিনিই সেই গুজবের সিংহ। ডিনারের পর কর্নেল বলেছিলেন—তোমাকে প্রথমে যে ঘরটাতে নিয়ে গিয়েছিল সেটা দিনের বেলায় কি খুঁজে বের করতে পারবে?

বলেছিলুম—পারব।

কর্নেল বলেছিলেন—আমি মিস্টার শর্মাকে বলে এসেছি ওই ঘরটা খুঁজে বের করতে। এবং সেই সঙ্গে আড়াল থেকে নজর রাখতেও বলেছি।

সে রাতে ঘুম আসতে চাইছিল না। বার বার মনে হচ্ছিল কি সাংঘাতিক রিস্ক আমি নিয়েছিলুম। সম্ভবত কর্নেল আমাকে ঠাট্টা-তামাসা করে আমার বোকামি বা ভীরুতার কথা বলে থাকেন বলেই তাকে দেখাতে চেয়েছিলুম আমার মধ্যে বিপদে আপদে চ্যালেঞ্জ নেওয়ার ক্ষমতা আছে।

সবে ঘুমের টান এসেছে, এমন সময় বিরক্তিকর শব্দে টেলিফোনটা বেজে উঠল। কর্নেল টেলিফোনটা তার হাতের কাছেই টেনে নিয়েছিলেন, রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন।—

কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি...প্রতিমা, কী ব্যাপার...সেকি, তোমার বাড়িতে তো ফোন নেই। এমন একটা ঘটনার পর তুমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে... না আমি বলছি আমাকে ফোন করে কোনও অন্যায় করোনি বরং সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাটা জানতে পেরে আমার সুবিধা হয়েছে।... তুমি সশস্ত্র কিন্তু অস্ত্র সব সময় কাজে না লাগতেও পারে। যেমন আজ জয়ন্ত সশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও একটা লোকের পাল্লায় পড়েছিল। কাল মর্নিংএ গিয়ে বলব। যাই হোক, আমি থানার ওসি মিস্টার শর্মাকে তোমার ব্যাপারটা... জানাব না, কেন?... আচ্ছা ঠিক আছে। সাবধানে বাড়ি ফিরে যাও।

কর্নেল রিসিভার রেখে বললেন—জয়ন্ত কি ঘুমিয়ে পড়েছ?

বললুম—না, প্রতিমাদেবী কি কারও পাল্লায় পড়েছিলেন—আমার মতো? কর্নেল বললেন—তার বাড়িতে কেউ কখন ঢুকে পড়েছিল সে টের পায়নি।

আদিবাসী মেয়েটিও জানতে পারেনি। তারা দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ার পর দরজায় কেউ কড়া নাড়ে, তার পর চাপা গলায় প্রতিমাকে ডাকে। প্রতিমা জিজ্ঞেস করে লোকটা কে? সে খুব চাপা স্বরে বলে তুমি দরজা না খুললে আমাকে চিনতে পারবে না, আমি বিপন্ন। প্রতিমা বলে সে কে, তা না বললে দরজা খুলবে না। তখন লোকটা বলে—তার কাছে নাকি সাংঘাতিক বোমা আছে। দরজা না খুললে সে বাংলো উড়িয়ে দেবে। তখনই প্রতিমা তার ফায়ার আর্মস এনে জানালার ফাঁক দিয়ে নল কাত করে এক রাউন্ড ফায়ার করে। সে লোকটার পায়ে গুলি ছুড়তে চেয়েছিল। কিন্তু তার পায়ে গুলি লাগেনি। সে ধুপধাপ শব্দে দৌড়ে পালিয়ে যায়। ততক্ষণে আদিবাসী মেয়েটি বুদ্ধি করে বারান্দার শীর্ষে রাখা বাল্বটা জ্বেলে দিয়েছিল। প্রতিমা জানালা দিয়ে দেখতে পায় গাছপালার ছায়ার আড়ালে একটা লোক পাঁচিল ডিঙিয়ে চলে গেল। প্রতিমা লক্ষ্য করেনি। কিন্তু তার আদিবাসী পরিচারিকা কুন্তি বলেছে লোকটার মাথায় বড় বড় চুল আর মুখে গোঁফ-দাড়ি ছিল।

আমি বলে উঠলুম তাহলে আমাকে যে বন্দি করে রেখেছিল সেই লোকটাই হবে।

কর্নেল বললেন—হাজারিলাল চৌবের ওই বাড়িটা সম্প্রতি ভাড়া করেছে চন্দ্রনাথ নামে এক বাঙালি। কাজেই তার আসল নাম যাই হোক তাকে চন্দ্রনাথ বলেই ধরে নেব। চন্দ্রনাথ আমাদের এবং পুলিশের হামলা টের পেয়ে আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। তার একটা আশ্রয়ের দরকার ছিল। অন্তত এ রাত্রের মতো। এও বোঝা যাচ্ছে চন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই প্রতিমার পরিচিত। যাক গিয়ে। আজ খুব ধকল গেছে। শুয়ে পড়ো।

বলে কর্নেল বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

এলোমেলো নানা কথা ভাবতে ভাবতে আমিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই ঘুম ভাঙল বাংলোর পরিচারকের ডাকে। সে আমার জন্য বেড টি এনেছিল কর্নেলের বিছানার দিকে ঘুরে দেখলুম বিছানা খালি তার মানে অভ্যাসমতো খুব ভোরবেলায় মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছেন।

পরিচারক আমার হাতে চয়ের কাপ প্লেট দিয়ে একটু হেসে বলল—বড়া সাব বাইরে গেছেন। উনি আমাকে বলে গেছেন ছোটা সাব যেন আটটার মধ্যে রেডি থাকেন।

বুঝতে পারলুম তার মানে আমরা বাইরে কোথাও ব্রেকফাস্ট করব। তখন সোয়া সাতটা বাজে। চা দ্রুত শেষ করে বাথরুমে গেলুম। তার পর গোঁফদাড়ি কামিয়ে এবং প্রাতঃকৃত্য সেরে বেরিয়ে এলুম। ছটা বুলেট শয়তানটা ইচ্ছে করেই নিয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হল সে কি জানত আমার রিভলবার সে হজম করতে পারবে না? নাকি সে কর্নেলকে খুব ভয় করে? বাড়তি আরও একডজন বুলেট

আমার কাছে ছিল। বরাবরই থাকে আমার রিভলবারটা আবার ছটা বুলেট লোড করে পকেটে রাখলাম। তার পর বারান্দায় গিয়ে একটা চেয়ারে বসে কর্নেলের অপেক্ষা করতে থাকলাম। কর্নেল ফিরে এলেন তখনও আটটা বাজেনি। যথারীতি তাঁর পিঠে আঁটা আছে হ্যাভারস্যাকের মতো কিন্তু একটু লম্বাটে কিটব্যাগ। ব্যাগ থেকে প্রজাপতি ধরার জালের স্টিক উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। গলায় ঝুলছে ক্যামেরা ও বাইনোকুলার। মাথায় টুপি। তিনি অভ্যাসমতো সম্ভাষণ করলেন—মনিং ডার্লিং, আশা করি সুনিদ্রা হয়েছে।

বললুম—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তো কফি না খেয়ে বেরুবেন না।

কর্নেল বললেন—কফি খাওয়ার সময় নেই। আমাকে এই বেশেই বেরুতে হবে। গেটের কাছে বিজয়বাবু গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। নিজেই ড্রাইভ করে এসেছেন। কর্নেল ভেতরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তার পর বেরিয়ে এসে দরজায় তালা আটকালেন। তার পর বললেন—চলো, কফি খাব রাজবাড়িতে।

জিজ্ঞেস করলুম—আর কোনও নতুন খবর নেই তো।

তিনি বললেন—একটা ছোট খবর আছে। সেটা বড় খবরও হতে পারত। দৈবাৎ হয়ে ওঠেনি।

নিচের লাউঞ্জে ম্যানেজার আমাদের নমস্কার করলেন। আমরা বেরিয়ে গিয়ে লনে হাঁটতে থাকলাম। তখন বললুম—খবরটা কী?

কর্নেল বললেন—অজয়বাবুর মেয়ে সুজাতা একটু বেশি স্মার্ট। সে ভোরবেলা জগিং করতে বেরিয়েছিল। দারোয়ান ছোটেলাল তাকে নিষেধ করেছিল কিন্তু সে শোনেনি। নদীর ব্রিজ পর্যন্ত আসতেই সে দেখে একটা কালো অ্যাম্বাসাডার সামনের দিক থেকে এগিয়ে আসছে। ওইরকম গাড়িতে তোমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছিল। তাই সে সতর্ক হয়ে ওঠে। সে রাস্তা ডিঙিয়ে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে যায়। পুকুরপাড়ে ওদের বাড়ির একজন লোক দাঁড়িয়েছিল। সে তাকে কাঁটাতারের বেড়ার ফাঁক দিকে ভিতরে ঢুকতে সাহায্য করে। বাড়ি ঢুকে প্রথমে সে কাউকে কিছু বলেনি। তার হাবভাব দেখে তার মা কিছু আঁচ করেন। তখন সুজাতা কথাটা বলে দেয়।

অজয়বাবু নিরীহ মানুষ কিন্তু বিজয়বাবু কথাটা শোনামাত্র গাড়ি আর রাইফেল নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। তিনি প্রথমে যান জলপ্রপাতের দিকে তার পর ঘুরে আসছেন এমন সময় আমি রাস্তার ধারের একটা টিলা থেকে নেমে আসছিলাম। আমাকে দেখে তিনি দাঁড়িয়ে যান। তার পর তার গাড়িতেই ট্যুরিস্ট লজ অবধি এসেছি। তাঁর বাড়িতে আমাদের ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন।

বিজয়বাবুকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। তাঁর পাশে রাইফেলটা খাড়া হয়ে আছে। কর্নেল তাঁর বাঁ দিকে বসলেন। আমাকে দেখে বিজয়বাবু একটু হাসবার চেষ্টা করে

বললেন—আসুন জয়ন্তবাবু গুজব রটেছিল একটা সিংহ এসে উৎপাত করছে। কিন্তু আসলে দেখছি সিংহটা হঠাৎ কালো রঙয়ের গাড়ি হয়ে গেছে।

বললুম—যে গাড়িটা সিংহের মতো আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল? বিজয়বাবু বললেন—হ্যাঁ, তার পর গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। ব্রিজ পেরিয়ে যাবার সময় তিনি বললেন—আচ্ছা কর্নেল সাহেব, আপনার কি মনে হয় না থানার কোনও পুলিশ প্রতিপক্ষের ঘুষ খেয়ে চুপ করে আছে। একটা কালো অ্যাম্বাসাডারকে এখনও খুঁজে বের করতে পারল না।

কর্নেল বললেন—গাড়িটা সম্ভবত এমন জায়গায় লুকিয়ে থাকে যে কেউ ভাবতেও পারে না সেখানে একটা গাড়ি আছে। এখন হাতে সময় থাকলে আমি গাড়িটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতুম। কারণ রাত্রে শিশিরে গাড়ির চাকার দাগ ঘাসের জঙ্গলেও স্পষ্ট ফুটে ওঠার কথা।

রাজবাড়িতে পৌঁছনোর পর আমরা দোতালায় বিজয়বাবুর ড্রয়িংরুমে গিয়ে বসলুম। কর্নেল টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন তার পর নিজের নাম বললেন—ওসি মিস্টার শর্মা কি এখন কোয়ার্টারে আছেন? ...আচ্ছা ঠিক আছে তাকে এখন কিছু বলার দরকার নেই। আমি ঠিকসময় গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করব। আপনি শুধু বলবেন আমি ফোন করেছিলাম। ফোন করার পর কর্নেল এসে সোফায় বসলেন। বিজয়বাবু তখন বাইরে। জিনস আর টপ পরা সুজাতা কাঁচুমাচু হেসে ঘরে ঢুকল। কর্নেল হাসতে হাসতে তাকে বললেন—ওটা কালো গাড়ি নয়। তোমার জ্যেঠু বলছিলেন যে ওটাই সিংহ, গাড়ির রূপ ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তবে তুমি বুদ্ধিমতী। জঙ্গলে না ঢুকলে তোমার খোঁজে আমাদের আবার সদলবলে বেরুতে হতো।

সুজাতা বলল—কর্নেল সাহেব আমি জঙ্গলে ঢোকার সময় একবার পিছু ফিরে দেখছিলুম গাড়ির কেউ আমাকে ফলো করছে কি না। কিন্তু শুধু দেখলুম ব্যাকসিটে একটা দাড়িওয়ালা লোক বসে আছে। তার হাতে যেন একটা ফায়ার আর্মস দেখেছি। না, চোখের ভুল নয় ঠিকই দেখেছি। লোকটার দাড়ি আপনার মতো অত সাদা নয়। চোখে সানগ্লাস আছে। মাথার চুলগুলো বেশ বড়। তবে সে সাধু-সন্ন্যাসী নয়।

এই সময় বিজয়বাবু এসে ভাইঝিকে বললেন—তোমাকে কাল রাত্রে পইপই করে বলা হয়েছিল—এটা তোমার কলকাতা শহর নয়।

সুজাতা বাঁকা ঠোঁটে বলল—সিংহগড়ে তো বোকারাই থাকে। বুদ্ধিমান হলে লোকটা গাড়িতে থেকে নেমে আমাকে তাড়া করত। তার কাছে আর্মসও ছিল। বলে সুজাতা চলে গেল।

বিজয়বাবু বললেন—ন'টা বেজে এল। এঘরেই ব্রেকফাস্ট করা যাবে। তার পর বেরিয়ে পড়ব।

একটু পরেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল। দিশি ব্রেকফাস্ট। গরম লুচি, আলুভাজা, ডিম পোচ আর সন্দেশ। তাড়াতাড়ি ব্রেকফাস্ট সেরে নিলুম। তার পর এল কর্নেলের কফি। কফি খেয়ে চুরুট ধরালেন কর্নেল। তার পর বললেন ওঠা যাক। বিজয়বাবু তাঁর রাইফেলের অবস্থা দেখে নিলেন, সেফটি ক্যাচ পরীক্ষা করলেন। তার পর বেরুলেন—গায়ে ছাইরঙা স্পোর্ট গেঞ্জি। পরনে একই রঙের প্যান্ট পায়ে কর্নেলের মতো হান্টিং বুট।

ড্রাইভার গেটের বাইরে রাস্তার উপর অপেক্ষা করছিল। কর্নেল সামনের সিটে এবং আমি পিছনের ব্যাকসিটে। কর্নেল বললেন—প্রথমে থানায় যাব।

থানায় ওসি মিস্টার শর্মা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাদের বসতে বললেন। তার পর চাপা স্বরে বললেন—জয়ন্তবাবু প্রথমে যে একতলা বাড়িটার কথা বলেছিলেন সেটা খুঁজে পাওয়া গেছে। ওটা একসময় একটা পাঠশালা ছিল। এলাকার আদিবাসী ছেলেমেয়েদের পড়াতেন একজন আদিবাসী পাদ্রি। কিন্তু জায়গা এমন দুর্গম যে প্রায় ওখানে নেকড়ে হানা দিত। এটা প্রায় বিশ বছর আগের কথা। তার পর থেকে ওটা খালি পড়ে আছে। কর্নেল বললেন—সেই বাংলোটায় এখনও পাহারা আছে কি?

—মিস্টার শর্মা বললেন—আছে। হাজারিলাল চৌবে সকালে এসে এস. আই মৃণালবাবুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাংলোর অবস্থা দেখে এসেছেন। আমরা তালা ভেঙেছি তাতে তিনি দুঃখিত নন। উনি আবার নতুন করে তালা দেবেন।

কর্নেল বললেন—কালো অ্যাম্বাসাডারটার খোঁজ করতে পারলেন?

মিস্টার শর্মা একটু হেসে বললেন আমাদের লোকেরা খোঁজ নিয়েছে ওই গাড়িটা এখানে সম্প্রতি এসেছে। ওটাকে মাঝে মাঝে নিউ টাউনশিপের দিকে যাওয়া আসা করতে দেখেছে কেউ কেউ।

কর্নেল বললেন—আমার ধারণা ওটা জলপ্রপাতের কাছাকাছি যে ঘাসের মাঠটা আছে তার পাশে ঘন জঙ্গলের মধ্যে রাখা হয় কারণ আমি আজ ভোরে জলপ্রপাতের কাছাকাছি গিয়ে বাঁদিকের ঘাসের জমিটা লক্ষ্য করছিলুম। কোথাও কোথাও ঘাসের ওপর চাকার দাগ লক্ষ্য করেছি। মিস্টার শর্মা বললেন—তাহলে আমি রমেশজিকে ফোর্স নিয়ে সেখানে পাঠিয়ে দিই। কী বলেন?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ, আমার মনে হয় গাড়িটাকে এখনও সেখানে পাওয়া যাবে। তা ছাড়া আজ ভোরে গাড়িটা একটা কীর্তি করেছে। কাছেই যে এমন গা ঢাকা দিয়ে থাকা যায়—এই বলে কর্নেল সংক্ষেপে অজয়বাবুর মেয়ে সুজাতার ঘটনাটা ওসিকে জানিয়ে দিলেন। মিস্টার শর্মাই তখনই রমেশবাবুকে ডেকে সব কথা বুঝিয়ে বলে এখনই ফোর্স নিয়ে বেরিয়ে পড়তে বললেন। কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন—আমি তা হলে এবার উঠি। গাড়িটা পেয়ে গেলে তার মালিককে খুঁজে বের করতে আপনার দেরি হবে না।

ওসি শর্মা বললেন—বিজয়বাবু রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছেন ব্যাপারটা কী? সিংহ মারবেন নাকি?

বিজয়বাবু বাঁকা হেসে বললেন—মারব বলেই বেরিয়েছি। দেখা যাক। ওসি হাসতে হাসতে বললেন—খুন খারাপি করে ফেলবেন না, আমরা লোকটাকে জ্যান্ত ধরতে চাই।

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—আমরা যাচ্ছি। জলপ্রপাতের ওদিকে। প্রস্রবণের উপর রামধনু দেখা যায় শুনেছি। দেখে চোখ সার্থক করে আসি।

থানা থেকে বেরিয়ে বিজয়বাবু বললেন—আমরা পুলিশের গাড়ির সঙ্গে গেলে কালো গাড়িটা ওখানে আছে কিনা জানতে পারতুম।

কর্নেল বললেন—মিস্টার সিংহ আমরা জলপ্রপাতে যাবার আগে একবার নিউটাউনশিপে প্রতিমা রায়ের বাংলো বাড়িতে যাব।

বিজয়বাবু ভ্রু কুঁচকে বললেন—সেখানে কেন? আপনি কি ওই মহিলাকে চেনেন। উনি নাকি এখন সন্ন্যাসিনী হয়ে মামার বাড়িটাকে আশ্রম করে ফেলেছেন?

কর্নেল বললেন—হ্যাঁ, জানি। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়েছে। শুনলে অবাক হবেন, গত রাতে কালো অ্যাম্বাসাডারের মালিক সেই লোকটা তাঁর কাছে আশ্রয় চাইতে গিয়েছিল। কাজেই একবার গিয়ে খবর নেওয়া দরকার।

বিজয়বাবু অবাক হয়ে শুনলেন—তার পর ড্রাইভারকে নিউটাউনশিপের প্রতিমার বাড়িতে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।

ড্রাইভার এলাকার নাড়িনক্ষত্র চেনে। সে পনেরো মিনিটের মধ্যে বাড়িটার দরজার কাছে গিয়ে গাড়ি দাঁড় করাল এবং হর্ন দিল।

দেখলুম একটি শক্তসমর্থ চেহারার প্রৌঢ়া হন্তদন্ত হয়ে এসে গেট খুলে দিল। ততক্ষণে কর্নেল নেমে তাকে জিজ্ঞেস করছিলেন—প্রতিমা আছেন কি না। সেই মেয়েটি চাপা স্বরে বলল—কিছুক্ষণ আগে একটা লোক এসেছে। ঠাকুরদিদি তার সঙ্গে কথা বলছে।

কর্নেল দ্রুত ভেতরে ঢুকে গেলেন। তাঁকে আমি অনুসরণ করলুম। বিজয়বাবু বেরিয়ে এলেন। কর্নেল হন্তদন্ত উঠে ঘরের বন্ধ দরজার কড়া নাড়লেন বললেন—প্রতিমা, আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার; দরজা খুলুন। ভেতরে প্রতিমার মুখে যেন কেউ হাত চাপা দিয়েছে, তাই তার কণ্ঠস্বর গোঙানির মতো শোনাল।

কর্নেল কাঁধের বার কয়েক জোরাল ধাক্কা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সপাটে একটা দিক ভেঙে পড়ল। তারপরেই দেখলুম তাঁর হাতে উদ্যত রিভলবার। একটা গুলির শব্দ শোনা গেল। ভিতরের লোকটাই গুলি ছুড়েছে তা বোঝা গেল। একেই বলে মিলিটারি ট্রেনিং। কর্নেল সেই মুহূর্তেই ঝাঁপ দেবার মতো ভেতরে নিজেকে ছুড়ে দিলেন। আমি ঘরে ঢুকে গেলুম। দেখলুম সোফার নিচে মেঝেতে তাঁর মতো

তাগড়াই চেহারার একটা লোকের বুকে বসে তার আর্মস ধরা হাতটা মোচড় দিচ্ছেন। তখনই চিনতে পারলুম। এই সেই দাড়িওয়ালা শয়তান যে আমাকে বন্দি করে রেখেছিল। প্রতিমাদেবী কান্নাজড়িত কণ্ঠস্বরে বললেন—আমারই ভুল। ও আমাকে একটা জরুরী কথা বলবে বলে, ঘরে ঢুকেই অস্ত্র বের করে জানলা বন্ধ করেছিল। চাপাস্বরে বলেছিল টুঁ শব্দ করলে মারা পড়বে। তাই কুন্তি কিছু বুঝতে পারেনি। রিভলবারটা কেড়ে নিয়ে কর্নেল তাঁকে দাঁড় করালেন তার পর বললেন—জয়ন্ত এস, এর দাড়ি চুল ওপড়াও। তার পরই একে চিনতে পারবে।

আমি তার দাড়ি একটানে ওপড়াতেই সে হুহু হুহু করে উঠল। তার পর তার চুল ধরে টানছিলুম। এবার বলে উঠলুম একি কর্নেল! এ যে আপনার কলকাতার বন্ধু রাঘবেন্দ্র রায়চৌধুরী।

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন—প্রতিমা এই লোকটি আমার পুরনো বন্ধু কিন্তু আমি এর ভেতরের ইতিহাস কিছুই জানতুম না। আমি বুঝতে পারছি এই লোকটি ছিল তোমার পুরনো প্রেমিক। না, এতে লজ্জা পাওয়ার কোনও কারণ নেই তোমার। একটা বয়সে এ ধরনের দুর্বলতা থাকতেই পারে। তবে এও সত্য তুমি এতদিন ধরে নিজের অবচেতনায় সেই দুর্বলতাকে লালন করে আসছিলে। যাইহোক, তুমি জয়ন্তর সঙ্গে গিয়ে তোমার পরিচিত সেই বাড়ি থেকে থানায় একটা ফোন করে দাও। থানার নম্বর জয়ন্ত জানে। ও তোমাকে বলে দেবে। তুমি ও.সি.কে বলবে কালো সিংহের মালিক প্রাক্তন এম.পি সাহেবের বাংলোয় ধরা পড়েছে। আমার কথা বলবে, তিনি যেন এখনই লোক নিয়ে এসে নিয়ে যান।

প্রতিমা বললেন—জয়ন্তবাবুকে যেতে হবে না। এখানে আপনি ফোন নাম্বার লিখে দিন।

একটা কাগজে ফোন নাম্বার লিখে দিলে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

রাঘবেন্দ্র নতমুখে দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলছিলেন। বিজয়বাবু ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—রাঘব, তোমার এত স্পর্ধা যে তুমি অভয়ানন্দের পাওয়া সেই ব্রোঞ্জের সিলদুটো দাবি করেছিলে। ওহে মূর্খ, কর্নেল সাহেব বলেছেন ওই সিলে গুপ্তধনের কোনও ঠিকানা নেই। ওটা প্রাচীন যুগের কোনও সামন্তরাজার সিল। নচ্ছার হতভাগা! এখনও তুমি এই হতভাগিনী প্রতিমার পিছু ছাড়োনি! ধিক তোমাকে!

কর্নেল বললেন—জীবনের এই প্রথম আমি একজন মানুষের আড়ালের চেহারা দেখতে পাইনি। আমার নিজের উপরেই রাগ হচ্ছে। যাই হোক, এখন পুলিশের গাড়ি এলেই কাজ শেষ। তার পর আমরা জলপ্রপাতের রামধনু দেখতে যাব।

ভূতুড়ে বাগানবাড়ি

হারাধন মল্লিক কর্নেলকে তাঁর জয় মা তারা নার্সারির নতুন ক্যাটালগ উপহার দিতে এসেছিলেন। ডিসেম্বরের সেই সকালে আমি কর্নেলের সঙ্গে আড্ডা দিতে গিয়েছিলুম। কাজেই আমিও এক কপি ক্যাটালগ উপহার পেলুম।

আর্টপেপারে ছাপা রঙিন সচিত্র ক্যাটালগ। রঙবেরঙের ফুল আর বিচিত্র সব উদ্ভিদের ছবিতে ভরা প্রায় একশো পাতার বইটি কর্নেলের মতো প্রকৃতিপ্রেমিকদের পক্ষে লোভনীয়। কিন্তু আমি খবরের কাগজের ক্রাইমরিপোর্টার। আমি এই বই নিয়ে কী করব? ভদ্রতার খাতিরে হারাধনবাবুর রুচির তারিফ করলুম শুধু।

হারাধন মল্লিক বললেন, 'রুচি-টুচির ব্যাপার নয় জয়ন্তবাবু! আমি আমার বিজনেসের স্বার্থে এই ক্যাটালগটা ছেপেছি। সরকারি অফিস, বড়-বড় কোম্পানি আর কর্নেলসায়েবের মতো ফেমাস লোকেদের কাছে পাঠাব। তাই এটা আমার একটা ইনভেস্টমেন্ট বলতে পারেন।'

কর্নেল ক্যাটালগটার পাতায় চোখ বুলেচ্ছিলেন। একটু পরে বললেন, 'তাহলে এতদিনে আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হলো মল্লিকমশাই?'

হারাধন মল্লিক মুচকি হেসে বললেন, 'কিন্তু কী ভাবে হলো সেটা লক্ষ্য করেছেন কি?'

'হুঁউ। আপনার পার্টনার ভদ্রলোকের নাম ছাপেননি। তার মানে—'

মল্লিকমশাই তাঁর কথার ওপর বললেন, 'আপনি তো জানেন রাজেনের সঙ্গে মানিয়ে চলতে আমার কত অসুবিধে হচ্ছিল। সবসময় আমার প্ল্যান প্রোগ্রামে বাগড়া দিচ্ছিল। ওর উদ্দেশ্য কী প্রথমে বুঝতে পারিনি। পরে বুঝে ফেললুম।'

এইসময় ষষ্ঠিচরণ কফি আনল। কর্নেল বললেন, 'কফি খান মল্লিকমশাই! আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে।'

হারাধন মল্লিক কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'আসলে গতরাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। রাজনকে তার শেয়ার বাবদ নগদ পাঁচ লাখ টাকা দিয়ে রফা করেছিলুম। সেইমতো কাগজপত্রও রেজেস্ট্রি করা হয়েছিল। কাল সকালে এসে সে আরও এক লাখ টাকা দাবি করল। তাই নিয়ে ঝামেলা।'

'টাকা দিলেন?'

'মাথা খারাপ?' তক্ষুনি থানার কোয়ার্টারে ফোন করে আমার মাসতুতো ভাই

নবারুণকে খবর দিলুম। নবারুণ গত মাসে গোপালনগর থানার ওসি হয়ে এসেছে। বেগতিক দেখে রাজেন আমার পায়ে ধরতে এল। ব্যাপারটা হলো, রাজেন মধ্যমগ্রামের ওদিকে একটা বাগানবাড়ি কিনেছে। চিন্তা করুন কর্নেলসায়েব! তিন একর বাগানবাড়ি! তার মধ্যে একটা পুকুর আছে। ছ'কামরা একতলা একটা বাড়ি আছে। আর আছে কয়েকরকম ফলের বাগান। তার মালিক এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। রাজেন কোন্ ফুসমন্তরে তাঁকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে মাত্র ছ'লাখ টাকায় বাগানবাড়িটা হাতিয়েছে! পাঁচ লাখ আমি রাজেনকে দিয়েছি। সেই টাকা অ্যাডভান্স করে দলিলপত্র সব রেডি করেছে। বাকি এক লাখ রেজিস্ট্রেশনের দিন দেবার কথা।' মল্লিকমশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'নবারুণ আসবার আগেই রাজেন কেটে পড়ল। কিন্তু আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না, বাগানবাড়ির মালিক ভদ্রলোকের এমন মতিভ্রম হলো কেন? ওই এলাকায় এখন শুধু জমির যা দর, তাতে ওই বাগানবাড়ির দাম কমপক্ষে তিরিশ লাখ হওয়ার কথা!'

'নবারুণবাবু এসেছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ। খুলে সব বললুম ওকে। ও বলল, এই এরিয়ায় রাজেনকে দেখামাত্র আমি যেন থানায় খবর দিই। অন্য অফিসারদের বলে রাখবে।'

কর্নেল ক্যাটালগের পাতায় দৃষ্টি রেখে বললেন, 'রাজেনবাবুর উদ্দেশ্য টের পেয়েছিলেন বললেন। কী সেটা?'

'নার্সারিতে ওর পোষাচ্ছে না। একা অন্য কোনো কারবারে নামতে চায়। প্রায়ই বলত, আমার পাল্লায় পড়ে ওর জীবনটাই নাকি হেল হয়ে যাচ্ছে।'

'কিন্তু মধ্যমগ্রামের ওদিকে ওই বাগানবাড়ি কিনে রাজেনবাবু কি স্বাধীনভাবে নার্সারি করবেন?'

হারাধন মল্লিক কিছুক্ষণ চুপচাপ কফি খাওয়ার পর আস্তে বললেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোনো নির্বোধ বৃদ্ধকে ঠকিয়ে বাগানবাড়িটা কেনার পর পাঁচ-ছ'গুণ দামে কাকেও বেচে মুনাফা কামাবে। রাজেনকে তো দেখেছেন! মুখের কথায় সবসময় মধু ঝরে। কিন্তু ভেতরে কূটবুদ্ধি। মহা ধড়িবাজ লোক!'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'রাজেনবাবু যে ছ'লাখ টাকায় তিন একর বাগানবাড়ি কিনছেন, আপনি সে-খবর কোথায় পেলেন?'

মল্লিকমশাই সহাস্যে বললেন, 'কাল রাজেন নিজের মুখে আমাকে বলেছে। তবে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের নামটা বলেনি। তিনি কোথায় থাকেন, তা-ও বলেনি। বাগানবাড়ি কিনে কী করবে তা জিজ্ঞেস করেছিলুম। শুধু বলল, পুকুরে মাছের চাষ করবে। আর ফলের বাগান তো আছেই।' বলে কফি শেষ করে উনি কর্নেলের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন। 'কর্নেলসায়েব! যা-ই বলুন, ব্যাপারটা মিসটিরিয়াস।'

কর্নেল হাসলেন। 'কিন্তু আপনি শিয়োর হচ্ছেন কী করে যে, রাজেনবাবু আপনাকে সত্যি কথা বলেছেন?'

হারাধন মল্লিক তাঁর ব্রিফকেস খুলে খবরের কাগজের একটা কাটিং বের করে কর্নেলকে দিলেন। বললেন, 'বলছি। আগে এটা দেখুন। এই বিজ্ঞাপনটা গত রবিবার জয়ন্তবাবুদের দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকায় বেরিয়েছিল। আমি ঠিকানা অনুসারে চিঠিও লিখেছিলুম। আসলে আমাদের গোপালনগর থেকে মধ্যমগ্রাম ততকিছু দূরে নয়। এদিকে কলকাতার বহর যে-হারে বেড়ে চলেছে, ওই এরিয়ায় একর তিনেক জমি এখন কিনে রাখলে ভবিষ্যতে কাজে লাগানো যাবে। আপনার কাছে স্বীকার করছি, তিরিশ লাখের মধ্যে দর হলে আমি অবশ্যই কিনে নিতুম। কিন্তু আজ রবিবার পর্যন্ত উত্তর পাইনি।'

কর্নেল বিজ্ঞাপনের কাটিংয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন। বললেন, 'আপনি ঠিকই বলেছেন মল্লিকমশাই! রহস্যজনকই বটে। বিজ্ঞাপনের ভাষাটা কেমন অদ্ভুত মনে হচ্ছে।'

এতক্ষণে আমার আগ্রহ জাগল। বললুম, 'দেখি বিজ্ঞাপনটা।'

কর্নেল কাটিংটা আমাকে দিলেন। দেখলুম, লেখা আছে :

'মধ্যমগ্রাম সন্নিকটে যশোর রোড হইতে হাফ কি.মি. দূরে সুলভে পুকুর একতলা দালান ফলের বৃক্ষাদিসহ তিন একর বাগানবাড়ি ক্রয়ের সাহস থাকিলে সরাসরি সাক্ষাৎ না করিয়া শুধু পত্র লিখুন : এম আর। প্রযত্নে শ্রীহরি অটোমোবাইলস। ৭/১ রামচন্দ্র মিস্ত্রি লেন। কলিকাতা-৪৬।'

বিজ্ঞাপনটা পড়ে বললুম, 'ভাষা অদ্ভুত বলেই মনে হচ্ছে। অবশ্য সাহস থাকিলে এই কথাটা কেন লেখা হয়েছে তার একটা ব্যাখ্যা করা যায়।'

হারাধন মল্লিক বললেন, 'কী ব্যাখ্যা?'

'সম্ভবত দাম খুব চড়া হবে, তার আভাস দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ। আমিও তা-ই ভেবেছিলুম।'

বিজ্ঞাপনটার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'পুরো নাম না লিখে এম আর কেন, এটা কিন্তু সত্যিই গোলমেলে।'

'আরও গোলমেলে ব্যাপার হলো, সরাসরি দেখা না করে চিঠি লিখতে বলা হয়েছে।'

কর্নেল বিজ্ঞাপনটা আমার হাত থেকে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা মল্লিকমশাই, আপনি কি কাল রাজেনবাবুকে এই বিজ্ঞাপনের কথা বলেছেন?'

'নাঃ। বলব কী? ওর কথা শুনেই বুঝতে পেরেছিলুম এই বাগানবাড়িই সে হাতিয়ে ফেলেছে। তবে ওই যে বলেছি, গতরাত্রে ভালো ঘুম হয়নি। সেটা এই গোলমেলে বিজ্ঞাপনের জন্যেই। রাজেনের কাছে কৌশলে আনরেজিস্টার্ড ডিডের একটুখানি দেখে নিয়েছি। ব্যাটাচ্ছেলে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, আরও এক লাখ তার কত দরকার।'

বললুম, 'টাইপ করা ডিড?'

'হ্যাঁ। কিন্তু নামটা পড়ার সুযোগ পাইনি। শুধু অ্যামাউন্টটা রাজেন দেখাল।' বলে হারাধন মল্লিক কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। 'তা হলেই বুঝুন কী ভাবে আমি শিয়োর হয়েছি যে সত্যিই রাজেন ছ'লাখ টাকার মধ্যমগ্রাম এরিয়ায় একটা বাগানবাড়ি কিনছে।'

কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চুরুট টানতে থাকলেন। তাঁর হাতে বিজ্ঞাপনের কাটিং। মল্লিকমশাই সম্ভবত কাটিংটা ফেরত চাইতে ঠোঁট ফাঁক করেছিলেন। আমার মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। বললুম, 'মল্লিকমশাই! গোটা ব্যাপারটাই গোলমেলে শুধু নয়, রীতিমতো রহস্যজনক। আপনি কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুতে পারে। আপনার প্রাক্তন পার্টনার রাজেনবাবুকেও ঢিট করতে পারবেন।'

কথাটা মনে ধরল হারাধন মল্লিকের। চিন্তিত মুখে বললেন, 'হ্যাঁ। আসল ব্যাপারটা জানতে আমার খুব আগ্রহ হচ্ছে। প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির বিজ্ঞাপনও মাঝেমাঝে কাগজে দেখি। কিন্তু যা অবস্থা হয়েছে, কাকেও বিশ্বাস করা কঠিন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'জয়ন্ত আপনাকে তাতিয়ে দিতে চাইছে মল্লিকমশাই! সাবধান!'

হারাধন মল্লিকও হাসলেন। 'না কর্নেলসায়েব! জয়ন্তবাবু আমাকে নতুন করে তাতিয়ে দেবেন কী, আমি নিজেই অলরেডি তপ্ত হয়ে আছি। বললুম না, গতরাত্রে ঘুমুতে পারিনি। শুধু ঘুরে-ফিরে একই চিন্তা। রাজেন এমন দাঁও মারল কী করে?'

'বেশ তো! বরং নিজেই গিয়ে শ্রীহরি অটোমোবাইলসের ঠিকানায় খোঁজখবর নিন। আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। নিশ্চয় কিছু আঁচ করতে পারবেন।'

'ঠিক বলেছেন।' বলে মল্লিকমশাই তখনই উঠে দাঁড়ালেন। 'বিজ্ঞাপনটা দিন! এখনই গিয়ে একটু ঢুঁ মেরে দেখি। কিন্তু ঠিকানাটা কোন্ এরিয়ার হতে পারে?'

কর্নেল বিজ্ঞাপনটা তাঁকে দিয়ে পাশের টেবিলের ড্রয়ার থেকে স্ট্রিট ডাইরেক্টরি বের করলেন। তারপর পাতা উল্টে দেখে নিয়ে বললেন, 'পূর্ব কলকাতার গোবরা এলাকায়। আপনি কি গাড়ি এনেছেন?'

'হ্যাঁ। নিজের গাড়ি ছাড়া ট্যাক্সির ভরসায় আজকাল কোথাও সময়মতো পৌঁছুনো কঠিন।'

'তাহলে তো আপনার শ্রীহরি অটোমোবাইলসে যাওয়ার একটা শক্ত অজুহাত আছে। আপনার গাড়িটা তো অ্যাম্বাসাডার। নাকি অন্য গাড়ি কিনেছেন?'

হারাধন মল্লিক বললেন, 'মাথা খারাপ? আমার অ্যাম্বাসাডার কত বছরের সঙ্গী।'

'আপনি গাড়ির মেরামতি কাজ করানোর ছলে কথা শুরু করবেন।'

মল্লিকমশাই সহাস্যে বললেন, 'ইঞ্জিন বড্ড তেল-মবিল খাচ্ছে। ওভারহলিং করানো এমনিতেই দরকার। কাজেই কথা বলার অসুবিধে হবে না।'

'ফিরে গিয়ে আমাকে টেলিফোনে জানাবেন কিন্তু!'

'তা আর বলতে?' বলে জয় মা তারা নার্সারির প্রোপ্রাইটার আমাদের কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'তুমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইকে একজন বাঘা মক্কেল জুটিয়ে দিতে চাইছিলে জয়ন্ত! হ্যাঁ, হারাধন মল্লিক এই কেসে সত্যিই একজন বাঘা মক্কেল। কারণ মধ্যমগ্রাম এলাকার একটা বাগানবাড়ি তাঁর মাথার ভেতর ঢুকে গেছে। বিশেষ করে রাজেন মুখার্জি ওটা প্রায় ফোকটে গ্রাস করেছেন, এটা উনি কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু হালদারমশাই কখনও একসঙ্গে দুটো কেস হাতে নেন না। গতরাত্রে আমাকে টেলিফোনে জানিয়েছেন, একখানা সাংঘাতিক কেস ওঁর হাতে এসেছে। আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চান। একটু বোসো। সাড়ে দশটা বাজতে চলল। যে-কোনো মুহূর্তে উনি এসে পড়বেন।'...

প্রাইভেট ডিটেকটিভ 'হালদার মশাই'-এর পুরো নাম কৃতান্তকুমার হালদার। সংক্ষেপে কে কে হালদার। গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউতে একটা তেতলা বাড়ির ছাদে অ্যাসবেস্টস চাপানো ছোট্ট ঘরে ওঁর অফিস। উনি একসময় পুলিশ ইন্সপেক্টর ছিলেন। রিটায়ার করার পর প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন। হঠকারী, বেপরোয়া আর খেয়ালি চরিত্রে মানুষ। ঢ্যাঙা গড়ন। মাথার চুল খুঁটিয়ে ছাঁটেন। ছদ্মবেশ ধরতে পটু। তবে অতি উৎসাহে বা হঠকারিতাবশে বহুবার বিপদেও পড়েছেন। আবার ঘটনাচক্রে অক্ষত শরীরে উদ্ধারও পেয়েছেন।

ওঁকে কর্নেলের দেখাদেখি আমিও 'হালদারমশাই' বলি। এইরকম নামের পিছনে একটা ঘটনা আছে। কর্নেলের মুখেই সেটা শুনেছিলুম।

কলকাতার কোনো বনেদি বাড়িতে বিয়ের রাত্রে ডাকাতির আভাস পেয়ে গৃহকর্তা তাঁর বন্ধু কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে আমন্ত্রণ করেছিলেন এবং কর্নেলের সাহায্যে পুলিশ মোতায়েনও করেছিলেন। কে কে হালদার তখন সবে ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলেছেন এবং একটা কেসের সূত্রে কর্নেলের সঙ্গে তাঁর আলাপও হয়েছে। কর্নেল তাঁর কনের মামা সাজিয়ে বিয়েবাড়িতে তৈরি রেখেছিলেন। ডাকাতরা বরযাত্রীদের ভিড়ে ঢুকে ওত পেতে বসে ছিল। সালংকারা কনেকে সবে বিয়ের আসরে আনা হয়েছে, অমনই ডাকাতরা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ানোর জন্য তৈরি হয়েছে কর্নেল আগে থেকে সংকেতবাক্য শিখিয়ে রেখেছিলেন কে কে হালদারকে। 'হালদারমশাই! হালদারমশাই! আপনার ভাগনির চোখে পোকা পড়েছে।'

সংকেতবাক্যটা শুনেই নাকি কে কে হালদার কর্নেলের অন্য নির্দেশ ভুলে গিয়ে পাঞ্জাবির ঝুল পকেট থেকে লাইসেন্সড্ ফায়ার আর্মস বের করে তাঁর নিজস্ব ভাষায় চেঁচিয়ে ওঠেন, 'কোন্ হালায় কইন্যার অলংকার লইতে চাও, পাও বাড়াও দেহি! ব্যাবাক খুলি উড়াইয়া দিমু!'

বলে তিনি মাথার ওপর এক রাউন্ড ফায়ারও করেন। শোরগোল পড়ে যায়। বেগতিক দেখে সেই সুযোগে ডাকাতরা পালিয়ে যায়। বাড়ির লনে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছিল। কে কে হালদারের রিভলভারের গুলি চাঁদোয়া ফুটো করে দিয়েছিল।

যাই হোক, সেই থেকে কর্নেল রসিকতা করে ওঁকে 'হালদারমশাই' বলতে শুরু করেছিলেন।...

এগারোটা নাগাদ ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'

তারপর প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাই কর্নেলের ড্রয়িংরুমে আবির্ভূত হলেন। তাঁর সঙ্গে একজন রুগ্‌ণ চেহারার প্রৌঢ় ভদ্রলোক এবং একজন যুবতী। ছিমছাম গড়ন এবং স্মার্ট হাবভাব। চেহারায় তীক্ষ্ণ লাবণ্য আছে।

হালদারমশাই আমাকে দেখে মুচকি হেসে বললেন, 'আরে! জয়ন্তবাবুও আছেন দেখছি! দ্যাখবেন মশায়! কাগজে য্যান কিছু ফাঁস করবেন না।' বলে তিনি কর্নেলের দিকে ঘুরলেন। 'কর্নেলস্যার! আলাপ করাইয়া দিই। ইনি মি. তপেশ মজুমদার। একটা প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি করতেন। রিটায়ার করছেন। আর এনার ডটার মিস শ্রীলেখা মজুমদার। বাবার কোম্পানিতে চাকরি করে। মিস মজুমদারই আমার ক্লায়েন্ট।'

কর্নেল বললেন, 'আপনারা বসুন।'...

রীতি অনুসারে ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। তারপর শ্রীলেখা হালদারমশাইয়ের নির্দেশে মুখ খুলল। তার মুখে ঘটনার যে বিবরণ শুনলুম, সংক্ষেপে তা এই :

এন্টালির ডা. সুরেশ সরকার রোডে শ্রীলেখা আর তার বাবা একটা ভাড়ার ফ্ল্যাটে দোতলায় থাকেন। শ্রীলেখার মা বছর দুই আগে মারা গিয়েছেন। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। ওই ফ্ল্যাটেই তার জন্ম। বাড়িটা তিনতলা। প্রতি তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। বাড়ির মালিক মহেন্দ্রনাথ রায় আগে দমদম এলাকায় থাকতেন। বছর পাঁচেক আগে দোতলার এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করে নিজে সেই ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। উচ্ছেদের ব্যাপারে বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা বরং খুশিই হয়েছিলেন। কারণ ওই পরিবারটি প্রতি রাত্রে মদ খেয়ে নাচগান হইহল্লা করত।

মহেন্দ্রনাথ তাঁর ফ্ল্যাটে একা থাকতেন। তাঁর লম্বাচওড়া তাগড়াই শরীর আর সায়েবি চালচলন। তাঁকে শ্রীলেখা প্রথম-প্রথম একটু এড়িয়ে থাকত। বিশেষ করে তাঁর ফ্ল্যাটে সঙ্গী ছিল একটা প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান। রাতের দিকে তাঁর ঘরে বন্ধুবান্ধব আসত এবং মদের আসরও বসত। তবে কোনো হইহল্লা ছিল না। ভাড়াটেদের কাছে তিনি 'রায়সায়েব' নামে পরিচিত ছিলেন। কারও সঙ্গে তাঁর অসদ্ভাব ছিল না।

মাঝে মাঝে রায়সায়েবের মেয়ে-জামাই এসে একবেলা কাটিয়ে যেত। ক্রমে তাঁর মেয়ে শর্বরীর সঙ্গে শ্রীলেখার আলাপ-পরিচয় এবং বন্ধুতা গড়ে ওঠে। এর

পর রায়সায়েবের সঙ্গেও শ্রীলেখার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রায়সায়েব শ্রীলেখাকে মেয়ের চেয়েও বেশি স্নেহ করতেন। কখনও তার কাছে চা খেতে চাইতেন। কখনও বলতেন, 'মা! এবেলা তোর হাতের রান্না খাব।'

গতবছর হঠাৎ মেয়ের বাড়ি গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়ে একটা নার্সিংহোমে ভর্তি হন তিনি। শর্বরীর কাছে ফোনে খবর পেয়ে শ্রীলেখা তাঁকে দেখতে গিয়েছিল। নার্সিংহোম থেকে সুস্থ হয়ে সরাসরি তিনি নিজের ফ্ল্যাটে চলে আসেন। শর্বরী একজন আয়া রেখে গিয়েছিল। কিছুদিন পরে সেই আয়া চলে যায়। তারপর রায়সায়েবের খোঁজখবর নিত শ্রীলেখা। কোনো হোটেল থেকে তাঁর খাবার আসত তিনবেলা। একদিন শ্রীলেখাকে ডেকে রায়সায়েব বলেন, 'জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে রে মা! আমি সেল্‌ফ-মেড ম্যান। পুরোনো গাড়ি বেচা-কেনার ব্যবসা করে প্রচুর কামিয়েছি। কিন্তু এই সত্তর বছর বয়সে বেশ বুঝে গেছি, সংসারে কেউ কারও আপন নয়। টাকার সঙ্গেই যত সম্পর্ক।'

শ্রীলেখা অবাক হয়ে যায়। কথায়-কথায় রায়সায়েব তাকে বলে ফেলেন, শর্বরী তাঁর নিজের মেয়ে নয়। তাঁর কোনো সন্তানাদি নেই। শর্বরীকে এক অনাথ আশ্রম থেকে পুষ্যি নিয়েছিলেন। এখন ক্রমশ তাঁর মনে সন্দেহ জেগেছে, শর্বরী আর তাঁর জামাই প্রদোষ তাঁকে স্লোপয়জন করে মেরে ফেলতে চায়। তারা দুজনে তাঁকে তাঁর সব সম্পত্তি আর টাকাকড়ি তাদের নামে উইল করে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। তাঁকে তারা এরকম পীড়াপীড়ি না করলেও তিনি অন্তত কিছু সম্পত্তি দিতেন। বাকিটা দিতেন সেই আশ্রমের নামে। কিন্তু তাদের আচরণে তিনি এমন ক্ষুব্ধ হয়েছেন যে, তাদের একটি কানাকড়িও দেবেন না।

গত মাসে এক সন্ধ্যায় শর্বরী আর প্রদোষ এলে শ্রীলেখা আড়ি পেতে শুনেছিল, রায়সায়েবকে ওরা প্রচণ্ড শাসাচ্ছে। কোথাকার একটা বাগানবাড়ি তাদের নামে লিখে দেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছে। পরদিন সকালে শ্রীলেখা দেখেছিল, রায়সায়েব তাঁর কুকুরটাকে দু'হাতে বুকের কাছে চেপে ধরে গাড়িতে তুলছেন। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে সে তার বাবার কাছে জানতে পারে, রায়সায়েবের কুকরটা মারা গেছে।

পরের ঘটনা অদ্ভুত। শর্বরী টেলিফোনে শ্রীলেখাকে হুমকি দিয়ে বলেছিল, তার বাবার সঙ্গে শ্রীলেখার অবৈধ সম্পর্কের কথা নাকি সে জানতে পেরেছে। শ্রীলেখা লজ্জায় দুঃখে অস্থির। সে আর রায়সাহেবের ঘরে যেত না। তিনি ডাকলেও এড়িয়ে যেত। তার বাবা তপেশবাবুই তাঁকে সঙ্গ দিতেন।

গত শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ ডোরবেল বাজে। তপেশবাবু পাড়ার একটা সমাজকল্যাণ সমিতির মিটিংয়ে গিয়েছিলেন। আইহোলে চোখ রেখে শ্রীলেখা দেখতে পায়, রায়সায়েব তাদের দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে দরজা খুলে বলে, 'কিছু দরকার আছে জ্যাঠামশাই?'

রায়সায়েব জোর করে ঘরে ঢুকে নিজেই দরজা এঁটে দেন। তাঁর হাতে ছড়ি এবং ব্রিফকেস ছিল। তিনি সোফায় বসে চাপা স্বরে বলেন, 'আমি সব জানি রে মা! হারামজাদি মেয়েটার এত সাহস! আমাকে আজ সকালে টেলিফোনে তোর সম্পর্কে অকথ্য যা খুশি বলছিল। ও নিয়ে মাথা ঘামাসনে। তুই আমার মেয়ে ছিলিস পূর্বজন্মে। এবার যা বলি শোন। এই ব্রিফকেসটা কোথাও লুকিয়ে রেখে দে। ঘুণাক্ষরে কাকেও যেন বলবিনে। এমন কি তোর বাবাকেও না।'

শ্রীলেখা বিমূঢ় হয়ে বলে, 'এতে কী আছে জ্যাঠামশাই?'

রায়সায়েবকে কেমন বিভ্রান্ত দেখাচ্ছিল। তিনি বলেন, 'যা-ই থাক; এটা তুই লুকিয়ে রাখ। কাল সকালে আমি এটা নিয়ে যাব।'

শ্রীলেখা জিজ্ঞেস করে, 'এতে টাকা আছে নাকি জ্যাঠামশাই?'

রায়সায়েব বলেন, 'হ্যাঁ। আছে।' তারপর উঠে দাঁড়ান। পা বাড়িয়ে বলেন, 'তোর বিছানার তলায় রাখবি মা! কেমন?'

শ্রীলেখা নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। সে বলে, 'কিন্তু আমার যে বড্ড ভয় করছে জ্যাঠামশাই!'

রায়সায়েব বলেন, 'আমার নিজেরই যে ভয় করছে। দ্যাখ মা! আমার কাছে লাইসেন্সড গান আছে। তবু রিস্ক নিতে সাহস পাচ্ছি না। লোকে আমাকে টাইগার রায় বলত। এখন আমি নখদন্তহীন। এই দ্যাখ না! সবসময় হাত দুটো কাঁপে। হারামজাদা-হারামজাদি কবে থেকে আমাকে স্লোপয়জন করে আসছিল, এতদিনে তার লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। আগের শরীর থাকলে মাত্র পাঁচ লাখ টাকা আমার ট্যাকেই গোঁজা থাকত।' বলে তিনি ছড়িতে ভর করে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে ফের বলেন, 'তিরিশ-চল্লিশ লাখের জায়গায় মাত্র ছয়। টলু ব্যাটাচ্ছেলে যদি আর এক লাখ নাও দিতে পারে, কিছু যায়-আসে না। পাঁচ দিয়েছে, ওতেই ডিডে সই করে দিয়েছি। ঠ্যালা সামলাতে হয়, টলু সামলাক। ওই দুই হারামজাদা-হারামজাদি কপাল চাপড়ে মরুক না! এতেই আমি খুশি হব।'

রায়সায়েব চলে যান। শ্রীলেখা ব্রিফকেসটা তার ঘরে ম্যাট্রেসের তলায় রেখে দেয়। সারারাত তার ঘুম হয়নি। গতকাল ভোরে উঠে অভ্যাসমতো তপেশবাবু পার্কে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন। সেইসময় সে দরজা খুলে লক্ষ্য করেছিলেন, রায়সায়েবের ফ্ল্যাটের দরজা একটু ফাঁক হয়ে আছে। তাদের ফ্ল্যাট এবং ওই ফ্ল্যাটটা মুখোমুখি। মাঝখানের ফ্ল্যাটে এক তামিল দম্পতি থাকেন। তাঁরা কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন। রায়সায়েবের ফ্ল্যাটের দরজার কাছে শ্রীলেখা নিছক কৌতূহলের বশেই গিয়েছিল। সে দেখতে পায়, দরজা ভেতর থেকে আটকানো নেই। তাই সে দরজা ঠেলে ডাকে, 'জ্যাঠামশাই!' কিন্তু সাড়া পায় না। তারপরই তার চোখে পড়ে, বসার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মধ্যে রায়সায়েব উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। পরনের রাতপোশাক মলমূত্রে নোংরা হয়ে আছে।

শ্রীলেখার ডাকাডাকিতে নিচের এবং ওপরের ফ্ল্যাটের লোকজন ছুটে আসেন। রায়সায়েবকে চিত করে শোয়ানো হয়। তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন। কিন্তু কথা বলতে পারছিলেন না। শিগগির পাড়ার সেই সমিতি থেকে অ্যাম্বুল্যান্স এনে তাঁকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। শ্রীলেখা নিচের তলার মনীশ পাত্রকে শর্বরীর ফোন নাম্বার দিয়েছিল। খবর পেয়ে শর্বরী ও প্রদোষ যখন হাসপাতালে আসে, তখন রায়সায়েব মারা গিয়েছেন।

কিন্তু এর পরের আরও সাংঘাতিক। শ্রীলেখা রায়সায়েবের ঘরে তাঁকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল। সেই সুযোগেই হয়তো ঘটনাটা ঘটে যায়। শ্রীলেখা তাদের ফ্ল্যাটে ফিরে তার বিছানার তলায় সেই ব্রিফকেসটা আর খুঁজে পায়নি। তার বাবা তখনও মর্নিংওয়াক থেকে ফেরেননি। তপেশবাবু মাঠে হাঁটাচলার পর একেবারে বাজার করে নিয়ে আটটা নাগাদ বাড়ি ফেরেন। তখনও আটটা বাজেনি। কাজেই তার বাবাকে কেমন করে সে সন্দেহ করবে? কেনই বা করবে? তবু সে তন্নতন্ন করে তাদের ফ্ল্যাটের ভেতর খুঁজে দেখে। কিন্তু ব্রিফকেসটার পাত্তা নেই।

তপেশবাবু ফিরে এলে অগত্যা তাঁকে ব্রিফকেসের কথা খুলে বলে শ্রীলেখা। এই ঘটনা পুলিশকে জানানো নিরাপদ নয়। তাই তপেশবাবু অনেক চিন্তাভাবনা করে হালদারমশাইকে টেলিফোন করেন। প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার তপেশবাবুর এক পুলিশ অফিসার আত্মীয়ের সূত্রে তাঁর পরিচিত। সেই আত্মীয় পুলিশ অফিসার রিটায়ার করে এখন চেতলায় আছেন।

শ্রীলেখা কথা শেষ হলে হালদারমশাই বললেন, 'এনার লগে ছয় বৎসর আগে আলাপ।'...

দুই

শ্রীলেখার কথা শুনতে শুনতে উত্তেজনা অনুভব করছিলুম। কারণ তার কথার সঙ্গে জয় মা তারা নার্সারির হারাধন মল্লিকের কথা টায়ে-টোয়ে মিলে যাচ্ছে। হালদারমশাই ঝটপট একটিপ নস্যি নিয়ে আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কর্নেল সেই সময় শ্রীলেখাকে বললেন, 'তুমি বলছি। রাগ কোরো না যেন।'

শ্রীলেখা বলল, 'রাগ করব কেন? হালদারজ্যাঠার কাছে আপনার পরিচয় পেয়েছি।'

'তোমাকে কিছু প্রশ্ন করতে চাই। আশা করি সঠিক উত্তর পাব।'

তপেশবাবু বললেন, 'আপনি আমাকেও প্রশ্ন করতে পারেন। টাকাভর্তি ব্রিফকেস হারানোটা আমার কাছে বড় কথা নয়। এটা আমাদের বাবা-মেয়ে দুজনকারই বিবেকের দায়।'

কর্নেল বললেন, 'আচ্ছা শ্রীলেখা, রায়সায়েবকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার পর কি তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা খোলা ছিল?'

শ্রীলেখা বলল, 'না। ওঁর শোবার ঘরে ঢুকে আমি বালিশের তলায় চাবির গোছা পেয়েছিলুম। সেই চাবি—'

'এক মিনিট। তুমি কি জানতে রায়সায়েব তাঁর ফ্ল্যাটের দরজার চাবি ওখানেই রাখতেন?'

'জানতুম। কারণ কত সময় লক্ষ্য করেছি, আমার সামনেই উনি বাইরে বেরুবেন বলে বেডরুম থেকে চাবি নিয়ে এলেন। বসার ঘরের ভেতর থেকে জানালার পর্দার ফাঁকে ওঁর বেডরুম দেখা যায়।'

'তো তুমি ওঁর ফ্ল্যাটে তালা এঁটে দিয়ে চাবির গোছা নিজের কাছে রেখেছিলে?'

'হ্যাঁ। তারপর বাবা ফিরে এলে বাবাকে ওটা দিয়েছিলুম।'

তপেশবাবু বললেন, 'চাবি নিয়ে আমি তখনই হাসপাতালে রায়সাহেবকে দেখতে গিয়েছিলুম। ঘণ্টা দেড়েক পরে ওঁর মেয়ে-জামাই এল। তখন ওঁর মেয়েকে চাবি দিলুম। রায়সায়েব মারা গেছেন। দশটা-সওয়া দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরে শ্রীলেখাকে খবরটা দিলুম।'

শ্রীলেখা বলল, 'রায়সায়েবের মৃত্যু খবর পেয়ে সত্যি বলতে কী, আমার দুর্ভাবনাটা কেটে গিয়েছিল। কারণ আর তো উনি ব্রিফকেস চাইতে আসবেন না। যাই হোক, তখনই বাবাকে ব্রিফকেসের ঘটনাটা বললুম। বাবা প্রথমে আমাকে খুব বকাবকি করলেন। কেন আমি টাকাভর্তি ব্রিফকেস নিয়েছিলুম? নিয়েছিলুম যদি, কেন রায়সায়েবকে ওই অবস্থায় দেখার পর ফ্ল্যাটের দরজায় তালা বন্ধ করে আসিনি?'

তপেশবাবু বললেন, 'বড্ড বোকামি করেছিল শ্রীলেখা।'

কর্নেল শ্রীলেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রায়সায়েবের মেয়ে বা জামাই কাল কখন ওঁর ফ্ল্যাটে এসেছিল?'

শ্রীলেখা বলল, 'শর্বরী হাসপাতাল থেকে বাবা আসার কিছুক্ষণ পরেই এসেছিল। আমি তো ওর সঙ্গে আর কথা বলতুম না। বাবা বলতেন। ব্রিফকেসের ঘটনা শোনার পর বাবা আমাকে বকাবকি করে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

তপেশবাবু বললেন, 'শর্বরী তখন তার বাবার ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। আমি বাইরে থেকে তাকে ডাকলুম। শর্বরী দরজার ফাঁকে মুখ বের করে আমাকে হঠাৎ রুক্ষ মেজাজে বলে উঠল, বাবার একটা লাইসেন্সড রিভলভার ছিল। পাচ্ছি না। নিশ্চয় ওটা আপনার মেয়ে হাতিয়েছে। আপনার মেয়েকে বলুন, এক্ষুনি ওটা ফেরত দিয়ে যাক। না দিলে আমি পুলিশকে জানাব।'

শ্রীলেখা বলল, 'কথাটা আমার কানে গিয়েছিল। বেরিয়ে গিয়ে বললুম, তোমার বাবার রিভলভার যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, পুলিশকে জানাতে পারো। শর্বরী আমাকে যাচ্ছেতাই বলতে শুরু করল। অন্য ফ্ল্যাটের অনেকে এসে শর্বরীকেই বকাবকি করলেন। বাবার প্রতি যদি এত মায়ামমতা, তাহলে এখানে একা এভাবে

ফেলে রেখেছিলে কেন? শর্বরী হুমকি দিয়ে বলল, এই বাড়ির মালিক এখন আমি। সব্বাইকে উচ্ছেদের নোটিশ দেব।'

'মেয়েলি কলহ আর কী!' তপেশবাবু বললেন। 'আজ সকালে দেখে এলুম, শর্বরী আর প্রদোষ রায়সায়েবের ফ্ল্যাটে এল। সঙ্গে এক কালো কোটপরা ভদ্রলোককে দেখলুম। নিশ্চয় কোনো ল-ইয়ার।'

কর্নেল শ্রীলেখাকে বললেন, 'রায়সায়েবের রিভলভার হারানো সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

শ্রীলেখা বলল, 'আমি রায়জ্যাঠামশাইয়ের রিভলভার দেখিনি। শুক্রবার রাত্রে ওঁর মুখেই যা শুনেছি।'

'শনিবার সকালে বেডরুমে ওঁর বালিশের তলায় বা বিছানায় কোনো আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না?'

শ্রীলেখা মাথা নাড়ল। বলল, 'না। তবে আমি অত খুঁটিয়ে কিছু লক্ষ্য করিনি।'

'শনিবার ভোরে তুমি যখন রায়সায়েবকে ওই অবস্থায় দেখতে পেয়েছিলে, তখন কি তোমার মনে হয়নি তাঁর ফ্ল্যাটের দরজা কেন খোলা আছে?'

শ্রীলেখা একটু চমকে উঠল যেন। বলল, 'আপনি ঠিক বলেছেন। শুধু আমার মনে নয়, বাবা বা বাড়ির কারও মনে এ প্রশ্ন এখনও ওঠেনি। অথচ—সত্যিই তো! এটা আমার মনে ওঠা উচিত ছিল। আসলে এমনও হতে পারে—ধরেই নিয়েছিলুম উনি খুব ভোরে দরজা খুলেছিলেন। মর্নিংওয়াকের অভ্যাস রায়জ্যাঠামশাইয়েরও ছিল। তবে প্রত্যেকদিন নয়। অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা যখন ছিল, তখন কুকুরটাকে সঙ্গে নিয়েই বেরুতেন অবশ্য।'

তপেশবাবু বললেন, 'রায়সায়েবের দরজা খোলা ছিল, এই পয়েন্টটা আসলে আমাদের কারও কাছে তত ইমপর্ট্যান্ট বলে মনে হয়নি।'

এতক্ষণে প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদার মশাই বললেন, 'কর্নেলস্যার! রায়সায়েব মরছেন, এটা আমাগো কেস না। কেস হইল গিয়া—'

'ব্রিফকেস!' বলে কর্নেল হেসে উঠলেন।

গোয়েন্দাপ্রবর সায় দিলেন। 'হঃ! ব্রিফকেস। আমার সন্দেহ, শনিবার রাত্রে ওই বাড়িরই কেউ রায়সায়েবেরে তপেশবাবুর ফ্ল্যাটে ব্রিফকেস হাতে লইয়া ঢুকতে দেখছিল। তারপর ওনারে ব্রিফকেস ছাড়া বাইরাইতে দেখছিল। আমি বাড়ির সব ফ্ল্যাটের লোকজনের লিস্ট করছি।'

বলে তিনি তাঁর বুকপকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করে কর্নেলকে দিলেন। কর্নেল বললেন, 'বা! এটা একটা কাজের মতো কাজ করেছেন হালদারমশাই!'

তপেশবাবু চাপাস্বরে বললেন, 'নিচের তলার একটা ফ্ল্যাটে থাকেন গণেশ নাগ। একা থাকেন। রায়সায়েবের সঙ্গে খুব ভাব তাঁর। বাড়ির কেয়ারটেকারের

দায়িত্ব গণেশবাবুকেই দিয়েছিলেন রায়সায়েব। কিন্তু গণেশবাবু শুক্রবার রাত্রের ট্রেনে নাকি বর্ধমান গিয়েছেন। পাম্পে জল তোলার দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছেন তাঁর পাশের ফ্ল্যাটের হরিহরণবাবুকে। তিনি অবশ্য গণেশবাবুর মতো নিজে পাম্প চালাচ্ছেন না। তাঁর কাজের লোক চালাচ্ছে।'

কর্নেল বললেন, 'গণেশবাবুকে সন্দেহের কোনো কারণ আছে কি?'

'আছে স্যার! মি. হালদারকে কথাটা বলেছি।'

হালদারমশাই বললেন, 'গণেশ নাগ সাট্টাবাজ। সাট্টাডন কইতে পারেন। জানি না, তারে রায়সাহেব অত পাত্তা দিতেন ক্যান?'

কর্নেল লিস্টে চোখ বুলিয়ে বললেন, 'তিনতলায় ন'নম্বর ফ্ল্যাটে থাকেন ঘনশ্যাম নন্দী। তাঁর নামের পাশেল লাল কালিতে টিক মেরেছেন কেন হালদারমশাই?'

গোয়েন্দামশাই বলার আগেই শ্রীলেখা বলে উঠল, 'আমার সন্দেহ কিন্তু ঘনশ্যামবাবুর ওপরই। বাবা অবশ্য গণেশবাবুকে সন্দেহ করেছেন। ঘনশ্যামবাবুর মেয়ে রেখার কাছে কিছুদিন আগে শুনেছিলুম, ওর বাবার যে গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ আছে, সেই জায়গাটা এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক কিনে নিয়েছেন ল্যান্ডলর্ডের কাছে। ল্যান্ডলর্ড ভাড়া নেওয়া বন্ধ করেছেন। তাই ঘনশ্যামবাবু রেন্টকন্ট্রোলারের কাছে ভাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু আজকাল যা অবস্থা, মারোয়াড়ি ভদ্রলোক আর ল্যান্ডলর্ড পাড়ার মস্তান লাগিয়ে যে-কোনো সময় উচ্ছেদ করতে পারেন। তাই ঘনশ্যামবাবু নতুন জায়গা খুঁজছেন। রেখা বলছিল, দরগা রোডের ওদিকে একটা গ্যারেজ বিক্রি হচ্ছে। কিন্তু দশ লাখ টাকা দর হেঁকেছে। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক আর ল্যান্ডলর্ডের সঙ্গে রায়সায়েব নাকি কথা বলেছেন। রায়সায়েবের কথায় মারোয়াড়ি ভদ্রলোক লাখ পাঁচেক দিয়ে রফা করতে চান। কাজেই—'

শ্রীলেখার কথার ওপর আমি বলে ফেললুম, 'ঘনশ্যামবাবুর গ্যারেজের নাম কি শ্রীহরি অটোমোবাইলস?'

কর্নেল আমার দিকে কটমটিয়ে তাকালেন। শ্রীলেখা বলল, 'আপনি জানেন?'

অগত্যা বলতে হলো, 'হ্যাঁ। মানে, একবার ওখানে আমার গাড়ির কাজ করিয়েছিলুম।'

শ্রীলেখা কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছি, ঘনশ্যামবাবু দু'বেলা রায়সায়েবের ঘরে বসে কথা বলছেন। দুজনে একসঙ্গে বেরুচ্ছেন। কাজেই আমার ধারণা, রায়সায়েব সম্ভবত ঘনশ্যামবাবুকে বলে থাকবেন, বাগানবাড়ি বিক্রি করে টাকা পেলে তাঁকে ধার দেবেন। কিংবা পার্টনার হয়ে দরগা রোডের গ্যারেজটা কিনে নেবেন।'

কর্নেল বললেন, 'তুমি বুদ্ধিমতী শ্রীলেখা!'

প্রাইভেট ডিটেকটিভের গোঁফ উত্তেজনায় তিরতির করে কাঁপছিল। বললেন,

'নোটবইয়ে ঘনশ্যাম নন্দীর গ্যারেজের ঠিকানা রাখছি। শিগগির সেখানে যাইয়া ওত পাতব।'

কর্নেল ঘড়ি দেখে বললেন, 'ঠিক আছে। হালদারমশাই যখন ব্যাপারটা হাতে নিয়েছেন, একটা কিনারা করে ফেলবেন। আপাতত শ্রীলেখার কাছে শর্বরী ও প্রদোষের ঠিকানাটা জানা দরকার। হালদারমশাই! ঠিকানাটা লিখে নিন।'

শ্রীলেখা বলল, 'এগজ্যাক্ট ঠিকানা আমি জানি না। শুধু এটুকু জানি রায়সায়েবের দমদমের বাড়িতে ওরা থাকে। নাগের বাজার এরিয়া, না কোথায়, মনে পড়ছে না।'

তপেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ওরা এখন তো আমাদের ওখানেই আছে। আমার সঙ্গে প্রদোষের কোনো ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। আমি সুযোগমতো ওদের দমদমের ঠিকানা জোগাড় করে মি. হালদারকে দেব।'

শ্রীলেখাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, 'দেখুন কর্নেলসায়েব! আপনি যেন কখনও ভাববেন না টাকার লোভে আমি বা আমার বাবা এই প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোকের সাহায্যে নিয়েছি। রায়জ্যাঠামশাইয়ের টাকা যদি উদ্ধার করা যায়, তা হলে সেই টাকা আপনার নির্দেশমতো কোনো আশ্রম বা ওয়েলফেয়ার সোসাইটিতে দান করব। আর— টাকা যদি উদ্ধার না করাও যায়, কে আমার ঘর থেকে তা চুরি করল, সেটা জানতে পারলেও আমি তৃপ্তি পাব।'

কর্নেল হাসলেন। 'তাকে শাস্তি দেবে না?'

'সম্ভব হলে দেব। না হলে আপনারা তো আছেন। পারবেন না তাকে শাস্তি দিতে?'

তপেশ মজুমদার মেয়ের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'ও সব কথা পরে। আগে চোর ধরা পড়ুক। তবে না শাস্তির প্রশ্ন? মিঃ হালদার! আপনি কি এখন কর্নেলসায়েবের কাছে থাকবেন?'

'থাকব। আপনারা যান গিয়া। দরকারমতো টেলিফোন করবেন।' বলে হালদারমশাই নস্যির কৌটো বের করলেন।...

বাবা-মেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর বললুম, 'আশ্চর্য ব্যাপার! শ্রীলেখার চোখে জল বেরিয়ে গেল দেখলুম।'

হালদারমশাই বললেন, 'মাইয়াডা বড় তেজি। বোঝলেন না? ভ্যানিটিতে লাগছে।'

কর্নেল আবার একটা চুরুট ধরালেন। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'হালদারমশাই নিশ্চয় আপনার ন্যায্য ফি-র কথা ক্লায়েন্টকে বলেছেন এবং অ্যাডভান্সও নিয়েছেন?'

গোয়েন্দাপ্রবর জিভ কেটে মাথা নেড়ে বললেন, 'তপেশবাবুর মাসতুতো ভাই বিভূতি সি আই ডি-তে আমার কলিগ ছিল। বুজম ফ্রেন্ড কইতে পারেন। ফিয়ের

কথা কই নাই। শ্রীলেখা কইছিল, কত লাগবে। আমি কইয়া দিচ্ছি, ফিয়ের কথা পরে। আগে পাওখান বাড়াইয়া দেখি জল কতটা ডিপ।'

'জল সত্যিই ডিপ হালদারমশাই! আপনি আপনার প্ল্যানমতো ঘনশ্যাম নন্দীর শ্রীহরি অটোমোবাইলসে গিয়ে ওত পাতুন।'

বললুম, 'বরং ছদ্মবেশে গিয়ে গ্যারাজের আশেপাশে ঘোরাঘুরি করুন। গোবরা এরিয়ার ফকির সেজে যাওয়াই ভালো।'

হালদারমশাই খি-খি করে হেসে উঠলেন। 'তা মন্দ কন নাই!'

এইসময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিয়ে বললেন, '...বলুন মল্লিকমশাই!... বলে কী! ভূতুড়ে বাড়ি? ...কী সর্বনাশ!...না, না। ঠিক করেছেন। ...বলুন। লিখে নিচ্ছি।' বলে কর্নেল টেবিলের ওপর প্যাডে কিছু লিখে নিলেন। 'ঠিক আছে। ছাড়ছি। পরে আপনার নার্সারিতে যাব।...হ্যাঁ। আগে খবর দিয়ে যাব। থ্যাংকস।' কর্নেল রিসিভার রেখে কাগজটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে ড্রয়ারে ঢোকালেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'মল্লিকমশাই কী বললেন? বাগানবাড়িটা ভূতুড়ে?'

হালদারমশাই ব্যগ্রভাবে বললেন, 'বাগানবাড়ি? রায়সাহেবের বাগানবাড়ি নাকি?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'তা জানি না। জয় মা তারা নার্সারির হারাধন মল্লিককে আপনি চেনেন না। ওঁর নার্সারি থেকে মাঝে মাঝে ক্যাকটাস উপহার পাই। ভদ্রলোক নার্সারির এরিয়া বাড়াতে একটা বাগানবাড়ি কিনতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু আজ বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছেন, ওখানে ভূতের অত্যাচারে কেউ বাস করতে পারে না।'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ বাঁকা মুখে বললেন, 'ভূতটুত বোগাস! চৌতিরিশ বৎসর পুলিশে চাকরি করছি। কত বনবাদাড় শ্মশান কবরস্তানে অন্ধকার রাত্রে ঘুরছি। কর্নেলস্যার! কী নার্সারি কইলেন য্যান—তার প্রোপাইটারেরে আমার নাম ঠিকানা দিলেন না ক্যান? আমি ভূত ভাগাইয়া ছাড়তাম।'

'পরে মল্লিকমশাইয়ের কেসটা নেবেন। আগে এই কেসটা নিয়ে লড়ে যান।'

হালদারমশাই হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন, 'আমার একটা খটকা বাধছে।'

'বলুন!'

'শ্রীলেখা আমারে যা-যা কইছিল, আপনারেও তা-ই কইল। কিন্তু এমন যদি হয়, ধরেন—সে কাইল ভোরে দরজা খোলা দেইখ্যা রায়সায়েবের ঘরে ঢুকছিল। তারপর ওনার বেডরুমে গিয়া চাবি লইছে। তারপর আলমারি খুইলা ব্রিফকেস চুরি করছে। নিজের ঘরে সেটা রাইখা তারপর বাড়ির লোকজনের ডাকছে। এদিকে কেউ তার কীর্তি লক্ষ্য কইরা সুযোগমতন চোরের ওপর বাটপারি করছে।'

'আপনার এই থিয়োরিও মজবুত।'

আমি বললুম, 'কিন্তু হালদারমশাই, তা হলে সে চেপে না গিয়ে তার বাবাকে বলে আপনার সাহায্য নিল কেন?'

গোয়েন্দাপ্রবর গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিলেন। ফিক করে হেসে বললেন, 'জয়ন্তবাবু শ্রীলেখার প্রেমে পড়ছেন য্যান! হঃ! চেহারাখান সেইরকমই।'

বললুম, 'ভ্যাট! কী যে বলেন!'

কর্নেল সহাস্যে বললেন, 'হালদারমশাই জয়ন্তের আঁতে ঘা দিয়েছেন। এটা যৌবনের ধর্ম! জয়ন্তের কোনো দোষ নেই। তবে বাস্তব জগৎ বড় কদর্য। সৌন্দর্যের আড়ালে কদর্যতা ওত পেতে থাকে।'

ক্ষুব্ধ হয়ে বললুম, 'কী আশ্চর্য! আমি যে পয়েন্টটা তুলেছি, তার পিছনে যুক্তি নেই বুঝি?'

'আছে। কিন্তু চিন্তা করো ডার্লিং! প্রায় পড়ে পাওয়া পাঁচ লাখ টাকা ঘর থেকে বাটপাড়ি হয়ে গেল বিশেষ করে শ্রীলেখার মতো স্মার্ট আধুনি মেয়ে চুপচাপ মেনে নেবে কোন্ যুক্তিতে? সে এক্ষেত্রে প্রতিশোধে মত্ত হয়ে উঠবেই।'

হালদারমশাই ঘড়ি দেখে বললেন, 'কী ক্কাণ্ড! প্রায় সাড়ে বারোটা বাজে। আমি যাই গিয়া কর্নেলস্যার! আপনার লগে যোগাযোগ রাখব। জয়ন্তবাবু! আমার কথায় রাগ করছেন না তো? মশয়! লাইফে থ্রিল যেমন ভালোবাসি, তেমনই একটুকখান জোকও দরকার মনে করি। জোক করছিলাম।'

বলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ সবেগে বেরিয়ে গেলেন। আমি ওঁর কথা বলার ভঙ্গিতে হেসে ফেলেছিলুম। কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত! সত্যি বলছি, তুমি সাবধান। শ্রীলেখা বা তোমার মনের কথা বলতে পারছি না। তবে তপেশবাবু মাঝে মাঝে তোমার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভদ্রলোক তাঁর জামাই হিসেবে তুমি উপযুক্ত কি না, তা-ই সম্ভবত ভাবছিলেন।'

বেগতিক দেখে বললুম, 'উঠি। প্রায় দশ কিলোমিটার ড্রাইভ করে বাড়ি ফিরতে হবে।'

কর্নেল চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'শাট আপ! আমার সঙ্গে তুমি লাঞ্চ খাবে। তারপর দুজনে মধ্যমগ্রাম এরিয়ার রায়সায়েবের সেই ভুতুড়ে বাগানবাড়িতে যাব। মল্লিকমশাই শ্রীহরি অটোমোবাইলসে গিয়েছিলেন। মালিকের নাম ঘনশ্যাম নন্দীই বটে। তাঁর কাছে শুনেছেন, বাগানবাড়িটা ভুতুড়ে বলে বিক্রি হচ্ছিল না। সম্প্রতি মালিক কাকে বেচে দিয়েছেন। তারপর নাকি বাগানবাড়ির ভূতটা খাপ্পা হয়ে তাঁকে মেরে ফেলেছে। এসব শুনে মল্লিকমশাই ঘনশ্যামবাবুকে বলেছেন, মালিকের সঙ্গে তাঁর পাকা কথা হয়েছিল। ভাগ্যিস অ্যাডভান্স করে ফেলেননি। যাক গে! তুমি ডিভানে গড়িয়ে নাও কিছুক্ষণ। আমি একটা জরুরি টেলিফোন করি।'...

দেড়টার মধ্যে লাঞ্চ সেরে নিয়ে দুটো নাগাদ আমরা বেরিয়েছিলুম। ইস্টার্ন মেট্রোপলিটান বাইপাস হয়ে ভি আই পি রোড। তারপর যশোর রোড ধরে

মধ্যমগ্রামের চৌরাস্তায় পৌঁছুতে প্রায় সওয়া তিনটে বেজেছিল। বাঁদিকে আমাকে গাড়ি দাঁড় করাতে বলেছিলেন কর্নেল।

একটু পরেই হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে এলেন একজন তাগড়াই গড়নের মধ্যবয়সি ভদ্রলোক। পরনে জ্যাকেট এবং জিনস। মুখে পাকানো কাঁচাপাকা গোঁফ। তিনি নমস্কার করে কর্নেলকে বললেন, 'আমাকে চিনতে পারছেন তো স্যার? আমি প্রশান্ত ব্যানার্জি। বড়বাবু আমাকে বললেন, আপনি তিনটের মধ্যে আসছেন।'

কর্নেল বললেন, 'যাক গে! তোমাকে পেয়ে ভালো হলো প্রশান্ত! ব্যাকসিটে বসো। আমার এই তরুণ বন্ধুর পরিচয় তোমাকে আশা করি দিতে হবে না।'

প্রশান্ত ব্যানার্জি যে পুলিশ অফিসার, তা তখনই বুঝে গেছি। তাঁর নির্দেশে কিছুটা এগিয়ে একটা সংকীর্ণ রাস্তায় মোড় নিতে হলো। তারপর ক্রমশ বসতি এলাকা ছাড়িয়ে আবার মোড় নিয়ে একটা মোরামবিছানো রাস্তায় পৌঁছুলুম। দু'দিকে পাকা ধানের জমি। মোরাম রাস্তাটা ধনুকের মতো বাঁক নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। একটা বাঁশঝাড় বাঁদিকে রেখে ডাইনে একটু এগিয়ে যাওয়ার পর প্রশান্তবাবু বললেন, 'এসে গেছি। গেটের সামনে দাঁড় করান জয়ন্তবাবু।'

দেখলুম, একটা ঝিলের ধারে পাঁচিলঘেরা একটা বাগান। বাগানের ফাঁকে পুকুর দেখা যাচ্ছিল। পুকুরের পাড়ে একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। গেটের একপাশে ফলকে লেখা আছে 'নন্দনকানন'।

প্রশান্তবাবুর ডাক শুনে একজন কালো কুচকুচে এবং বেঁটে লোক এসে গেটের ওধারে দাঁড়াল। তার পরনে খয়েরি রঙের ফুলপ্যান্ট, গায়ে একটা নীল ফুলহাতা সোয়েটার। মাথার চুল চুড়োবাঁধা। মুখে গোঁফদাড়ি। চোখ দুটো লাল। তার এক হাতে লাঠি, অন্য হাতে টর্চ। এই তো আস্ত ভূত!

দেখলুম প্রশান্ত ব্যানার্জিকে সে চেনে। করজোড়ে প্রণাম করে সে বলল, 'খবর খারাপ ছোটবাবু! রায়সায়েব মারা গিয়েছেন। সকালে দমদম থেকে ওনার জামাই লোক দিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন। এদিকে আরেক ঝামেলা! রায়সায়েবের এক বন্ধু দুপুরবেলা মোটরসাইকেলে চেপে এসে হাজির। তিনি নাকি এই বাগানবাড়ি কিনেছেন।'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'গেটের তালা খোলো রঘু! তারপর তোমার কথা শুনব।'

রঘু তালা খুলে গেট দুটো টেনে সরাল। প্রশান্তবাবুর ইঙ্গিতে গাড়ি ভেতরে নিয়ে গেলুম। তিনি বললেন, 'গাড়ি একেবারে বাড়ির সামনে নিয়ে চলুন। আমি রঘুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে যাচ্ছি।'

বাগানের পর বিশৃঙ্খল ফুলের ঝোপঝাড় পেরিয়ে পুকুরের পশ্চিমপাড়ে বাড়ির লনে পৌঁছুলুম। বাড়িটা পূর্বমুখী। চারদিকে উঁচু খোলা বারান্দা। সামনে কয়েক পা এগোলে পুকুরের শানবাঁধানো ঘাট। স্বচ্ছ জলে এখনই ছায়া থমথম করছে। পাখিদের তুমুল চ্যাঁচামেচি চলেছে। প্রকৃতিপ্রেমিকদের পক্ষে হয়তো জায়গাটা নন্দনকানন। কিন্তু আমার কেন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল।

কর্নেল পুকুরের ঘাটের মাথায় দাঁড়িয়ে বাইনোকুলারে তিনদিক দেখে নিলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, 'রঘু নিশ্চয় ভূত বশকরা মন্ত্র জানে। কেমন তান্ত্রিকের মতো চেহারা। তাই না?'

বললুম, 'লোকটাকে রাতবিরেতে হঠাৎ দেখলে ভূত ভেবে অনেকে ভিরমি খাবে!'

কথা বলতে বলতে ততক্ষণে প্রশান্তবাবু এসে গিয়েছেন। রঘু এক লাফে বারান্দায় উঠে গেল। তারপর একটা ঘরের দরজা খুলে একটা-একটা করে তিনটে চেয়ার এনে দিল। আমরা বসলুম।

রঘু বলল, 'ছোটবাবু! সায়েবরা এসেছেন। আমি চায়ের জোগাড় করি।'

প্রশান্তবাবু বললেন, 'কর্নেলসায়েব! আপনারা চা খাবেন নিশ্চয়?'

কর্নেল বললেন, 'থাক। বেশিক্ষণ বসব না। রঘুর সঙ্গে দুটো কথাবার্তা বলে চলে যাব।'

রঘু আমাদের সামনে ঘাসের ওপর বসল। তারপর বলল, 'মাঠাকরুন বেঁচে থাকতে এই বাগানবাড়ির কী রূপ ছিল আর কী রূপ এখন হয়েছে। আমি অত খাটতে পারিনে। বয়স হয়েছে। খেটেই বা কী করব? রায়সায়েব আগে প্রায়ই বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসতেন বছর দুই হলো, আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। মাঝে মাঝে দিদি-জামাইবাবু আসে। তবে রাত-বিরেতে তারা থাকতে চায় না। আসলে খুলে বলি সার, ভূতুড়ে বলেই রায়সায়েব এ বাড়ি বিক্রি করতে পারেননি।'

কর্নেল বললেন, 'রায়সায়েব তাঁর কোন বন্ধুকে এই বাগানবাড়ি বেচেছেন, তাঁকে তুমি চেনো?'

'হ্যাঁ সার! চিনব না কেন? রাজেনবাবু তো মধ্যমগ্রামেরই লোক। পরে কলকাতা চলে গিয়েছিলেন। রাজেনবাবুই রায়-সায়েবকে মাঝে মাঝে এখানে টেনে আনতেন।' এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিয়ে রঘু চাপা স্বরে ফের বলল, 'ওই দেখুন মন্দির ভেঙে জঙ্গল গজিয়েছে। দেবতার অভিশাপ স্যার! সতীলক্ষ্মী গিন্নিমা মনের দুঃখে সুইসাইড করেছিলেন। মরা মানুষ। তার ওপর মনিব। রায়সায়েবের নিন্দে করব না। এই বাড়িতে বাইজির আসর বসাতেন। বেশি কী বলব?'

'আচ্ছা রঘু! এই বাড়িতে নাকি দিনদুপুরেও ভূতের উপদ্রব হয়?'

রঘু মাথা নেড়ে বলল, 'আজ্ঞে স্যার! কথাটা মিথ্যে নয়। মহাগুরু ধরেছিলুম। তাঁর দয়ায় আমার কোনো ক্ষতি হয় না। রাতবিরেতে পুকুরের জলে কতরকম শব্দ শুনি। বাগানে কে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে। কখনও বাড়ির ছাদে ঢিল পড়ে। দিনদুপুরেও রেহাই নেই সার! তবে ওই যে বললুম, আমার গুরুর কৃপা। জোরে মন্ত্র পড়ি। অমনি সব থেমে যায়। রায়সায়েবের যে বন্ধু এ বাড়ি কিনেছেন, তিনি সব জেনেশুনেই কিনেছেন।'

প্রশান্তবাবু হাসি চেপে কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ আমাদের পিছনে কোনো

ঘরের ভেতর থেকে একটা চাপা তীক্ষ্ণ গোঙানির শব্দ শোনা গেল। রঘু লাফিয়ে উঠে অঙ্গভঙ্গি করে মন্ত্র পড়তে পড়তে বারান্দার দিকে গেল। গোঙানির থেমে গেল একটু পরে। কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীরমুখে বললেন, 'প্রশান্ত! এখানে আর নয়। চলো! ফেরা যাক।'

প্রশান্তবাবু খুব অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু কর্নেল তখন গাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছেন।...

তিন

গাড়ি লক করা ছিল না। কর্নেল সামনের সিটে বসে পড়লেন। প্রশান্তবাবু আমার সঙ্গে এসে ব্যাকসিটে বসলেন। আস্তে বললেন, 'ব্যাপার কী কর্নেলসায়েব?'

কর্নেল তেমনই গম্ভীরমুখে বললেন, 'আমরা আরও কিছুক্ষণ বসলে আরও বিদঘুটে কিছু ঘটতে পারে। কাজেই কেটে পড়াই উচিত।'

প্রশান্তবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'কী আশ্চর্য! ওটা কোনো রোগা কুকুরের ডাক ছাড়া কিছু নয়। রঘুর একটা কুকুর ছিল। হয়তো সেটাই গোঙাচ্ছিল। আপনি রঘুকে তো চেনেন না। আমি ভালোই চিনি! ব্যাপারটা আপনাকে বলতে আপত্তি নেই।'

কর্নেল বললেন, 'চলো! যেতে-যেতে শুনব।'

গাড়ি স্টার্ট দিয়েছি, এমন সময় রঘু এসে গেল। গাড়ির পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'আপনারা এইটুকুতেই ভয় পেয়ে চলে যাচ্ছেন সার? এই ভূতুড়ে বাগানবাড়িতে একা থাকি। কথা বলার মানুষ পাইনে। আরও কিছুক্ষণ থাকলে টের পেতেন আমি কী অবস্থায় এখানে থাকি।'

প্রশান্তবাবু হাসি চেপে বললেন, 'সায়েব সেজন্যেই কেটে পড়ছেন রঘু!'

রঘু হেসে অস্থির। বলল, 'আহা! আমি থাকতে ভূতপেরেতের বাবার সাধ্যি নেই—'

হঠাৎ সে চুপ করে গেল এবং পিছনের দিকে তাকাল। আমি আস্তে গাড়ি ড্রাইভ করছিলুম। তার হঠাৎ চুপ করে যাওয়ার কারণ তখনই বুঝতে পারলুম। বাড়ির দিকে থেকে আবার সেই তীক্ষ্ণ গোঙানি শোনো যাচ্ছিল।

প্রশান্তবাবু বললেন, 'জয়ন্তবাবু! প্লিজ একটু থামুন! ভূতের নিকুচি করেছে।'

গাড়ি দাঁড় করালুম বাগানের ভেতর। শীতের সূর্য ততক্ষণে গাছপালার আড়ালে নেমে গিয়েছে। বাগানের ভেতর ছায়া গাঢ় হয়েছে। প্রশান্তবাবু গাড়ি থেকে নেমে পুলিশের মূর্তি ধরলেন। রঘুর সোয়েটারের কলার ধরে ধমক দিয়ে বললেন, 'এই ব্যাটা রোঘো! চল! তোর কুকুরটার অবস্থা দেখি। কুকুরটার নিশ্চয় কিছু হয়েছে। তাই গোঙাচ্ছে।'

রঘু কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, 'না স্যার! আমার সেই কুকুরটা গত সপ্তায় মারা গিয়েছে। আপনি সার্চ করবেন তো চলুন!'

প্রশান্তবাবু প্যান্টের পকেট থেকে তাঁর সার্ভিস রিভলভার বের করে রঘুর টর্চটা কেড়ে নিলেন। তারপর বললেন, 'কর্নেলসায়েব! এক মিনিট! আমি আসছি রোঘো! চল! সব ঘরের তালা খুলে আমাকে দেখাবি! আগে তোর ঘরে ঢুকব।'

উনি রঘুকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন। কর্নেল বললেন, 'পুলিশের খেয়াল! চলো জয়ন্ত! আমরা গেটের কাছে খোলা জায়গায় গিয়ে অপেক্ষা করি। রঘু গেটে তালা আটকে রেখেছে।'

গেটের কাছে পৌঁছে আমি গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ালুম। কর্নেল গাড়িতেই বসে রইলেন। এখান থেকে গাছপালা-ঝোপঝাড়ের ফাঁকে একতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল। দেখলুম, প্রশান্তবাবু রঘুর সঙ্গে একটা ঘরে ঢুকলেন। তারপর সেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল। বললুম, 'বাগানবাড়িতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা আছে দেখছি।'

কর্নেল চুরুট ধরাচ্ছিলেন। ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'নাঃ! তুমি কী করে যে সাংবাদিক হলে আজও বুঝতে পারলুম না। তোমাকে বরাবর বলে আসছি, খাঁটি সাংবাদিক হতে হলে প্রথমে দরকার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের স্বভাব।'

'কথাটা বেজায় বাসি কর্নেল! আসলে আমি বাগানবাড়িটার পরিবেশ লক্ষ্য করছিলুম।'

'তোমার চোখে পড়া উচিত ছিল বারান্দার মাথায় কভার্ড ল্যাম্প আছে আর ওই দ্যাখো, বাড়ির পশ্চিম দিক থেকে ইলেকট্রিক লাইন এসেছে। বাইরে কাঠের পোলটাও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।'

প্রশান্তবাবু ফিরে এলেন মিনিট দশেক পরে। রঘু তাঁর পিছনে কথা বলতে বলতে আসছিল। গেট খুলে দিয়ে হাসিমুখে বলল, 'ছোটবাবু সব ঘর সার্চ করলেন। বাড়ির পেছনেও খুঁজলেন। কুকুর থাকলে তো?'

প্রশান্তবাবু তাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'রোঘো! তোকে আবার সাবধান করে যাচ্ছি। গাঁজার আসর বসাবিনে। গাঁজার আসরে নেলোর কোনো শাগরেদ ঢুকে তোর গলা কেটে পুকুরে ফেলে দেবে। তারপর কী করবে জানিস? যা-সব দামি আসবাব আর চিনেমাটির জিনিসপত্র দেখলুম, লুঠ করে নেবে।'

রঘু বলল, 'সার! আপনার সাহসে সাহস।'...

পথে যেতে যেতে প্রশান্তবাবু বললেন, 'রঘু আমাদের ইনফরমার। এই বাগানবাড়িতে স্মাগলাররা মাঝে মাঝে এসে উৎপাত করে। চোরাচালানি জিনিসপত্র পাঁচিল গলিয়ে ঝোপের মধ্যে ফেলে দেয়। কখনও ওকে হুমকি দিয়ে কোনো ফেরারি স্মাগলার বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কয়েকবার আমরা হানাও দিয়েছি। তবে এটা ঠিক, রঘু গাঁজাখোর হলেও খুব ধূর্ত। তেমনই সাহসীও বটে। ওর চেহারা দেখে বোঝা যাবে না কিছু।' প্রশান্তবাবু হঠাৎ ঝুঁকে চাপা স্বরে বললেন, 'ব্যাটার

কাছে আনলাইসেন্সড পিস্তল আছে। পুলিশ নিজের স্বার্থে ওটা নিয়ে ঝামেলা করতে চায় না।'

কর্নেল চুপ করে থাকলেন। আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'আপনি পিস্তলটা কি দেখেছেন?'

'না। তবে ওটা আছে, তা জানি'...

মধ্যমগ্রাম চৌরাস্তার মোড়ে পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'প্রশান্ত! এই শীতের সন্ধ্যায় কফি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার তাড়া আছে। তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। বড়বাবুকেও আমার ধন্যবাদ জানাবে।'

প্রশান্ত ব্যানার্জি নেমে গেলেন। তারপর কর্নেলের কাছে এসে চাপা স্বরে বললেন, 'কেন রায়সায়েবের বাগানবাড়ি গিয়েছিলেন, জানতে চাইনে। কিন্তু অমন করে হঠাৎ উঠে এলেন কেন, জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'তখন তো বলেছি ডার্লিং। ভূতে বারবার বিরক্ত করলে আমার অসহ্য লাগে।'

'ঠিক আছে কর্নেলসায়েব। সময়মতো আসল কারণটা ঠিকই জানতে পারব।' বলে হাসতে হাসতে নমস্কার করে প্রশান্তবাবু চলে গেলেন।

কর্নেল পকেট থেকে একটা ছোট্ট নোটবই বের করে রাস্তার আলোয় কিছু দেখে নিয়ে বললেন, 'চলো জয়ন্ত! তাড়াহুড়োর দরকার নেই। যে-পথে এসেছি, সেই পথেই ফেরা যাক।'...

ফেরার পথে নন্দনকাননে শোনা সেই অদ্ভুত গোঙানি সম্পর্কে কর্নেলকে প্রশ্ন করেও কোনো সদুত্তর পেলুম না। উনি শুধু একটা কথাই বললেন, যে-কথাটা বহুবার ওঁর মুখে নানা প্রসঙ্গে শুনেছি। 'জয়ন্ত! প্রকৃতিতে রহস্যের শেষ নেই।'

এমন কথার কোনো জবাব নেই। কাজেই বরাবরকার মতো চুপ করে গেলুম।

উল্টোডিঙির মোড়ে পৌঁছে কর্নেল বললেন, 'ব্যস! এখানে আমাকে নামিয়ে দিয়ে তুমি সল্টলেক তোমার ফ্ল্যাটে চলে যাও। আমি ট্যাক্সি করে নিই।'

বললুম, 'কেন? আমার গাড়িতে যথেষ্ট তেল আছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'তেল আছে, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু কেসটা তো আমার নয়। হালদার মশাইয়ের।'

ততক্ষণে বাঁদিকে ঘুরে ই এম বাইপাসে ঢুকে পড়েছি। বললুম, 'আপনার কেস না হলে রায়মশাইয়ের বাগানবাড়িতে হানা দিতে গিয়েছিলেন কেন?'

'বাড়িটা সত্যি ভূতুড়ে কি না জানার ইচ্ছে ছিল। কারণ বিজ্ঞাপনে ওই কথাটা—সাহস থাকিলে—এর অর্থ আমার কাছে এরকম কিছুই মনে হয়েছিল! তুমি আর মল্লিকমশাই এর অর্থ করেছিলে চড়া দাম। মনে পড়ছে তো?'

'হ্যাঁ। আসলে আজকাল লোকে ভূতপ্রেতের তোয়াক্কা না করে যেখানে খুশি জমিজায়গা কিনে নিচ্ছে। তাই সাহস থাকার ওই অর্থই করেছিলুম।'

'এখন শ্রীহরি অটোমোবাইলসের ঘনশ্যাম নন্দী মল্লিকমশাইকে যখন ভূতের উৎপাতে বাগানবাড়িটা বিক্রি হচ্ছিল না বলেছেন, তখন আমার কৌতূহল জেগেছিল। তবে দ্যাখো, ওখানে গিয়ে একটা নতুন কথা জানা গেল।'

'বাড়িটাতে স্মাগলারদের উৎপাতের কথা। তাই না?'

'তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা, জয়ন্ত! হালদারমশাইয়ের এটা কাজে লাগবে। রাজেন মুখুজ্জে রায়সায়েবের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ওখানে মাঝে মাঝে যাতায়াত করতেন।'

'রাজেনবাবুকে দুঃসাহসী বলতে হবে। জেনেশুনেও অমন জায়গা কিনেছেন।' বলেই আমার টনক নড়ল। 'কিন্তু কর্নেল, সেল-ডিড তো আনরেজিস্টার্ড থেকে গেল! রায়সায়েব মারা গেছেন। এবার ওই ডিডের জোরে কি রাজেনবাবু নন্দনকাননের মালিকানা পাবেন?'

'আইনজ্ঞরা অবশ্য অনেক ফ্যাকড়া বের করতে পারেন। তবে আমার মনে হয়, রায়সায়েবের সই যদি জেনুইন হয় এবং সাক্ষীদেরও সই থাকে—সাক্ষীরা নিশ্চয় জীবিত, তাছাড়া রেজেস্ট্রি অফিসের স্বীকৃত কোনো ডিডরাইটার যদি ডিডটা তৈরি করে থাকেন, তাহলে সম্পত্তি পেতে অসুবিধে হবে না।'

কর্নেল কথাটা বলেই বাঁদিকে এবং ডানদিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর কিছুটা এগিয়ে যাবার পর বললেন, 'সামনে কোথাও আইল্যান্ড পেরিয়ে ডানদিকে আসতে হবে। পেছনের মোড়ে রাইট টার্ন করা নিষেধ দেখলুম।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'ওদিকে কোথায় যাবেন?'

'বেলেঘাটা এরিয়ায় ঢুকতে হবে। ততবেশি দূরে নয়।'

ডানদিকে ঘুরে আবার যেদিক থেকে আসছিলুম, সেদিকেই চললুম। তারপর কর্নেলের নির্দেশে বাঁদিকে একটা রাস্তায় ঢুকলুম। কিছুদূর চলার পর কর্নেল জ্যাকেটের পকেট থেকে সেই খুদে নোটবইটা বের করে রাস্তার আলোয় দেখে নিলেন। বললেন, 'হ্যাঁ। ডানদিকে ঢুকতে হবে।'

দুটো গাড়ি যাতায়াতের মতো সংকীর্ণ রাস্তা। তবু নামে রোড। বি সি শেঠ রোড। একটা দোতলা এবং গেটওয়ালা বাড়ির কাছে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন কর্নেল। তারপর উনি নেমে গেলেন। আমি একটু এগিয়ে গাড়ি ব্যাক করে উল্টোদিকে একটা পাঁচিলের কাছে রাখলুম। তারপর গাড়ি লক করে কর্নেলের কাছে গেলুম। কর্নেল গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বুঝলুম, ইতিমধ্যে ডোরবেলের বোতাম টিপেছেন। একটা লোক এসে কর্নেলকে দেখে নিশ্চয় বিদেশি সায়েব ভেবে সেলাম ঠুকল।

কর্নেল তাকে অবাক করে বাংলায় বললেন, 'রাজেনবাবু আছেন?'

'আপনারা কোথা থেকে আসছেন সার?'

'আহা! উনি আছেন কি না?'

দোতলা থেকে ভরাট গলায় কেউ বলল, 'কে রে বিশু?'

কর্নেল একটু পিছিয়ে এসে মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাল্লো রাজেনবাবু!'

'কী সর্বনাশ! কর্নেলসায়েব যে!'

একটু পরে বলিষ্ঠ গড়নের এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে গেট খুলে বললেন, 'আসুন! আসুন! আমার কী সৌভাগ্য! আপনি যে আমার মতো সামান্য লোকের বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন কল্পনাও করিনি।'

বাড়ির একটুরো লনের সাজসজ্জা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, রাজেন মুখার্জি নার্সারির হালহদিস কতখানি জানেন। বাড়িটা অবশ্য পুরোনো। বনেদিয়ানার ছাপ রাতের আলোয় অস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছিল। বসার ঘরের আসবাবে সেকাল-একালের লক্ষণও স্পষ্ট। আমাদের বসিয়ে রাজেনবাবু বিশুকে কফি আনতে বললেন।

কর্নেল বললেন, 'আকস্মিক ঘটনাচক্রে আপনার কাছে এসে গেলুম।'

রাজেনবাবু অমায়িক হেসে বললেন, 'এসেছেন এই যথেষ্ট। কেন এসেছেন তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।'

'আলাপ করিয়ে দিই। জয়ন্ত চৌধুরি। দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার সাংবাদিক। জয়ন্ত, ইনিই জয় মা তারা নার্সারির পার্টনার—'

'ছিলুম। মল্লিকদা আপনাকে বলেননি কিছু?'

'হ্যাঁ। আজ সকালে মল্লিকমশাই নতুন ক্যাটালগ উপহার দিতে গিয়েছিলেন। দুঃখ করে বললেন, আপনি নাকি অন্য কোনো কারবারে নামবেন বলে পার্টনারশিপ ছেড়ে দিয়েছেন।'

'ছেড়ে এমনি-এমনি দিইনি কর্নেলসায়েব! মল্লিকদার খেয়ালের কথা তো জানেন! কোন মুল্লুকে কী ক্যাকটাসের খবর পেয়ে অর্ডার দিলেন। চিন্তাও করলেন না এখানকার সয়েল বা ক্লাইমেটে তা বাঁচবে কি না। যদি বা বাঁচে, তার খদ্দের পাবেন কি না ঠিক নেই। প্রতিবছর এই সব বেহিসেবি কাজে মোটা টাকা লোকসান হচ্ছিল। আরও কত বেয়াড়া খেয়াল ওঁর মাথায় চাপাছিল, বলে লাভ নেই। শেষ পর্যন্ত কেটে পড়তে পেরেছি বাপের ভাগ্যি। খুব সামান্য টাকায় পার্টনারশিপ ছেড়েছি। জায়গার দামই এ বাজারে বিশ লাখ!'

'মল্লিকমশাই বলছিলেন আপনি নাকি পাঁচ লাখে রফা করেছেন।'

'করলুম। আমারও তাড়া ছিল। এদিকে মল্লিকদা এর বেশি দিতে পারবেন না বললেন। না—পারতেন। আমি ছ্যাঁচড়ামি পছন্দ করিনে। কোর্টকাছারি করা আমার ধাতে নেই।'

কর্নেল একট হেসে বললেন, 'এবার আকস্মিক ঘটনাচক্রটা কী শুনুন। মধ্যমগ্রামে আমার চেনা এক ভদ্রলোক থাকেন। কথায়-কথায় তাঁর কাছে শুনেছিলুম, ওই এলাকায় নন্দনকানন নামে একটা বাগানবাড়ি আছে। কোনো এক রায়সায়েবের বাগানবাড়ি। সেখানে তিনি নাকি অদ্ভুত ধরনের পরগাছা দেখেছেন।

আমার ব্যাপার তো জানেন! দুপুরে জয়ন্তকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম। চৌরাস্তায় হঠাৎ আমার এক দূরসম্পর্কের ভাগনের সঙ্গে দেখা হলো। সে ওখানকার থানায় সম্প্রতি বদলি হয়ে এসেছে। প্রশান্ত ব্যানার্জি নাম। না—আমি বামুন নই। তবে বামুন আত্মীয় কি থাকতে নেই? তাতে সে একজন পুলিশ অফিসার। বাগানবাড়িটা তার সাহায্যে খুঁজে বের করলুম। তারপর অবাক হয়ে শুনলুম রাজেন মুখার্জি নামে কলকাতার এক ভদ্রলোক নাকি নন্দনকানন কিনেছেন। কেয়ারটেকার বলল, নতুন মালিক মোটর সাইকেলে চেপে এসেছিলেন। তবে নন্দনকাননে নাকি ভূতের খুব উৎপাত।'

এই সময় বিশু ট্রেতে কফি আর স্ন্যাক্স আনল। লক্ষ্য করছিলুম, রাজেনবাবু কর্নেলের কথা শুনে যাচ্ছেন, কিন্তু কোনো ভাবান্তরের চিহ্ন নেই মুখে। বিশু চলে গেল তিনি জোরে শ্বাস ছেড়ে বললেন, 'কফি খান কর্নেলসায়েব!'

কর্নেল কফির কাপ তুলে চুমুক দিয়ে বললেন, 'কেয়ারটেকার নতুন মালিকের চেহারার যে বর্ণনা দিল, আপনার সঙ্গে মিলে যায়। তাই জয়ন্তের সঙ্গে বাজি রেখে বললুম, আপনিই নন্দনকাননের নতুন মালিক।'

রাজেনবাবু আস্তে বললেন, 'আমার দুর্বুদ্ধি কর্নেলসায়েব! কেয়ারটেকার আর কিছু বলেনি?'

'বলেছিল, পুরোনো মালিক রায়সায়েব হঠাৎই মারা গেছেন। আপনার সঙ্গে তাঁর নাকি চেনাজানা ছিল।'

'ছিল। বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। তবে খুলেই বলছি, একসঙ্গে মদ্যপান করতুম। আপনি জানেন কর্নেলসায়েব, আমি স্পষ্ট কথা বলি। হ্যাঁ—নন্দনকানন আমি জলের দরে পেয়েছি। রায়দা আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আর ভূতের উৎপাত বললেন। তা-ও মিথ্যা নয়। ওই বাগানবাড়িতে আমি রায়দার সঙ্গে রাত কাটিয়েছি। নানারকম অদ্ভুত-অদ্ভুত শব্দ শুনেছি। কিন্তু না—ভূতের ভয় আমার নেই।'

সুযোগ পেয়ে বললুম, 'ঘরের ভেতর থেকে দু'বার গোঙানি শুনেছি! কর্নেল তো তক্ষুনি কেটে পড়লেন। পরগাছার খোঁজ নিলেনই না।'

রাজেনবাবু বললেন, 'আমার প্রব্লেম ভূত নয় কর্নেলসায়েব! মানুষ।'

কর্নেল বললেন, 'কে সে?'

'তা জানি না। জানলে তো মুখোমুখি লড়া যেত।'

'কী প্রব্লেম বাধাচ্ছে সে?'

'অলরেডি বাধিয়েছে। রায়দা—পুরো নাম মহেন্দ্রনাথ রায়—মারা গিয়েছেন শনিবার। শুক্রবার রাত্রে আমি ওঁকে ডাঃ সরকার রোডে পৌঁছে দিয়েছিলুম। অবশ্য উনি নিজেই নিজের গাড়ি ড্রাইভ করেছিলেন। পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটা খুলে বলি। পাঁচ লাখ টাকা ক্যাশ ওঁকে ল-ইয়ারের বাড়িতে বসে দিয়েছি। উনি ডিডে সই করেছেন। রেজিস্ট্রি হওয়ার কথা আগামী কাল সোমবার। তো অত ক্যাশ টাকা

নিয়ে একা বাড়ি ফিরবেন রায়দা! আমি তাই ওঁর সঙ্গে গিয়েছিলুম। দোতলায় ওঁর ফ্ল্যাট। উনি বললেন, এবার তুমি এসো রাজেন! আমি চলে এলুম। সেই রাত্রে ওঁর হার্ট অ্যাটাক হলো। গতকাল হাসপাতালে গিয়ে শুনলুম, উনি ডেড।'

'খবর পেলেন কার কাছে?'

'রায়দার বাড়িতে এক ভাড়াটে থাকে। নাম ঘনশ্যাম নন্দী। রায়দা একসময় সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি বেচা-কেনার কারবার করতেন। পুরোনো বা ভাঙাচোরা গাড়ি শস্তায় কিনে ভোল বদলে নতুন করে ফেলতেন। ওই ভোলবদলের কাজটা করে দিত ঘনশ্যাম। গোবরার ওদিকে ওর একটা গ্যারাজ আছে। শ্রীহরি অটোমোবাইলস। তো মাঝে মাঝে রায়দার সঙ্গে ওখানে আড্ডা দিতে যেতুম। রায়দা আমাকে সেকেন্ড হ্যান্ড একটা ভালো গাড়ি কম টাকায় দিতে চেয়েছিলেন। রাজি হইনি। আমার মোটর সাইকেলই ঠিক আছে।'

'ঘনশ্যামবাবু আপনাকে খবর দিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।' বলে রাজেনবাবু চাপা শ্বাস ছাড়লেন। একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'ডিড আনরেজিস্টার্ড। ওটা কোনো প্রব্লেম নয়। কিন্তু গত রাত্রে এবং আজ সকালে দু'বার টেলিফোনে কেউ আমাকে হুমকি দিয়েছে, রায়সায়েবকে নাকি আমিই মার্ডার করে আমার দেওয়া টাকা হাতিয়ে পালিয়ে এসেছি।'

'কী আশ্চর্য! মার্ডার হলে তো হাসপাতালের ডাক্তাররা—'

কর্নেলের কথার ওপর রাজেনবাবু বললেন, 'ডাক্তাররা ডেথ সার্টিফিকেট দিয়েছেন, হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যু। এর আগেও দু'বার রায়দার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল।'

'লোকটা কি আপনার কাছে টাকাকড়ি চাইছে?'

'হ্যাঁ। আড়াই লাখ টাকা তাকে না দিলে সে রায়দার জামাইকে বলে আমার পিছনে পুলিশ লেলিয়ে দেবে।'

কর্নেল হাসলেন। 'কিন্তু রায়সায়েবের বডি তো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে!'

রাজেনবাবুও হেসে উঠলেন। তিনি বললেন, 'রাস্কেলটা বলছে, রায়দা নাকি একটা চিঠি লিখে গিয়েছেন, রাজেন মুখার্জি আমার বুকে ঘুষি মেরে ব্রিফকেস ভর্তি পাঁচ লাখ টাকা নিয়ে পালিয়েছে। চিঠিটা নাকি তার হাতে এসেছে। কী ভাবে এসেছে, তা সে বলতে রাজি নয়।'

'কিন্তু টাকাটা আপনার কাছে সে কী ভাবে নেবে, বলেছে, কিছু?'

'গতরাত্রে ব্যাটাকে পাত্তা দিইনি। আজ সকালে কিছুক্ষণ মিষ্টি কথা বলেছি। টাকা কখন কোথায় কী ভাবে তাকে দিতে হবে, তা সে কাল সোমবার জানাবে। কখন জানাবে তা বলেনি।'

বললুম, 'কর্নেল! পুলিশকে আপনি জানিয়ে দিলে কোন ফোন নাম্বার থেকে রাজেনবাবুকে সে ফোন করছে, তা টেলিফোন এক্সচেঞ্জে আড়ি পেতে জানা সম্ভব।'

রাজেনবাবু মাথা নাড়লেন। 'লোকটা মহা ধূর্ত। দু'বারই পাবলিক বুথ থেকে ফোন করেছে। গাড়ি চলাচলের শব্দ শুনে তা বুঝতে পেরেছি। বুথটা কোনো বড় রাস্তার ধারে।'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'রাজেনবাবু! লোকটা যে-ই হোক, সে রায়সায়েবের চেনা কেউ। আপনার কী ধারণা?'

'ঠিক বলেছেন। সে জানে আমি রায়দাকে পাঁচ লাখ টাকা দিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সেই টাকা তাহলে ওঁর মেয়ে-জামাইয়ের পাওয়ার কথা। টাকা ঘরেই থাকবে। তাই না? কারণ রায়দার ফ্ল্যাটে ওরা আছে।'

'আপনি ওঁর মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাগানবাড়ি আপনাকে বেচে দেওয়ার কথা জানিয়েছে কি?'

'কাল হাসপাতালে গিয়েই জানিয়েছি। তখন ওরা কোনো মন্তব্য করেনি। তারপর গতরাত্রে উড়ো ফোনে হুমকি শুনে তখনই শর্বরী—মানে, রায়দার মেয়েকে জিজ্ঞেস করেছি টাকাভর্তি ব্রিফকেস পেয়েছে কি না। এটাই আশ্চর্য! ওরা পাঁচ লাখ টাকাভর্তি কোনো ব্রিফকেস পায়নি।' রাজেনবাবু একটু হাসলেন। 'শর্বরী আসলে রায়দার পালিতা কন্যা। কোনো অনাথ আশ্রম থেকে দত্তক নিয়েছিলেন। বাজে টাইপ মেয়ে। টাকা পেয়েও অস্বীকার করছে। তার মানে কী বুঝতে পারছেন? পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাতে তৈরি। ওর বাবাকে টাকা না দিয়ে ডিডে সই করিয়ে নিয়েছি বলে কেস করবে। পরে অবশ্য ফেঁসে যাবে। তাতে কী? আমাকে হ্যারাস করানো তো হবে। রায়দার জামাই প্রদোষ আসল বজ্জাত। রায়সায়েব মেয়ে-জামাইকে পছন্দ করতেন না বললে কম বলা হবে। ওদের বিশ্বাসই করতেন না। তাই দমদমের বাড়ি থেকে এন্টালি এরিয়ায় নিজের আর একটা বাড়িতে চলে এসেছিলেন। আপনাদের বলছি—প্লিজ কথাটা যেন গোপন থাকে, মাঝে মাঝে রায়দা আমাকে বলতেন, শর্বরী আর প্রদোষ সম্পত্তির লোভে তাঁকে নাকি স্লোপয়জন করছে। তাই ওঁর স্বাস্থ্য ক্রমশ ভেঙে পড়ছে।'

আমার মনে পড়ল, আজ সকালে শ্রীলেখা ঠিক একই কথা বলছিল। কর্নেল এবার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'রায়সায়েবকে আপনি টাকা দিয়েছেন। তাঁকে বাড়ি পৌঁছেও দিয়েছেন। তা হলে রায়সায়েবের ওরকম কোনো চিঠি লিখে রেখে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, আপনি উড়ো ফোন পেয়ে—'

রাজেন মুখার্জি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁর কথার ওপর সহাস্যে বললেন, 'ও রকম কোনো চিঠির অস্তিত্ব নেই। রায়দা কেন আমার বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি তেমন কিছু লিখবেন? কাজেই আমি ভয় পাইনি। বরং বলতে পারেন খাপ্পা হয়েছি। এত সাহস কার? লোকটা কে? কর্নেলসায়েব! আমার প্রব্লেমটা অন্যরকম। মল্লিকদাকে জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন, এই রাজেন মুখার্জি যা বলে, ঠিক তা-ই করে। আমি যত ভদ্রলোক, তত ছোটলোক। প্লিজ কর্নেলসায়েব! আপনার সামনে এ

কথা বলছি বলে যেন কিছু মনে করবেন না। জয়ন্তবাবু! আপনিও যেন কিছু মনে করবেন না। নন্দনকাননের ভূতগুলোকে শায়েস্তা করার আগে এই ভূতটাকে কীভাবে শায়েস্তা করব, তাই নিয়ে আমি প্রব্লেমে পড়েছি।'

রাজেনবাবু আমাদের সঙ্গে এইসব কথা বলতে বলতে গেট পর্যন্ত এলেন। কর্নেল রাস্তায় নেমে হঠাৎ ঘুরে বললেন, 'একটা কথা। নিছক কৌতূহল। আপনি শুক্রবার রাত্রে কি রায়সায়েবের গাড়ি থেকে নেমে ওঁর কথামতো তখনই চলে গিয়েছিলেন? নাকি উনি দোতলায় ওঠা অব্দি অপেক্ষা করেছিলেন?'

'রায়দা নিচের তলায় সিঁড়ির কাছে পৌঁছুনো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিলুম। খুলে বলি। বাড়ি ফেরার পথে আমরা দুজনে মাত্র তিনি পেগ করে হুইস্কি খেয়েছিলুম। দেখলুম, উনি সুস্থভাবে হাঁটতে পারছেন। তাই চলে এলুম। কিন্তু হঠাৎ একথা কেন কর্নেলসায়েব?'

'আমার ধারণা, তখন কেউ সেখানে কোথাও ছিল এবং ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছিল। সে জানত, আপনি নন্দনকানন কিনছেন। রায়সায়েবের হাতে ব্রিফকেস এবং আপনাকে দেখে সে একটা অঙ্ক কষেছিল।'

রাজেন মুখার্জি হাসলেন। 'হ্যাঁ। লোকটা যে ওই বাড়ির, তা কি আমি বুঝিনি? কর্নেলসায়েব! যথাসময়ে আপনাকে জানাব, রাস্কেলটাকে কী শাস্তি দিয়েছি।'...

চার

সে-রাত্রে ই এম বাইপাসের দিকে যেতে যেতে কর্নেল আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী বুঝলে জয়ন্ত?'

বলেছিলুম, 'রাজেনবাবুর কথাবার্তা গোলমেলে মনে হচ্ছে।'

'কেন?'

'যদি ওঁর কথাগুলো সত্য হয় তাহলে ওই উড়োফোনের ব্যাপারে উনি অত উত্তেজিত কেন? তা ছাড়া আর একটা কথা আমার কানে বিঁধেছে। নন্দনকানন কেনার ব্যাপারে আমারই দুর্বুদ্ধি বলারই বা মানে কী?'

'হুঁ। মাঝেমাঝে তোমার পর্যবেক্ষণশক্তি এভাবেই টের পাই।'

'ওঃ কর্নেল! আবার আপনি আমার আঁতে ঘা দিচ্ছেন।'

'মোটেই না ডার্লিং! তুমি দুটো ভাইটাল পয়েন্ট তুলেছ।' বলে উনি মুখ বাড়িয়ে ডেকে উঠেছিলেন, 'ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!'

'ট্যাক্সি কেন? আমি পৌঁছে দেব বলেছি—'

কর্নেল আমার কথা থামিয়ে গাড়ির দরজা খোলার চেষ্টা করতেই ব্রেকে পায়ের চাপ দিয়েছিলুম। উনি আমাকে অবাক করে তক্ষুণি নেমে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপেছিলেন। ট্যাক্সিটা চলে গেলে আমি বাঁদিকে ঘুরে সল্টলেকে আমার বাড়ির

দিকে চলেছিলুম। মাঝে মাঝে কর্নেল এমন খামখেয়ালি হয়ে ওঠেন, তা আমার জানা। তাই ওইভাবে হঠাৎ তাঁর চলে যাওয়ায় অবাক হইনি।

আসলে ইলিয়ট রোডে ওঁর তিনতলার অ্যাপার্টমেন্ট গিয়ে জানার ইচ্ছে ছিল, প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কোনো খবর আছে কি না।...

পরদিন সকালে কর্নেলের কাছে যাবার ইচ্ছে তীব্রই ছিল। যাবার আগে ওঁকে টেলিফোন করেছিলুম। তখন প্রায় আটটা বাজে। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ জানিয়েছিল, তার 'বাবামশাই' ছাদের বাগান থেকে নেমে শুধু কফি খেয়ে বেরিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, বাইরে কোথাও ব্রেকফাস্ট করে নেবেন।

হালদারমশাইয়ের বাড়িতে ফোন করেছিলুম। রিং হচ্ছিল। কেউ ফোন ধরেনি। সবে ব্রেকফাস্ট করে সেদিনকার দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পাতায় অন্যমনস্কভাবে চোখ বুলোচ্ছি, টেলিফোন বেজে উঠেছিল। কর্নেলের ফোন ভেবেছিলুম। কিন্তু আমার উৎসাহে জল ঢেলে আমাদের নিউজ ব্যুরোর চিফ সত্যদার নির্দেশ এসেছিল, 'জয়ন্ত এখনই নিউ আলিপুরে চলে যাও। ফ্ল্যাটে ডাকাতি হয়েছে। দু'দুটো মার্ডার। থানার সোর্স থেকে এইমাত্র খবর পেয়েছি। তুমি সোর্সকে চেনো। আগে ফোনে কনট্যাক্ট করে নাও। বাড়ির নাম্বার পেয়ে যাবে। শোনো! আমরা বড় করে কভারেজ দেব। ভিকটিম আমাদের চিফ এডিটরের বাবার বন্ধু ছিলেন। বুঝলে কিছু? ওঃ জয়ন্ত! আই রিপিট—ভিকটিম রত্নেশ অরোরা আমাদের চিফ এডিটরের বাবার—মানে, বু...বু... বুজম—'

উত্তেজনা এলে তোতলামি এসে যায় সত্যদার। দ্রুত বলেছিলুম, 'বুঝেছি দাদা! বুজম্ ফ্রেন্ড।'...

দিনটা যা গেল, বলার নয়। চিফ এডিটরের বাবার প্রাণের বন্ধু বলে কথা। কর্নেলের সঙ্গগুণে গোয়েন্দাদের রীতিনীতি আমার করায়ত্ত। এদিকে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা আমার কাছে কী ধরনের কভারেজ আশা করে তা-ও জানা। অতএব অফিসে ফিরে প্রায় সাড়ে তিন কলাম পরিমাণ একখানা রোমহর্ষক রহস্যকাহিনি দাঁড় করালুম। সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ কফি শেষ করে সত্যদাকে দিলুম। তারপর টেবিলে ফিরে এক কাপ চা নিয়ে বসেছি, টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে সাড়া দিতেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ হালদারমশাইয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'জয়ন্তবাবু? আমি হালদার কইতাছি।'

'বলুন হালদারমশাই!'

'বাইরাইবেন কখন?'

'চায়ের কাপ শেষ হলেই বেরুব। আপনি কোথা থেকে বলছেন?

কর্নেলস্যারের ঘরে আছি। কর্নেলস্যার এখনও ফেরেন নাই। ওয়েট করতাছি। আপনি ওনার খবর জানেন? মানে—উনি কোথায় গেছেন?'

'কিছুই জানি না। আপনার খবর আছে কিছু?'

'আছে। সেইজন্যই কর্নেলস্যারের ওয়েট করতাছি। আপনি আইবেন না?'

'চা খেয়েই বেরুচ্ছি।'...

ইলিয়ট রোডে কর্নেলের তিনতলার অ্যাপার্টমেন্ট পৌঁছে দেখলুম, কর্নেল ফিরেছেন এবং হালদারমশাইয়ের কথা মন দিয়ে শুনছেন। আমাকে দেখে কর্নেল একটু হাসলেন। কেন হাসলেন বুঝতে পারলুম না।

হালদারমশাই বললেন, 'তো যা বুঝলাম, ঘনশ্যামবাবুর কারখানা শ্রীহরি অটো-মোবাইলস শিগগির দরগা রোডে রিপ্লেস্‌ড হবে। আমারে কইলেন, দু'সপ্তাহ বাদে গাড়ি লইয়া যাইবেন। দরগা রোডের নতুন ঠিকানাও দিলেন।'

কর্নেল বললেন, 'আপনি কি গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন?'

হালদারমশাই হাসলেন। 'গাড়ি পামু কই? প্রাইভেট কার ভাড়া পাওয়া যায়। কিন্তু খামোখা খরচ কইর‍্যা লাভ কী? ওনারে কইছি, গাড়ি ব্রেকডাউন ভ্যানে লইয়া যামু। অ্যাক্সেল ভাইঙ্গ্যা গেছে।'

'তা হলে দরগা রোডের গ্যারেজটা কিনে ফেলেছেন ঘনশ্যামবাবু?'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কইলেন, অ্যাডভান্স করছেন। সামনের সপ্তায় রেজেস্ট্রি কইর‍্যা লইবেন । দর জিগাইলাম। শুধু হাসলেন। শ্যাষে কইলেন, দরদাম জিগাইবেন না। মাথা খারাপ হইয়া যাইব।'

ষষ্ঠী আমার জন্য কফি আনল। কর্নেল বললেন, 'জয়ন্তর ওপর আজ খুব ধকল গিয়েছে। বিকেল চারটে নাগাদ বারাসত থেকে তোমার কাগজের অফিসে ফোন করেছিলুম। তুমি নেই শুনে সত্যবাবুকে লাইনটা দিতে বললুম। সত্যবাবু বললেন, জয়ন্তকে একটা ডাকাতি আর খুনের পিছনে লড়িয়ে দিয়েছি। বলেই তোমাদের ব্যুরো চিফ সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন, চিফ এডিটরের বাবার বন্ধু আর তার চাকর খুন। বহু লক্ষ টাকার অলংকার লোপাট। চিফ এডিটর নাকি আমার সাহায্য চান।'

বললুম, 'ভ্যাট! পুলিশ অলরেডি জেনে গেছে বাড়ির লোকের কাজ।'

কর্নেল হাসলেন। 'সে যাই হোক, আমি তোমার ব্যুরো চিফকে বলেছি, কাল মর্নিংয়ে দু'তিন সপ্তাহের জন্য রাজস্থানে যাচ্ছি।'

'আপনি বারাসত গিয়েছিলেন? হঠাৎ সেখানে কী?'

'মধ্যমগ্রামের কাছে বারাসত।'

হালদারমশাই বললেন, 'আমি উঠব কর্নেলস্যার! এবার ভাইটাল পয়েন্টে আসতাছি।'

'বলুন।'

'দরগা রোডের গ্যারাজের ঠিকানায় মালিকের খোঁজ করলাম। মালিক এক মুসলিম ভদ্রলোক। তেনারে কইলাম, শুনছি আপনি জমিসুদ্ধ গ্যারেজ সেল করবেন। আমার কেনার ইচ্ছা আছে। উনি কইলেন, অলরেডি এক পার্টি অ্যাডভান্স করছে। কইলাম, তাতে কী? সেই পার্টি যা দর দেবে, আমি তার বেশি

দিমু। ভদ্রলোক কইলেন, সাড়ে তিন কাঠা জমিতে টিনের শেডসমেত গ্যারেজ। পনেরো লাখ দর উঠেছে।' হালদারমশাই হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে হাতের কৌটো থেকে এক টিপ নস্যি নিলেন। তারপর গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে বললেন, 'ঘনশ্যাম নন্দী পনেরো লাখ টাকা জোগাড় করছে!'

'আপনাকে বাড়িয়ে বলতেই পারেন উনি।'

'শ্রীলেখা ঘনশ্যাম নন্দীর মাইয়ার কাছে শুনছিল দশ লাখ। যাই হোক, দশ লাখ কি পনেরো লাখ। এত টাকা ঘনশ্যাম নন্দী পাইল কই? কর্নেলস্যার! ঘনশ্যামই শ্রীলেখার ঘর থিক্যা ব্রিফকেস চুরি করছে।'

'আপনি প্রমাণ করবেন কী ভাবে?'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কাঁচুমাচু মুখে হাসলেন। 'আরও কিছু ইনফরমেশন জোগাড় কইর‍্যা আমি একখান থিয়োরি খাড়া করব। তারপর আপনার ডিরেকশন মতন চলব।'

কর্নেল নিভে যাওয়া চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'আপাতত আপনি একটা কাজ করতে পারেন।'

'কন?'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'আপনি বলেছেন শ্রীলেখাই আপনার ক্লায়েন্ট।'

'হঃ। রায়সায়েব তারেই টাকাভর্তি ব্রিফকেস দিচ্ছিলেন। তার বাবারে তো দেন নাই। তাই আইনত শ্রীলেখা আমার ক্লায়েন্ট।'

'তা হলে তার বাবা তপেশ মজুমদারের গতিবিধির ওপর নজর রাখুন।'

গোয়েন্দাপ্রবর গুলিগুলি চোখে তাকালেন। 'এট্টু হিন্ট দিন অন্তত। নজর রাখব ক্যান?'

'কারণ জানতে চাইবেন না হালদারমশাই! আপনি কাল খুব ভোরে ডা. সুরেশ সরকার রোডে ওঁদের বাড়ির কাছাকাছি কোথাও ওত পেতে থাকবেন। না—জয়ন্তের মতো ঠাট্টা করছি না। আপনাকে ছদ্মবেশ ধরতে হবে। কারণ দৈবাৎ আপনি তপেশবাবু চোখে পড়ে যেতে পারেন। আমি চাই, ওঁর অজ্ঞাতসারে ওঁকে ফলো করবেন। শুভস্য শীঘ্রম। অন্তত কাল এবং পরশু দুটো দিন আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। ভোর ছটা থেকে রাত্রে তপেশবাবু তাঁর ফ্ল্যাটে ফিরে শুয়ে পড়া পর্যন্ত নজর রাখতে হবে। শুয়ে পড়লেন কি না, তা নিশ্চয় বুঝতে পারবেন। তারপর আপনি পদ্মপুকুর পার্কে গিয়ে পোশাক বদলে বাড়ি ফিরে যাবেন। বলুন! পারবেন কি?'

হালদারমশাই হাসলেন। 'এ আর কী এমন কাম? পুলিশলাইফে বনবাদাড়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মশার কামড় খাইছি। বৃষ্টিতে ভিজছি। শীতে হাড় বরফ হইয়া গেছে।'

'আর একটা কথা। রাত্রে বাড়ি ফিরেই আমাকে টেলিফোনে তপেশবাবুর গতিবিধি জানাবেন।'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ যেন এবার কাজের মতো একটা কাজ পেয়েছেন, এই ভঙ্গিতে সটান উঠে দাঁড়ালেন এবং 'যাই গিয়া' বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।

অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলুম। বললুম, 'কী অদ্ভুত!'

কর্নেল বললেন, 'নন্দনকাননের ভূতের চেয়ে মোটেও অদ্ভুত নয়। প্রাইভেট ডিটেকটিভরা কেন, পুলিশের ডিটেকটিভরাও এ ধরনের কাজ করে থাকেন। হালদারমশাই এতে অভ্যস্ত। তা ছাড়া তুমি তো জানো, উনি অসাধারণ অ্যাডভেঞ্চারার।'

'যাক গে! হঠাৎ আপনি বারাসতে দিন কাটিয়ে এলেন কেন?'

'বলেছি তো ডার্লিং! মধ্যমগ্রামের কাছে বারাসত।'

'ওঃ কর্নেল! হেঁয়ালি করবেন না।'

'হেঁয়ালি নয় জয়ন্ত! সমস্যা হলো, তুমি অনেকসময় কোনো ব্যাপার তলিয়ে লক্ষ্য করো না! কোনো সম্পত্তি যদি মধ্যমগ্রাম এরিয়ায় থাকে, তা কেনাবেচার রেজিস্ট্রেশন কোথায় হবে?'

'হ্যাঁ। বারাসত রেজিস্ট্রি অফিসেই হবে।'

'অতএব ডিডরাইটার সেই অফিসেরই স্বীকৃত কেউ হবেন।' কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বললেন, 'প্রশান্তর সাহায্যে ডিডরাইটার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্টকে খুঁজে বের করেছি। তারপর যিনি নন্দনকাননের সেল-ডিড তৈরি করেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দেরি হয়নি। ছ'লাখ টাকার ডিড। প্রচুর টাকার স্ট্যাম্প কিনতে হয়েছে রাজেনবাবুকে। গোপালনগরের জয় মা তারা নার্সারির অন্যতম প্রোপ্রাইটার হিসেবে রাজেন মুখার্জিকে বারাসতেও অনেকে চেনেন। তো ডিডরাইটার ইসমাইল হোসেন খবর পেয়ে গেছেন, রায়সায়েব শনিবার মারা গেছেন। কাজেই ডিড রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে না। অবশ্য রায়সায়েবের মতো নামজাদা লোক না হয়ে অন্য কোনো সাধারণ লোক বা গরিবগুরবো হলে কাউকে বিক্রেতা সাজিয়ে রেজিস্ট্রেশন করানোর অসুবিধে ছিল না।'

'কিন্তু এসব খবর নতুন করে জানার জন্য পুরো একটা দিন খরচ করে ফেললেন?'

'খরচ করে লাভ হয়েছে জয়ন্ত!'

'একটু ঝেড়ে কাশুন বস!'

কর্নেল চোখ খুলে হাসতে হাসতে বললেন, 'এখনও সেই সময় আসেনি। অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ে বেড়াচ্ছি।'

'তবে যে বলছেন লাভ হয়েছে?'

'তা হয়েছে। অন্তত কিছু তথ্য পেয়ে গিয়েছি। স্থানীয় সিভিল কোর্টের ল-ইয়ার কুমুদ সেনগুপ্ত গত শুক্রবার ছুটির পর বাড়িতে ছিলেন। সেই সময় রাজেন মুখার্জি এবং রায়সায়েব ডিডরাইটার ইসমাইল হোসেনকে রেজিস্ট্রি অফিস থেকে কুমুদবাবুর বাড়িতে নিয়ে যান। রায়সায়েব গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন। সেখানে কুমুদবাবুর ডিকটেশন অনুসারে ইসমাইল সায়েব ডিড টাইপ করেন। কুমুদবাবু এবং তাঁর জুনিয়র শৈবাল ঘোষ সাক্ষী হিসেবে সই করেন। সেখানেই রাজেনবাবু একটা ব্রিফকেস খুলে পাঁচশো টাকার নোটের বান্ডিল গুনে টেবিলে রাখেন। রায়সায়েবের জন্য রাজেনবাবু বারাসত বাজার এলাকা থেকে একটা দামি ব্রিফকেস কিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। রায়সায়েব টাকার বান্ডিলগুলো সেই ব্রিফকেসে ভরে তালা এঁটে দুটো চাবি পকেটে ঢোকান। বাঁকা হেসে তিনি বলেন, এ আমার হাতের ময়লা! রাজেন খামোখা ব্রিফকেস কিনল। বারণ করলুম। শুনল না। কত লাখ-লাখ টাকা আমার এই প্যান্টের পকেট আর জ্যাকেটের ভেতর-পকেটে থেকেছে। যাই হোক, এর পর রায়সায়েব তাঁর জ্যাকেটের ভেতর জামার ওপর বাঁদিকে বেল্টে আটকানো একটা ছোট্ট রিভলভার কেস দেখিয়ে বলেন, বুড়ো হয়েছি। কিন্তু দরকার হলে চোখের পলকে এটা বের করে গুলি চালাতে পারি। তিনি রিভলভার বের করে দেখানও বটে। কুমুদবাবুর বাড়ি থেকে বেরুতে প্রায় সাড়ে ছটা বেজে যায়। কুমুদবাবুর জুনিয়র শৈবালবাবু থাকেন সল্টলেকে। আসার পথে এয়ারপোর্ট হোটেলের বারে তিনজনে তিন পেগ করে হুইস্কি খেয়েছিলেন। শৈবালবাবুর সঙ্গে কথায়-কথায় ব্যাপারটা জানতে পারলুম। কিন্তু এবার টাইম ফ্যাক্টর এসে যাচ্ছে। অন্তত নটার আগে রায়সায়েবের ডা. সুরেশ সরকার রোডের ফ্ল্যাটে পৌঁছুনো অসম্ভব। শ্রীলেখা সম্ভবত ঘড়িতে সময় না দেখেই আটটা বলেছে।'

কর্নেল চুপ করলেন। একটু পরে বললুম, 'এইসব তথ্য থেকে কি ব্রিফকেস হারানোর সূত্র পাবেন বলে আশা করছেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'আশা? কোথায় যেন পড়েছিলুম আশা ছলনাময়ী—নাকি কুহকিনী। তবু আশা করতে দোষ কী? আসলে পাঁচ লাখ টাকা সত্যি রাজেনবাবু রায়সায়েবকে দিয়েছিলেন কি না এবং সেই টাকা কোনো ব্রিফকেসে ভরা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছি।'

'শ্রীলেখাকে ফোন করে টাইম ফ্যাক্টরের গণ্ডগোলটা শুধরে নেওয়া যায় কি না দেখুন।'

'করব। আগে রাজেনবাবুকে ফোন করা দরকার। আজ সেই উড়ো ফোন এসেছিল কি না শোনা যাক।' বলে কর্নেল টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করতে থাকলেন।

কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'হ্যালো! মি. রাজেন মুখার্জি আছেন?...এখনও ফেরেননি?... শুনুন! উনি ফিরলে বলবেন, কর্নেল নীলাদ্রি সরকারকে যেন রিং

করেন।...হ্যাঁ। ক-র্নে-ল নী-লা-দ্রি স-র-কা-র। বরং কর্নেলসায়েব বললেও ...ধন্যবাদ। রাখছি।'

রিসিভার রেখে কর্নেল বিরক্ত মুখে বললেন, 'কোনো মহিলা ধরেছিলেন। না—কাজের মেয়ে নয়। বেশ ধারালো কণ্ঠস্বর। কিন্তু আমার নামটা উচ্চারণ করতে হোঁচট খাচ্ছিলেন। ষষ্ঠী! আর এক রাউন্ড কফি দিয়ে যা বাবা! আজ ঠাণ্ডাটা একটু বেড়েছে মনে হচ্ছে।'

ষষ্ঠীচরণ কফি আনল। আমার আর কফি খাওয়ার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কর্নেলের বরাবর ওই একটাই ধুয়ো 'কফি ব্রেনকে চাঙ্গা করে।'

কফি খেতে খেতে বললুম, 'নার্ভ চাঙ্গা হয়েছে। শ্রীলেখার কাছে জেনে টাইম ফ্যাক্টরের গণ্ডগোলটা এবার মিটিয়ে নিন।'

কর্নেল মিটিমিটি হেসে বললেন, 'শ্রীলেখাকে ফোন করার চাইতে বরং কাল মর্নিংয়ে তুমি চলে এসো। তোমাকে শ্রীলেখা দর্শন করাব।'

হেসে ফেললুম। 'ওর কাছে পাত্তা পাব না। ওর প্রেমিক না থেকে পারে না।'

সেইসময় ডোরবেল বাজল এবং কর্নেল যথারীতি হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'

একটু পরে ষষ্ঠীচরণ এসে বলল, 'এক ভদ্রলোক বাবামশাই! রঞ্জনবাবু—না কী যে নামটা।'

কর্নেল চোখ পাকিয়ে বললেন, 'শিগগির এক কাপ কফি। আমি দেখছি।'

বলে উনি ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়ে গেলেন। এঘরের দরজার পর একটা ছোট্ট ঘর আছে। ডাক্তারদের চেম্বারে ওয়েটিং রুমের মতো। সদর দরজায় ইন্টারলকিং সিস্টেম। বাইরে থেকে খোলা যায় না। ভেতর থেকে খোলা যায়। দরজা খোলার শব্দ এবং কর্নেলের আপ্যায়নমাখা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'আরে! আসুন! একটু আগে আপনার বাড়িতে রিং করেছিলুম। শুনলুম আপনি বেরিয়েছেন।'

ষষ্ঠী রাজেনবাবুকে রঞ্জনবাবু করেছে। কর্নেলের পেছনে রাজেন মুখার্জি ঢুকলেন। মুখে সেই অমায়িক হাসি। সোফায় বসে তিনি সহাস্যে বললেন,

'সোজা বারাসত থেকে আসছি! আচ্ছা কর্নেলসায়েব! আপনি আমার পিছনে লেগেছেন কেন বলুন তো? মল্লিকদার কাছে আপনার সম্পর্কে কিছু কথা শুনেছিলুম বিশ্বাস করিনি। কিন্তু যা শুনেছিলুম। তা সত্যি!'

কর্নেল বললেন, 'কী সর্বনাশ! আপনার পিছনে কী ভাবে লেগেছি বলুন তো?'

'বারাসত আমার লইয়ার কুমুদবাবুর জুনিয়র শৈবাল ঘোষের কাছে সব শুনলুম। ডিডরাইটার ইসমাইলদাও বলল। যাই হোক, প্লিজ আমাকে বলুন। শর্বরী বা প্রদোষ কি আপনাকে অ্যাপ্রোচ করেছে? বেশ! তা যদি হয়, আমার ক্ষোভের কোনো কারণ নেই। আপনি বারাসতে খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলেন, সত্যি আমি রায়দাকে ছ'লাখের মধ্যে পাঁচ লাখ দিয়েছিলুম কি না। এই তো? এবার বলুন, এর বিপরীত কথা কি কিছু শুনে এসেছেন?'

'রাজেনবাবু! পাঁচ লাখ টাকা আপনি রায়সায়েবকে দিয়েছেন, তা সত্য। আবার একথাও সমান সত্য, টাকাভর্তি সেই ব্রিফকেসটা রায়সায়েবের ঘরে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'বাড়ির কোনো ফ্ল্যাটের কোনো লোক সুযোগ বুঝে ব্রিফকেসটা হাতিয়ে নিয়েছে। ঘনশ্যামের কাছে শুনেছি, রায়দা বাথরুমে পড়েছিলেন। সেই সময় অনেক লোক তাঁর ফ্ল্যাটে ঢুকেছিল। গোলমালের মধ্যে ব্রিফকেস হাতানো কী এমন কঠিন কাজ?'

'মানছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পাঁচ লাখ টাকা ভর্তি ব্রিফকেস রায়সায়েয়েব ঘরের মধ্যে যেখানে-সেখানে ফেলে রাখবেন?'

রাজেনবাবু দু'হাত চিতিয়ে কাঁধ নাড়া দিয়ে হতাশার ভঙ্গি করে বললেন, 'রায়দা ব্রিফকেস বিছানায় ফেলে রাখলেও অন্তত আমি অবাক হব না। উনি দশ-বিশ লাখ টাকাকে হাতের ময়লা বলতেন। কতদিন লক্ষ্য করেছি, গাদা গাদা নোট ওঁর বিছানার চাদরের তলায় ছড়ানো আছে।'

'আপনি ডাঃ সুরেশ সরকার রোডের ফ্ল্যাটে নিশ্চয় গিয়েছেন?'

'গিয়েছি বইকি। শুধু আমি একা নই, রায়দার বন্ধুর সংখ্যা তো কম ছিল না।'

ষষ্ঠী রাজেনবাবুর জন্য কফি আনল। কর্নেল বললেন, 'কফি খান। আমি আমার ভূমিকাটা ব্যাখ্যা করছি।'

ভেবেছিলুম, রাজেনবাবু খাপ্পা হয়ে উঠবেন ক্রমশ। কিন্তু ওঁকে এতটুকু উত্তেজিত দেখাচ্ছে না। মুখে পরিচ্ছন্ন হাসি আঁকা আছে। কফিতে চুমুক দিয়ে বললেন, 'বেশিক্ষণ বসব না। লনে মোটর সাইকেল রেখে এসেছি। সিটে হেলমেটও আটকে রেখেছি। কর্নেলসায়েবের বাড়ি সেফ বলে জানি।'

কর্নেল চুরুট ধরালেন। তারপর আস্তে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'উড়ো ফোনের খবর বলুন!'

'ফোন এসেছিল। স্কাউন্ড্রেলটা লেজে খেলাচ্ছে। কাল সকালে বলবে, কোথায় কীভাবে আড়াই লাখ টাকা দিতে হবে।'

'কেউ জোক করছে না তো আপনার সঙ্গে?'

'না! রীতিমতো হুমকি। আমি গায়ে মাখছি না। বলেছি, ঠিক আছে দেব।'

কর্নেল একটু পরে বললেন, 'ঘনশ্যাম নন্দীর শ্রীহরি অটোমোবাইলস উঠে যাচ্ছে। জয়ন্তের এক বন্ধু ওখানে গাড়ির কাজ করিয়েছিল। তাই জয়ন্ত আজ ওখানে তার গাড়ির কাজ করাতে গিয়েছিল। জয়ন্ত! তুমি রাজেনবাবুকে ব্যাপারটা বলো!'

কর্নেল আমার দিকে অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করলেন। বললুম, 'ঘনশ্যামবাবুর গ্যারাজের জায়গা যাঁর, তিনি এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোককে বেচে দিয়েছেন। আমার মনে হলো, টাকা-পয়সা নিয়ে রফা হয়েছে। কারণ ঘনশ্যামবাবু বললেন, শ্রীহরি অটোমোবাইলস দরগা রোডে চলে যাচ্ছে। সেখানে একটা সাড়ে তিন কাঠার

ওপর শেড দেওয়া পুরোনো গ্যারেজ পেয়েছেন। অ্যাডভান্সও করেছেন। এবার ভাড়ায় নয়, নগদ টাকায় কিনছেন। টাকার পরিমাণ না বললেও আমার ধারণা ওই এলাকায় জমির দরই অন্তত কাঠাপ্রতি তিন থেকে পাঁচ লাখ।'

রাজেনবাবু তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। ফিক করে হেসে বললেন, 'তা হলে লটারিতে টাকা পেয়েছে ঘনশ্যাম। কিংবা সাট্টাবাজটার সঙ্গে জুটে মোটা টাকা কামিয়েছে। কর্নেল-সায়েবকে বলা উচিত। রায়দার কারবার ছিল যতসব বজ্জাতদের সঙ্গে। সুরেশ সরকার রোডে এরিয়ার কুখ্যাত সাট্টা ডন গণেশকে উনি ফ্ল্যাট ভাড়া দিয়ে গেছেন। আবার কেয়ারটেকারের দায়িত্বও গণেশ পেয়েছিল। ভাড়া থেকে ওয়ান-থার্ড বাদ দিতেন রায়দা।'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'ঘনশ্যামবাবু রায়সায়েবের ব্রিফকেস—'

তাঁকে থামিয়ে রাজেনবাবু বললেন, 'কিছু বলা যায় না। ঘনশ্যামও হাতাতে পারে। আমি কয়েকদিনের মধ্যে ঠিকই জেনে যাব, ওর টাকার সোর্স কী। উঠি কর্নেলসায়েব! শর্বরী-প্রদোষকে জানিয়ে দিয়েছেন তো কথাটা—টাকা আমি সত্যি রায়দাকে দিয়েছিলুম?'

'জানাবো। ও নিয়ে কিছু ভাববেন না। আমি আপনার হিতৈষী রাজেনবাবু!'

রাজেনবাবু হাসিমুখে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দুজনকে নমস্কার করে বেরিয়ে যাচ্ছেন, হঠাৎ কর্নেল বললেন, 'একটা কথা জানতে বাকি আছে রাজেনবাবু! শুক্রবার আনরেজিস্টার্ড ডিড আপনি আপনার লইয়ার কুমদবাবুর কাছে রেখে এসেছিলেন কেন?'

রাজেনবাবু ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, 'কী আশ্চর্য! ডিডটা তো বারাসতেই রেজিস্ট্রি হতো। কাজেই কুমুদবাবুর কাস্টডিতে রাখা সেফ ছিল। ওঃ কর্নেল! আপনি সত্যি অদ্ভুত মানুষ!'

বলে রাজেন মুখার্জি দ্রুত বেরিয়ে গেলেন।...

পাঁচ

পরদিন সকালে কর্নেলের সঙ্গে ডা. সুরেশ সরকার রোডে শ্রীলেখাদের ফ্ল্যাটে গেলুম। রায়সায়েবের এই বাড়িটার চওড়া গেট আছে। কিন্তু হাট করে খোলা। উঠোনের মতো একটুকরো জায়গায় একটা লাল মারুতি ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে টিনের শেড। বাড়িটার কোনো নাম নেই।

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে দুজনে ভেতরে গেলুম। শ্রীলেখা কথামতো দোতলার জানালায় আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত নেমে এল। নিচে সংকীর্ণ করিডরের বাঁদিকে সিঁড়ি। শ্রীলেখাকে উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। সে চাপা স্বরে বলল, 'একটু আগে কর্নেলসায়েবকে ফোন করেছিলুম। শুনলুম, আপনারা বেরিয়েছেন।'

বাড়িটা স্তব্ধ এবং কেমন যেন পোড়ো বাড়ির মতো দেখাচ্ছিল। অথচ তিনটে ফ্লোরে মোট নটা ফ্ল্যাটে লোকজন বাস করে। সিঁড়িতে ওঠার সময় কর্নেল বললেন, 'কিছু কি ঘটেছে?'

ঠোঁট আঙুল রেখে শ্রীলেখা ডানদিকের ফ্ল্যাটটা দেখাল শুধু। মধ্যের ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ দেখলুম। শ্রীলেখা বলেছিল, এই ফ্ল্যাটে এক তামিল দম্পতি থাকেন এবং তাঁর কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছেন। এখনও ফেরেননি তা হলে!

দোতলায় ডানদিকের ফ্ল্যাটের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। লক্ষ্য করলুম, চৌকাঠের ওপর কালো রঙে ইংরেজিতে শুধু লেখা আছে : এম আর। সেই বিজ্ঞাপনটার কথা মনে পড়ল।

কর্নেল রায়সায়েবের ফ্ল্যাটের দরজার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন। শ্রীলেখা চাপা স্বরে ডাকল, 'ভেতরে চলে আসুন।' তার কথায় ব্যস্ততা এবং উত্তেজনা ছিল।

বসার ঘরটা ছিমছাম সাজানো। সোফাসেট আছে। কাচের আলমারিতে পুতুল আর নানারকম লোকশিল্পের নমুনা সাজানো আছে। একটা ছোট র‍্যাকে বই ভর্তি এবং র‍্যাকের মাথায় কয়েকটা রঙিন ফোটো দেখতে পেলুম। শ্রীলেখার বালিকা বয়সের ফোটো। তার বাবা-মায়ের ফোটো।

দরজা আস্তে বন্ধ করে শ্রীলেখা আস্তে বলল, 'এতক্ষণ খুব হইহল্লা চলছিল শর্বরীদের ফ্ল্যাটে। প্রদোষ থানায় গেছে। শুনলুম, ফোনে পুলিশ ডেকেছিল। পুলিশ পাত্তা দেয়নি। তাই নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। দেখলুম, ঘনশ্যামবাবুও তার সঙ্গে গেলেন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'কিন্তু ঘটনাটা কী?'

'সেই ব্রিফকেসটা রায়সায়েবের গাড়ির তলায় পাওয়া গিয়েছে।'

'বলো কী!'

'হ্যাঁ।' বলে শ্রীলেখা মুখ বিকৃত করল। 'আমার বাবাকে কী বলব? সর্বঘটের কাঁটালি কলা। ভোরে মর্নিংওয়াকে বেরুনোর সময় বাবার ওটা চোখে পড়ে। প্রথমে ভেবেছিলেন রাস্তার কুকুর শুয়ে আছে। বাবার এক অভ্যাস! রাস্তার কুকুর দেখলে তাড়া করেন। তো ছড়ির গুঁতো মারতে গিয়ে দেখেন, কুকুর নয়। একটা ব্রিফকেস।'

'তারপর?'

শ্রীলেখা উত্তেজনায় দম নিতে থেমেছিল। বলল, 'উনি ব্রিফকেসটা ছড়ি দিয়ে টেনে আনার চেষ্টা করছিলেন। নিচের ফ্ল্যাটের মনীশবাবু দেখতে পেয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। গণেশজ্যাঠা কাল রাত্রে বর্ধমান থেকে ফিরেছে। সে-ও দেখতে পেয়েছিল। এবার কল্পনা করুন।'

'হইচই শুরু হয়েছিল?'

শ্রীলেখা আস্তে শ্বাস ছেড়ে বলল, 'হ্যাঁ। শর্বরীই নেমে গিয়ে বেশি চ্যাঁচামেচি

করছিল। আমিও দরজা লক করে নিচে গেলুম। আশ্চর্য কর্নেলসায়েব! সেই ব্রিফকেসটা। সে-রাত্রে দেখেই বুঝেছিলুম, নতুন আর দামি ব্রিফকেস। হাতলের মাথায় কোম্পানির রঙিন স্টিকার সাঁটা ছিল। রায়সায়েবের সেই ব্রিফকেস।'

'তালা আঁটা ছিল কি?'

'তাই কি থাকে? তালা ভাঙা। ভেতরে কিছু নেই।'

তার মানে টাকা হাতিয়ে নিয়ে খালি ব্রিফকেস রেখে গিয়েছে চোর!'

আমি বললুম, 'কিন্তু বাইরে কোথাও না ফেলে দিয়ে গাড়ির তলায় রাখল কেন?'

শ্রীলেখা বাঁকা হেসে বলল, 'শর্বরীকে খেপিয়ে দিয়ে মজা করতে চেয়েছে। শর্বরী থানায় ডায়েরি করেছিল শুনেছি। অবশ্য পুলিশ আসেনি। এলে জানতে পারতুম।'

কর্নেল বললেন, 'তোমার বাবা কোথায়?'

শ্রীলেখা রাগ করে বলল, 'বাবা এক ফোঁপরদালাল। থানা থেকে প্রদোষের আসতে দেরি হচ্ছে দেখে কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেলেন। এত নিষেধ করলুম। শুনলেন না। আপনারা বসুন। চা আনি। নাকি কফি খাবেন? কফি আছে। বাবা শীতকালে কফি খান।'

'থাক। কফি খেয়েই বেরিয়েছি।' বলে কর্নেল চুরুট বের করলেন। শ্রীলেখা উঠে গিয়ে পাশের ঘর থেকে একটা মাটির খুদে ভাঁড় এনে সেন্টার টেবিলে রাখল। চুরুট ধরিয়ে কর্নেল বললেন, 'ধোঁয়া ছাড়া আমার ব্রেন কাজ করে না। গন্ধটা তোমার অসহ্য লাগতে পারে।'

শ্রীলেখা বলল, 'না। আমাদের অফিসে অনেকে সিগারেট খায়। আমাদের সেলস-একজিকিউটিভ সেনসায়েব পাইপ টানেন।'

'তুমি ক'দিনের ছুটি নিয়েছ যেন?'

'পাঁচ দিনের। আজ মঙ্গলবার। কাল অব্দি ছুটি। শনিবার থেকে ছুটি নিয়েছিলুম।'

কর্নেল হাসলেন। 'তোমার প্রাইভেট ডিটেকটিভ ভদ্রলোককে কি খবর দিয়েছ, ব্রিফকেস পাওয়া গেছে?'

'আপনাকে টেলিফোন করার পর ওঁকে করেছিলুম। রিং হয়ে গেল। কেউ ধরল না।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'আচ্ছা কর্নেল! ওঁকে তো এখানে কোথাও দেখলুম না? থানায় গিয়েছেন নাকি?'

কর্নেল আমাকে আগ্রাহ্য করে তুম্বো মুখে বললেন, 'তো শ্রীলেখা, সেদিন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছিলুম।'

শ্রীলেখা বলল, 'বলুন!'

'শনিবার ভোরে তুমি রায়সায়েবের ঘরের দরজা খোলা দেখে ভেতরে ঢুকেছিলে। ঘরে কি আলো জ্বলছিল?'

'আলো?' শ্রীলেখা একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'না। বসার ঘরে আলো জ্বলছিল না। বাথরুমে জ্বলছিল। সেজন্যই তো ওঁকে দেখতে পেয়েছিলুম।'

'এবার একটু ভেবে এই প্রশ্নের উত্তর দাও। বসার ঘরে সোফার সেন্টার টেবিলে কি গ্লাস বা—ধরো, মদের বোতল এসব কিছু লক্ষ্য করেছিলে?'

শ্রীলেখা বলল, 'না। ওসব কিছুই ছিল না। সেন্টার টেবিলের দিকে আমি প্রথমেই তাকিয়েছিলুম। কারণ আমার সন্দেহ হয়েছিল, বেশি মদ খেয়ে রায়জ্যাঠামশাই হয়তো নেশার ঘোরে পড়ে আছেন। তবে দরজা খোলা থাকার ব্যাপারটা নিয়ে বাবা এবং মি. হালদারের সঙ্গে আলোচনা করেছি। উনি সেই রাত্রে সম্ভবত দরজা আটকাতে ভুলে গিয়েছিলেন। কারণ আরও একবার বাবা ভোরে বেরিয়ে দেখেছিলেন, ওঁর ফ্ল্যাটের দরজা ফাঁক হয়ে আছে এবং ওঁর কুকুরটা সেখানে বাইরে মুখ বের করে বসে আছে। বাবা কুকুরকে খুব ভয় করেন।'

'এবার বলো, রায়সায়েবকে যখন তুমি শুক্রবার রাত্রে দরজা খুলে দাও, তখন কি ঘড়ি দেখেছিলে?'

শ্রীলেখা একটু অবাক হল। 'না তো!'

'তা হলে তখন রাত আটটা, তা তুমি কী ভাবে জানলে? মনে করে দ্যাখো। তুমি আমাকে বলেছ, রাত আটটায় রায়সায়েব কলিং বেল বাজিয়ে তোমাকে ডাকেন।'

শ্রীলেখা বিব্রত বোধ করল। একটু পরে বলল, 'আসলে বাবা রোজ ওঁদের সমিতি থেকে বাড়ি ফেরেন রাত নটা-সওয়া নটায়। তাই—'

'বুঝেছি। কিন্তু এমন হতে পারে তোমার বাবা সেরাত্রে দশটা-সওয়া দশটায় বাড়ি ফিরেছিলেন!'

'বাবা বলতে পারেন।' শ্রীলেখা তারপরই বলল, 'হ্যাঁ। কোনো-কোনো রাত্রে বাবার ফিরতে দেরি হয়, তা ঠিক।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'শীতের ভোরে তোমার বাবা মর্নিংওয়াকে বের হন। বিছানার আরাম ছেড়ে উঠে দরজা আটাকাতে তোমার বিরক্তি লাগে না?'

শ্রীলেখা আড়ষ্টভাবে হাসল। 'বিরক্ত হই না বললে মিথ্যে বলা হবে। রাগ করে কোনো-কোনো দিন শুয়েই থাকি। একটু দেরি করে দরজা আটকাই। বাবা গ্রাহ্য করেন না। আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েই বেরিয়ে যান।'

এই সময় নিচে গাড়ির শব্দ শোনা গেল। শ্রীলেখা উঠে গিয়ে জানালায় উঁকি মেরে বলল, 'প্রদোষরা ফিরে এল।'

কর্নেল বললেন, 'পুলিশ এসেছে কি?'

'দেখতে পাচ্ছি না। আপনারা বসুন। আমি গিয়ে দেখি বরং।'

'যাও। তবে প্রদোষবাবুদের সামনে তোমার বাবাকে বোলো না আমরা এসেছি।' বলে কর্নেল তাকে ডাকলেন। 'হ্যাঁ—একটা কথা। তোমার বাবা কি ম্যাগাজিন পড়েন না? ম্যাগাজিন দেখছি না।'

'বাবা শুধু নিউজপেপার পড়ে।' বলে শ্রীলেখা বেরিয়ে গেল। দরজার কপাট টেনে বন্ধ করে দিল বাইরে থেকে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ এবং চাপা কথাবার্তা শোনা যাচ্ছিল। কর্নেল হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এক মিনিট। বাথরুম থেকে আসছি।'

এই ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটা রাস্তার দিকে। কর্নেল বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। আমি উঠে গিয়ে রাস্তার দিকের জানালায় উঁকি দিলুম। হালদারমশাই যে-বেশেই থাকুন চিনতে পারব। কিন্তু কাছাকাছি রাস্তায় তেমন কাউকেও চোখে পড়ল না।

ফ্ল্যাটের দরজার সামনে চাপা স্বরে কথাবার্তা চলেছে। হঠাৎ কোনো মহিলা কর্কশ স্বরে বলে উঠল, 'থাক। আর ন্যাকামি করবেন না। আপনার মেয়েকে জিজ্ঞেস করুন।'

শ্রীলেখার কথা কানে এল। 'বাজে কথা বলবে না শর্বরী! পারো তো নিজে গিয়ে আমার নামে থানায় ডায়রি করে এসো!'

পাল্টা হুমকি শোনা গেল। 'এখনও করিনি শুধু তপেশকাকুর খাতিরে।'

কর্নেল বাথরুম থেকে বেরিয়ে এলেন। চাপা স্বরে বললুম, 'রায়সায়েবের মেয়ে শ্রীলেখার সঙ্গে ঝগড়া করছে।'

কথাটা বলেই চোখে পড়ল, কর্নেল পিঠে আটকানো তাঁর কিটব্যাগ এবং গলা থেকে ঝুলন্ত ক্যামেরা আর বাইনোকুলার নিয়েই বাথরুমে ঢুকেছিলেন। উনি ওই অবস্থায় সোফায় বসেছিলেন, তা-ও মনে পড়ল। এটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। বাইরে গেলেই তাঁর গলা থেকে বাইনোকুলার আর ক্যামেরা ঝোলে। পিঠে আটকানো থাকে ওই কিটব্যাগটা। কিটব্যাগের শীর্ষে বেরিয়ে থাকে প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক। আজ অবশ্য ওটা দেখিনি। তবে ক্যামেরা-বাইনোকুলার সঙ্গে নিয়েছিলেন।

আমি তাকিয়ে আছি দেখে কর্নেল বললেন, 'বাইরে ঝগড়া হচ্ছে। কিন্তু তুমি আমার দিকে তাকিয়ে কী দেখছ?'

বললুম, 'কিটব্যাগসুদ্ধু বাথরুমে ঢুকেছিলেন? ওতে এমন মূল্যবান কি কিছু আছে?'

'তা তো আছেই।'

'এখানে রেখে গেলে কি সেটা আমি চুরি করতুম?'

কর্নেল হাসলেন। 'কী আশ্চর্য! হঠাৎ বাথরুম পেল। ওটা খুলে রাখার তর সইল না। এ নিয়ে তোমার গোয়েন্দাগিরি দেখছি হালদারমশাইকেও হার মানায়।'

'কী মুশকিল! গোয়েন্দাগিরি নয়। কিটব্যাগের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, বাইনোকুলার আর ক্যামেরাও গলায় ঝুলিয়ে কারও বাথরুমে ঢোকা অদ্ভুত লাগে না?'

কর্নেল সকৌতুকে বললেন, 'কাল রাত্রেই রাজেনবাবুর মুখে শুনেছ আমি একজন অদ্ভুত লোক! এরকম অদ্ভুত আচরণ এবার থেকে ইচ্ছে করেই করব দেখতে পাবে।'

দরজা খুলে শ্রীলেখা এবং তার বাবা তপেশবাবু ঢুকলেন। তপেশবাবু করজোড়ে বলে উঠলেন, 'নমস্কার স্যার! শ্রীলেখা, বলবি তো কর্নেলসায়েবরা এসেছেন! মি. হালদার এলেন না?'

কর্নেল বললেন, 'ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারিনি। যাই হোক, শ্রীলেখার মুখে শুনলুম—'

তপেশবাবু সোফায় ধপাস করে বসে বললেন, 'ভেরি মিসটিরিয়াস ঘটনা কর্নেলসায়েব!' বলে চাপা কণ্ঠস্বরে ইনিয়ে-বিনিয়ে উনি ঘটনাটা বর্ণনা করলেন। শ্রীলেখার মুখে যা আমরা শুনেছি, তা অবশ্য উনি একটু রঙ চড়িয়ে বললেন। তাছাড়া একটা কুকুরই নাকি ব্রিফকেসটার পাশে শুয়েছিল এবং তার লেজ বেরিয়ে ছিল বলেই ওঁর চোখে পড়ে ব্রিফকেসটা। কুকুরটা ছড়ির গুঁতো খেয়ে পালিয়ে যায়। তারপর ব্রিফকেসটা উনি দেখতে পান।

কর্নেল বললেন, 'থানায় গিয়েছিলেন। পুলিশ কী বলল?'

তপেশবাবু ফিক করে হেসে চাপা স্বরে বললেন, 'যেমন প্রদোষ তেমনই শর্বরী মিথ্যুকের মিথ্যুক। বলেছিল, পাঁচলাখ টাকা ভর্তি ব্রিফকেস হারানোর ডায়রি করেছে থানায়। আজ গিয়ে শুনলুম, পুলিশ ডায়রিই নেয়নি। কেন নেবে বলুন? ডায়রি করতে গিয়েছিল বটে; কিন্তু পুলিশ জেরা করে জানতে চেয়েছিল, ব্রিফকেসটা এবং তার ভেতরে সত্যিই টাকা ছিল কি না, প্রদোষ বা শর্বরী কি দেখেছে? দুজনেই গবেট। জেরার চোটে স্বীকার করেছিল, তারা ব্রিফকেস দেখেনি। রায়সায়েবের এক বন্ধুর কাছে শুনেছে। সেই লোকটাকে রায়সায়েব নাকি মধ্যমগ্রামের বাগানবাড়ি বিক্রি করেছেন। ওরা সেই লোকটাকে থানায় ডেকে আনতে চেয়েছিল। সে নাকি মহা ধূর্ত লোক। এই গণ্ডগোলে কেন জড়াতে আসবে? তা ছাড়া পুলিশ কোনো থার্ড পার্টির কথা শুনবে কেন? সে তো বাইরের লোক। কাজেই ডায়রি নেয়নি পুলিশ।'

'আজ কী বলল, পুলিশ?'

'থানায় গিয়ে দেখলুম, ডিউটি অফিসার পাত্তা দেয়নি। বড়বাবুর জন্য প্রদোষ আর ঘনশ্যাম অপেক্ষা করছিল। আমি যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বড়বাবু এলেন। সব কথা শুনে বড়বাবু বললেন, রায়সায়েব মানে মহেন্দ্র রায় তো? তার ব্যাকগ্রাউন্ড পুলিশের জানা। চোরাই গাড়ি কেনা-বেচার কারবার করত। প্রদোষকে কী অপমান না করলেন বড়বাবু! শেষে ঝুলির বেড়ালও বের করে দিলেন। গুজব শুনতুম, শর্বরী রায়সায়েবের নিজের মেয়ে নয়। বড়বাবু খুলে বলে দিলেন কথাটা।'

শ্রীলেখা বলল, 'শর্বরীর থোঁতা মুখ ভোঁতা হবে। কিন্তু পুলিশ কেসটা নিলে

ভালো হতো। কর্নেলসায়েব আর মি. হালদার একদিকে, পুলিশ অন্যদিকে তদন্তে নামলে চোর শিগগির ধরা পড়ত।'

তপেশবাবু বাঁকা মুখে বললেন, 'ছেড়ে দে। চোর কে, তা না হয় কর্নেলসায়েবরাই গোপনে তদন্ত করে জানতে পারলেন। কিন্তু টাকাগুলো কি উদ্ধার করতে পারবেন? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঘনা—ওই ঘনশ্যাম নন্দীই তো বিছানার তলা থেকে ব্রিফকেস চুরি করে টাকাগুলো হাতিয়ে গতরাত্রে খালি ব্রিফকেসটা ফেলে দিয়েছে। এটা সে ইচ্ছে করেই করেছে। ভেবেছে তুই আর আমি খালি ব্রিফকেস দেখে শোকে আকুল হব।'

তপেশ মজুমদার কথাগুলো বলে ঠোঁট কামড়ে ধরলেন। মনে হলো, ছেড়ে দে বললেন বটে, কিন্তু ওঁর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের আগুন জ্বলছে।

শ্রীলেখাও ঠোঁট কামড়ে ধরেছিল। শ্বাস ছেড়ে বলল, 'অতগুলো টাকা অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করবে ঘনশ্যামকাকু?'

তপেশবাবু বললেন, 'তোরই বোকামি। তবে টাকাটা তোর বা আমার নয়। তা ছাড়া রায়সায়েবও আর বেঁচে নেই। তখন অবশ্য ভেবেছিলুম বিবেকের দায় বলে কথা। এখন মনে হচ্ছে, পাপের কড়ি পাপেই খায়। রায়সায়েবের লাইফ হিস্ট্রি থানার বড়বাবুর মুখে শুনে আর তার ওপর আমার কোনো সিমপ্যাথি নেই।'

বলে তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। 'কর্নেলসায়েবদের চা-কফি খাইয়েছিস?'

কর্নেল বললেন, 'শ্রীলেখাকে নিষেধ করেছি। আমরা কফি খেয়েই বেরিয়েছিলুম। যাই হোক, এবার উঠি।'

শ্রীলেখা বলল, 'কর্নেলসায়েব! বাবা যা-ই বলুন, আমি কিন্তু পিছিয়ে আসছি না। বাবা আমাকে চেপে যেতে বলেছিলেন। আমিই পুলিশকে জানানোর জন্য ইনসিস্ট্ করেছিলুম। তখন বাবা বললেন, পুলিশকে এসব কথা জানানো ঠিক হবে না। বরং তাঁর পরিচিত একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ আছেন—'

কর্নেল উঠে দাঁড়িয়ে তাকে থামিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। মি. হালদারকে যখন তোমার বাবা তোমার পক্ষ থেকে লড়িয়ে দিয়েছেন, তখন তিনি এর কিনারা না করে থামবেন না। তার চেয়ে বড় কথা, মি. হালদার গত রবিবার আমার বাড়িতে জোর দিয়ে বলেছিলেন, শ্রীলেখাই আমার ক্লায়েন্ট। তার মানে কি বুঝতে পারছ? তোমার বাবা ওঁকে নিষেধ করলেও উনি থামবেন না।'

আমি হাসি চেপে বললুম, 'হালদারমশাইকে শ্রীলেখা দেবীও যদি থামতে বলেন, উনি থামবেন না।'

তপেশবাবু চিন্তিত মুখে বললেন, 'শ্রীলেখার পীড়াপীড়িতে অকারণ একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। পাঁচ লাখ টাকার ব্যাপার। ঘনাবাবু হোক কিংবা যে-ই, হোক, গায়ে পড়লে সে ফোঁস করে ছোবল মারবে। যা দিনকাল পড়েছে!'

শ্রীলেখা রুষ্ট মুখে বলল, 'তুমি চুপ করো তো! তোমার সমিতি নিয়ে থাকো তুমি। আমার ব্যাপার আর নাক গলাবে না বলে দিচ্ছি।'...

আমরা রাস্তায় পৌঁছেছি, সেই সময় দেখলুম উল্টো দিকে গোড়াবাঁধানো একটা বটগাছের তলায় একজন খাটো লুঙি এবং ফুলহাতা সোয়েটার পরা লোক ঠেলাওয়ালাদের সঙ্গে কথা বলছে। মুখে গোঁফদাড়ি। মাথায় মাফলার জড়ানো। আমাদের দিকে লোকটা একবার ঘুরে আবার কথা বলতে থাকল। চিনতে পারলুম। গোয়েন্দাপ্রবর এই রাস্তার সাধারণ লোকজনের সঙ্গে নিজেকে একাকার করতে পেরেছেন।

তপেশবাবু আমাদের বিদায় দিতে এসেছিলেন। আমরা গাড়িতে উঠে বসলে তিনি কর্নেলকে মিনতি করে বললেন, 'নির্বোধ মেয়ের কথা কানে নেবেন না স্যার। আপনি মি. হালদারকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। আমিও গোপনে ওঁকে বলব। খামোখা ঝামেলা করে আর লাভ নেই। ঘনা বেয়াড়া লোক। তাকে গণেশের শাগরেদ। আমাকে বা শ্রীলেখাকে প্রাণে মেরে দেবে।'

কর্নেল বললেন, 'বলব। আপনি চিন্তা করবেন না। হ্যাঁ—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গিয়েছি।'

তপেশবাবু সাগ্রহে বললেন, 'বলুন স্যার।'

'শুক্রবার রাত্রে আপনি ঠিক কটা নাগাদ বাড়ি ফিরেছিলেন?'

'তা সওয়া নটা হবে। ওই যে পার্কের মোড়ে আমাদের সমিতির অফিস দেখছেন। ওখান থেকে হেঁটে আসতে যেটুকু সময় লাগে।'

'এই বাড়িতে ঢোকার সময় কি কাউকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলেন?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' তপেশবাবু চঞ্চল হয়ে উঠলেন। 'দেখেছিলুম। মনে পড়ছে বটে।'

'তাকে চিনতে পেরেছিলেন?'

'স্ট্রিট-লাইটে পেছনদিকটা দেখেছিলুম তবে চেনা মনে হয়েছিল আসলে সে-রকম চেনা নয়। রায়সাহেবের কাছে অনেকেই আসত। তাকেও দেখেছি সম্ভবত। তা না হলে চেনা মনে হবে কেন?'

'তারপর আপনি সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকেছিলেন?'

তপেশবাবু একটু অবাক হলেন। 'হ্যাঁ। কিন্তু সেদিন তো এসব কথা জিজ্ঞেস করেননি! আজ কেন জিজ্ঞেস করছেন কর্নেলসায়েব?'

কর্নেল হাসলেন। 'মি. হালদার তদন্ত করে জানতে পেরেছেন, সে-রাতে ঠিক ওই সময় একজন বাইরের লোক এ বাড়িতে ঢুকেছিল। দেখা যাচ্ছে, মি. হালদার ঠিক জেনেছেন তা হলে। আর একটা কথা। আপনি নিজের ফ্ল্যাটে ঢোকার সময় রায়সায়েবের ফ্ল্যাট কি বন্ধ দেখেছিলেন?'

তপেশবাবু কর্নেলের প্রশ্নে ক্রমশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছিলেন। বললেন, 'মনে পড়ছে না।'

'কোনো কারণে কি অন্যমনস্ক ছিলেন?'

'না, না। মানে—সবসময় সব ব্যাপার লক্ষ্য থাকে না তো!'

'ফ্ল্যাটটা তালাবন্ধ থাকলে সিঁড়িতে দোতলায় ওঠার মুখে চোখে পড়ার কথা।'

তপেশবাবুকে নার্ভাস দেখাচ্ছিল। একটু ইতস্তত করে বললেন, 'তালাবন্ধ দেখিনি মনে পড়ছে।'

'তার মানে, রায়সায়েব ঘরে ছিলেন?'

'সম্ভবত।'

'তপেশবাবু! এই গেটের কাছ থেকে দেখা যায়, রায়সায়েবের ঘরে আলো জ্বলছিল কি না।'

তপেশবাবু এতক্ষণে যেন জলের ভেতর থেকে মাথা তুললেন। শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। ওঁর ঘর আলো জ্বলছিল। আপনি এই কথাটা না বললে মনে পড়ত না।'

'আপনি রাত্রে কখনও ওঁর ঘরে ঢুকেছেন?'

'না। রাত্রে মদের আসর বসত। তা ছাড়া রায়সায়েব একা থাকলেও মাতাল অবস্থায় আছেন ভেবে রাত্রে পারতপক্ষে ওঁর ঘরে কখনও ঢুকিনি।'

হঠাৎ শ্রীলেখার আবির্ভাব হল। রাগে ফুঁসে উঠে তপেশবাবুকে বলল, 'কর্নেলসায়েবের সময়ের দাম নেই? তুমি ওঁকে সাধাসাধি করতে এসেছ যেন উনি এ ব্যাপার আর মাথা না ঘামান। তাই না? কর্নেলসায়েব! বাবার কথা শুনবেন না। বাবাকে আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয় রেখার বাবার সঙ্গে কোনো কথা হয়েছে।'

তপেশবাবু বললেন, 'আঃ! কী হচ্ছে? রাস্তায় সিন ক্রিয়েট করতে এসেছিস তুই?'

কর্নেল আমাকে বললেন, 'চলো জয়ন্ত! দেরি হয়ে গেল।'

পদ্মপুকুর পার্কের কাছে গিয়ে কর্নেল আমাকে গাড়ি থামাতে বললেন। কেন বললেন, একটু পরে বুঝতে পারলুম। ছদ্মবেশী হালদারমশাই হন্তদন্ত এসে পড়লেন। বললেন, 'খবর আছে কর্নেলস্যার!'

কর্নেল বললেন, 'গাড়িতে উঠে বসুন। আপনাকে আর কষ্ট করে তপেশবাবুর গতিবিধি জানতে হবে না।'...

ছয়

হালদারমশাই গাড়িতে ওঠার সময় তাঁর বগলদাবা একটা নোংরা মোটাসোটা কাপড়ের ব্যাগ দেখতে পেলুম। গাড়ি স্টার্ট দিয়ে বললুম, 'আপনি কি এই বেশেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ পিছনের সিটে বসে ততক্ষণে গোঁফ-দাড়ি ওপড়াতে শুরু করেছেন। বললেন, 'নাঃ! ভোর সাড়ে পাঁচটায় পদ্মপুকুর পার্কে নামছিলাম। তারপর পার্কে গিয়া এই ড্রেস ধরছিলাম।'

'কেউ ছিল না পার্কে?'

'প্রচণ্ড শীত। মধ্যিখানে ওই চত্বর দেখলেন? ওখানে ভবঘুরেরা আগুন জ্বালছিল। আমি ঝোপের ফাঁকে লুঙ্গিখান শুধু পরলাম। গোঁফ-দাড়ি আটকাইয়া দিলাম। তিন মিনিটের কাম।' বলে হালদারমশাই কর্নেলের পিঠের পাশে মুখ আনলেন। 'খবর এখন কমু কর্নেলস্যার?'

কর্নেল বললেন, 'খবরটা যদি হয় রায়সায়েবের গাড়ির তলায় পাওয়া ব্রিফকেস, তা হলে বলার দরকার নেই।'

হালদারমশাই ব্যগ্রভাবে বললেন, 'সে-খবর তো আপনি লইছেন, গেটের বাইরে জয়ন্তবাবুর গাড়ি দেইখ্যাই বুঝছিলাম। আমি কই অন্য কথা।'

'বলুন তা হলে।'

গোয়েন্দাপ্রবর এবার চাপা স্বরে বললেন, 'শ্রীলেখাদের বাড়ির উল্টোদিকে বটতলায় বইয়া ছিলাম। ঠেলাওয়ালারা আগুন জ্বালছিল। তখন ছয়টা বাজে। সবে ওখানে গিয়া বইছি। হঠাৎ শ্রীলেখাদের বাড়ির ছাদ থেইকা কীসব জিনিস পড়ল। বটতলার কেউ লক্ষ্য করে নাই। তখনই গিয়া দেখি, আবর্জনার গাদার ওপর দড়ি দিয়া গোল কইর‍্যা বান্ধা—দেখাইতাছি আপনারে।'

বলে তিনি ব্যাগের ভেতর হাত ভরলেন। কর্নেল তাঁর দিকে না ঘুরেই বললেন, 'রঙিন পত্রিকা!'

'অ্যাঃ?' হালদারমশাই চমকে উঠলেন। 'আপনি জানেন?'

কর্নেল এবার ঘুরে তাঁর হাত থেকে পত্রিকার বান্ডিলটা নিলেন। আমি অবাক হয়ে বললুম, 'পত্রিকার বান্ডিল ওভাবে কে ফেলল? ইংরেজি পত্রিকা মনে হচ্ছে!'

কর্নেল বললেন, 'এখন আর কোনো কথা নয়। বাড়ি ফিরে আগে কফি।'

হালদারমশাই আস্তে বললেন, 'হেভি মিস্ট্রি!'...

অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে কর্নেল ষষ্ঠীচরণকে কফি আনতে বললেন। আমি পত্রিকার মোটাসোটা বান্ডিলটা খুলে দেখার জন্য উসখুস করছিলুম। কিন্তু কর্নেল ওটা তাঁর টেবিলের নিচের ড্রয়ারে চালান করে দিলেন। তারপর তাঁর কিটব্যাগের চেন খুলে একই মাপের আরও একগাদা পত্রিকা বের করে সেই ড্রয়ারে ঢোকালেন। বললুম, 'আপনিও দেখছি অনেকগুলো ম্যাগজিন পেয়েছেন! একই ম্যাগাজিন মনে হলো। কোথায় পেলেন? আমি তো আপনার সঙ্গেই ছিলুম। দেখতে পেলুম না কেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'এগুলো আমার ব্যাগেই ছিল।'

'তাহলে হালদারমশাইয়ের কুড়োনো ম্যাগাজিনগুলোর সঙ্গে রাখলেন কেন?'

'একই পত্রিকা। তাই একসঙ্গে রাখলুম।'

হালদারমশাই বললেন, 'কর্নেলস্যার! বাথরুমে যাব।'

'হ্যাঁ। আপনার হাত-মুখ ধুয়ে ফেলা দরকার। যান। গরম জলও পাবেন। পোশাক ঠিকঠাক করাও দরকার। ফ্রেশ হয়ে আসুন।'

হালদারমশাই ড্রয়িংরুম-সংলগ্ন বাথরুমে গিয়ে ঢুকলেন। দেখলুম, কর্নেল চোখ বুজে সাদা দাড়ি মুঠো করে ধরে টানছেন। বললুম, 'আপনি এভাবে চোখ বুজে দাড়ি টানাটানি করলেই বুঝতে পারি, অঙ্কটা মিলছে না।'

কর্নেল চোখ খুললেন না। বললেন, 'অঙ্ক নয় জয়ন্ত! আতঙ্ক বলতে পারো।'

'বলেন কী! কিসের আতঙ্ক?'

'প্রাণের।'

'আপনার প্রাণের?' বলে হেসে ফেললুম। 'আপনার প্রাণ যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে যখন যায়নি, তখন কারও সাধ্য নেই আপনার প্রাণের ওপর হামলা করে।'

কর্নেল আমার কথায় কান না দিয়ে আপনমনে বললেন, 'লোকটা কি এত বোকা হবে?'

'কোন্ লোকটা?'

কর্নেল চোখ খুলে সোজা হয়ে বসলেন। তারপর টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'রিং হয়ে যাচ্ছে। কেউ ধরছে না। বাড়িতে লোকজন কেউ নেই নাকি?'

ষষ্ঠীচরণ কফি আর স্ন্যাক্সের ট্রে রেখে গেল। কর্নেল রিসিভার রেখে কফির পেয়ালা তুলে নিলেন। কাকে ফোন করেছিলেন, জানতে চাইলুম না। কারণ ওঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারছিলুম কোনো প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব পাব না।

হালদারমশাই প্যান্ট-শার্ট জ্যাকেট পরে তাঁর স্বাভাবিক চেহারা নিয়ে ফিরে এলেন। বললেন, 'কর্নেলস্যারের কাছে একখান পুরানো নিউজপেপার লমু।'

কর্নেল বললেন, 'দিচ্ছি। আপনার ছদ্মবেশভর্তি ব্যাগটা কাগজে জড়িয়ে নেওয়া উচিত। চেহারা এবং পোশাকের সঙ্গে ফিট করছে না।'

'ঠিক কইছেন।' বলে হাসিমুখে গোয়েন্দাপ্রবর বসলেন। তারপর কফির পেয়ালা তুলে যথারীতি ফুঁ দিয়ে চুমুক দিতে থাকলেন।

একটু পরে টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। '...হ্যাঁ, বলছি। শুনুন। কিছুক্ষণ আগে আপনাকে রিং করেছিলুম। বাড়িতে কোনো লোক থাকে না বুঝি?...ও!...শুনুন! আমি আপনার সাড়া না পেয়ে ভেবেছিলুম, আপনি হয়তো আমার কথা গুরুত্ব দেননি।...হ্যাঁ, ব্যাপারটা সিরিয়াস। আপনি বরং কয়েকদিন জন্য বাইরে কোথাও ঘুরে আসুন।...হ্যাঁ—আশা করি, শিগগির একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।...না, না। রিস্ক নেবেন না। রাখছি।'

রিসিভার রেখে কর্নেল স্বগতোক্তি করলেন, 'লোভ অনেকসময় মানুষকে অন্ধ করে।'

হালদারমশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'কারে অন্ধ করল?'

কর্নেল তাঁর কথায় কান দিলেন না। বললেন, 'হালদারমশাই! আপনাকে এবার একটা কাজ করতে হবে।'

'কন?'

'দরগা রোডে ঘনশ্যাম নন্দীকে যে ভদ্রলোক জমিসমেত গ্যারেজ বিক্রি করছেন, তাঁর নাম কী?'

হালদারমশাই জ্যাকেটের ভেতর থেকে একটা খুদে নোটবই বের করে পাতা উল্টে দেখে বললেন, 'সাহিল খান। নন-বেঙ্গলি মুসলিম।'

'কোনো তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। আপনি আপনার নিজের বুদ্ধি অনুসারে কাজ করবেন। আবার বলছি, তাড়াহুড়ো করবেন না।'

'কাজটা কী কন কর্নেলস্যার!'

'সহিল খানের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জেনে নেবেন, ঘনশ্যাম নন্দী একা ওঁর গ্যারাজ কিনছেন, নাকি কোনো পার্টনার আছে। সেই পার্টনারের নাম কী!'

হালদারমশাইকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল। বললেন, 'সাহিল খান বেশি কথা কইতে চান না। কেমন য্যান বাঁকাচোরা কথাবার্তা। পাত্তা দিতেই চান না।'

বললুম, 'আপনাকে ভদ্রলোক ইনকাম ট্যাক্স অফিসের লোক ভেবেছিলেন সম্ভবত।'

কর্নেল হাসলেন। 'জয়ন্ত ঠিক ধরেছে মনে হচ্ছে। আপনাকে টিপিক্যাল ওই লাইনের লোক সাজতে হবে। না—পোশাকে নয়। কথাবার্তায়। আপনি বরং এক কাজ করবেন। থিয়েটার রোড এরিয়ায় একটা গাড়ি মেরামতের গ্যারেজ আছে। আমার যখন গাড়ি ছিল, ওখানেই কাজ করাতুম। এক মিনিট।'

বলে উনি টেবিলের একটা ড্রয়ার টেনে কতকগুলো কার্ড বের করলেন। সেগুলো টেবিলে রেখে আবার কতকগুলো বের করে খুঁজতে থাকলেন। ড্রয়ারটা অজস্র নেমকার্ড ভর্তি। কিছুক্ষণ খোঁজার পর একটা কার্ড হাতে নিয়ে কর্নেল বললেন, 'চার বছর আগে আমার ল্যান্ডরোভার গাড়িটা বেচেছি। তারপর থেকে জয়ন্তের কাঁধে চেপে বেড়াচ্ছি। অবশ্য জয়ন্ত এসব ব্যাপারে খুব উদার।'

বললুম, 'মোটেও না। এক্সক্লুসিভ একেকটা থ্রিলিং স্টোরি ছেপে দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার পসার বেড়েছে। আমার গাড়ির ফুয়েল খরচের ব্যাপারে তাই কর্তৃপক্ষ একেবারে মুক্তহস্ত। আমি কি নিজের ট্যাকের পয়সা খরচ করি?'

কর্নেল ততক্ষণে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করছিলেন। লাইন পেয়ে বললেন, 'সরলবাবু? আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...হ্যাঁ। ভালো আছি। আপনি— না, না। গাড়ি কিনিনি। একটু মন দিয়ে শুনুন। আমার খুব আপনজন মি. কে কে হালদার। খুলেই বলি। উনি একজন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার। বর্তমানে প্রাইভেট ডিটেকটিভ।...না। কোনো গোলমেলে ব্যাপার নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। একটা কেসের ব্যাপার মি. হালদারের গাড়ি মেরামত এবং গ্যারেজ সংক্রান্ত ট্রেনিং দরকার। আপনাকে শুধু একটু কোঅপারেট করতে হবে। উনি আপনাদের কাজকর্ম ওয়াচ করবেন। কথাবার্তা শুনবেন।...হ্যাঁ। ঠিক ধরেছেন। মি. হালদার

বুদ্ধিমান এবং অভিজ্ঞ মানুষ। দু'দিনই যথেষ্ট। তবে ওঁর পরিচয় যেন গোপন থাকে।...হ্যাঁ। অসংখ্য ধন্যবাদ। উনি আমার নেমকার্ড নিয়ে আপনার কাছে যথাসময়ে যাবেন। ছাড়ি। কেমন?'

রিসিভার রেখে কর্নেল হালদারমশাইকে একটা নেমকার্ড দিলেন। তারপর সরলবাবুর গ্যারেজের ঠিকানা লিখে দিলেন। হালদারমশাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন। তখনই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কর্নেলস্যারের কী কমু? থিয়োরিটিক্যালি জানি, ডিটেকটিভেরে সর্ববিদ্যাবিশারদ হইতে হয়। এই ট্রেনিংটা আমার প্রফেশনে সত্যই দরকার ছিল। কর্নেলস্যার! জয়ন্তবাবু! যাই গিয়া।'

গোয়েন্দাপ্রবর সবেগে প্রস্থান করলেন। হাসতে হাসতে বললুম, 'কে বা কারা একটা গাড়ি মেরামতের জায়গা কিনছে, তার জন্য হালদারমশাইকে এভাবে লড়িয়ে দিলেন বস? রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি।'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'রহস্য কীসের? হালদারমশাইয়ের এ ধরনের ট্রেনিং ভবিষ্যতের কাজে লাগতেই পারে। কলকাতার এইসব গ্যারেজের মধ্যে পরস্পর এলাকাভিত্তিক যোগযোগ আছে। কাজেই আমি যা জানতে চাইছি, তা হালদারমশাই ওখানেও দৈবাৎ জেনে যেতেও পারেন।'

বললুম, 'আপনি আজ আর কোথাও বেরুবেন নাকি?'

'কিছু ঠিক নেই। তবে আপাতত আমিও আর তাড়াহুড়ো করছি না। দরকার হলে তোমাকে খবর দেব।'

বললুম, 'একটা কথা। রায়সায়েবের রিভলভার হারানোর ব্যাপারে ওঁর মেয়ে-জামাই পুলিশকে কি কিছু জানায়নি? আপনি তপেশবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন না কেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'তপেশবাবু যখন রিভলভার সম্পর্কে কোনো কথা বললেন না, তখন ধরেই নিয়েছি, প্রদোষ ও শর্বরী পুলিশের কাছে এ ব্যাপারটা চেপে গেছে।'

'চেপে যাওয়ার কী কারণ থাকতে পারে, রিভলভারটার যদি লাইসেন্স থাকে?'

'বোঝা যাচ্ছে, লাইসেন্স ছিল না। তা থাকলে রায়সায়েবের ফ্ল্যাটে কোনো নিরাপদ জায়গায় পাওয়া যেত। ধরো, আলমারির লকার কিংবা এ ধরনের কোনো জায়গায়। বার্ষিক রিনিউয়্যালের কাগজপত্রও থাকত।'

'তাহলে ওটা বেআইনি অস্ত্র?'

'তাছাড়া আর কী?' বলে কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজলেন।...

সেদিন সন্ধ্যায় দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকা থেকে কর্নেলকে টেলিফোন করেছিলুম। ষষ্ঠীচরণ সাড়া দিয়ে বলেছিল, 'বাবামশাই বিকেলে বেরিয়েছেন। কিছু বলতে হবে?'

বলেছিলুম, 'বলবে, আমি ফোন করেছিলুম।'

রাত্রে সল্টলেকে ফিরে ভেবেছিলুম কর্নেলকে টেলিফোন করি। কিন্তু করিনি। একটু অভিমান হয়েছিল। ঠিক করেছিলুম, উনি নিজে থেকে ফোন না করলে ওঁকে আমিও এড়িয়ে থাকব। আমার ধারণা, এই কেসের ব্যাপারে কোনো কারণে উনি আমাকে হয়তো এড়িয়ে থাকছেন।

পরে মনে পড়েছিল কর্নেল বলেছিলেন, তাড়াহুড়ো না করে আস্তেসুস্থে এগোতে চান। তাই হয়তো উনি কোথাও পাখি-প্রজাপতি বা অর্কিডের খোঁজে ঘুরতে বেরিয়েছেন। কলকাতা ছেড়ে অনেকসময় কর্নেল দূরদূরান্তে পাড়ি জমান। আমাকে সবক্ষেত্রে সঙ্গী করেন, এমন তো নয়।

শুক্রবার সন্ধ্যায় অফিসে বসে পুলিশসূত্রে পাওয়া বড়রকমের একটা ছিনতাইয়ের খবর জমকালো করে লিখছি, টেলিফোন বেজে উঠল। সাড়া দিতেই কর্নেলের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'জয়ন্ত! বাড়ি ফেরার পথে ষষ্ঠীর হাতের এক পেয়ালা কফি খেয়ে যেয়ো!'

বললুম, 'আপনার গতিবিধি এই কদিনে যত রহস্যজনক হোক, তা নিয়ে আমি কিন্তু মাথা ঘামাইনি।'

'ঠিক করেছ ডার্লিং! খামোকা হয়রান হতে। যাই হোক, এসো কিন্তু!'

'কিছু খবর আশা করছি কর্নেল!'

পেতে পারো।' বলে কর্নেল টেলিফোন ছেড়ে দিলেন।...

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্ট পৌঁছুতে সাড়ে সাতটা বেজে গেল। ড্রয়িংরুমে হালদারমশাইকে দেখে বললুম, 'বাঃ! ট্রেনিং শেষ করে হালদারমশাইও এসে গেছেন দেখছি!'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ হাসতে হাসতে বললেন, 'ট্রেনিং একদিনেই শেষ।'

'সে কী!'

'কর্নেলস্যারেরে জিগান।'

কর্নেল চুরুট টানছিলেন। একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'ট্রেনিং একদিনে শেষ হওয়ার কথা নয়। তবে হালদারমশাই একদিনেই জেনে ফেলেছিলেন, দরগা রোডে সাহিল খানের গ্যারেজের খদ্দের কারা। কারা বলছি। কারণ যা অনুমান করেছিলুম, মিলে গেছে।'

হালদারমশাই বলে উঠলেন, 'সরলবাবুর হেডমেকানিক খোকন রঙের মিস্তিরিরে কইছিল, দরগা রোডে সাহিল মিয়াঁর গ্যারাজ আবার খুলবে। নতুন মালিক একজন ভালো রঙের মিস্তিরি খুঁজছেন। সরলবাবু পেমেন্ট ঠিকমতো করেন না। রঙের মিস্তিরি কইল, তুমি এখানে কাজ ছাড়লে আমিও ছাড়ব। দুইজনের কথা আমার কানে আইতেই ওত পাতছিলাম।'

বললুম, 'বুঝলুম। কিন্তু নতুন মালিকদের একজন তো ঘনশ্যাম নন্দী। অন্যজন?'

কর্নেলকে মুখ খোলার সুযোগ দিলেন না হালদারমশাই। বললেন,

'রায়সায়েবেরে দেখলাম অরা ভালোই চেনে। খোকন কইল, রায়সায়েবের জামাই তার বাড়িতে গেছিল। তখনই বুঝলাম প্রদোষ আর এক পার্টনার।' কথাগুলো এক নিঃশ্বাসে বলার পর হালদারমশাই একটিপ নস্যি নিলেন।

কর্নেল বললেন, 'এটা স্বাভাবিক। রায়সায়েবের ফ্ল্যাটে প্রচুর নগদ টাকা থাকতেই পারে। দশ-বিশ লাখ টাকা নাকি ওঁর হাতের ময়লা ছিল।'

বললুম, 'কিন্তু ঘনশ্যাম নন্দীকে তা হলে অর্ধেক টাকা দিতে হয়েছে। সাহিল খান পনেরো লাখে গ্যারেজ বেচছেন বলেছিলেন। ঘনশ্যামবাবু যদি মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের কাছে পাঁচ লাখ আদায় করতে পারেন, বাকি আড়াই লাখ জোগাড় করা তাঁর পক্ষে হয়তো অসম্ভব নয়।'

হালদারমশাই বললেন, 'কী কন জয়ন্তবাবু! আমার ক্লায়েন্টের কাছে রায়সায়েবের ব্রিফকেসে পাঁচ লাখ টাকা ছিল। ঘনশ্যাম তা চুরি করছিল। কাজেই আড়াই লাখ টাকা দেওয়ার প্রব্লেম কীসের?'

ষষ্ঠীচরণ আমার জন্য কফি আনল। কর্নেল বললেন, 'কফি খেয়ে নার্ভ চাঙ্গা করে নাও জয়ন্ত!'

কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'নার্ভ চাঙ্গা করে আমার লাভ নেই। চোর কে, তা জানা গেছে। কিন্তু প্রমাণ করা যাবে না। রায়সায়েবের রিভলভার কে চুরি করেছে, তা-ও জানার উপায় নেই। সত্যসেবক পত্রিকায় যে একটা চমকপ্রদ এক্সক্লুসিভ স্টোরি করব, তার আইনসম্মত ভিত্তিও তো নেই।'

কর্নেল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল হাঁক দিলেন, 'ষষ্ঠী!'

একটু পরে গোপালনগর জয় মা নার্সারির সেই হারাধন মল্লিক ঘরে ঢুকলেন। কর্নেল বললেন, 'আসুন মল্লিকমশাই! বসুন!'

মল্লিকমশাই সোফায় বসে হালদার-মশাইয়ের দিকে তাকালেন। 'ওঁকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?'

কর্নেল বললেন, 'আমার ঘরেই দেখেছেন। উনি মি. কে কে হালদার। আপনাকে যেমন মল্লিকমশাই বলি, ওঁকে তেমনই হালদারমশাই বলি। হালদারমশাই! বলুন তো ইনি কে?'

গোয়েন্দাপ্রবর ফিক করে হাসলেন। 'চিনছি। আপনারে উনি কুমড়োপটাশ দিতে আইছিলেন!'

মল্লিকমশাই হাসলেন না। কিন্তু কর্নেল ও আমি হেসে ফেললুম। কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ—জয়ন্তের ভাষায় কুমড়োপটাশ। ওগুলো একরকম ক্যাকটাস। প্রজাতির নাম লাতিন ভাষায় পারোদাইয়া সাঙ্গুইনিফ্লোরা। লাল রঙের চমৎকার ফুল ফোটায়।'

মল্লিকমশাই বললেন, 'কুমড়ো নয়, বরং আনারস বা গোল এঁচোড়ের সঙ্গে মিল আছে খানিকটা।'

মল্লিকমশাইয়ের জন্য ষষ্ঠীচরণকে কফি আনতে বলে কর্নেল তাঁর দিকে ঘুরলেন। 'কলকাতা এসেছিলেন কোনো কাজে। নাকি—'

হারাধন মল্লিক মাথায় জড়ানো মাফলার খুলতে খুলতে কর্নেলের কথার ওপর বললেন, 'হ্যাঁ। কলকাতা এসেছিলুম নিজের কাজে। ফেরার পথে আপনাকে খবরটা দিতে এলুম।'

'বলুন। এঁদের সামনেই বলতে পারেন, যত গোপনীয় হোক।'

হারাধন চাপা স্বরে বললেন, 'রাজেন মধ্যমগ্রামের সেই বাগানবাড়ি কিনছে বলেছিলুম। গতকাল বিকেলে বারাসতে গিয়ে বিশ্বস্ত সূত্রে শুনলুম, সেদিনই ডিড রেজেস্ট্রি হয়েছে। আজ সকালে ওর বাড়ি হয়ে এসেছি। কথায়-কথায় রাজেন স্বীকার করল, বাগানবাড়িটা কিনে বড্ড ভুল করেছে। গতরাত্রে ওখানে থাকতে গিয়েছিল। ভূতের উৎপাতে রাতদুপুরে মোটরসাইকেলে চেপে পালিয়ে এসেছে। বাগানবাড়িটা নাকি সত্যিই ভূতুড়ে। রাজেন ওটা বিক্রি করে দেবে। ওর কথা শুনে আমি একটু লোভে পড়ে গিয়েছিলুম। ঈশ্বরের আশীর্বাদে আমি যাঁকে গুরু ধরেছি, তিনি বিরাট শক্তিধর তান্ত্রিক। তাই আমার মনে বরাবর জোর আছে।'

'আপনি কিনতে চাইলেন?'

'হ্যাঁ। কিন্তু রাজেনের তো চক্ষুলজ্জার বালাই নেই। মুখের ওপর বলে দিল, তার হাতে তিরিশ লাখ টাকার অফার আছে। আমি কিনলে পঁচিশ লাখে দেবে। হাড়েবজ্জাত আর কাকে বলে। কিনেছে মাত্র পাঁচ কিংবা ছ'লাখ।'

আমি চমকে উঠেছিলুম মল্লিকমশাইয়ের কথা শুনে। রায়সায়েব তো গত শনিবার মারা গিয়েছেন। তা হলে গতকাল ডিড রেজিস্ট্রি হলো কী করে? প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল। 'আচ্ছা মল্লিকমশাই! সম্পত্তি কেনা-বেচার ডিড রেজিস্ট্রি হয়ে কী ভাবে?'

কর্নেল আমার দিকে চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'আশ্চর্য জয়ন্ত! তুমি একজন সাংবাদিক। তা ছাড়া নিজে সল্টলেকে ফ্ল্যাট কিনেছ! তোমার জানা উচিত কী ভাবে রেজিস্ট্রেশন হয়।'

বুঝলুম, প্রশ্নটা তোলা ঠিক হয়নি। কিন্তু মল্লিকমশাই বলে উঠলেন, 'মফস্সলে প্রপার্টি ডিড রেজিস্ট্রেশনে হাঙ্গামা নেই। ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার বা সাবরেজিস্ট্রার বিক্রেতার দিকে তাকিয়ে শুধু জিজ্ঞেস করেন, টাকা পেয়েছেন? ব্যস! কেউ হয়তো আর একটা কথা জিজ্ঞেস করেন, কতখানি জমি বেচলেন? এইমাত্র।'

হালদারমশাই সায় দিয়ে বললেন, 'ঠিক কইছেন। আমি দেখছি। বেশি কিছু জিগায় না।'

ষষ্ঠী কফি দিয়ে গেল। মল্লিকমশাই কফি খেতে খেতে সহাস্যে বললেন, 'গুরুদেবকে বলে রাজেনের কেনা বাগানবাড়িতে আরও এক ডজন ভূত লেলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করব।'

কর্নেল বললেন, 'মল্লিকমশাই! ওই বাগানবাড়ি বিক্রির বিজ্ঞাপনের কথাগুলো নিশ্চয় ভুলে যাননি?'

'না। বড্ড গোলমেলে।'

'শুধু ভূতের জন্য গোলমেলে নয় মল্লিকমশাই! আমার ধারণা শরিকি ঝামেলা আছে।'

'আলবাত আছে। রাজেন এখন তা জেনে গিয়েছে বলেই ভূতের বদনাম রটাচ্ছে। বুঝুক ঠ্যালা।'

কফি খাওয়ার পর হারাধন মল্লিক বিদায় নিলেন। এবার বললুম, 'আচ্ছা কর্নেল তা হলে রাজেন মুখার্জি একজন জাল রায়সাহেবকে রেজেস্ট্রি অফিসে হাজির করেছিলেন। তাই না?'

কর্নেল চোখ বুজে কিছু ভাবছিলেন। বললেন, 'সে তো বোঝাই যাচ্ছে।'

'এবার রায়সায়েবের মেয়ে-জামাই ডাক্তারের ডেথ সার্টিফিকেটের সাহায্যে রাজেনবাবুর বিরুদ্ধে জালিয়াতির মামলা করলেই তো কেলেংকারি।'

হালদারমশাই গুলিগুলি চোখে তাকিয়ে ছিনেল। বললেন, 'কর্নেলস্যার! এট্টু বুঝাইয়া কন তো!'

কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। চোখ খুলে হঠাৎ হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে তিনি ডায়াল করতে থাকলেন। সাড়া এলে বললেন, 'শ্রীলেখা? আমি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার বলছি।...হ্যাঁ। শোনো। রায়সায়েবের ফ্ল্যাটে ওঁর মেয়ে-জামাই এখনও আছে কিনা জানো?...তোমার বাবা ঠিক জানেন?... কখন?...আচ্ছা, রাখছি। ...না, না। তোমার এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

রিসিভার রেখে কর্নেল ব্যস্তভাবে বললেন, 'জয়ন্ত! হালদারমশাই! কুইক!' জিজ্ঞেস করলুম, 'কোথায় যাবেন?'

'দমদম এরিয়ায়। এক মিনিট। তোমার নিচে অপেক্ষা করো। আমি আসছি।' বলে কর্নেল ভেতরের ঘরে চলে গেলেন।...

সাত

কোথায় চলেছি, তা বুঝতে পেরেছিলুম। কিন্তু দমদম এলাকা আমার একেবারে অচেনা বললেই চলে। কর্নেলের সঙ্গে বারদুয়েক এই এলাকায় এসেছিলুম। কর্নেলের নির্দেশ অনুসারে অনেক ছোট-বড় রাস্তা এবং গলিতে ক্রমাগত বাঁক নিতে নিতে মোটামুটি চওড়া একটা রাস্তায় পৌঁছেছিলুম। কর্নেল বললেন, 'সামনে বাঁকের মুখে বাঁদিকে গাড়ি দাঁড় করাবে।'

এই রাস্তার দু'ধারে কদাচিৎ দোকানপাট দেখা যাচ্ছিল। বাঁকে একটা পানের দোকানের কাছে ফুটপাত ঘেঁষে গাড়ি দাঁড় করালুম। স্ট্রিট-লাইট থেকে ফুটপাতে আলো ছড়াতে বাধা দিয়েছে সারবন্দি ঝাঁকড়া বেঁটে গাছ। গাড়ি লক করে

কর্নেলকে অনুসরণ করলুম। বোঝা যাচ্ছিল, কর্নেল বাড়িটা চেনেন। তার মানে, আমার অজ্ঞাতসারে রায়সায়েবের আদত বাড়িটাতে এসেছেন।

বাঁদিকে একটা গেটের মাথায় আলো জ্বলছিল। কর্নেল সেখানে গিয়ে আস্তে ডাকলেন, 'ধরমবীর!'

পাশের একতলা ছোট্ট ঘরের বারান্দা থেকে বেঁটে, গুঁফো এবং মোটাসোটা একটা লোক এগিয়ে এল। তার মাথায় গেল ছাইরঙা টুপি, পরনে খাকি প্যান্ট এবং গায়ে জড়ানো আস্ত কম্বল। সে একবার অকারণ টর্চ জ্বেলেই নিভিয়ে দিল। তারপর কর্নেলকে দেখে সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'আইয়ে কর্নিলসাব!'

কর্নেল বললেন, 'তোমার সায়েব-মেমসায়েবের সঙ্গে দেখা করব ধরমবীর! শুনলুম, ওঁর এন্টালি এরিয়ার বাড়ি থেকে এ বাড়িতে ফিরেছেন।'

'জি হ্যাঁ কর্নিলসাব! আপনারা কৃপাসে এক মিনিট থামবেন। আমি খবর ভেজে আসছি।'

'ধরমবীর! তুমি আমার এই কার্ডটা নিয়ে যাও।'

ধরমবীর কার্ড নিয়ে এগিয়ে গেল গাড়িবারান্দার দিকে। গাড়িবারান্দার ভেতরে আলো জ্বলছিল। দু'ধারে দুটো থাম। একটা গাড়ি দেখা যাচ্ছিল। দোতলার দুটো আলো জ্বলছিল।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, 'এমন অভদ্র ক্যান? গেট খুলল না।'

কর্নেল বললেন, 'গেট খুলে ধরমবীর ভেতরে নিয়ে গেল না। বোঝা যাচ্ছে ওর মালিকের নিষেধ আছে। তবে আমি যা আশঙ্কা করে ছুটে এলুম, তা ভুল মনে হচ্ছে।'

জিজ্ঞেস করলুম, 'খুনখারাপির আশঙ্কা নয় তো?'

কর্নেল গলার ভেতরে বললেন, 'চুপ!'

অন্তত পাঁচ মিনিট পরে ধরমবীর ফিরে এসে ভেতরে থেকে গেটের তালা খুলে দিল। বলল, 'আসুন কর্নিলসাব!'

আমরা ভেতরে ঢুকলে সে তালা আটকে দিল। তারপর আমাদের পাশ কাটিয়ে সামনে গেল। চাপা স্বরে বলল, 'রাজেনবাবু এসেছেন কর্নিলসাব! রাজেন মুখার্জি।'

কর্নেল জিজ্ঞেস করলেন, 'উনি কখন এলেন?'

'সাব-মেমসাব আসলেন বিকালে। উনি আসলেন ছ'টার সময়ে। মোটরসাইকেলে আসলেন।'

গাড়িবারান্দার কাছে গিয়ে দেখলুম, একটা মোটরসাইকেল দাঁড় করানো আছে। ধরমবীর আমাদের যে ঘরে বসতে বলল, সেটা বনেদি রীতির হলঘর। ভেতর থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। আমরা সোফায় বসলুম। ধরমবীর বলল, 'ছোটাসাব এক্ষুণি আসবেন।'

দোতলায় কুকুরের ডাক শোনা গেল। তারপর একটা প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়্যান কুকুরের গলায় বাঁধা চেন হাতে ধরে বলিষ্ঠ গড়নের এক যুবক নেমে এল। কুকুরটা

সম্ভবত হালদারমশাইকেই সহ্য করতে পারছিল না। তাঁর দিকে ঝাঁপ দেবার ভঙ্গি করছিল।

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'প্রদোষবাবু! কুকুরের উপদ্রবে যা বলতে এসেছি, তা বলা হবে না। কুকুরটাকে সরান। আর রাজেনবাবু এসেছেন, তাঁকেও ডাকুন।'

প্রদোষ ভুরু কুঁচকে বলল, 'রাজেনকাকুকে আপনি চেনেন?'

'চিনি। আপনিও আমাকে চেনেন—মানে, ডা. সুরেশ সরকার রোডে আপনার শ্বশুরের বাড়িতে আমি নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছিলুম। বিশেষ করে আমার এই মার্কামারা চেহারা সহজেই চোখে পড়ার কথা।'

এই সময় সিঁড়ির ওপর থেকে রাজেনবাবুর কথা শোনা গেল। 'প্রদোষ! কাকে কুকুরের ভয় দেখাচ্ছ? কর্নেলসায়েবের আসল পরিচয় তুমি জানো না! কুকুর সরাও শিগগির!'

প্রদোষ কুকুরের চেনটা ধরমবীরের হাতে দিয়ে বলল, 'জনিকে ওপরে রেখে এসো।'

ধরমবীর কুকুরটাকে টানতে টানতে ওপরে নিয়ে গেল। ততক্ষণে রাজেন মুখার্জি নেমে এসেছেন। প্রদোষ একটু তফাতে বসল। তাকে দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম, এতক্ষণে মদের আসরে ছিল। রাজেনবাবু কর্নেলের মুখোমুখি বসে হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনার কার্ড দেখামাত্র বুঝে গিয়েছি, আপনি আসলে আমাকেই ফলো করে এসেছেন। আচ্ছা কর্নেলসায়েব! আপনি আমাকে উড়োফোনের হুমকি থেকে বাঁচাবেন এই ভরসায় আছি। আর আপনি উল্টে আমাকে বিপদে ফেলার তালে আছেন। খুলে বলুন তো আমার অপরাধটা কী?'

কর্নেল বললেন, 'রাজেনবাবু! আমি আপনার কাছে আসিনি। এসেছি প্রদোষবাবুর কাছে। আপনার সঙ্গে কথা বলার দরকার হলে টেলিফোনে বা আপনার বাড়িতে গিয়েই বলব। অন্যত্র নয়।'

'আপনার মেজাজ ভালো নেই মনে হচ্ছে। ঠিক আছে। প্রদোষের সঙ্গে কথা বলুন। আমি কেটে পড়ি।'

বলে রাজেন মুখার্জি উঠে দাঁড়ালেন। প্রদোষ বলল, 'রাজেনকাকু! তুমি ওপরে গিয়ে বসতে পারো। এখনই চলে যাবে কেন?'

'আর বসব না। প্রায় সাড়ে নটা বাজে। কাল আমার অনেক কাজ।'

রাজেনবাবু বেরিয়ে গেলেন। প্রদোষ তাঁকে বিদায় দিতে গেল। ততক্ষণে ধরমবীর কুকুর বেঁধে রেখে এসেছে। সে-ও দ্রুত বেরিয়ে গেল। তাকে গেটের তালা খুলে দিতে হবে।

হালদারমশাই চাপা স্বরে বললেন, 'কর্নেলস্যার! কেমন অভদ্র দ্যাখেন! আপনি একজন অনারেবল পার্সন। আপনারে রায়সায়েবের জামাই নমস্কার পর্যন্ত করল না?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আমি অন্য একটা কথা ভাবছি। এখানে প্রদোষ ও শর্বরী সায়েব-মেমসায়েব। এমন একটা বনেদি বাড়িতে বাস করে। গেটে দারোয়ানও আছে। অথচ এন্টালি এলাকার রায়সায়েবের ওই বাড়িতে তারা নিছক সাধারণ লোক হয়ে ওঠে। থানার পুলিশ পর্যন্ত পাত্তা দেয় না। তার মানে, মানুষের দরদাম বাড়ে-কমে পরিবেশ অনুসারে।'

এই সময় প্রদোষ ফিরে এল। তারপর একটু তফাতে আগের মতো বসে কর্নেলকে বলল, 'আপনাকে সুরেশ সরকার রোডে তপেশবাবু আর তাঁর মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছিলুম। তখন ভেবেছিলুম আপনি ওদের অফিসের লোক-টোক কেউ হবেন। এখন রাজেনকাকুর কাছে শুনলুম আপনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ।'

কর্নেল গম্ভীর মুখে বললেন, 'না। রাজেনবাবু আপনার সঙ্গে জোক করেছেন। আসলে আপনার শ্বশুর রায়সায়েবকে আমি চিনতুম। আপনি আমাকে তপেশবাবু ও শ্রীলেখার সঙ্গে কথা বলতে দেখেছেন, তা ঠিক। তপেশবাবুর সঙ্গে আমি আপনার শ্বশুর সম্পর্কে খবর নিচ্ছিলুম। যদি বলেন, আপনার বা আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কেন দেখা করিনি, তাহলে বলব আপনাদের মানসিক অবস্থার কথা বুঝেই ডিসটার্ব করতে চাইনি।'

প্রদোষ কর্নেলের কথা গ্রাহ্য করল বলে মনে হলো না আমার। সে বলল, 'ঠিক আছে। আমার কাছে কেন এসেছেন বলুন!'

'মধ্যমগ্রাম এলাকায় রায়সায়েবের একটা বাগানবাড়ি আছে।'

প্রদোষ তাঁর কথার ওপর বলল, 'শ্বশুরমশাই রাজেনকাকুকে বেচে দিয়েছেন।'

'কত টাকায় বেচেছেন? সেলডিড নিশ্চয় আপনি দেখেছেন?'

'দেখুন, শ্বশুরমশাই ছিলেন খেয়ালি লোক। যাকে পছন্দ করতেন, তাকে স্বর্গে তুলে দিতেন। রাজেনকাকুকে মাত্র ছ'লাখ টাকায় নন্দনকানন বেচেছেন, এতে অবাক হইনি। তবে পাঁচ লাখ অ্যাডভান্স দিয়ে ডিড করিয়েছিলেন, রাজেনকাকু। সেই টাকাগুলো শ্বশুরমশাইয়ের ফ্ল্যাট থেকে চুরি গিয়েছে। এতেও কিন্তু আমি অবাক হইনি। শ্বশুরমশাই নেশার ঘোরে দরজা খুলে রাখলে চুরি যেতেই পারে।'

'আপনি সেলডিড কি দেখেছেন?'

'দেখেছি। কিন্তু আপনি এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন কেন?'

'বলছি। আগে বলুন, সেলডিড কি রেজিস্টার্ড ডিডের কপি? কারণ এত শিগগির রেজিস্ট্রি অফিস থেকে ওরিজিন্যাল রেজিস্টার্ড ডিড পাওয়া যায় না।'

প্রদোষ কর্নেলের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'জানি। রাজেনকাকু আমাদের ল-ইয়ার মুকুন্দ হাজরার সামনে আমাকে যে ডিড দেখিয়েছেন, তা আনরেজিস্টার্ড। শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার দিন তাতে সই করেছিলেন। রাজেনকাকু বলেছেন, বাকি এক লাখ টাকা একমাসের মধ্যে দেবেন।'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'এবার আমার কথাটা বলি। আমি প্রাইভেট ডিটেকটিভ নই।' তিনি হালদারমশাইকে দেখিয়ে ফের বললেন, 'ইনি একজন বিগ বিজনেসম্যান। ইনি তিরিশ লাখ টাকায় নন্দনকানন কিনতে চান। রায়সায়েব যদি উইল করে তাঁর সব সম্পত্তি আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর নামে দিয়ে থাকেন, নন্দনকাননের মালিকানা আপনাদেরই।'

এই সময় সিঁড়ির ওপর থেকে কোনো মহিলার কর্কশ কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'বাবার উইলে সম্পত্তির মালিক আমি।'

দেখলুম, নাইটির ওপর শাড়ি পরা গোলগাল গড়নের এক যুবতী চটি ফটফটিয়ে নেমে আসছে। সে প্রদোষের পাশে এসে দাঁড়াল। কর্নেল বললেন, 'আপনিই কি রায়সায়েবের মেয়ে শর্বরী?'

'হ্যাঁ। তখন থেকে শুনছি নন্দনকানন নিয়ে কথা হচ্ছে। বাবার উইল কোর্টে প্রোবেট করতে দিয়েছি। ওতে বাবার স্থাবর-অস্থাবর সব প্রপার্টি আমার নামে দেওয়া হয়েছে।'

কর্নেল বললেন, 'বাঃ! এরকম স্ট্রেটকাট কথাবার্তাই আমি পছন্দ করি। আচ্ছা শর্বরী দেবী, উইলে কি নন্দনকাননের উল্লেখ আছে?'

'আছে। সেইজন্যই তো রাজেনকাকু রোজ এসে তেল দিচ্ছে আমাকে। ল-ইয়ার মুকুন্দবাবু বলেছেন, একবার উইল করার পর সেই উইল না বদলে কেউ তার কোনো স্থাবর সম্পত্তি বেচে দিতে পারে না। নন্দনকানন বেচে বাবা উইলের শর্ত ভেঙেছেন।'

প্রদোষ বলল, 'আঃ শর্বরী! তুমি আকরণ মামলা-মোকদ্দমায় জড়ানোর প্ল্যান করেছ। আমি আরও দুজন বড় ল-ইয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি তাঁরা বলেছেন, উইলকারী নিজের প্রয়োজনে প্রপার্টির কোনো অংশ বেচতেই পারেন।'

কর্নেল বললেন, 'শর্বরী দেবী! এই ভদ্রলোক নন্দনকানন কিনতে চান। তিরিশ লাখ টাকা দেবেন। আপনি রাজেনবাবুকে চাপ দিন। হ্যাঁ—আর একটা কথা।' বলে তিনি আমাকে দেখালেন। 'এই ভদ্রলোক থাকেন বারাসতে। ইনিই মধ্যমগ্রাম এরিয়ায় রায়সায়েবের বাগানবাড়ির খোঁজ দেন আমার বিজনেসম্যান বন্ধুকে। দুজনেই এখানে উপস্থিত। তো যা বলছিলুম। বারাসাত রেজিস্ট্রেশন অফিস থেকে আজ কী খবর জেনেছেন, বলুন মি. চৌধুরি!'

একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলুম। সামলে নিয়ে বললুম, 'গতকাল নন্দনকাননের মালিক রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে জনৈক রাজেন মুখার্জিকে—মানে, ফাঁকে কিছুক্ষণ আগে এখানে দেখলুম, তাঁকেই নন্দনকানন বেচে দিয়েছেন। ছ'লাখ টাকার দলিল রেজেস্ট্রি হয়ে গিয়েছে।'

প্রদোষ কিছু বলতে যাচ্ছিল। শর্বরী চেঁচিয়ে উঠল আগেকার মতো কর্কশ কণ্ঠস্বর। 'কী? গতকাল বাবা রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে নন্দনকানন রেজেস্ট্রি করে

দিয়েছেন? বাবা মারা গিয়েছেন গত শনিবার। রাজেনকাকু বাবার ভূতকে হাজির করিয়েছিল রেজেস্ট্রি অফিসে?'

বললুম, 'প্লিজ! উত্তেজিত হবেন না। বরং কাল রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে হেডক্লার্কের কাছে খবর নিন। নিজের পরিচয় দেবেন না যেন।'

এতক্ষণে প্রদোষ বলে উঠল, 'শর্বরী! রাজেনকাকু আমাকে বলে গেলেন, এই কর্নেল ভদ্রলোক প্রাইভেট ডিটেকটিভ। তুমি এসব কথায় কান দিয়ো না। কাল সন্ধ্যায় নন্দনকাননে পার্টি দিচ্ছেন রাজেনকাকু। ওখানেই বাকি এক লাখ টাকা মিটিয়ে দেবেন।'

শর্বরী খাপ্পা হয়ে বলল, 'তুমি চুপ করে থাকো! পার্টিতে তুমি গিয়ে স্ফূর্তি করবে। আমি কাল সকালে মুকুন্দবাবুকে সঙ্গে নিয়ে যাব। বাবার ডেথ সার্টিফিকেট দেখাব রেজেস্ট্রি অফিসে। তারপর থানায় গিয়ে জালিয়াতির কেস ঠুকে দেব রাজেন মুখার্জির নামে।'

কর্নেল বললেন, 'শর্বরী দেবী! যা কিছু করবেন, সব যেন গোপনে করেন। রাজেন মুখার্জিকে আমি চিনি। সাংঘাতিক লোক।'

শর্বরী বলল, 'আমার হাতেও সাংঘাতিক লোক আছে। গণেশকাকুকে এখনই ফোন করে সব জানাচ্ছি।'

প্রদোষ বলল, 'শর্বরী! খামোখা ঝামেলা বাড়িয়ো না। রাজেনকাকু বাগড়া দিলে দরগা রোডের গাড়ির গ্যারেজ হাতছাড়া হয়ে যাবে। ঘনশ্যামবাবু আর আমি পঞ্চাশ হাজার করে এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স দিয়েছি মনে রেখো।'

শর্বরী ধমক দিল। 'রাখো তোমার গ্যারেজ!' বলে সে আগের মতো চটি ফটফটিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল।

প্রদোষ বলল, 'কোনো মানে হয়? ও মশাই! আপনারা এবার আসুন তো! খামোখা একটা অশান্তি বাধিয়ে দিলেন।' বলে সে উঠে দাঁড়াল 'এক্ষুনি না গেলে আমি জনিকে লেলিয়ে দেব। চলে যান বলছি!'

কর্নেল তুম্বো মুখে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আপনাকে একটা কথা বলে যাওয়া উচিত প্রদোষবাবু! রাজেনবাবুর ফাঁদে পা দেবেন না। আপনার স্ত্রী বুদ্ধিমতী মহিলা। তাঁকে আপনি সাহায্য করুন। তা না হলে দুজনেই বিপদে পড়বেন।'

প্রদোষ প্রায় গর্জন করল। 'থাক! কেটে পড়ুন এবার।'...

গেটের বাইরে গিয়ে বললুম, 'আপনি সত্যিই একটা ঝামেলা বাধিয়ে এলেন কর্নেল! পাঁচলাখ টাকা কে চুরি করেছে, এটাই ছিল মূল কেস। আপনি কেন যে বেলাইনে পা বাড়ালেন বুঝতে পারছি না।'

হালদারমশাই উদ্বিগ্নভাবে বললেন, 'কিছু বুঝলাম না।'

কর্নেল বললেন, 'যথাসময়ে বুঝবেন।'

গাড়ি স্টার্ট করার পর কর্নেল বললেন, 'যে-পথে এসেছি, ওপথে নয়। সিধে

চলো জয়ন্ত! সিঁথির মোড় হয়ে যাব। এত রাত্রে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ট্রাফিক জ্যামের ভয় নেই।'

কিছুক্ষণ পরে তিনি চুরুট ধরালেন। চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। হালদারমশাই বললেন, 'নস্য লই। ব্যাবাক ভুইল্যা গিছলাম। একখান ড্রামা দ্যাখলাম য্যান! মাথা ভোঁ ভোঁ করতাছে।'

কর্নেল বললেন, 'জয়ন্ত বেলাইনে যাওয়ার কথা বলছিলে! বাইরে থেকে ট্রেনে হাওড়া স্টেশনের দিকে আসবার সময় অসংখ্য লাইন চোখে পড়ে। তাই না? তুমি জানো না, ট্রেন কোন্ লাইন ধরে গেলে নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মে পৌঁছোবে।'

উপমা দিয়ে কর্নেল চুপ করে গেলেন। সারাপথ একেবারে চুপ।...

শীতকালে আমি পারতপক্ষে সাড়ে সাতটার আগে শয্যাত্যাগ করি না। ঘুম ভাঙলেও কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকি। পরদিন ঠিক ওই সময়টাতেই বিরক্তিকর টেলিফোনের শব্দ। মশারির ভেতর থেকে হাত বাড়িয়ে রিসিভার টেনে বলে দিলুম, 'রং নাম্বার!'

'রাইট নাম্বার ডার্লিং!'

'গুড মর্নিং কর্নেল!'

'মর্নিং জয়ন্ত! বুঝতে পারছি বিছানা ছেড়ে ওঠোনি!'

'কোনো খবর আছে নিশ্চয়?'

'একটুখানি আছে। তবে আমার ইচ্ছে, তুমি এখনই বেরিয়ে পড়ো। কারণ আমার এখানে তোমার ব্রেকফাস্টের নেমন্তন্ন।'

'এখনই বেরুব? মানে, বাথরুম ইত্যাদি—'

'তোমার ইচ্ছে।...'

কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্ট সওয়া আটটা নাগদ পৌঁছে দেখি, তপেশ মজুমদার আর তাঁর কন্যা শ্রীলেখা গম্ভীরমুখে বসে আছেন।

কর্নেল বললেন, 'হালদারমশাইও এসে পড়বেন। বোসো। পটে এখনও প্রচুর কফি আছে। তৈরি করে নাও।'

কফিতে চুমুক দিয়ে বললুম, 'আবহাওয়া গম্ভীর মনে হচ্ছে। নতুন কিছু কি ঘটেছে?'

শ্রীলেখা বলে উঠল, 'আমি কী বলব? বাবাকে জিজ্ঞেস করুন। সবতাতে বাবার নাক গলানো চাই-ই। কিসে কী ঘটতে পারে একটুও চিন্তা করে না।'

তপেশবাবু বললেন, 'ভুল যা হবার হয়ে গেছে। স্বীকার করছি, কথাটা আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু তখন যা অবস্থা, কথাটা বললে হিতে বিপরীত হবে ভেবেই বলিনি। গত রাত্রে ঠিক করলুম, চেপে রাখা ঠিক হচ্ছে না। তাই ভোরবেলা তোকে ঘুম থেকে জাগিয়ে বলে দিলুম।'

এই সময় ডোরবেল বাজল। কর্নেল যথারীতি হাঁকলেন, 'ষষ্ঠী!'

প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার হন্তদন্ত ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। তাঁর মক্কেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গতরাত্রে ভাবছিলাম শ্রীলেখাকে ফোন করুম।'

কর্নেল বললেন, 'বসুন হালদরমশাই! কফি খেয়ে আগে নার্ভ চাঙ্গা করুন।'

হালদারমশাইকে কফি তৈরি করে দিয়ে কর্নেল বললেন, 'শ্রীলেখাকে কেন ফোন করবেন ভেবেছিলেন হালদারমশাই?'

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, 'রায়সায়েবের গাড়ি এখনও ওখানে আছে, না লইয়া গেছে, তা জানবার ইচ্ছা ছিল।'

শ্রীলেখা বলল, 'শর্বরী গাড়ির চাবি ঘনশ্যামকাকুকে দিয়ে এসেছিল। এখানে আসবার সময় দেখে এলুম, ঘনশ্যামকাকু গণেশকে গাড়িতে চাপিয়ে নিয়ে কোথায় গেল।'

বললুম, 'তা হলে শর্বরী সদলবলে বারাসত যাবে। প্রদোষের তোয়াক্কা করবে না।'

কর্নেল বললেন, 'ওসব কথা থাক। তপেশবাবু! আপনি এবার হালদারমশাইকে কথাটা জানিয়ে দিন।'

তপেশবাবু একটু কেশে নার্ভাস ভঙ্গিতে বললেন, 'কথাটা আগে বলা উচিত ছিল।'

শ্রীলেখা রুষ্টমুখে বলল, 'ভণিতা না করে সোজাসুজি বলো!'

'বলি।' তপেশবাবু আবার একটু কাশলেন। 'শুক্রবার রাত্রে সমিতি থেকে ফিরে সিঁড়ি বেয়ে উঠছি, সেইসময় দেখলুম রায়সায়েব আমাদের ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে যাচ্ছেন। আমাকে দেখে উনি বললেন, আসুন। একটু গল্প করা যাক। পরে বুঝতে পেরেছিলুম, উনি শ্রীলেখাকে টাকাভর্তি ব্রিফকেস লুকিয়ে রাখার জন্য সময় দিতে চেয়েছিলেন। তো আমি ওঁর ঘরে ঢুকে টের পেলুম, নেশা করে এসেছেন। জিজ্ঞেস করলুম, শ্রীলেখার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন বুঝি? উনি বললেন, হ্যাঁ। আপনার মেয়েকে বলছিলুম, শর্বরীর নামে প্রপার্টি উইল করে রেখেছি। কালই উইল বদলাব। তুই পূর্বজন্মে আমার মেয়ে ছিলিস। অন্তত এই বাড়িটা তোর নামে দিয়ে যাব। বলে উনি হঠাৎ পেট চেপে ধরে বললেন, পেটের ভেতরটা কেমন করছে। বসুন। বাথরুম থেকে আসি। তারপর যে-পোশাকে ছিলেন, সেই পোশাকেই বাথরুমে ঢুকে পড়লেন। মিনিট পাঁচেক পরে বেরিয়ে এসে বললেন, পেটের গণ্ডগোল হলো কেন বুঝতে পারছি না। ওঁকে হজমের ট্যাবলেট খেতে বললুম। উনি বেডরুমে গিয়ে পোশাক বদলে এলেন। বললেন, দুপুরে খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে। তারপর আবার বাথরুমে ঢুকলেন। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এসে টেবিলের ড্রয়ার থেকে দুটো ট্যাবলেট খেলেন। আমি বললুম, বরং ডাক্তারকে ফোন করুন। রায়সায়েব বললেন, দেখা যাক, এই

ট্যাবলেটে কমে নাকি। মদের গন্ধ আমার সহ্য হয় না। উঠে চলে এলুম। বলে এলুম, দরজা আটকে দিন। উনি বললেন, দিচ্ছি।'

হালদারমশাই কান খাড়া করে শুনছিলেন। এবার বললেন, 'রাত্রে আর খোঁজ লন নাই?'

'না। শীতের রাত্রে লেপের তলায় ঢুকলে আর বেরুতে ইচ্ছে করে না।'

শ্রীলেখা বলল, 'আজ ভোরের ব্যাপারটা বলো!'

তপেশবাবু বললেন, 'হ্যাঁ। আজ ভোরে নিচে নেমে দেখি, সেই কুকুরটা রায়সায়েবের গাড়ির তলায় শুয়ে আছে। তাকে ছড়ির খোঁচা মেরে তাড়িয়ে দিলুম। তারপর দেখি, কী একটা সাপের মতো জিনিস। ওখানে সাপ আসবে কোথা থেকে? তো—'

কর্নেল টেবিলের ড্রয়ার থেকে ব্রাউন রঙের বেল্টসহ একটা ফায়ার আর্মস ঢোকানো চামড়ার কেস বের করে সহাস্যে বললেন, 'রায়সায়েবের হারানো রিভলভার!'

চমকে উঠেছিলুম। হালদারমশাই বললেন, 'দেখি, দেখি!'

কর্নেল খুদে একটা আগ্নেয়াস্ত্র বের করে বললেন, 'এ সত্যিকার রিভলভার নয় এবং পিস্তলও নয়। নেহাত একটা টয় পিস্তল। যাত্রা-থিয়েটারে বা সিনেমায় ব্যবহার করা হয়। নিছক খেলনা। এটা দেখিয়েই রায়সায়েব কত লোককে তটস্থ রাখতেন। চোর ব্যাপারটা টের পেয়ে সেই ব্রিফকেসটার মতোই এটা ফেলে দিয়েছে।'

বললুম, 'সেই ব্রিফকেসটার মতোই মানে?' মতোই বলছেন কেন?'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'নিজেই বুঝে নাও এর মানে কী?'

হালদারমশাই ফোঁস শব্দে শ্বাস ছেড়ে বলে উঠলেন, 'হঃ! বুঝছি।'...

আট

তপেশবাবু ও শ্রীলেখা চলে যাওয়ার পর কর্নেল বললেন, 'হালদারমশাই! আপনাকে আজ একটা কাজের দায়িত্ব দেব।'

হালদারমশাই বললেন, 'কন কর্নেল-স্যার!'

'একটু ঝুঁকি আপনাকে এ কাজে নিতেই হবে।'

'লমু! আমার লাইসেন্সড ফায়ার আর্মস আছে। খেলনার জিনিস না, সিক্স রাউন্ডার খাঁটি রিভলভার।'

'জানি। তাই বলে আপনাকে মানুষ খুন করতে বলছি না। আমার কথাগুলো মন দিয়ে শুনুন।' কর্নেল ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে বললেন, 'মধ্যমগ্রাম এরিয়ার রায়সায়েবের বাগানবাড়ি নন্দন-কাননে যাওয়ার ম্যাপ এঁকে

দিচ্ছি। আপনি সেখানে চলে যান। নন্দনকাননের কেয়ারটেকারের নাম রঘু। সাধুসন্ন্যাসীর মতো চেহারা। তবে প্যান্টশার্ট-সোয়েটার পরে থাকে। গাঁজা খায়। হ্যাঁ—ও বাড়িতে ঢুকলে দিনদুপুরেও ভূতের সাড়া পাবেন। কিন্তু ভয় পাবেন না। গ্রাহ্যও করবেন না। আপনি রঘুর সঙ্গে ভাব জমাবেন। আর ভাব জমাতে হলে আপনাকে সাধুসন্ন্যাসীর ছদ্মবেশ ধরতে হবে। আপনি তো এ কাজ খুব দক্ষ এবং অভিজ্ঞ।'

'হুঃ! আপনি দ্যাখছেন। জয়ন্তবাবুও দ্যাখছেন। কতবার সন্ন্যাসী সাজছি!'

'আজ সন্ধ্যায় নন্দনকাননে রাজেন মুখার্জি পার্টি দেবেন। কাজেই আপনার এখনই চলে যাওয়া দরকার। আপনি বাগানবাড়িটার কাছাকাছি গিয়ে জোরে ওং হ্রীং ক্রীং—এই রকম মন্ত্রটন্ত্র হুঙ্কার দিয়ে আওড়াবেন। আশা করি, রঘু আপনাকে খাতির করে নন্দনকাননে ঢোকাবে। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আছে। ঝোপজঙ্গল আছে। রঘুকে বলে আপনি ওখানে ঢুকে আসন করে বসবেন। শীতকালে সাপের ভয় নেই। রঘুকে বলবেন, গোপনে সাধনা করতে এসেছেন। এই জায়গাটা আপনার পছন্দ।'

উত্তেজনায় গোয়েন্দাপ্রবরের গোঁফের দুই ডগা তিরতির করে কাঁপছিল। বললেন, 'ওসব যা করার আমি করব। আমার আসল কাজটা কী, তা-ই কন কর্নেলস্যার!'

'বলছি। আপনি এমন জায়গায় আসন করবেন—'

'ধুনি জ্বালব না?'

'না। ধুনি জ্বাললে রাজেনবাবুর চোখে পড়বে। শুধু তা-ই নয়, অন্য কারও চোখে পড়বে। তো যা বলছিলুম। আপনি এমন জায়গায় আসন করবেন, যেখান থেকে মোটামুটিভাবে অনেকটা জায়গা চোখে পড়ে। কারও সন্দেহজনক গতিবিধি চোখে পড়লে লক্ষ্য রাখবেন। একটা কথা। সন্ধ্যায় বাগানবাড়িতে পার্টি হবে। কিন্তু বাড়িটা আলো দিয়ে সাজানো হবে কি না জানি না। আপনি তা টের পাবেন। যদি বাড়ির চারধারে আলো জ্বালা না হয়, আপনি বাড়ির কাছাকাছি লুকিয়ে থাকার মতো ঝোপঝাড় পাবেন। না—দিনে নয়, সন্ধ্যার সময় আপনি গোপনে ডেরা থেকে বের হবেন।'

'কিন্তু আমার আসল ডিউটিটা কী কইলেন না?'

'আপনি বিচক্ষণ মানুষ। আপনার প্রচুর অভিজ্ঞতা আছে এসব লাইনে। নিজের কাজ নিজেই বুঝতে পারবেন। দরকার শুধু তীক্ষ্ণ-দৃষ্টে নজর রাখা।'

'শুধু এই? আর কিছু না?'

কর্নেল চোখ খুলে বললেন, 'বললুম না? কারও সন্দেহজনক গতিবিধি বা কাজকর্ম দেখলে উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে যা করা উচিত, তা-ই করবেন।'

'আপনারা ওখানে থাকবেন কি?'

'রাজেন মুখার্জি আমাদের নেমন্তন্ন করেননি। যদি করেন, থাকব। যদি না-ও করেন, আমরা থাকব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু হালদারমশাই কি বাড়ি থেকেই সন্ন্যাসী সেজে যাবেন?'

প্রাইভেট ডিকেটিভ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অসুবিধা নাই। গেরুয়া কাপড়ের ঝুলি আছে। মড়ার খুলি আছে। আর যা দরকার, সবই সঙ্গে লমু। চিন্তা করবেন না।'

কর্নেল বললেন, 'এক মিনিট। ম্যাপ এঁকে আপনাকে জায়গাটা কোথায়, তা বুঝিয়ে দিই। ওদিকটায় কাছাকাছি বসতি নেই। বাঁশঝাড়, পোড়া ইটখোলা, আমবাগান আর ধান বা সবজিখেত আছে।'

কিছুক্ষণ পরে গোয়েন্দাপ্রবর যথারীতি 'যাই গিয়া' বলে সবেগে বেরিয়ে গেলেন।...

ব্রেকফাস্ট করার সময় কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'আজ সন্ধ্যার নাটকটা জমে উঠত, যদি ওখানে তপেশ মজুমদার আর তাঁর মেয়ে উপস্থিত থাকত।'

'কেন?'

এই সময় ড্রয়িংরুমে টেলিফোন বেজে উঠল। ডাইনিং রুমের পাশে কর্নেলের বেডরুমে টেলিফোন লাইনের এক্সটেনশন আছে। ষষ্ঠীচরণ টেলিফোন ধরতে পা বাড়িয়েছিল। কর্নেল নিজেই দ্রুত বেডরুমে গিয়ে ঢুকলেন। তাঁর কথা শোনা যাচ্ছিল। 'হ্যাঁ, বলছি।...ঠিক আছে। আপনার চিন্তার কারণ নেই।..হ্যাঁ। একটু রিস্ক তো নিতেই হবে।...ঠিক বলেছেন। ধড়িবাজ লোক। সবাইকে হাতে রেখেছে। বোঝা যাচ্ছে।...না, না। কিছু মনে করিনি। প্রথমে আপনাকে ভুল বুঝেছিলুম। পরে বুঝলুম, আপনি আমাকে মিথ্যা বলেননি। এ ধরনের জোক করা স্বাভাবিক। কারণ লোকটা তো প্রকাণ্ড লোভী।... আচ্ছা। ছাড়ছি। জাস্ট এ মোমেন্ট। আপনাকে গার্ড দেওয়ার লোক থাকবে। কাজেই রিস্ক নিন।...থ্যাংকস।'

কর্নেল ফিরে এলে বললুম, 'কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?'

উনি চোখ কটমটিয়ে বললেন, 'খাওয়ার সময় কথা বলতে নেই।'...

ব্রেকফাস্টের পর ড্রয়িংরুমে গিয়ে কর্নেল চুরুট ধরালেন। নিয়মমতো ষষ্ঠীচরণ কফি দিয়ে গেল। চুরুট এবং কফি পর্যায়ক্রমে সেবন করা কর্নেলের অভ্যাস।

কিছুক্ষণ পরে বললুম, 'এখন কি কোথাও বেরুবেন?'

কর্নেল এ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে টেবিলের নিচের ড্রয়ার খুলে একগুচ্ছের রঙিন ইংরেজি পত্রিকা বের করলেন। পত্রিকাগুলো দেখমাত্র চিনতে পারলুম, হালদারমশাই এগুলো সুরেশ সরকার রোডে শ্রীলেখাদের বাড়ির নিচের রাস্তায় আবর্জনার গাদায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।

দেখলুম, কর্নেল পত্রিকাগুলো দু'ভাগ করে টেবিলে রাখছেন। বললুম, 'এগুলোর কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। কিন্তু ভাগাভাগি করছেন কেন?'

কর্নেল হাসলেন। 'হালদারমশাইয়ের কুড়িয়ে পাওয়া পত্রিকাগুলো আমার। আর এইগুলো তুমি আমার কিটব্যাগ থেকে বের করতে দেখেছিলে। এগুলো তোমাকেই দিচ্ছি। এগুলো তোমার মতো যুবকের কাছেও লোভনীয়।'

উনি খানছয়েক পত্রিকা আমার সামনে সোফায় সেন্টার টেবিলে ফেলে দিলেন। ওপরের পত্রিকাটার নাম দেখেই চমকে উঠলুম। এ সেই কুখ্যাত বা সুখ্যাত মার্কিন সেক্সম্যাগাজিন 'প্লেবয়'! তখনই বাকি পত্রিকাগুলোর নাম দেখে নিয়ে দ্রুত পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে নগ্ন নারীদেহ, এমনকি জঘন্য অশালীন ও পাশবিক যৌনবিষয়ক ছবি চোখে পড়ার পর সশব্দে বুজিয়ে রাখলুম। বললুম, 'কর্নেল! আপনি আমার সঙ্গে এ ধরনের কদর্য রসিকতা করতে পারলেন? ছ্যা ছ্যা!'

কর্নেলকে গম্ভীর দেখাচ্ছিল। বললেন, 'এই বৃদ্ধবয়সে আমার মতিচ্ছন্ন দশা ঘটেনি। কিংবা আমি মানসিক বিকারগ্রস্তও হইনি। সেই বয়সটা আমি পার হয়ে এসেছি জয়ন্ত!'

'তাহলে এগুলো রেখেছেন কেন? আমাকেই বা দেখতে দিলেন কেন?'

'গতরাত্রে তোমাকে হাওড়া স্টেশনগামী ট্রেনে বসে জটিল রেললাইনের উপমা দিয়েছিলুম। মনে করো, এটা তারই অন্তর্গত একটা রেলওয়ে ট্র্যাক।'

'প্লিজ কর্নেল! আর হেঁয়ালি নয়।'

'এগুলো আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম। হালদারমশাই যেমন ওগুলো কুড়িয়ে পেয়েছিলেন।'

'ওই পত্রিকাগুলোও কি এমনি সেক্স-ম্যাগাজিন?'

'নাঃ! তুমি এগুলোও দেখতে পারো!' বলে কর্নেল পত্রিকাগুলো আমাকে দিলেন।

অবাক হয়ে দেখলুম, এই পত্রিকাগুলো সবই হর্টিকালচার এবং নার্সারি সংক্রান্ত। এদেশে এবং বিদেশে ছাপা রঙিন ছবিতে ভরা। কত রকমের ফুল, ক্যাকটাস, অর্কিড এবং বিচিত্র প্রজাতির উদ্ভিদের ছবি।

দেখে নিয়ে বললুম, 'রায়সায়েবের বাড়ির ওপরতলা থেকে এগুলো রাস্তায় পড়তে দেখেছিলেন হালদারমশাই। কিন্তু এই সেক্সম্যাগাজিনগুলো আপনি কোথায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন?'

কর্নেল এবার একটু হেসে বললেন, 'ওই বাড়িতে একজন লোকের কাছে সবগুলো পত্রিকাই ছিল। হর্টিকালচার বা নার্সারি সংক্রান্ত পত্রিকার প্রতি তার অনুরাগ না থাকবারই কথা। তা ছাড়া এগুলো প্রকাশ্যে রাখলে বাড়ির লোকের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। অত ঝুটঝামেলার চেয়ে এগুলো জানালা গলিয়ে ফেলে দেওয়াই ভালো। কাগজকুড়ুনিরা লুফে নেবে।'

'কিন্তু তাহলে সেক্সম্যাগাজিনগুলো সে কোন্ সাহসে রেখেছিল?'

'লোকটার মধ্যে স্বাভাবিক যৌনপ্রবৃত্তি আছে। তাই এগুলো সে রেখে দিয়েছিল।'

'আপনি পেলেন কোথায়?'

কর্নেল কিছুক্ষণ মিটিমিটি হাসলেন। তারপর বললেন, 'বইয়ে পড়েছি, স্বাভাবিক যৌনশক্তি কমে যাওয়ার পর নাকি মানুষের অবচেতনায় যৌনবিকার সৃষ্টি হয়। তার চাপে মানুষ নানা উপায়ে যৌন অতৃপ্তি চরিতার্থ করতে চায়। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা আমার রুচিতে বাধে। যাই হোক, আমাদের এই লোকটা সেক্সম্যাগাজিনের ছবি দেখে আনন্দ পেত। তাই এগুলো ফেলে দেয়নি। অর্থাৎ এগুলো রাখার লোভ সম্বরণ করতে পারেনি।'

বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কিন্তু আপনি এগুলো পেলেন কোথায়?'

'কুড়িয়ে পাইনি। চুরি করেছি।'

'বলেন কী! কোথা থেকে চুরি করলেন, তা বলতে এত লুকোছাপা করার মানে হয় না।'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'সেদিন আমি পিঠে কিটব্যাগ আর ক্যামেরা-বাইনোকুলারসহ তপেশবাবুর বাথরুমে ঢুকেছিলুম দেখে তুমি অবাক হয়েছিলে!'

সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলুম, 'কী আশ্চর্য! তা হলে আপনি তপেশবাবুর বাথরুম থেকে এই সেক্সম্যাগাজিনগুলো চুরি করেছিলেন?'

'ঠিক ধরেছ।'

'কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন যে বাথরুমে—'

কর্নেল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি অন্তর্যামী নই। আমার সত্যি বাথরুমে যাওয়ার দরকার হয়েছিল। তাই বলে দৈবাৎ বাথরুমে এগুলো চোখে পড়েছিল, এমন নয়। খুলেই বলি। ওই ফ্ল্যাটে দুটো বাথরুম আছে। ভেতরকার বাথরুমটা শ্রীলেখা ব্যবহার করে, এটাই স্বাভাবিক। আর, বসার ঘরের সংলগ্ন বাথরুমটা তপেশবাবু করেন, এ-ও স্বাভাবিক। তাই তপেশবাবুর বাথরুমটা আমার দেখার দরকার ছিল।'

'কিন্তু কেন?'

'আমি খুঁজছিলুম পত্রিকাগুলো তপেশবাবু কোথায় রেখেছেন? পত্রপত্রিকা লোকে বসার ঘরে সোফাসেটের সেন্টার টেবিলের ওপরে বা তলায় রাখে। সেখানে খবরের কাগজ ছাড়া কোনো পত্রিকা দেখিনি।'

'আপনি কেমন করে জানলেন তপেশবাবুর কাছে এই পত্রিকাগুলো আছে?'

'অঙ্ক জয়ন্ত! স্রেফ অঙ্ক!'

'ওঃ কর্নেল! আপনার মুখে অঙ্কটঙ্ক শুনলে মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে যায়।'

'তুমি সেদিন একটু কান খোলা রাখলে শুনতে পেতে, আমি শ্রীলেখাকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, তার বাবার ম্যাগাজিন পড়ার অভ্যাস আছে কি না। শ্রীলেখা বলেছিল, তার বাবা শুধু নিউজপেপার পড়েন।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। কর্নেল রিসিভার তুলে সাড়া দিলেন। ততক্ষণে আমার মনে পড়ে গেল, সেদিন কর্নেল শ্রীলেখাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তার বাবা ম্যাগাজিন পড়েন কি না। শ্রীলেখা বলেছিল, 'বাবা শুধু নিউজপেপার পড়ে।'

টেলিফোন কর্নেলকে বলতে শুনলুম, '...মল্লিকমশাই! আপনি যা ভালো বুঝেছেন, তা-ই করেছেন! আপনি তো জানেন, জমিজমা বা প্রপার্টির ব্যাপার আমার কোনো জ্ঞানগম্যি নেই।...কুড়ি লাখ?...অ্যাডভান্স করেছেন। নাকি?...বলেন কী! বাগান-বাড়িটার নাম তো সুন্দর। নন্দনকানন। বাঃ! খুব ভাল।...আজ সন্ধ্যায়? কিন্তু আমাকে তো রাজেনবাবু নিমন্ত্রণ করেননি। বিনা নিমন্ত্রণে পার্টিতে যাই কী করে?...হ্যাঁ। তখন যাব। আপনি কিনে বরং নিজেই একটা পার্টি দেবেন। না হয় পিকনিক।...দশ লাখ অ্যাডভান্স? বেশ তো! কিন্তু ডিড রেজিস্টার্ড কিনা জেনে নিয়েছেন তো?...রেজিস্টার্ড ডিডের কপি হলে আর কথা কী?...হ্যাঁ। নিজের ল-ইয়ার সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত।...আচ্ছা! ছাড়লুম।'

রিসিভার রেখে কর্নেল আমার দিকে তাকালেন। বললুম, 'সর্বনাশ! হারাধন মল্লিককে কুড়ি লাখে নন্দনকানন বেচছেন রাজেনবাবু? মল্লিকমশাইকে আপনি নিষেধ করলেন না?'

কর্নেল বললেন, 'মল্লিকমশাইকে নিষেধ করলেও শুনবেন বলে মনে হয় না। বিজ্ঞাপন দেখার পর থেকেই ওঁর মাথায় ওই বাগানবাড়িটা ঢুকে গিয়েছে। আর, নিষেধ করতে হলে সব কথা খুলে বলতে হয়। টেলিফোনে অত কথা বলা সম্ভব নয়। যাই হোক, এতক্ষণে বোঝা গেল রাজেনবাবু নন্দনকাননে পার্টি দিচ্ছেন কেন এবং এ-ও বোঝা গেল, কাউকে জাল রায়সায়েব সাজিয়ে এত শিগগির ডিড রেজিস্ট্রি করালেন কেন। রেজিস্টার্ড ডিডের নকল বের করেছেনও খুব তাড়াতাড়ি। মল্লিকমশাই খুলে না বললেও বোঝা যাচ্ছে, রাজেনবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন। রাজেনবাবু এই দাঁও ছাড়তে চাননি। যত শিগগির হাতে কুড়ি লাখ টাকা আসে, তত ওঁর সুবিধে। আকাশে পাখা মেলবেন।'

বললুম, 'তা বুঝলুম। কিন্তু রায়সায়েবের মেয়ে-জামাইকে রাজেনবাবু নেমন্তন্ন করতে গেলেন কেন?'

'ওরা উপস্থিত থাকলে মল্লিকমশাইয়ের মনে আর কোনো সন্দেহের ছিটেফোঁটাও থাকবে না। ভেবে দ্যাখো জয়ন্ত, আমি যদি শর্বরীকে খুঁচিয়ে না দিতুম—অর্থাৎ কাউকে জাল রায়সায়েব সাজিয়ে ডিড রেজিস্ট্রি করার কথা না বলে দিতুম, শর্বরী ব্যাপারটা নিয়ে মাথা ঘামাত না। যদি বা ঘামাত, রাজেনবাবু আর প্রদোষ আইনের ফ্যাকড়া দেখিয়ে তাকে চুপ করিয়ে রাখত।'

'সবাই বোঝা গেল। কিন্তু শ্রীলেখার বিছানা থেকে ব্রিফকেস ভর্তি টাকা চুরি করল কে?'

'তপেশবাবু আর তাঁর মেয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, ঘনশ্যাম নন্দীই চোর।'

'আপনার বিশ্বাসটা কী, তা-ই বলুন!'

কর্নেল আবার একটা চুরুট ধরিয়ে একরাশ ধোঁয়ার মধ্যে বললেন, 'আশা করি, আজ সন্ধ্যায় এই রহস্যের পর্দা তুলতে পারব।'...

কথামতো সেদিন বিকেল তিনটেয় আমার সল্টলেকের ফ্ল্যাটে কর্নেল ট্যাক্সি চেপে পৌঁছুলেন। আমি তৈরি ছিলুম। গ্যারাজ থেকে আমার গাড়ি বের করে বললুম, 'ইতিমধ্যে নতুন কিছু ঘটেনি তো?'

গাড়িতে চেপে কর্নেল বললেন, 'সাড়ে বারোটায় প্রদোষ টেলিফোন করেছিল।'

'তার মানে, আপনাকে খুব ধমক দিল? গণেশকে আপনার পিছনে লেলিয়ে দেবে বলল?'

কর্নেল আমার রসিকতায় কান দিলেন না। বললেন, 'ঘনশ্যাম নন্দী গিয়ে শর্বরীকে বুঝিয়ে দিয়েছে, শ্রীলেখার সঙ্গে রায়সায়েবের অবৈধ সম্পর্কের কথা সে জানে। তার মেয়ে রেখাও ব্যাপারটা জানে। রায়সায়েবের ব্রিফকেসভর্তি পাঁচ লাখ টাকা শ্রীলেখা হাতিয়ে নিয়েছে। তাই তার বিরুদ্ধে শর্বরী ও প্রদোষ কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা জানবার জন্যই শ্রীলেখা প্রাইভেট ডিটেকটিভ হায়ার করেছে। সেই প্রাইভেট ডিটেকটিভ শর্বরীকে মিসলিড করতে চায়।'

'প্রদোষ বলল?'

'হ্যাঁ। প্রদোষ এইসব কথা বলার পর আমাকে থ্রেট করল। তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি যদি ওদের ব্যাপার নাক গলাই, তা হলে গণেশ তার দলবল নিয়ে আমার ওপর হামলা করবে। ইলিয়ট রোডের কাছেই রিপন স্ট্রিট এলাকায় গণেশের লোকজন আছে।'

'তা হলে শর্বরী বারাসত যায়নি?'

'না। কাজেই আজ সন্ধ্যায় নন্দনকাননে রাজেনবাবুর পার্টিতে ওরা যে যাবে, তা ধরে নেওয়া যায়। ঘনশ্যাম ও গণেশও সম্ভবত যাবে। কারণ সাহিল খানের গ্যারাজ কেনার ব্যাপারে নাকি রাজেনবাবুর সাহায্য প্রদোষ ও ঘনশ্যামের দরকার। প্রদোষ নিজের মুখেই তা কাল রাত্রে বলছিল। তুমি শুনেছ সে-কথা।'

'রাজেনবাবুর সাহায্য মানেটা কী?'

কর্নেল চুরুট ধরিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে পড়ার আগে বেনেপুকুর থানার এক পরিচিত অফিসারকে ফোন করেছিলুম। তিনি বললেন, সাহিল খানের নামে চোরাই গাড়ি সংক্রান্ত একটা মামলা ঝুলছে। তাই তার গ্যারেজের কাজকর্ম বন্ধ। ওর দুজন মেকানিককে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছিল। এইসব কারণে সাহিল খানের গ্যারেজে কেউ কাজ করতে চায় না। গ্যারেজ অচল হয়ে গেছে। বেচে না দিয়ে উপায় কী?'

'কিন্তু রাজেনবাবুর ভূমিকাটা কী?'

'রাজেন মুখার্জি সাহিল খানের বন্ধু। তার কেস মিটিয়ে দেবার ব্যাপারে রাজেনবাবু অনেকদিন ধরে তদ্বির করছেন। প্রায়ই নাকি তিনি বেনেপুকুর থানায় একজন নামজাদা ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ারকে নিয়ে যাতায়াত করেন। আদালতের বাইরে ওরকম একটা কেস মিটমাট হওয়া নিশ্চয় কঠিন। কিন্তু এতেই সাহিল খানের রাজেনবাবুর প্রতি অনুরক্ত হওয়া স্বাভাবিক।'

'অনুরক্ত বলে গ্যারেজের দরদাম কমাবেন সাহিল খান?'

কর্নেল একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'থিয়েটার রোড এলাকার সেই গ্যারাজের মালিক সরলবাবুকে টেলিফোন করে বাকিটুকু জেনেছি। বলেছিলুম না? ওঁদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা থাকে। সরলবাবু খবর পেয়েছেন, সাহিল খান তিন লাখ অ্যাডভান্স পেয়েছেন। বাকি বারো লাখ ছ'মাসের মধ্যে দুই কিস্তিতে নেওয়ার পর সেলডিড রেজিস্ট্রি হবে। ছ'মাস কাজ চালাতে পারলে টাকা শোধ করা ঘনশ্যামের পক্ষে কঠিন নয়। এদিকে প্রদোষ তো তার পাশে থাকছে। মোদ্দা কথা, রাজেন মুখার্জি ওদের গ্যারান্টার।'

'প্রদোষের সোর্স অব ইনকাম কী! রায়সায়েব তো তাঁর পালিতা কন্যা আর তার স্বামীকে বিশ্বাস করতেন না।'

'ওটা তাঁর নিছক পাগলামি ছিল। কিংবা শ্রীলেখা বানিয়ে বলেছে। তুমি একটু চিন্তা করলেই বুঝবে, পালিতা কন্যার প্রতি অমন সাংঘাতিক সন্দেহ থাকলে কি তিনি তার নামে সব সম্পত্তি উইল করতেন?'

'সত্যিই উইল করে গিয়েছেন কি না কে জানে!'

'আমি জানি। জেনেছি। তোমাকে বলেছিলুম, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। আস্তে সুস্থে এগোব। মধ্যে দুটো দিন আমি ঠাণ্ডা মাথায় অনেকটা এগিয়ে যেতে পেরেছি।' বলে কর্নেল ঘড়ি দেখছেন। 'তুমি কিন্তু বড্ড বেশি তাড়াহুড়ো করছ জয়ন্ত! আস্তে গাড়ি চালাও। সাড়ে তিনটের মধ্যে এয়ারপোর্টের মোড়ে এসে গেলুম?'

'এটা কিন্তু স্বাভাবিক স্পিড, বস! এই রাস্তায় এর চেয়ে আস্তে চালালে অ্যাকসিডেন্টের আশঙ্কা ছিল।'

'তুমি বস বলা ছাড়ো ডার্লিং! লালবাজারের ডি সি ডি ডি ওয়ান অরিজিৎ লাহিড়ির দেখাদেখি তুমি বস বলা শুরু করেছ! অরিজিতের মুখে এটা মানায়।' বলে কর্নেল বাঁদিকে ঘুরে কিছু দেখতে থাকলেন।

ডাইনে মোড় নিয়ে যশোর রোড দিয়ে গাড়ি চলেছে। সামনে গাড়ির লম্বা লাইন। যে-কোনো সময় যানজট বেধে যেতে পারে। কর্নেল বললেন, 'বাঃ! সময় কাটানোর চমৎকার জায়গা। বাঁদিকে গাড়ির চাকা নামিয়ে দাও। অসাধারণ নামটা তো! বন্ধুমহল! হট অ্যান্ড কোল্ড ড্রিংকস—এই শীতে কেউ কোল্ড ড্রিংক খাবে

কি? আসলে সাইনবোর্ডের লেখা বদলানোর মানে হয় না। শুধু পানীয় নয়। কেক, প্যাস্ট্রি—সন্দেশ পর্যন্ত! এমন কি চাউমিনও! ডার্লিং! আমরা দু'পেয়লা কফি নিয়ে ভেতরে বসব। এখানে গাড়ি রাখার অসুবিধে নেই।'...

কর্নেল মাঝে মাঝে—যাকে বলে, 'ফানি' হয়ে ওঠেন। আমাদের খুব খাতির করে ঢোকাল বন্ধুমহলে। পিঠে কিটব্যাগ আঁটা এবং গলায় বাইনোকুলার-ক্যামেরা ঝোলানো সাদা দাড়িওয়ালা মাথায় টুপিপরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ বৃদ্ধকে দেখে যে বন্ধুমহলের উর্দিপরা পরিচারকরা বিদেশি ট্যুরিস্ট ভেবেছে, তাতে আমি নিঃসন্দেহ। এ-ও ভেবেছে, 'প্রেস' স্টিকার আঁটা গাড়ি মানেই যখন খবরের কাগজের গাড়ি, তখন এক সাংবাদিক সদ্য এয়ারপোর্টে প্লেন থেকে নামা এই বৃদ্ধ সায়েব ট্যুরিস্টকে কোথাও কোনো দর্শনীয় স্থান দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে।

এর ফলে দু'পেয়ালা কফির বিল এল কুড়ি টাকা।

টাকা অবশ্য কর্নেলই দিলেন। তারপর যখন আবার গাড়িতে চেপে স্টার্ট দিলুম, তখন আলো জ্বলে উঠেছে। সাড়ে চারটেতেই ছদ্ম-সন্ধ্যার ঘোর। তাকে জমাট করেছে রাস্তার যানবাহনের চাকা থেকে উৎক্ষিপ্ত ধুলোবালি। একেই বলে ধোঁয়া।....

মধ্যমগ্রামের চৌরাস্তার কাছে সেদিনকার মতো সাদা পোশাকে প্রশান্ত ব্যানার্জি অপেক্ষা করছিলেন। ব্যাকসিটে বসে তিনি চাপা স্বরে কর্নেলকে বললেন, 'বড়বাবুর কোয়ার্টারের সামনে গাড়ি রাখাটা সেফ। যেখানে-সেখানে গাড়ি রাখা উচিত হবে না। গতকাল এক ভদ্রলোকের বাড়ির সামনে থেকে একটা গাড়ি চুরি হয়েছে।'

প্রশান্তবাবুর নির্দেশে আঁকাবাঁকা রাস্তা ও গলি ঘুরে পুলিশ কোয়ার্টারের গেট পেরিয়ে একখানে গাড়ি দাঁড় করালুম। তারপর প্রশান্তবাবু আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। ওসি-র সঙ্গে আলাপ হলো। শৈলেশ সিংহ তাঁর নাম। কর্নেলের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারলুম, পুলিশ ফোর্স তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে। ছটার মধ্যে নন্দনকাননের পিছনে গিয়ে ওত পাতবে। আমরা পৌঁছুব সওয়া ছটা নাগাদ।

অবাক হয়ে ভাবছিলুম, এ ধরনের এলাহি কাণ্ডের উদ্দেশ্য কী? একটা বাগানবাড়িতে পার্টি হচ্ছে। সেখানে সেই বাড়িটা বিক্রির ব্যাপারে দশ লাখ টাকা আডভান্স দেওয়া-নেওয়া এমন কি বেআইনি কাজ? এ তো ইনকাম ট্যাক্সের লোকেদের হানা দেওয়া নয়। পুলিশ হানা দেবে। কেন হানা দেবে?

কিছুক্ষণ পরে শৈলেশ সিংহের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লুম। একটু পরে বুঝলুম, অন্যপথে নন্দনকাননের দিকে চলেছি। প্রায় মিনিট কুড়ি পরে (আমার অনুমান মাত্র) সামনে একটু দূরে অনেকগুলো আলো দেখতে পেলুম। তারপর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে একটা পাঁচিলের কাছে যেই পৌঁছেছি,

হালদারমশাইয়ের গর্জন ভেসে এল। 'হ্যান্ডস আপ। এট্টুখানি নড়লে হালার খুলি উড়াইয়া দিমু।' সেই সঙ্গে টর্চের আলো জ্বলে উঠল।

পাঁচিলটা ফুট ছয়েক উঁচু। পাঁচিল ডিঙিয়ে পুলিশের লোকেরা ঢুকে পড়ল। কর্নেল আমার হাত ধরে টানলেন। কিন্তু তার আগেই পাঁচিলের ওপর মুখ বাড়িয়ে দেখে নিয়েছি, রাজেনবাবুর হাতে ছোরা এবং একটা লোক পিছু হটছে।...

নয়

কর্নেল আমার হাত ধরে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে গেটের সামনে গিয়ে বলেছিলেন, 'পুলিশ পাঁচিল ডিঙিয়েছে। কাজেই আমাদের পাঁচিল ডিঙিয়ে যাওয়ার দরকার নেই।'

আমি হতবাক। গেটের বাইরে এবং ভেতরে কয়েকটা গাড়ি দেখতে পেয়েছিলুম। বাড়ির সামনের দিকে অনেকগুলো আলো জ্বলছিল। ঘরের ভেতরও যথেষ্ট আলো। কিন্তু বাকি তিনদিক অন্ধকার।

বারান্দায় ওঠার আগে কর্নেল ডেকেছিলেন, 'হালদারমশাই! আপনি কোথায়?'

বাড়ির পিছন দিক থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গিয়েছিল। 'ড্রেস চেঞ্জ করতাছি কর্নেলস্যার!'

সামনে চওড়া একটা ঘরের ভেতর বিশাল ডিমালো গড়নের একটা শ্বেতপাথরের টেবিল ঘিরে যাঁরা বসে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাজেনবাবুর লইয়ার কুমুদ সেনগুপ্ত, হারাধন মল্লিক, প্রদোষ ও শর্বরীকেই শুধু চিনতে পেরেছিলুম। টেবিলে কয়েকটা হুইস্কি ও রামের বোতল, কয়েকটা ডিশে স্তূপীকৃত মাছভাজা, কষা মাংস, চানাচুর, পাঁপরভাজা ইত্যাদি চোখে পড়েছিল।

সবাই পুতুলের মতো নিস্পন্দ হয়ে বসে ছিল। পাশের ঘর থেকে কয়েকজন লাঠি ও বন্দুকধারী পুলিশ এসে ঢুকল। তারপর রাজেন মুখার্জিকে পেছনে দুই হাতে হাতকড়া পরানো অবস্থায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলেন প্রশান্ত ব্যানার্জি। তাঁর পিছনে ওসি শৈলেশ সিংহ ছিলেন। তিনি যাকে নিয়ে এলেন, তাঁকে দেখে চমকে উঠলুম। তিনি কুমুদবাবুর জুনিয়র সেই শৈবাল ঘোষ।

শৈবাল ঘোষের মুখে উদ্‌ভ্রান্ত ভাব এবং পোশাকও এলোমেলো। তিনি ঘনঘন শ্বাস নিচ্ছিলেন। অতিকষ্টে বললেন, 'জল খাব।'

শৈলেশ সিংহ টেবিল থেকে জলের আস্ত জগটা তুলে তাঁকে দিলেন শৈবালবাবু ঢকঢক করে জল খেয়ে বললেন, 'আমি বসব।'

একজন কনস্টেবল তাঁকে কোণের দিক থেকে একটা চেয়ার এসে দিল। তিনি ধপাস করে বসে বড়লেন। তারপর দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠলেন। শৈলেশ সিংহ তাঁর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'চিয়ার আপ শৈবালবাবু! কর্নেলসায়েব আপনাকে রক্ষার জন্য উপযুক্ত গার্ড রেখেছিলেন। ছোরাটা দিন প্রশান্তবাবু।'

প্রশান্ত ব্যানার্জির হাতে একটা ছোরা ছিল। ওটাই আমি একপলকের জন্য রাজেনবাবুর হাতে দেখেছিলুম। শৈলেশ সিংহ ছোরাটা দেখিয়ে কুমুদবাবুকে বললেন, 'রাজেন মুখার্জি এটা দিয়েই আপনার জুনিয়র অ্যাডভোকেটের মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করতে চেয়েছিল।'

'পারে নাই!' বলে সদর্পে হালদারমশাই এসে ঘরে ঢুকলেন। 'আমি ওত পাতছিলাম। এনারে লইয়া বাড়ির পিছনে কয় পাও গেছে, অমনই টর্চ জ্বালছি। এক সেকেন্ড দেরি হইলে ফাঁসাইয়া দিত। আচমকা এনার পেটে ধাক্কা মারছিল এই হালায়। ইনি ধাক্কা খাইয়া মাটিতে পড়লে বাঁচার উপায় ছিল না।'

শৈবালবাবু হাঁসফাঁস করে জড়ানো গলায় বলে উঠলেন, 'আমাকে ওই খুনে শয়তান একটা গোপন কথা বলবে বলে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে আমি ক'পেগ হুইস্কি খেয়ে ফেলেছিলুম। তাই—'

কর্নেল একটু হেসে বললেন, 'থাক। চুপচাপ বসে থাকুন। হালদারমশাই! আপনার চ্যালা কোথায় গেল?'

হালদারমশাই চমকে উঠলেন। 'অ্যাঃ! সে গেল কই?' বলে তিনি বেরুতে যাচ্ছেন, একজন কনস্টেবল রঘুকে নিয়ে দরজার সামনে এল।

রঘু কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, 'আমি তো পালাইনি। এই বলাইদার সঙ্গে কথা বলছিলুম। আমি পালাব কেন?'

কর্নেল হাসতে হাসতে বললেন, 'রঘু একজন ম্যাজিসিয়ান। ভেনট্রিলোকুইজম্ অর্থাৎ স্বরজাদুর কথা আপনারা নিশ্চয় জানেন। রঘু সেই বিদ্যায় ওস্তাদ। সেদিন বিকেলে সে আমাদের কাছে বসে স্বরজাদুর খেলা দেখিয়েছিল। সে আমাদের কাছে, অথচ এই ঘরের ভেতর থেকে গোঙানির শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আমিও এই বিদ্যাটা জানি। ওর গলার দিকে লক্ষ্য রেখেই টের পেয়েছিলুম। এই বাড়িকে রঘু ভূতের বাড়ি করে ফেলেছে। কিন্তু কার হুকুমে? মিঃ সিংহ! রঘুর কাছে কথাটা জেনে নিন।'

শৈলেশ সিংহ তার পেটে রুলের গুঁতো মারতে এলে রঘু বলে উঠল, 'রাজেনবাবু আমাকে মাসে-মাসে তিরিশ টাকা করে দিতেন। রায়সায়েবের ওয়াইফ সুইসাইড করার পর থেকে রাজেনবাবু আমাকে এই কাজে লাগিয়েছিলেন জিজ্ঞেস করুন মিথ্যা বলছি, না সত্যি বলছি।'

শৈলেশ সিংহ বললেন, 'এই রাজেনবাবু কেমন করে জানল যে তুই এই ম্যাজিক জানিস?'

'রাজেনবাবুই তো আমাকে রায়সায়েবের এই বাগানবাড়িতে চাকরি জুটিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কলকাতার ফুটপাত ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াতুম। খুব কষ্টে ছিলুম। তারপর একদিন—'

তাকে থামিয়ে কর্নেল বললেন, 'রায়সায়েবের কাছ থেকে এই বাগানবাড়ি শস্তায় কেনার জন্যই রাজেন মুখার্জি রঘুকে কাজে লাগিয়েছিল। তবে ও কথা

থাক। আপনারা সব পুতুলের মতো বসে আছেন কেন? কী মল্লিকমশাই? দশ লাখ টাকা কি অ্যাডভান্স করে ফেলেছেন?'

হারাধন মল্লিক বললেন, 'আজ্ঞে না। এই যে আমার ল-ইয়ার যতীনবাবু। ইনি চুপিচুপি বলেছিলেন, এই মদের আসরে টাকা অ্যাডভান্স করা বা দলিলপত্র সই করানো ঠিক হবে না।'

'টাকা কি সঙ্গে আছে আপনার?'

মল্লিকমশাই হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'আমার মাথা খারাপ? টাকা আমি গাড়িতে রেখে এসেছি। আমার ছেলে অশোক গাড়িতে বসে আছে।'

হালদারমশাই শৈবালবাবুকে দেখিয়ে বললেন, 'কিন্তু এনারে রাজেন হালায় জবাই করত ক্যান?'

কর্নেল বললেন, 'সংক্ষেপে বলছি। গত সপ্তাহে শুক্রবার সন্ধ্যায় নতুন ব্রিফকেসের ভেতর পাঁচ লাখ টাকা ভরে রায়সায়েব ডিডে সই করেছিলেন। রাজেনের লইয়ার কুমুদবাবু এখানে আছেন। তাঁর বাড়ি থেকে রায়সায়েব সন্ধ্যায় টাকাভর্তি নতুন ব্রিফকেস নিয়ে নিজের গাড়িতে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে ওঠে এই রাজেন মুখার্জি এবং কুমুদবাবুর জুনিয়র শৈবালবাবু। শৈবালবাবু ব্যাকসিটে বসে ছিলেন। গাড়ি ড্রাইভ করছিলেন রায়সায়েব। এয়ারপোর্ট হোটেলের বারে রাজেন রায়সায়েবকে সেলিব্রেট করার প্রস্তাব দিয়েছিল। রায়সায়েব মদে আসক্ত মানুষ। তিনজনে বারে ঢোকেন। টেবিলে তিনজনে হুইস্কি খাচ্ছিলেন। একসময় শৈবালবাবুর চোখে পড়ে, রাজেনের ব্রিফকেসটাও নতুন এবং একই কোম্পানির তৈরি। বয়স্ক এবং ভগ্নস্বাস্থ্য এক বৃদ্ধ মানুষ মহেন্দ্র রায়ের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে রাজেন দুটো কাজ করে। শৈবালবাবু প্রথমটা দেখতে পেয়েছিলেন। রাজেন টেবিল থেকে ওঠার সময় রায়সায়েবের ব্রিফকেসটা নিয়ে নিজের ব্রিফকেসটা রায়সায়েবের হাতে তুলে দেয়। দ্বিতীয়টা আমি তদন্ত করে জেনেছি। রায়সায়েবের গ্লাসে রাজেন কড়া জোলাপ জাতীয় কোনো তরল ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছিল। তার ফলে বাড়ি ফিরে তিনি পেটের অসুখে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে গিয়ে হার্টফেল করে মারা যান।'

শর্বরী এতক্ষণে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। প্রদোষ বলল, 'পরে কাঁদবে। কথাগুলো শোনো।'

কর্নেল বললেন, 'রায়সায়েবকে রাজেন যে ব্রিফকেসটা দিয়েছিল, তাতে ভরা ছিল প্রচুর রঙিন বিদেশি ম্যাগাজিন। এক ডজন আর্টপেপারে ছাপা ম্যাগাজিনের ওজন আছে। রায়সায়েবের পক্ষে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বোঝা সম্ভব ছিল না তাঁর ব্রিফকেসে আসলে কী আছে কিংবা তাঁর ব্রিফকেসটা বদল হয়ে গিয়েছে।'

প্রদোষ বলল, 'সেই ব্রিফকেসটা কেউ চুরি করেছিল। পরে তালাভাঙা অবস্থায় শ্বশুরমশাইয়ের গাড়ির তলায় সে ফেলে রেখেছিল ব্রিফকেসটা।'

কর্নেল বললেন, 'হালদারমশাই সুরেশ সরকার রোডে রায়সায়েবের বাড়ির নিচে আবর্জনার গাদায় কতকগুলো রঙিন ম্যাগাজিন কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। সেগুলো হর্টিকালচার এবং নার্সারি সংক্রান্ত দামি ম্যাগাজিন। সেগুলো দেখামাত্র আবার সন্দেহ জেগেছিল, রাজেন এই মল্লিকমশাইয়ের নার্সারির পার্টনার ছিল। এদিকে সেদিনই ব্রিফকেসটা তালাভাঙা অবস্থায় পাওয়া গেছে। অমনই আমার সন্দেহ হলো, রাজেন কি কোনো এক সুযোগে শুক্রবার রাত্রে ব্রিফকেস বদল করে রায়সায়েবকে ফাঁকি দিয়েছিল? সেইসময়— রাজেনের মুখে শুনলুম, কেউ তাকে পাঁচ লাখের অর্ধেক দেবার জন্য হুমকি দিচ্ছে। সে কে হতে পারে? কেন সে হুমকি দিচ্ছে? আমার মনে পড়ে গেল, শুক্রবার রাত্রে কলকাতা ফেরার সময় শৈবালবাবু সঙ্গে ছিলেন। তাই সোজা তাঁকে টেলিফোনে চার্জ করলুম। পুলিশের ভয় দেখালুম। এমনকি তাঁকে রাজেনবাবুর হাত থেকে বাঁচানোর জন্য বাইরে কোথাও যেতে বললুম। প্রথমে শৈবালবাবু লোভে পড়েছিলেন। পরে আমার সঙ্গে গোপনে দেখা করে ব্রিফকেস বদলের ঘটনা বললেন। আমি ফাঁদ পাতার সুযোগ খুঁজছিলুম। পেয়েও গেলুম। মল্লিকমশাইয়ের নন্দনকানন কেনার প্রচণ্ড ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ডিড তো আনরেজিস্টার্ড। তাই রাজেন কাউকে জাল রায়সায়েব সাজিয়ে ডিড রেজিস্ট্রি করেছে। এই খবরও পেয়ে গেলুম। রেজিস্টার্ড ডিডের নকল বের করা সহজ। রাজেন এই পার্টির আয়োজন করল। সে ইতিমধ্যে টের পেয়েছিল শৈবালবাবু তার ব্রিফকেস বদল দেখেছেন। কারণ আমি শৈবালবাবুকে পরামর্শ দিয়েছিলুম, আসল ঘটনা বলে রাজেনের ওপর চাপ দিন। রাজেন আজ পার্টিতে তাকে নিমন্ত্রণ করে রফা করতে চেয়েছিল। শৈবালবাবুকে সে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল কিন্তু শৈবালবাবুকে আমি টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছিলুম।'

শৈলেশ সিংহ বললেন, 'সাংঘাতিক রফা! অবশ্য আপনার টোপও সাংঘাতিক।'

'হ্যাঁ। আমি বুঝতে পেরেছিলুম, রাজেন শৈবালবাবুর মুখ চিরকালের জন্য বন্ধ করতে না পারলে এই বাগানবাড়ি কেউ কিনবে না। শৈবালবাবু তাঁর সিনিয়র কুমুদবাবুর কাছে ক্রেতার খোঁজ পাবেন এবং জাল রায়সায়েব সাজিয়ে রাজেনের ডিড রেজেস্ট্রির কথা ফাঁস করে দেবেন।'

প্রদোষ বললেন, 'আমার শ্বশুরমশাইয়ের ফায়ার আর্মস চুরি গেছে।'

কর্নেল হাসলেন। 'ওটা নিছক টয় পিস্তল। যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমায় ব্যবহার করা হয়। রায়সায়েবের অনেক বদনাম ছিল পুলিশ মহলে। তাঁর সত্যিকার ফায়ার আর্মসের লাইসেন্স পেতে অসুবিধে ছিল। তাই তিনি ওই টয় পিস্তল দেখিয়ে বহু লোককে তটস্থ রাখতেন। টয় পিস্তলটা আমার হাতে এসে গেছে। আমি ওটা কুড়িয়ে পেয়েছি। এই দেখুন।'

বলে কর্নেল ওসি শৈলেশ সিংহকে বেল্ট এবং কেসসুদ্ধ টয় পিস্তলটা পরীক্ষা করতে দিলেন। মি. সিংহ সেটা দেখার পর হেসে ফেললেন। 'হ্যাঁ। নিছক খেলার অস্ত্র!'

শর্বরী কান্নাজড়ানো গলায় বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পেরেছি। তপেশবাবুর মেয়ে শ্রীলেখাই বাবার ব্রিফকেস আর ওই টয় পিস্তল চুরি করেছিল। তারপর সে যখন দেখল, ব্রিফকেসে টাকা নেই, আর ওটা টয় পিস্তল, তখন একে-একে দুটোই ফেলে দিয়েছিল।'

কর্নেল বললেন, 'শ্রীলেখা যে চুরি করেছিল, তা যখন প্রমাণ করা যাবে না, তখন চুরি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। তার চেয়ে বড় কথা, ফেলে দেওয়া ব্রিফকেসে টাকার বদলে ম্যাগাজিন ভরা ছিল। আর সত্যিকার ফায়ার আর্মসের বদলে আপনার বাবা টয় পিস্তল সঙ্গে রাখতেন। কাজেই যে-ই চুরি করুক, তার চুরি নিষ্ফল হয়েছে। শৈলেশবাবু! আমি এবার বিদায় নিচ্ছি। আপনারা আপনাদের কর্তব্য পালন করুন। আসুন হালদারমশাই! জয়ন্ত! চলে এসো।'

প্রশান্ত ব্যানার্জি বললেন, 'এক মিনিট কর্নেলসায়েব! আপনাদের সঙ্গে দুজন কনস্টেবল দিচ্ছি। পুলিশ কোয়ার্টারে আপনাদের গাড়ি আছে। কনস্টেবলরা সিকিউরিটির লোককে বলে না দিলে গাড়ি বের করার প্রব্লেম হবে।'...

* * *

কলকাতা ফেরার পথে প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে কে হালদার নন্দনকাননে তাঁর অভিজ্ঞতার বিররণ দিচ্ছিলেন। বিবরণ শেষ হলে তিনি একটিপ নস্যি নিয়ে বললেন, 'কিন্তু রায়সায়েবের ব্রিফকেস শ্রীলেখার ঘরে বিছানার তলায় রাখা ছিল। সেই ব্রিফকেস চুরি গেল। মিস্ট্রি সল্‌ভ করনের জন্যই শ্রীলেখা আমার সাহায্য চাইছিল। সেই মিস্ট্রি তো সল্‌ভ হইল না!'

কর্নেল বললেন, 'আপনার মিস্ট্রি আশা করি জয়ন্ত সল্‌ভ করে দিতে পারবে।'

হালদারমশাই অবাক হয়ে বললেন, 'আঃ! জয়ন্তবাবু? কন কী?'

বললুম, 'হালদারমশাই! শুধু এটুকু বলতে পারি শ্রীলেখার বাবা তপেশ মজুমদার রায়সায়েবের ব্রিফকেসে রাজেন মুখার্জির ভরে রাখা পত্রিকাগুলো হাতিয়েছিলেন।'

গোয়েন্দাপ্রবর বললেন, 'তার মানে, তপেশবাবুই ব্রিফকেস চুরি করছিলেন?'

কর্নেল বললেন, 'হ্যাঁ। তপেশবাবু তাঁদের সমিতি থেকে ফিরে তাঁর ফ্ল্যাটে রায়সায়েবকে কথা বলতে শুনে আড়ি পেতেছিলেন। এটাই আমার অঙ্ক। এছাড়া তাঁর পক্ষে শ্রীলেখাকে রায়সায়েবের ব্রিফকেস রাখতে দেওয়ার খবর কোনোভাবেই জানা সম্ভব নয়।'

বললুম, 'কিন্তু মেয়ের বিছানার তলা থেকে ব্রিফকেস চুরি করে তপেশবাবু কোথায় তা লুকিয়ে রেখেছিলেন?'

'তাঁর বাথরুমে। শ্রীলেখা তার বাবার বাথরুমে কেন ঢুকবে? ধরা যাক, বাবাকে যদি সে সন্দেহ করেও থাকে, তাঁর বাথরুমে পাঁচ লাখ টাকা ভর্তি ব্রিফকেস রাখার

সম্ভাবনা সে আঁচ করতে পারেনি। অত টাকা কি কেউ বাথরুমে রাখে? কিন্তু আসল কথাটা হলো, নিজের বাবাকে শ্রীলেখা সন্দেহই করেনি। ওটা ওর নিছক মুখের কথা। বাবাকে সন্দেহ করলে প্রাইভেট ডিটেকটিভের সাহায্য কি সে তার বাবার মাধ্যমে চাইত? নিজেই গোপনে কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সির কাছে যেত। আজকাল কাগজে এসব এজেন্সির বিজ্ঞাপন প্রায়ই ছাপা হয়।'

হালদারমশাই খিক খিক করে হেসে উঠলেন। 'ব্রিফকেসে টাকার বদলে ম্যাগাজিন দেইখ্যা তপেশবাবুর কী অবস্থা!'

কর্নেল বললেন, 'তবে খানছয়েক ম্যাগাজিন তাঁর দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছিল।'

বললুম, 'হ্যাঁ। সেক্সম্যাগাজিনগুলো।'

হালদারমশাই ব্যাকসিট থেকে ঝুঁকে এলেন। 'কী কইলেন? কী কইলেন?'

বললুম, 'কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে কফি খেতে খেতে দেখবেন। একটু অপেক্ষা করুন।'

কর্নেল বললেন, 'টয় পিস্তলটা কিন্তু চুরি করেছিল স্বয়ং শ্রীলেখা। এ-ও আমার অঙ্ক।'

'সে কী! শ্রীলেখা ওটা চুরি করবে কেন?'

'অঙ্ক কষে দ্যাখো। রায়সায়েব তাকে পাঁচ লাখ টাকা রাখতে দিয়ে মারা পড়েছেন। অতএব সেই টাকা রক্ষা করার স্বাভাবিক তাগিদে রায়সায়েবের বিছানা থেকে ওটা সে চুরি করেছিল। সে ওটা সত্যিকার ফায়ার আর্মস ভেবেছিল। টাকাভর্তি ব্রিফকেস চুরি গেল। তারপর সেটা পাওয়া গেল রায়সায়েবের গাড়ির তলায়। তখন হতাশ শ্রীলেখা ঘনশ্যাম নন্দীকে চোর সন্দেহ করে তাঁকে গুলি করে মারতে চেয়েছিল। অর্থাৎ মারার প্ল্যান করেছিল, এটা অনুমান করা যায়। কিন্তু ফায়ার আর্মসটা ব্যবহার করতে গিয়েই সে বুঝতে পারে, এটা খেলনা মাত্র। তখন সে রায়সায়েবের গাড়ির তলায় ফেলে দেয়। যাই হোক, আমার অঙ্ক নির্ভুল তার প্রমাণ কাল সকালে পাবে। তপেশবাবু আর শ্রীলেখাকে কাল সকাল নটার মধ্যে আসতে বলেছি।'

বললুম, 'ছেড়ে দিন। বাবা-মেয়েকে আর হ্যারাস করে কী হবে?'

হালদারমশাই শুধু বললেন, 'হঃ!'...

বাংলা রহস্যকাহিনীতে কর্নেল নীলাদ্রি সরকার এক অসামান্য সংযোজন। সান্টা ক্লোসের মতো সাদা দাড়িগোঁফ, টাকঢাকা টুপি, পিঠের কিটব্যাগ থেকে উঁকি দেয় প্রজাপতিধরা নেট-স্টিক, গলায় ঝুলন্ত বাইনোকুলার এবং ক্যামেরা, বিশালদেহী এই বৃদ্ধ, অথচ যুবকের মতো শক্তিমান মানুষটিকে সহসা দেখলে বিদেশি ট্যুরিস্ট বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু তিনি বাঙালি এবং সদালাপী সজ্জন ব্যক্তি। বিরল প্রজাতির পাখি, প্রজাপতি, ক্যাকটাস, অর্কিডের সন্ধানে তিনি দুর্গম পাহাড় জঙ্গল ও ঐতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ঘুরে বেড়ান। তবে তাঁর সেরা ব্যতিক রহস্যভেদ। কোনও রহস্যময় হত্যাকাণ্ড কিংবা জঘন্য অপরাধমূলক ঘটনা ঘটে গেলে অথবা তার কোনও আভাস পেলেই তিনি সেখানে ছুটে যান। অবলীলাক্রমে জটিল রহস্যের জট ভাজে ভাজে উন্মোচন করেন। তরুণ সাংবাদিক জয়ন্ত চৌধুরি, তদুপরি প্রাইভেট ডিটেকটিভ কে. কে হালদার ওরফে 'হালদারমশাই' যখনই কর্নেলের অ্যাপার্টমেন্টে হাজির হন, তখনই পাঠককে মেরুদণ্ড সোজা রেখে বসতে হয়। কারণ এবার এক ভয়াল-জটিল রহস্যের সূত্রপাত অনিবার্য। বাংলা কথাসাহিত্যে সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু রহস্যকাহিনী নির্মাণেও যে তিনি কত দক্ষ, তার প্রমাণ তাঁরই সৃষ্টি কর্নেল নীলাদ্রি সরকার। কর্নেলের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখে। ...